মার্কস এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

ভলিউম-২

খণ্ড -৪, ৫, ৬

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

৪

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том IV

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}176}{016(01)\text{-}79}$ 740-79 0101020000

সূচি

কার্ল মার্কস

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার (১)

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকা

এত অকালে যাঁর মৃত্যু ঘটল, আমার সেই বন্ধুবর **ইয়োজেফ ভেইডেমেয়ার*** ১৮৫২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নিউ ইয়র্কে একটি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করতে মনস্থ করেছিলেন। কুদেতার একটি ইতিহাস এই সাপ্তাহিকের জন্যে দিতে তিনি আমাকে আহ্বান জানান। সেইমতো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অবধি আমি সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ তাঁর জন্যে লিখেছিলাম 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' শিরোনামায়। ইতিমধ্যে ভেইডেমেয়ারের আদি পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। তার পরিবর্তে ১৮৫২ সালের বসন্তকালে তিনি Die Revolution নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, আর তার প্রথম সংখ্যা জুড়ে রইল আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'। সেই সময়ে এর কয়েকশত কপি জার্মানিতে পৌঁছে যায়, যদিও আসল বইয়ের বাজারে সেটা ঢোকে নি। চরম বামপন্থার ভান করে থাকেন এমন একজন জার্মান প্রকাশককে আমি আমার বইখানি বিক্রয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু 'যুগবিরুদ্ধ' এহেন 'ঔদ্ধত্য' দেখে তিনি ঘোর নীতিবাদীর মতোই স্তম্ভিত হয়ে যান।

উপরের তথ্যগুলি থেকেই বোঝা যাবে যে তৎকালীন ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ চাপেই বর্তমান রচনাটি রূপ নেয়, এবং এর ঐতিহাসিক মালমশলাতে ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরবর্তী কিছু নেই। বর্তমানে এর পুনর্মুদ্রণের

---

* আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে সেণ্ট লুই অঞ্চলের সামরিক অধ্যক্ষ। (মার্কসের টীকা।)

জন্যে দায়ী অংশত বইয়ের বাজারের চাহিদা, আর কিছু পরিমাণে জার্মানিতে আমার বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

এই বিষয়ে এবং আমার রচনা প্রকাশের প্রায় **সঙ্গে সঙ্গেই** লেখা আর দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা আছে — ভিক্তর হুগোর 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' এবং প্রুধোঁর 'কুদেতা'।

ভিক্তর হুগো 'কুদেতা'র দায়িত্বসম্পন্ন প্রকাশকের বিরুদ্ধে তিক্ত ও শ্লেষাত্মক কটূক্তি করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁর রচনায় ঘটনাটা দেখা দিয়েছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। একটিমাত্র মানুষের প্রচণ্ড কাজমাত্র তিনি এর মধ্যে দেখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে তার ফলে সেই লোকটিকে তিনি ক্ষুদ্র নয়, মহানই করে তুললেন , কারণ যে কর্মোদ্যোগ একটি ব্যক্তিগত গুণ হিসেবে তার প্রতি তিনি আরোপ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। অপর পক্ষে, প্রুধোঁ অবশ্য এই কুদেতাকে একটা পূর্বতন ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণাম রূপে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু কুদেতা সম্পর্কে তাঁর অংকিত ইতিহাসের ছবিটুকু অলক্ষিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে এর নায়কের ইতিহাস-সম্মত পক্ষসমর্থন। এতে করে আমাদের তথাকথিত **বিষয়নিষ্ঠ** ঐতিহাসিকদের ভুলটা তিনিও করে বসেছেন। তার বিপরীতে আমি দেখিয়েছি কীভাবে ফ্রান্সে **শ্রেণী-সংগ্রাম** এমন অবস্থা ও সম্পর্ক সৃষ্টি করল যার ফলে একটি সামান্যবুদ্ধি অদ্ভুত হাস্যকর জীবের পক্ষে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হল।

এই রচনার সংস্কারসাধন করতে গেলে এর বিশিষ্ট রসটি নষ্ট হয়ে যেত। তাই আমি কেবল মুদ্রাকর-প্রমাদগুলি সংশোধন করে এবং আজকের দিনে যা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে এমন কয়েকটি প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই নিবৃত্ত হয়েছি।

'কিন্তু অবশেষে যেদিন সম্রাটের বেশে লুই বোনাপার্ট সজ্জিত হবেন, সেদিন ভাঁদোম স্তম্ভের (২) উপর থেকে নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা মাটিতে আছড়ে পড়বে।' আমার রচনার এই শেষ কথাগুলি ইতিমধ্যেই যথার্থ প্রমাণ হয়েছে।*

১৮১৫ সালের অভিযান সম্পর্কে তাঁর লেখাতে কর্নেল শারাস

* এই খণ্ডের পৃঃ ৯৯ দ্রঃ। — সম্পাঃ

নেপোলিয়ন পূজার বিরুদ্ধে আক্রমণের সূত্রপাত করলেন। তারপরে এবং বিশেষত বিগত কয়েক বৎসরে ঐতিহাসিক গবেষণা, সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রুপের হাতিয়ার চালিয়ে ফরাসী সাহিত্য নেপোলিয়ন কিংবদন্তীটিকে চিরতরে শেষ করে দিয়েছে। সাধারণ্যে রেওয়াজী এই ধারণাটার এই প্রচন্ড প্রত্যাখ্যান, এই বিরাট মানসিক বিপ্লব কিন্তু ফ্রান্সের বাইরে দৃষ্টি আকর্ষণ কমই করেছে এবং বোধগম্য হয়েছে আরও কম।

পরিশেষে, আমার আশা আছে যে, তথাকথিত **সিজারবাদের** যে ইস্কুলে শেখান বুলি বিশেষত জার্মানিতে এখন খুব চালু আছে সেটার মূলোৎপাটনে আমার এই রচনা সহায়ক হবে। অগভীর এই ঐতিহাসিক উপমায় এই মূলকথাটা মনে রাখা হয় না যে, প্রাচীন রোমে শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছিল শুধু বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু জনসমষ্টির ভিতরে — স্বাধীন ধনী ও স্বাধীন গরিবদের মধ্যে — আর জনসমষ্টির উৎপাদনরত বিশাল অংশটা দাসবন্দ ছিল এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিষ্ক্রিয় পাদভূমি মাত্র। **সিসমন্দির** এই অর্থপূর্ণ কথাটি লোকে মনে রাখে না: রোমক প্রলেতারিয়েতের চলত সমাজের ঘাড়ে চেপে, আর আধুনিক সমাজের চলে প্রলেতারিয়েতের ঘাড়ে চেপে (৩)। প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রামের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক পারিবেশের মধ্যে এত পরিপূর্ণ প্রভেদ থাকার দরুন ঐ দুইয়ের পয়দা করা রাজনৈতিক চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে মিলও যাজকশিরোমণি স্যামুয়েলের সঙ্গে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের মিলের চেয়ে বেশি হতে পারে না।

কার্ল মার্কস

লন্ডন, ২৩ জুন, ১৮৬৯

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে মার্কস কর্তৃক লিখিত, হামবুর্গ, জুলাই, ১৮৬৯

১৮৬৯ সালের সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

তৃতীয় জার্মান সংস্করণে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা

প্রথম প্রকাশের তেত্রিশ বৎসর পরেও যে 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এর নতুন সংস্করণের প্রয়োজন হল, এর থেকে প্রমাণ হয় যে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মূল্য আজও একটুও হ্রাস পায় নি।

রচনাটি বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচায়ক। সমগ্র রাজনৈতিক জগতের উপরে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো যে ঘটনাটি এসে পড়ে, যে ঘটনাকে কিছু লোক নৈতিক ক্রোধভরে উচ্চরবে নিন্দা করল, আবার অনেকে মেনে নিল বিপ্লবের হাত থেকে পরিত্রাণ ও সেটার ভুলগুলোর জন্যে দণ্ড হিসেবে, অথচ যে ঘটনা সকলকেই আশ্চর্য করল এবং কারও বোধগম্য হল না, সেই ঘটনার অব্যবহিত পরেই এমন একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষুরধার ব্যাখ্যান মার্কস উপস্থিত করলেন যাতে ফেব্রুয়ারির সেই দিনগুলির পর থেকে ফরাসী ইতিহাসের সমগ্র ধারাটি সেটার অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সংযোগের মধ্যে উদঘাটিত হল, ২ ডিসেম্বর তারিখের (৪) অলৌকিক কাণ্ডটি এইসব অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সংযোগের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণামে পর্যবসিত হল, এবং তাতে করে কুদেতার নায়ককে তার যথোচিত প্রাপ্য অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ছাড়া অন্যভাবে দেখার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত থাকল না। তাছাড়া, মার্কস এমন নিপুণ হাতে এই চিত্রটি আঁকলেন যে, পরবর্তী কালের প্রতিটি নতুন তথ্যের প্রকটন ছবিটির বাস্তবানুগতাই নতুন করে প্রমাণ করেছে। বর্তমানের জীবন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে এমন উন্নত ধরনের উপলব্ধি, ঘটার মুহূর্তেই ঘটনা সম্বন্ধে এমন স্বচ্ছদৃষ্টি বিচার সত্যসত্যই তুলনাহীন।

কিন্তু এই কাজের জন্যে ফ্রান্সের ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসের মতো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ফ্রান্সেই ঐতিহাসিক শ্রেণী-সংগ্রামে লড়াই প্রতিবারেই একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছেছে, কাজেই যে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক রূপের ভিতরে এই সংগ্রাম চলেছে এবং যার মধ্যে এর ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার ফুটে উঠেছে সেই রূপটা স্পষ্টতম রেখায় ক্ষোদিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল এবং রেনেসাঁসের (৫) পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক উপরে উপরে প্রতিষ্ঠিত একীভূত রাজতন্ত্রের আদর্শ দেশ এই ফ্রান্স মহাবিপ্লবে সামন্ততন্ত্র বিধ্বস্ত ক'রে প্রতিষ্ঠা করেছে

অবিমিশ্র বুর্জোয়া শাসন, যেটার ক্লাসিকাল বিশুদ্ধতার জুড়ি মেলে না ইউরোপের অন্য কোন দেশে। তেমনি এখানে শাসক বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বাভিমুখী প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম যে তীব্র রূপে দেখা দেয় তা অন্যত্র অজানা। এইজন্যেই মার্কস বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ফ্রান্সের অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের চলতি ইতিহাসেরও প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন ও ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য মালমশলা মজুত করে রাখতেন, তাই ঘটনাবলি তাঁকে কখনো হতচকিত করে দিতে পারে নি।

এছাড়া ছিল কিন্তু আরও একটি পরিস্থিতি। প্রথম মার্কসই ইতিহাসের গতির এই প্রধান নিয়মটি আবিষ্কার করেন যে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, অথবা ভাবাদর্শের অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই চলুক না কেন, সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামই প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শ্রেণীগুলির সংগ্রামের অল্পবিস্তর স্পষ্ট অভিব্যক্তি; আর এইসব শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং একই সঙ্গে এই শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘর্ষকেও আবার নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিরই অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের মাত্রা, উৎপাদনের চরিত্র ও প্রণালী সেটা দিয়ে নির্ধারিত বিনিময়-প্রণালী। প্রকৃতি বিজ্ঞানের রাজ্যে শক্তির রূপান্তরের নিয়ম যেমন, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই নিয়মটিও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ, এবং দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস (৬) বোঝার চাবিকাঠিও তাঁকে যুগিয়েছিল এই নিয়মটি। এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিয়মটিকে যাচাই করে দেখেছিলেন, এবং তেত্রিশ বৎসর পরে আজও আমাদের বলতে হবে পরীক্ষায় চমৎকার উত্তীর্ণ হয়েছে নিয়মটি।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

মার্কসের 'লুই বোনাপার্টের
আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের
তৃতীয় সংস্করণের
জন্যে এঙ্গেলস কর্তৃক
লিখিত, হামবুর্গ, ১৮৮৫

'লুই বোনাপার্টের
আঠারোই ব্রুমেয়ার'
গ্রন্থের পাঠ অনুসারে
মুদ্রিত
জার্মান থেকে
ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার

১

হেগেল একস্থানে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্ব ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ও ব্যক্তি যেন দুবার হাজির হয়। সেইসঙ্গে একথাটা বলতে তাঁর ভুল হয়েছিল: প্রথম বার আসে বিয়োগান্ত নাটকের রূপে, দ্বিতীয় বারে প্রহসন হিসেবে। দাঁতোঁ-র পরিবর্তে কসিদিয়ের; রবেস্‌পিয়েরের বদলে লুই ব্লাঁ; ১৭৯৩-১৭৯৫ সালের 'পর্বতের' (৭) জায়গায় ১৮৪৮-১৮৫১ সালের 'পর্বত'; খুড়োর বদলে ভাইপো। আঠারোই ব্রুমেয়ারের (৮) দ্বিতীয় সংস্করণটির পরিস্থিতিতেও সেই একই ব্যঙ্গচিত্র!

স্বীয় ইতিহাস মানুষই রচনা করে বটে, কিন্তু ঠিক আপন খুশিমতো নয়, নিজেদের নির্বাচিত পরিস্থিতিতে নয়, প্রত্যক্ষবর্তী, অতীত থেকে প্রদত্ত ও আগত পরিস্থিতিতে। মৃত পূর্বপুরুষদের সমস্ত ঐতিহ্য জীবিত লোকের মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে থাকে। ঠিক যখন মনে হয় তারা নিজেদের মধ্যে ও বস্তুজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধনে, তথা অভূতপূর্ব কোন সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, সেইসব বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণেই তারা অতীতের ভূত নামিয়ে এনে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের নাম, রণধ্বনি ও সাজসজ্জা ধার নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসপটে নতুন দৃশ্যটিকে ঐ কালপূজ্য ছদ্মবেশে ও ধার করা ভাষায় উপস্থিত করতে চায়। এইভাবেই লুথার আদিপ্রচারক পল-এর মুখাবরণ ধারণ করলেন; ১৭৮৯ থেকে ১৮১৪ সাল অবধি বিপ্লব কখনো রোম প্রজাতন্ত্র, আবার কখনো-বা রোম সাম্রাজ্যের বেশে সজ্জিত হয়ে দাঁড়াল; এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লব কখনো ১৭৮৯-এর, কখনো-বা ১৭৯৩-১৭৯৫ সালের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের অনুকরণ ছাড়া বেশি কিছু জানত না। এইভাবেই কেউ কোন নতুন ভাষা শিখলে সে সর্বদাই ভাষাটাকে মাতৃভাষায় মনে মনে অনুবাদ করে নেয়, কিন্তু যখন সে মাতৃভাষা স্মরণ না করেও নতুন ভাষার রাজ্যে বিচরণ করতে পারে, নতুন ভাষা প্রয়োগের

সময় আপন ভাষা ভুলে থাকতে পারে, শুধু তখনই বলা চলে সে নতুন ভাষার মূলভাবটাকে হজম করেছে, সেটার মাধ্যমে অবাধে মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে।

বিশ্ব ইতিহাসের বিগতদের ডেকে আনার এই কথা নিয়ে চিন্তা করলে সঙ্গে-সঙ্গে একটি লক্ষণীয় প্রভেদ প্রকাশ পায় তাদের মধ্যে। কামিল দেমুলাঁ, দাঁতোঁ, রবেস্পিয়ের, সাঁ-জুস্ত, নেপোলিয়ন, প্রাচীন ফরাসী বিপ্লবের নায়কেরা এবং বিভিন্ন তরফ ও জনগণও রোমক বেশে ও রোমক উক্তি দিয়ে তাঁদের যুগোচিত কাজ সম্পাদন করেছিলেন; কাজটা হল আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের শৃঙ্খলমোচন ও প্রতিষ্ঠা। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেই জমিতে গজিয়ে ওঠা সামন্ত মস্তকগুলিকে ছেদন করেছিলেন। অন্যজন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে সেই অবস্থার সৃষ্টি করলেন একমাত্র যে অবস্থাতেই স্বাধীন প্রতিযোগিতার বিকাশ, টুকরা-টুকরা করা ভূমিসম্পত্তির উপযোগ এবং জাতির অবারিত শিল্পোৎপাদন শক্তির বিনিয়োগ সম্ভব ছিল; ফ্রান্সের সীমাও পার হয়ে তিনি সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন, অবশ্য ইউরোপ মহাদেশে ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে একটা উপযুক্ত আধুনিক পরিবেশ যোগানোর জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণে। নতুন সামাজিক বিন্যাস যেইমাত্র প্রতিষ্ঠিত হল অমনি প্রলয়পূর্বের অতিকায়েরা অদৃশ্য হলেন এবং তাঁদের সঙ্গে গেল পুনরুজ্জীবিত রোম-সাম্রাজ্যিক গৌরব -- ব্রুটাসেরা, গ্রাকাস ভ্রাতৃদ্বয়, পুবলিকোলার গোষ্ঠী, ট্রিবিউন এবং সেনেটের সদস্যারা, এমনকি সিজার স্বয়ং। বুর্জোয়া সমাজ সেটার সংযমী বাস্তবতার মাঝে পয়দা করল সেটার প্রকৃত ব্যাখ্যাকার ও মুখপাত্রদের — সে, কুজাঁ, রুআয়ে-কলার, বেঞ্জামিন কঁস্তাঁ এবং গিজো-দের; সেটার আসল সমরনায়কেরা গিয়ে বসলেন অফিসের কামরায়, আর মাথামোটা অষ্টাদশ লুই হলেন সেটার রাজনৈতিক সর্দার। ধনোৎপাদন ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সংগ্রামে সম্পূর্ণ নিমগ্ন এই সমাজ আর উপলব্ধি করল না যে, রোমান যুগের প্রেতাত্মারা তার শৈশব শয্যার পাশে পাহারা দিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ বীরসদৃশ না হলেও সেটাকে জন্মদান করতে প্রয়োজন হয়েছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ, সন্ত্রাস, গৃহযুদ্ধ ও গণসংগ্রামের। রোম প্রজাতন্ত্রের ক্লাসিক কঠোর ঐতিহ্যের মধ্যে এই সমাজের গ্ল্যাডিয়েটার মল্লরা তাদের আদর্শ, তাদের শিল্প-রূপ খুঁজে পেয়েছিল; পেয়েছিল সেই আত্মপ্রবঞ্চনাগুলি যা

তাদের সংগ্রামের অন্তর্বস্তুর বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতাটাকে নিজেদের কাছেই গোপন রাখতে ও ঐতিহাসিক মহা ট্র্যাজেডির চড়া তারে নিজেদের উৎসাহকে বেঁধে নেবার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল। তেমনি, এর শতাব্দীকাল পূর্বে, বিকাশের অন্য এক পর্যায়ে ক্রমওয়েল ও ইংরেজরা তাঁদের বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের ভাষা, ভাবাবেগ আর মায়ামোহের অনুকরণ করেছিলেন। যখন আসল লক্ষ্য সিদ্ধ হল, ইংরেজদের সমাজের বুর্জোয়া রূপান্তর সম্পন্ন হল, তখন হ্যাবেকুক্-এর স্থান নিলেন লক্।

অতএব এইসব বিপ্লবের সময়ে বিগতদের পুনরুজ্জীবন যে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল সেটা পুরাতনের প্যারডি নয়, নতুন সংগ্রামের মহিমাকীর্তন; নির্দিষ্ট কাজটিকে কল্পনায় বড়ো করে তোলা, বাস্তবে সেটার সমাধানে থেকে পলায়ন নয়; আর একবার বিপ্লবের মর্মবস্তুটিকে আয়ত্ত করা, আবার সেটার প্রেতাত্মার বিহার করানো নয়।

১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত পুরনো বিপ্লবের প্রেতাত্মাই শুধু ঘুরে বেড়াল পুরনো বায়ি-র ছদ্মবেশধারী **républicain en gants jaunes*** মারাস্ত থেকে শুরু করে সেই ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিটি পর্যন্ত, যে তার মামুলী ঘৃণ্য মুখাবয়ব লুকিয়ে রাখে নেপোলিয়নের লৌহ মৃত্যু-মুখোসের অন্তরালে। সমগ্র একটি জাতি ভেবেছিল বিপ্লবের সাহায্যে সেটা নিজের মধ্যে ত্বরিত গতিশক্তি সঞ্চারিত করেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা দেখল ফিরে গিয়ে পড়েছে অধুনালুপ্ত এক যুগে, আর এই প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে যাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকে তার জন্যেই যেন আবার দেখা দিল সেই বিগত যুগের সন তারিখ, পুরনো কালনির্ঘণ্ট, পুরনো সব নাম, পুরনো সব অনুশাসন, যা বহু আগেই হয়ে পড়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যাবত্তার বিষয়বস্তু আর সেইসব খুদে আইনবাজ, যারা বহুপূর্বেই ক্ষয়প্রাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। জাতির মনের ভাবটা দাঁড়াল বেড্লাম্-এর (৯) সেই ইংরেজটির মতো, যার ধারণা সে প্রাচীন মিশরীয় ফেয়ারোদের আমলে বাস করে, এবং যার প্রাত্যহিক বিলাপ এই যে, ইথিয়োপীয় স্বর্ণখনির ভূগর্ভস্থ কয়েদখানাতে আটক অবস্থায় তাকে সোনা খুঁড়তে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, তার মাথায় বাঁধা স্তিমিতপ্রায় দীপ, পিছনে লম্বা চাবুক হাতে দাস শ্রমিকদের সর্দার, ফটকে বর্বর ভাড়াটে সৈন্যদের তালগোল পাকান ভিড়,

* হলুদ দস্তানা পরিহিত প্রজাতন্ত্রী। — সম্পাঃ

কোনো সাধারণ ভাষা না থাকায় তারা খনিতে বাধ্যতামূলক শ্রমরত শ্রমিকদের কথাও বোঝে না, পরস্পরের কথাও বোঝে না। উন্মাদ ইংরেজটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি একজন জন্ম-স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক, আর আমার কাছে কিনা এইসব কাজ দাবি করা হচ্ছে প্রাচীন ফেরাওদের জন্যে সোনা উৎপাদন করতে।' 'বোনাপার্ট পরিবারের ঋণশোধের জন্যে,' ফরাসী জাতি আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে। ইংরেজটি যতদিন সুস্থমস্তিষ্কে ছিল ততদিন সে সোনা উৎপাদনের বদ্ধমূল ধারণাটা ছাড়তে পারে নি। ফরাসী জাতি যতদিন বিপ্লব করেছে, ততদিন নেপোলিয়নের স্মৃতি ভুলতে পারে নি, তার প্রমাণ ১০ ডিসেম্বরের নির্বাচন (১০)। বিপ্লবের বিপদ-আপদ থেকে মিশরের মাংসের হাঁড়িতে (১১) প্রত্যাবর্তনের জন্যে তারা লোলুপ হয়ে উঠেছিল, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর আনল তার প্রত্যুত্তর। আদি নেপোলিয়নের ব্যঙ্গচিত্রমাত্র নয়, আদি নেপোলিয়নকেই যেন তারা ফিরে পেল, যদিও উনিশ শতকের মধ্যভাগে যার চেহারাটা ব্যঙ্গচিত্রের মতোই দেখাতে বাধ্য।

উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের কাব্য-প্রেরণা আর অতীত থেকে নয়, আসতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎ থেকেই। অতীত সম্পর্কে সমস্ত কুসংস্কার মোচন না করে সেটার নিজের কাজ আরম্ভ করাই সম্ভব নয়। আগেকার বিপ্লবগুলির পক্ষে বিশ্বের অতীত ইতিহাস স্মরণ করার প্রয়োজন ছিল নিজেদের সারবস্তু সম্পর্কে নিজেদের প্রতারণা করার জন্যে; নিজের সারবস্তুতে পেঁছনোর জন্যে উনিশ শতকের বিপ্লবকে মৃতদের সমাধিস্থই রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে উক্তিটা সারবস্তুকে ছাপিয়ে উঠত; এক্ষেত্রে সারবস্তু উক্তিটাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (১২) ছিল অতর্কিত আক্রমণ, পুরাতন সমাজকে **আচম্বিতে দখল,** এবং লোকে এই অপ্রত্যাশিত **আঘাতটাকে** পৃথিবীজোড়া গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি, নতুন-যুগপ্রবর্তক ঘটনা বলে ঘোষণা করল। ২ ডিসেম্বর তারিখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যেন জাদুবলে মিলিয়ে গেল এক তাসের জুয়াড়ির ভেলকি চালে; যা উচ্ছেদ হল বলে মনে হল সেটা আর রাজতন্ত্র নয়, সেটা হল শতাব্দীর পর শতাব্দীর সংগ্রামে রাজতন্ত্রের হাত থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া উদারনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো। **সমাজ** কর্তৃক নতুন সারবস্তু লাভের বদলে **রাষ্ট্র** যেন ফিরে গেল তার আদিমতম রূপে, অর্থাৎ তরবারি ও যাজকের নির্লজ্জ

রকমের অবিমিশ্র আধিপত্যে। এইভাবে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির অভাবিত আঘাতের (coup de main) উত্তর দিল ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরের হঠকারিতা (coup de tête)। সহজে এল, সহজেই গেল। মাঝের সময়টুকু কিন্তু বৃথায় যায় নি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে মৃদু বায়ু হিল্লোলের চেয়ে বেশি কিছু হতে হলে নিয়মিত, বলা যেতে পারে পাঠ্যপুস্তকের মতো বিকাশধারার যেসব পাঠ আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আগেই যেতে হত, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে ফরাসী সমাজ সেগুলির অভাব পূরণ করেছে একটি সংক্ষেপিত, কারণ বৈপ্লবিক প্রণালীতে। সমাজ এখন যেন যাত্রারম্ভস্থল থেকে পিছিয়ে পড়েছে; আসলে সেটাকে এখন প্রথমে তৈরী করে নিতে হবে বিপ্লবের যাত্রারম্ভস্থলটা, অর্থাৎ একমাত্র যে পরিস্থিতি, সম্পর্ক ও পরিবেশে আধুনিক বিপ্লব গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে।

যেমনটা ছিল আঠারো শতকে তেমনি বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলে সাফল্য থেকে সাফল্যের দিকে, সেগুলির নাটকীয় চমক একটা অন্যটাকে পিছনে ফেলে যায়; ব্যক্তি ও বিষয় যেন তখন উজ্জ্বল রত্নে খচিত হয়ে ওঠে; প্রতিটি দিনেই তখন পরম উল্লাসের মেজাজ; কিন্তু সে-বিপ্লব স্বল্পায়ু, অচিরেই শীর্ষবিন্দুতে উঠে যায় এবং তারপরে ঝঞ্ঝা পর্বের ফলাফল ঠাণ্ডা মাথায় আত্তীকরণ শেখার আগেই সমাজ যেন অতি পান-ভোজন জনিত অসুস্থতার সুদীর্ঘ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যেমনটা ছিল উনিশ শতকে তেমনি সব প্রলেতারীয় বিপ্লব অবিরাম আত্মসমালোচনা করে চলে; আপন গতিপথে বারবার থমকে দাঁড়ায়; আপাতসমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করার জন্যে ফিরে আসে; নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, অকিঞ্চিৎকরতাকে উপহাস করে নির্মমভাবে সম্যক; শত্রুকে ধরাশায়ী করে যেন শুধু যাতে পরক্ষণেই সে আবার মাটি থেকে নবশক্তি সঞ্চয় ক'রে আরও প্রকাণ্ড রূপে তাদের সম্মুখীন হতে পারে; নিজেদেরই লক্ষ্যের অনির্দিষ্ট বিশালত্ব দেখে বারবার পিছিয়ে যায়, যতক্ষণ না এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে যে কোন ফিরে-যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতিটাই চিৎকার করে ডাক দেয়:

Hic Rhodus, hic salta!

এই তো গোলাপফুল, এখানে নৃত্য করো! (১৩)

উপরন্তু, ফ্রান্সের ঘটনাক্রম প্রতিপদে অনুধাবন না করে থাকলেও, বিপ্লবের ভাগ্যে অভাবনীয় এক বিপর্যয়ের অশুভ পূর্বাভাস মোটামুটি দক্ষ পর্যবেক্ষক মাত্রেরই উপলব্ধি করার কথা। ১৮৫২ সালের মে মাসে দ্বিতীয় রবিবারের (১৪) সুফল প্রত্যাশায় গণতন্ত্রী ভদ্রলোকেরা যেভাবে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তাঁদের আত্মসন্তুষ্ট সেই জয়হুঙ্কার কানে শোনাই যথেষ্ট ছিল। তাঁদের মনে ১৮৫২ সালের মে মাসের ঐ দ্বিতীয় রবিবারটি একটি বদ্ধমূল ধারণা, একটি অন্ধ বিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চিলিয়াস্টদের (১৫) কল্পিত সেই তারিখটির মতো যেদিন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের (millennium) প্রতিষ্ঠা হবে। বরাবরের মতো, দুর্বলতা আশ্রয় নিয়েছিল অলৌকিক ক্রিয়াকান্ডের বিশ্বাসে; শুধু কল্পনায় শত্রুকে উড়িয়ে দিয়ে ধরে নেওয়া হল শত্রু বিজিত হয়েছে; এবং ভবিষ্যৎ জীবনে চিত্তের গহনে (in petto) যেসব কীর্তি বিরাজ করছে, যদিও এখনই তা কার্যকরী করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না এই মাত্র, সেই সবের নিষ্ক্রিয় প্রশস্তি করতে বসে বর্তমানকে বোঝার শক্তি হারিয়ে গেল। যে বীরের দল নিজেদের প্রমাণিত অক্ষমতা অস্বীকারের চেষ্টায় পরস্পরকে সহানুভূতি জানিয়ে একত্রে ভিড় জমান, তাঁরা পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, জয়মাল্যগুলি আগেভাগে সংগ্রহ করে ঠিক সেই সময়ে ব্যস্ত ছিলেন ফটকাবাজারে in partibus (১৬) প্রজাতন্ত্ররাজ্যগুলি নিয়ে অগ্রিম হিসাবনিকাশ করতে; সুবিবেচকের মতো তাঁদের বিনয়ী স্বভাবের উপযুক্ত প্রশান্তির সঙ্গেই আগে থাকতে তাঁরা সেখানকার সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলেন। নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো তাঁদের আঘাত করল ২ ডিসেম্বর, এবং যেসব জাতি কাপুরুষোচিত হতাশার দিনে সর্বাধিক সরব ব্যক্তিদের চীৎকারে অন্তরের ভয়-ভাবনা ডুবিয়ে দিয়ে খুশি থাকে, তারা সম্ভবত উপলব্ধি করল যে হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁকানি দিয়ে ক্যাপিটোল (১৭) রক্ষার দিন আর নেই।

সংবিধান, জাতীয় সভা, রাজবংশ-সমর্থক তরফগুলি, নীল ও লাল রং-এর প্রজাতন্ত্রীরা, আফ্রিকার বীরেরা (১৮), বক্তৃতামঞ্চের বজ্রনির্ঘোষ, দৈনিক পত্রিকার বিজলীঝলক, সমগ্র সাহিত্য, রাজনৈতিক নামডাক ও বুদ্ধিজীবী খ্যাতি, দেওয়ানী আইন ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি, মুক্তি, সাম্য,

সৌভ্রাত্র এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার — কুহকের মতো সব মিলিয়ে গেল এমন এক ব্যক্তির মায়ামন্ত্রে যাকে তার শত্রুপক্ষ পর্যন্ত যাদুকর বলবে না। সর্বজনীন ভোটাধিকার যেন ক্ষণকাল মাত্র টিকে থাকল যাতে নিজের অন্তিম ইচ্ছাপত্র সর্বসমক্ষে স্বহস্তে রচনা ক'রে জনগণেরই নামে ঘোষণা করে যেতে পারে: যাকিছু বিদ্যমান বিনাশ তার প্রাপ্য।*

ফরাসীদের মতো এইটুকু বললেই হবে না যে, তাদের জাতি আচম্বিতে ফেঁসে গিয়েছিল। যে অসতর্ক মুহূর্তটিতে যে কোন দুর্বৃত্ত এসে শ্লীলতাহানি করে যেতে পারে, তার জন্যে কোন জাতি বা কোন নারী মার্জনা পায় না। এই ধরনের কথার মারপ্যাঁচে ধাঁধার সমাধান মেলে না, সেটাকে অন্যভাবে উপস্থিত করা হয় মাত্র। তিন কোটি ষাট লক্ষ লোকের জাতিকে তিনজন জুয়াচোর কেমন করে অতর্কিতে কাবু ক'রে প্রতিরোধবিহীন অবস্থায় বন্দী করে ফেলতে পারে তার ব্যাখ্যা এখনও বাকি রয়েছে।

১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লব যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে, সাধারণ রূপরেখায় তার চুম্বক করা যাক:

তিনটি প্রধান পর্ব সম্বন্ধে কোনো ভুলের অবকাশ নেই: **ফেব্রুয়ারি কালপর্যায়**; ১৮৪৮-এর ৪ মে থেকে ১৮৪৯-এর ২৮ মে — **প্রজাতন্ত্র গঠনের** বা **জাতীয় সংবিধান-সভার কালপর্যায়**; ১৮৪৯-এর ২৮ মে থেকে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর — **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** বা **জাতীয় বিধান-সভার কালপর্যায়**।

১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ বা লুই ফিলিপের পতনের দিন থেকে ৪ মে তারিখে সংবিধান-সভার অধিবেশন পর্যন্ত এই **প্রথম কালপর্যায়**, প্রকৃত **ফেব্রুয়ারি কালপর্যায়কে** বলা চলে বিপ্লবের **প্রস্তাবনা**। এই কালপর্যায়ে উপস্থিতমতো গড়া সরকার নিজেকে **অস্থায়ী** বলে ঘোষণা করল, তাতে সরকারীভাবে ব্যক্ত হল এই কালপর্যায়ের চরিত্র, আর এটার প্রস্তাবিত, চেষ্টিত ও ব্যাখ্যাত সবকিছু সেই সরকারের মতোই **অস্থায়ী** বলে জাহির হল।

---

* গ্যেটের 'ফাউস্ট'-এ মেফিস্টোফিলিসের উক্তি। — সম্পাঃ

কিছুই এবং কেউই অস্তিত্বের এবং সত্যকার কর্মের অধিকার দাবি করার সাহস করল না। বিপ্লবের প্রস্তুতি অথবা সংঘটন করেছিল যেসব উপাদান, যথা রাজবংশবিরোধী তরফ (১৯), প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণী, গণতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকেরা, সকলেই ফেব্রুয়ারি **সরকারে** স্থান পায় অস্থায়িভাবে।

অন্য কিছু তখন সম্ভব ছিল না। ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে গোড়ায় নির্বাচন প্রথার এমন সংস্কার-সাধন মনস্থ করা হয়েছিল যার ফলে অস্তিমান শ্রেণীর ভিতরে রাজনৈতিক বিশেষ-সুবিধাভোগীদের মহলটা সম্প্রসারিত হবে এবং ফিনান্স অভিজাতবর্গের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা উচ্ছেদ হবে। কিন্তু বাস্তব সংঘাতের সময় যখন এল, যখন জনসাধারণ ব্যারিকেড খাড়া করল, জাতীয় রক্ষিদল নির্লিপ্তভাব অবলম্বন করল, সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধের কোনো গুরুতর চেষ্টা করল না এবং রাজতন্ত্র পলায়ন করল, তখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হল। প্রতিটি তরফ এর ব্যাখ্যা করল নিজের মতো করে। অস্ত্রহাতে প্রজাতন্ত্র অর্জন করে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণী তার উপরে নিজেদের ছাপ মেরে সেটাকে **সামাজিক প্রজাতন্ত্র বলে** ঘোষণা করল। আধুনিক বিপ্লবের সাধারণ মর্মবস্তুটা এইভাবে নির্দেশিত হল, কিন্তু লভ্য উপকরণ, জনগণের শিক্ষার মান এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সম্পর্ক যা ছিল তাতে তখন অবিলম্বে বাস্তবে যা হাসিল করা যেত তার সবকিছুর সঙ্গে ঐ মর্মবস্তুটার একান্ত বিশিষ্ট বৈপরীত্য। পক্ষান্তরে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে সহযোগীদের অবশিষ্ট অংশ সরকারী ক্ষমতার বৃহত্তম ভাগ পেল, তাতে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হল। সাড়ম্বর বাক্যজালের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা আর আনাড়ীপনা, নতুনত্বের জন্যে সোৎসাহ প্রচেষ্টার সঙ্গে পুরাতন বাঁধিগতের দৃঢ়মূল আধিপত্য, সমগ্র সমাজের আপাত সামঞ্জস্য এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ির এত বেশি তালগোল পাকান মিশ্রণ তাই আর কোন কালপর্যায়ে চোখে পড়ে না। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যখন উন্মোচিত ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতের স্বপ্নে তখনও মত্ত এবং সাধ মিটিয়ে সামাজিক সমস্যাবলি নিয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনায় নিমগ্ন, তৎক্ষণে সমাজের পুরাতন শক্তিগুলি দলবদ্ধ, সমবেত হয়ে গেছে, ভেবে দেখেছে এবং অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেয়েছে জাতির যারা অধিকাংশ সেই কৃষক আর

পেটি বুর্জোয়াদের, যারা জুলাই রাজতন্ত্রের (২০) প্রতিবন্ধকগুলো ধূলিসাৎ হবার পরে হঠাৎ রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে ঝড়ের মতন প্রবেশ করেছিল।

১৮৪৮-এর ৪ মে তারিখ থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসের শেষ পর্যন্ত **দ্বিতীয় কালপর্যায় হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র গঠনের, প্রতিষ্ঠার কালপর্যায়।** ফেব্রুয়ারির দিনগুলির ঠিক পরেই প্রজাতন্ত্রীরা রাজবংশবিরোধী তরফকে এবং সমাজতন্ত্রীরা প্রজাতন্ত্রীদের আচমকা কাবু করে ফেলল শুধু তাই নয়, সারা ফ্রান্সকে আচমকা কাবু করে ফেলল প্যারিস নগরী। ১৮৪৮-এর ৪ মে তারিখে জাতীয় সভার অধিবেশন বসে, এই সভা জাতীয় নির্বাচনে গঠিত হয়ে জাতির প্রতিনিধি হিসেবে দেখা দিল। ফেব্রুয়ারির দিনগুলোর দুরহঙ্কারের জীবন্ত প্রতিবাদরূপী এই সভা বুর্জোয়া পরিসরে সঙ্কুচিত করে আনতে চেয়েছিল বিপ্লবের ফলাফলকে। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অবিলম্বে এই জাতীয় সভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে সেটার উদ্বোধনের অল্প কয়েক দিন পরেই ১৫ মে তারিখে (২১) বৃথাই চেষ্টা করল বলপ্রয়োগে সেটার অস্তিত্ব নাকচ করতে, সেটাকে লোপ করতে, সেটার যে সংগঠিত রূপের মাধ্যমে জাতির সক্রিয় মানস দিয়ে প্রলেতারিয়েত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তাকে ফের তার অঙ্গ-উপাদানগুলিতে খন্ডখন্ড করে ফেলতে। সকলেই জানে, ১৫ মে-র একমাত্র পরিণাম হল ব্লাঙ্কি ও তাঁর সঙ্গীদের অর্থাৎ প্রলেতারিয়ান তরফের সত্যকার নেতাদের আলোচ্য পর্বের সমগ্র সময়ের জন্যে জন-রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারণ।

লুই ফিলিপের **বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের** পরে আসতে পারে শুধু **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র**, অর্থাৎ কিনা, যেখানে রাজার তরফে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি সংকীর্ণ অংশ শাসন করছিল সেখানে এখন জনগণের তরফে শাসন চালাবে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের দাবিগুলি অবাস্তব প্রলাপ, সেগুলোর অবসান ঘটাতে হবে। জাতীয় সংবিধান-সভার এই ঘোষণায় প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের প্রত্যুত্তর হল **জুন অভ্যুত্থান** — এই অভ্যুত্থান ইউরোপে গৃহযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে বৃহত্তম ঘটনা। জয় হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের। সেটার পক্ষে ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গ, শিল্প বুর্জোয়ারা, মধ্যশ্রেণী, পেটি বুর্জোয়ারা, ফৌজ, সচল রক্ষিদল হিসেবে সংগঠিত

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত*, বুদ্ধিজীবীরা, যাজকমণ্ডলী এবং গ্রামীণ জনসমষ্টি। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তারা নিজেরা ছাড়া আর কেউ রইল না। জয়লাভের পরে তিন হাজারের বেশি বিদ্রোহীকে জবাই করা হয়, আর পনের হাজার নির্বাসিত হয় বিনা বিচারে। এই পরাজয়ের পরে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চের একেবারে **পশ্চাদ্‌ভূমিতে** গিয়ে পড়ল। এরপরে যখনই আন্দোলন নতুন করে শুরু হল বলে প্রতীয়মান হয়েছে তখনই তারা আবার অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে তাদের শক্তিপ্রয়োগ, আর সর্বদাই ফলাফল হয়েছে আরও সামান্য। যখনই তাদের ঊর্ধ্বতন কোন সামাজিক স্তরে বৈপ্লবিক চঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তখনই শ্রমিক শ্রেণী তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে; এবং সেইজন্যে তাদের ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন তরফের পরাজয়ের অংশীদার হতে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের এইসব আঘাত সমাজের যত বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সেই অনুপাতে সেগুলো আরও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। সভায় এবং সংবাদপত্রের জগতে প্রলেতারিয়েতের প্রধান নেতারা একে একে আদালতের শিকার হয়েছেন, আর নেতৃত্বে এসেছে ক্রমশ অধিকতর সন্দেহজনক ব্যক্তিরা। অংশিকভাবে প্রলেতারিয়েত নেমে পড়েছে **বিভিন্ন অত্ত্ববাগীশ পরীক্ষায়, বিনিময়-ব্যাঙ্কে এবং শ্রমিক-সংঘে, এইভাবে এমন এক আন্দোলনে যাতে তারা প্রাচীন পৃথিবীরই বিপুল সম্মিলিত সহায়-সংগতির সাহায্যে সেটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবার পথ বর্জন করে, এবং সমাজের অগোচরে একান্তে নিজেদের জীবনযাত্রার গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশের ভিতরে কোনরকমে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করে, আর তার অনিবার্য ফল হিসেবেই তাদের ভরাডুবি হয়।** জুন মাসে যাদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের লড়াই হয় সেই **সবকটা শ্রেণী** সেটার পাশাপাশি ধূলিশায়ী হবার আগে পর্যন্ত সেটা যেন নিজের মধ্যে বৈপ্লবিক মহত্ত্ব পুনরাবিষ্কার করতে কিংবা নবস্থাপিত কোন সম্পর্ক থেকে নতুন উদ্যম লাভে অসমর্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কথা অন্তত বলা চলে যে, সেই সুমহান, বিশ্ব-ঐতিহাসিক সংগ্রামের সম্মান নিয়েই তারা পরাজয়বরণ করল; জুন মাসের ভূকম্পনে কেবল ফ্রান্স নয়, সারা ইউরোপ কম্পিত হয়েছিল। অথচ উচ্চতর

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১১০-১১১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

শ্রেণীগুলির পরবর্তী সমস্ত পরাজয় এত সস্তায় পাওয়া গেছে যে, সেগুলোকে আদৌ ঘটনা বলে চালাতে বিজয়ীদের নির্লজ্জ অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয়েছে, আর পর্যুদস্ত পক্ষটি প্রলেতারিয়ান পক্ষ থেকে যতদূরে অবস্থিত ততই বেশি কলঙ্কর হয়েছে ঐ পরাজয়।

জুন মাসের বিদ্রোহীদের পরাজয় অবশ্য বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন এবং সেটা নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল, জমি সমান করে দিল, কিন্তু সেইসঙ্গে তাতে দেখা গেল যে, ইউরোপের বিচার্য বিষয় হল 'প্রজাতন্ত্র না রাজতন্ত্র' এই প্রশ্ন ছাড়া অন্যকিছু। সেটা খুলে দেখিয়ে দিল যে, এখানে **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** তাৎপর্য হল অন্যান্য শ্রেণীর উপর একশ্রেণীর অবাধ স্বৈরাচার। সেটা প্রমাণ করল যে, যেসব দেশে আছে প্রাচীন সভ্যতা, যেখানে শ্রেণীগুলির গঠন সুপরিণত, আছে উৎপাদনের আধুনিক পরিবেশ এবং যেখানে মানসিক চেতনায় শতাব্দীর পর শতাব্দীর কাজের ফলে সমস্ত সনাতনী ধারণা লুপ্ত, এমনসব দেশে **প্রজাতন্ত্র** বলতে বোঝায় **সাধারণত বুর্জোয়া সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শুধু রাজনৈতিক রূপ,** উদাহরণস্বরূপ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো বুর্জোয়া সমাজের **জীবনযাত্রার রক্ষণশীল রূপ** নয়, -- সেখানে ইতিমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী থাকলেও সুনির্দিষ্ট রূপধারণ করে নি, অবিরাম পরিবর্তনের টানে তাদের মূল উপাদানগুলির মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন এবং পারস্পরিক বিনিময় চলছে, উৎপাদনের আধুনিক উপকরণগুলি বদ্ধতাগ্রস্ত উদ্বৃত্ত জনসমষ্টির সঙ্গে মানানসই না হয়ে বরং মগজ আর কর্মীর আপেক্ষিক ঘাটতিটাকে পূরণ করছে, এবং যেখানে, শেষত, বৈষয়িক উৎপাদনের উদ্দাম যৌবনচঞ্চল গতি একটা নতুন দুনিয়াকে নিজস্ব করে নিতে চাইছে, সেটা সেকেলে প্রেত জগৎ লোপের সময়ও রাখে নি, সুযোগও রাখে নি।

জুনের দিনগুলিতে সমস্ত শ্রেণী আর তরফ **শৃঙ্খলার তরফে** সম্মিলিত হয়েছিল **নৈরাজ্যের তরফ**, সমাজতন্ত্রের, কমিউনিজমের তরফ হিসেবে প্রলেতারিয়ান শ্রেণীর বিরুদ্ধে। **'সমাজের শত্রুদের'** কবল থেকে তারা সমাজের 'পরিত্রাণ' ঘটাল। **'সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা'** -- পুরনো সমাজের এই মূলমন্ত্রটাকে তাদের সৈন্যবাহিনীর সংকেতশব্দে পরিণত ক'রে তারা প্রতিবিপ্লবী ধর্মযোদ্ধাদের কাছে ঘোষণা করল, 'এই প্রতীক দ্বারা তোমরা

জয়ী হইবে' (২২)। জুন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই প্রতীকের আওতায় সমবেত বহু তরফের কোনটা সেই মুহূর্ত থেকে যখনই নিজের শ্রেণী-স্বার্থে বিপ্লবের রণাঙ্গন দখলে রাখতে চেয়েছে তখনই এই 'সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা' জিগিরে সেটার পতন ঘটেছে। শাসক গোষ্ঠীর পরিধি যতবার সংকুচিত হয়েছে, যখনই কোন ব্যাপকতর স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ একচেটে স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে, ঠিক ততবারই সমাজের পরিত্রাণ ঘটেছে। সরলতম বুর্জোয়া আর্থিক সংস্কার, অতি মামুলী উদারনীতি, অতি আনুষ্ঠানিক প্রজাতান্ত্রিকতা, অতি ভাসাভাসা গণতন্ত্রের প্রতিটি দাবিই একসঙ্গে 'সমাজের উপর হামলা' হিসেবে ধিক্কৃত এবং 'সমাজতন্ত্র' বলে কলঙ্কচিহ্নিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 'শৃঙ্খলা আর ধর্মের' পান্ডা পুরোহিতেরাই পদাঘাতে তাদের পিথীয় তেপায়া (Pythian tripods) (২৩) থেকে বিতাড়িত হয়, রাত্রির অন্ধকারে শয্যা থেকে টেনে তুলে কয়েদী গাড়িতে উঠিয়ে তাদের ভূগর্ভস্থ জেলখানায় পোরা হয় অথবা পাঠান হয় নির্বাসনে; তাদের দেবদেউল ধূলিসাৎ করে, তাদের মুখ বেঁধে, কলম ভেঙ্গে, তাদের আইনকানুন ছিঁড়ে ফেলা হয় ধর্মের নামে, সম্পত্তির নামে, পরিবারের নামে, শৃঙ্খলার নামে। শৃঙ্খলার গোঁড়া সমর্থক বুর্জোয়াদের তাদেরই ঝুলবারান্দার উপরে গুলি করে হত্যা করে মাতাল সৈন্যের জনতা, তাদেরই পবিত্র গৃহাশ্রম কলুষিত করা হয়, আমোদ করার জন্যে তাদের গৃহের উপর চলে গোলাবর্ষণ — সম্পত্তির নামে, পরিবারের নামে, ধর্মের নামে, শৃঙ্খলার নামে। অবশেষে বুর্জোয়া সমাজের ঘৃণ্যতম জীবদের নিয়ে গঠিত হয় **শৃঙ্খলার পবিত্র বাহিনী** এবং **'সমাজের ত্রাণকর্তা'** রূপে টুইলেরিসে অধিষ্ঠিত হয় বীর ক্রাপুলিনস্কি*।

২

ঘটনাধারার সূত্র ধরে আবার চলা যাক।

জুন মাসের দিনগুলি থেকে পরবর্তী কালে **জাতীয় সংবিধান-সভার ইতিহাস হল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রবাদী উপদলের প্রাধান্য এবং ভাঙনের**

* লুই বোনাপার্ট। — সম্পাঃ

ইতিহাস — সেই উপদল যারা ত্রিবর্ণ প্রজাতন্ত্রী, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী, রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রী, আনুষ্ঠানিক প্রজাতন্ত্রী, ইত্যাদি নামে পরিচিত।

লুই ফিলিপের বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের আমলে এরা ছিল **সরকারীভাবে** স্বীকৃত প্রজাতন্ত্রবাদী **বিরোধী দল,** কাজেই সমসাময়িক রাজনৈতিক জগতের একটি স্বীকৃত অঙ্গবিশেষ। এদের প্রতিনিধিরা ছিল বিধান-সভার কক্ষদ্বয়ে; সংবাদপত্রের জগতে এদের বেশকিছুটা প্রভাবাধীন ক্ষেত্র ছিল। প্যারিসে প্রকাশিত এদের মুখপত্র *National* পত্রিকা সেটার নিজস্ব ধাঁচে *Journal des Débats*-এরই (২৪) মতো সম্মানিত বলে গণ্য হত। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের যুগে এদের এই প্রতিষ্ঠার উপযোগীই ছিল এদের চরিত্র। এরা বুর্জোয়াদের এমন উপদল নয় যাদের কোন বৃহৎ সাধারণ স্বার্থ ঐক্যবদ্ধ করে এবং উৎপাদনের বিশিষ্ট অবস্থায় যারা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এরা ছিল প্রজাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বুর্জোয়া, লেখক, আইনজীবী, সামরিক অফিসার আর রাজকর্মচারীদের নিয়ে গড়া এমন একটি চক্র, যাদের প্রতিপত্তির কারণ হল লুই ফিলিপের প্রতি দেশের ব্যক্তিগত আক্রোশ, প্রথম প্রজাতন্ত্রের (২৫) স্মৃতি, প্রজাতন্ত্রের আদর্শে কিছু উৎসাহী লোকের বিশ্বাস, কিন্তু সর্বোপরি **ফরাসী জাতীয়তাবাদ** — ভিয়েনা সন্ধিচুক্তি (২৬) এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রতি এই জাতীয়তাবাদের বিদ্বেষে এরা অবিরাম ইন্ধন যোগাত। লুই ফিলিপের রাজত্বকালে যারা *National* পত্রিকার অনুগামী ছিল তাদের একটা বৃহদংশ এসেছিল এই প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের জন্যে, সেইজন্যেই পরে প্রজাতন্ত্রের আমলে এই সাম্রাজ্যবাদই লুই বোনাপার্টরূপী মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাদের সম্মুখে হাজির করতে পারে। বাদবাকি বুর্জোয়া প্রতিপক্ষের মতো এরাও ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ফ্রান্সে ফিনান্স অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বাজেটের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ, এই তর্কযুদ্ধ থেকে এত সুলভ জনপ্রিয়তা এবং গোঁড়া নীতিবাগীশী সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এত প্রচুর মালমশলা পাওয়া যেত যে, তার ব্যবহার না করা অসম্ভব। শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা ফরাসী সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি দাসোচিত সমর্থনের জন্যে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, যদিও ব্যবস্থাটাকে তারা গ্রহণ করেছিল জাতীয় অর্থনীতির যুক্তির চেয়ে জাতীয়তাবাদের যুক্তি অনুসারেই বেশি পরিমাণে; আর গোটা

বুর্জোয়া শ্রেণী এদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গিরণের জন্যে। এছাড়া অন্য সব দিক থেকে *National*- এর তরফ ছিল **বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রবাদী,** অর্থাৎ এরা চেয়েছিল বুর্জোয়া শাসনের রাজতান্ত্রিক রূপের বদলে প্রজাতান্ত্রিক রূপ এবং, সর্বোপরি, নিজেদের জন্যে, এই শাসন-ক্ষমতার বৃহত্তম বখরা। এই রাজনৈতিক রূপান্তরের পরিবেশ সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা অবশ্য এদের ছিল না। পক্ষান্তরে, এদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল এবং লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষের দিকে সংস্কারের ভোজসভাগুলিতে যা প্রকাশ্যে স্বীকার করা হত সেটা হল এই যে, এরা ছিল গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদের এবং বিশেষত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরাগভাজন। বাস্তবিকপক্ষে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের যা রীতি সেইভাবেই এই বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা প্রথমটায় অর্লিয়ান্সের ডাচেসকে রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে তুষ্ট থাকার উপক্রম করেছিল, এমন সময়ে ফেটে পড়ল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং এদের সর্বাধিক পরিচিত প্রতিনিধিদের স্থান নির্দিষ্ট করল অস্থায়ী সরকারে। শুরু থেকে স্বভাবতই এরা বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্থাভাজন ছিল, আর জাতীয় সংবিধান-সভায় এদের ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। জাতীয় সভার উদ্বোধনের সময়ে গঠিত কার্যনির্বাহক কমিশন থেকে অস্থায়ী সরকারের **সমাজতন্ত্রী** সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেওয়া হয়, তারপর জুন অভ্যুত্থান লেগে যাবার সুযোগ নিয়ে *National*- এর তরফ **কার্যনির্বাহক কমিশনকেও** বরখাস্ত করে এবং তদুপরি তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী **পেটি-বুর্জোয়া** বা **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের** (লেদ্রু-রলাঁ প্রভৃতি) হাত থেকে অব্যাহতি পায়। জুনের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নায়ক, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক তরফের জেনারেল কাভেনিয়াক একনায়কতান্ত্রিক গোছের ক্ষমতা নিয়ে কার্যনির্বাহক কমিশনের স্থান গ্রহণ করেন। *National*- এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক মারাস্ত জাতীয় সংবিধান-সভার স্থায়ী সভাপতি হয়ে বসেন এবং মন্ত্রিত্বগুলো এবং অন্যান্য সব উচ্চপদও পড়ে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের ভাগে।

প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া উপদলটি বহুকাল যাবৎ নিজেদের জুলাই রাজতন্ত্রের আসল উত্তরাধিকারী বলে মনে করে আসছিল, তারা এইভাবে দেখল তাদের অতি বড় আশাও ছাপিয়ে গেল। তারা কিন্তু লুই ফিলিপের

আসলে যেমনটা স্বপ্ন দেখত সেইভাবে রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের উদারপন্থী বিদ্রোহের মারফত ক্ষমতা পেল না, পেল পুঁজির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থান মারফত, যে-অভ্যুত্থানকে দমন করা হয় গ্রেপ-শট্ চালিয়ে। তারা যেটাকে **সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক** ঘটনা হিসেবে নিজেদের কাছে চিত্রিত করত, সেটা বাস্তবে হয়ে দাঁড়াল **সর্বাপেক্ষা প্রতিবৈপ্লবিক** ঘটনা। ফলটি তাদের কোলে এসে পড়ল বটে, কিন্তু সেটা পড়ল জ্ঞানবৃক্ষ থেকে, জীবন-তরু থেকে নয়।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একচ্ছত্র শাসন টিকেছিল শুধু ১৮৪৮ সালের ২৪ জুন থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই শাসনের সংক্ষিপ্তসার হল **প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের খসড়া-রচনা** এবং **প্যারিসে অবরোধের অবস্থা চাপান।**

ঐ নতুন **সংবিধান** মূলত ছিল ১৮৩০ সালের নিয়মতান্ত্রিক সনদের (২৭) প্রজাতান্ত্রিক সংস্করণ মাত্র। জুলাই রাজতন্ত্রের অধীনে ভোটাধিকারের যে বিশেষ সীমাবদ্ধতা বুর্জোয়া শ্রেণীরও একটি বৃহৎ অংশকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছিল, সেটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সেটার পরিবর্তে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার ঘোষণা করেছিল। সে ঘটনাটাকে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা বাতিল করে দিতে পারল না। নির্বাচনী এলাকায় ছয় মাস বসবাসের একটি সীমাবদ্ধতা শর্ত যোগ করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রশাসন-ব্যবস্থা, পৌরপ্রতিষ্ঠান, বিচার-ব্যবস্থা, ফৌজ, প্রভৃতির পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন অক্ষুণ্ণই রইল; অথবা যেখানে সংবিধান সেগুলোকে বদলাল সেখানে পরিবর্তনটুকু হল সূচিপত্রে, পাঠ্যাংশে নয় -- নামে পরিবর্তন, বিষয়বস্তুতে নয়।

১৮৪৮ সালের স্বাধীনতাগুলির মধ্যে যেগুলি অপরিহার্য রূপেই মুখ্যস্থানীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুদ্রণের স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, সংগঠন আর সমাবেশের স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং ধর্মমতের স্বাধীনতা, প্রভৃতি, সেগুলি এখন যেন একটি সাংবিধানিক উর্দি পেয়ে অভেদ্য হল। কারণ এই সমস্ত স্বাধীনতার প্রত্যেকটিকেই ফরাসী নাগরিকের **শর্তহীন নিরঙ্কুশ** অধিকার বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু সর্বত্রই এই পার্শ্বটীকা রইল যে, এই অধিকার সেই পরিমাণে অবাধ যে-পরিমাণে তা **'অন্যান্যের সমান অধিকার**

এবং **জন-নিরাপত্তা'** দিয়ে কিংবা ঠিক এইসব পৃথক পৃথক স্বাধীনতার পরস্পরের মধ্যে এবং জন-নিরাপত্তার সঙ্গে ঠিক এই সঙ্গতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রণীত 'আইনগুলি' দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। যথা: 'সংগঠনের, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশের, দরখাস্ত প্রেরণের এবং সংবাদপত্রে কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে মত প্রকাশের অধিকার নাগরিকদের আছে। **অন্যান্যের সমান অধিকার এবং জন-নিরাপত্তা ব্যতীত কোন চৌহদ্দি নাই এই সকল অধিকার প্রয়োগে।'** (ফরাসী সংবিধানের ২য় পরিচ্ছেদের ৮ম ধারা।) — 'শিক্ষা অবাধ। আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্তে এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার স্বাধীনতা **প্রয়োগ করা** যাইবে।' (ঐ, ৯ম ধারা।) — 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে **ছাড়া** প্রত্যেকটি নাগরিকের গৃহ অলঙ্ঘনীয়।' (২য় পরিচ্ছেদের ৩য় ধারা।) ইত্যাদি, ইত্যাদি। — অতএব সংবিধান অবিরাম ভবিষ্য **বুনিয়াদী** আইনসমূহের উল্লেখ করছে, যা এই পার্শ্বটীকাগুলিকে বলবৎ করবে এবং এইসব অবাধ অধিকারের প্রয়োগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যাতে পরস্পরের মধ্যে কিংবা জন-নিরাপত্তার সঙ্গে সেগুলির সংঘাত না ঘটে। পরবর্তীকালে শৃঙ্খলার বান্ধবেরা এইসব বুনিয়াদী আইন প্রণয়ন করে এবং ঐসব স্বাধীনতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে সেগুলি প্রয়োগে বুর্জোয়া শ্রেণীকে অন্যান্য শ্রেণীর সমানে অধিকার দিয়ে ব্যাহত হতে না হয়। যেসব ক্ষেত্রে এইসব স্বাধীনতা 'অন্যান্যের' বেলায় একেবারেই নিষিদ্ধ, কিংবা পুলিসের ফাঁদের মতোই কয়েকটি শর্তাধীনে সেগুলির প্রয়োগ অনুমত, তেমন সবকটি ক্ষেত্রেই সেটা, সংবিধানে যা নির্দিষ্ট, একমাত্র **'জন-নিরাপত্তা,'** অর্থাৎ বুর্জোয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে। শেষ পর্যন্ত তাই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই সংবিধানের নিকট আবেদন করে উভয় পক্ষই: এই সমস্ত স্বাধীনতা যারা বাতিল করল সেই শৃঙ্খলার বান্ধবেরা, তেমনি গণতন্ত্রীরাও, যারা এর প্রত্যেকটি অধিকারই দাবি করেছিল। কারণ সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদে রয়েছে সেটার বিপরীত বক্তব্য, রয়েছে সেটার ঊর্ধ্বতন আর নিম্নতন কক্ষ, অর্থাৎ সাধারণ কথায় স্বাধীনতা, আর পার্শ্বটীকায় স্বাধীনতার উচ্ছেদ। সুতরাং যতকাল স্বাধীনতার **নামটা** শ্রদ্ধেয়, শুধু তার বাস্তব রূপায়ণটা ব্যাহত রইল — অবশ্য বৈধ উপায়ে — ততকাল স্বাধীনতার অস্তিত্বের উপর **বাস্তব জীবনে** যত মারাত্মক আঘাতই পড়ুক, স্বাধীনতার সংবিধানগত অস্তিত্বটা রইল অক্ষুণ্ণ ও অলঙ্ঘিত।

এই সংবিধানটিকে এত সূদক্ষ উপায়ে অলঙ্ঘ্য করে তোলা সত্ত্বেও একিলিসের মতো এরও একটি দুর্বলতা থেকে যায় — গোড়ালিতে নয়, মাথায়, বরং বলা ভাল, যাতে সেটা গুটিয়ে এসেছিল সেই দুটো মাথায় — একদিকে **বিধান-সভা** এবং অন্যদিকে **রাষ্ট্রপতি**। সংবিধানের পৃষ্ঠা উল্টে গেলেই দেখা যাবে, যেসব অনুচ্ছেদে বিধান-সভার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল সেইগুলিই শর্তহীন, স্পষ্ট-নির্দিষ্ট, আত্মবিরোধবর্জিত এবং বিকৃতির অসাধ্য। কারণ এখানে ছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের নিজেদের নিরাপদ করার ব্যাপার। সংবিধানের ৪৫-৭০ ধারায় শব্দপ্রয়োগ এমন যাতে জাতীয় সভা রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে সংবিধানসম্মত উপায়ে, অথচ রাষ্ট্রপতি জাতীয় সভাকে অপসারণ করতে পারে কেবল সংবিধানবিরুদ্ধ উপায়েই, সংবিধানটাকেই একপাশে ঠেলে রেখেই শুধু। অতএব সংবিধান এখানে সেটার বলপূর্বক বিনাশের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। ১৮৩০ সালের সনদের মতো ক্ষমতা-বিভাগের অনুমোদন মাত্র নয়, সেটাকে বাড়িয়ে অসহনীয় বৈপরীত্যে পরিণত করা হয়েছে এতে। বিধানিক আর নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে পার্লামেণ্টারী কোন্দলকে গিজো বলেছিলেন **সাংবিধানিক ক্ষমতার জুয়া খেলা,** সেটা ১৮৪৮-এর সংবিধানে অনবরত খেলা হয় va-banque *। একদিকে রইল সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত পুনঃনির্বাচনযোগ্য সাত-শ' পঞ্চাশ জন জন-প্রতিনিধি; তাদের নিয়ে হল একটি নিয়ন্ত্রণাতীত অলঙ্ঘ্য অবিভাজ্য জাতীয় সভা, যে-সভার রইল বিধানিক সর্বশক্তিমত্তা, যেটা যুদ্ধ, শান্তি এবং বাণিজ্যিক সন্ধিচুক্তির শেষ কথা বলার অধিকারী, রাজক্ষমার একমাত্র অধিকারী এবং অধিবেশনের স্থায়িত্বগুণে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ বরাবর যেটার দখলে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি, তিনি রাজক্ষমতার সমস্ত বিশেষক উপাদানের অধিকারী; জাতীয় সভার মুখাপেক্ষী না হয়েই তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং অপসারণ করতে পারেন; নির্বাহী ক্ষমতার সমস্ত উপায়াদি তাঁর হস্তগত; তিনি সমস্ত পদে নিয়োগের অধিকারী এবং তার ফলে তিনি ফ্রান্সের অন্তত পনের লক্ষ লোকের জীবিকার

---

* সর্বস্ব পণ করে। — সম্পাঃ

বিলিবন্দেজ করেন, যেহেতু অত লোকই সমস্ত পর্যায়ের পাঁচ লক্ষ রাজকর্মচারী এবং সামরিক অফিসারদের উপর নির্ভরশীল। তাঁর পিছনে রইল সমগ্র সশস্ত্র শক্তি। অপরাধী ব্যক্তিবিশেষকে মার্জনা করা, জাতীয় রক্ষিদলকে বরখাস্ত করা, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সঙ্গে ঐকমত্য অনুসারে নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ, ক্যান্টনের পরিষদ এবং পৌর পরিষদগুলিকে খারিজ করার অধিকারী তিনি। পরদেশের সঙ্গে সমস্ত সন্ধিচুক্তির ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা তাঁরই এখতিয়ারে। জাতীয় সভা অবিরাম অনুষ্ঠান করে রঙ্গভূমিতে এবং প্রত্যহ জন-সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তিনি কিন্তু থাকেন ইলিজে-র নিরালায়, আর তাঁর চোখের সামনে এবং বুকের ভিতরে সংবিধানের ৪৫ ধারা প্রত্যহ তাঁকে শোনায়, 'Frère, il faut mourir!'* তোমার নির্বাচনের পরে চতুর্থ বৎসরে রমণীয় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে তোমার ক্ষমতার অবসান ঘটবে! তখন তোমার গৌরবের শেষ, একই সুর দ্বিতীয় বার বাজে না, আর যদি ঋণ করে থাক তবে দেখো যেন সংবিধানে তোমার জন্যে মঞ্জুর করা ছয় লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে সময়োচিতভাবে সেই ঋণ শোধ কোরো — অবশ্য যদি না রমণীয় মে মাসের দ্বিতীয় সোমবারে ক্লিশি (২৮) যাত্রা তোমার মনঃপূত হয়! সুতরাং সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে বাস্তব ক্ষমতা দিলেও নৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে চেয়েছে জাতীয় সভার জন্য। আইনের অনুচ্ছেদ দিয়ে নৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা তো অসম্ভব, সেটা বাদ দিলেও, ফ্রান্সের সমস্ত মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সংবিধান আর-একবার আত্মবিলোপ করেছে। জাতীয় সভার সাত-শ' পঞ্চাশ জন সদস্যের মধ্যে ফরাসীদের সমস্ত ভোট ভাগ হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তা উল্টে কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটিমাত্র ব্যক্তির জন্যে। এক-একজন জন-প্রতিনিধি যেখানে শুধু এক-একটা তরফের কিংবা এক-একটা শহরের কিংবা এক-একটা সেতুমুখের, এমনকি, সাত-শ' পঞ্চাশের একজনকে নির্বাচন করতে হবে শুধু এই প্রয়োজনটুকুর প্রতিনিধি, তাতে উদ্দেশ্য কিংবা মানুষটি কাউকে খুঁটিয়ে দেখা হয় না, কিন্তু তিনি হলেন সমগ্র জাতিরই নির্বাচিত

* 'ভ্রাতঃ, মরণের জন্যে প্রস্তুত হও!' — ত্রাপিস্ট মতের ক্যাথলিক সন্ন্যাসিদলের সভ্যরা পরস্পর দেখা হলে এই বলে সম্বোধন করত। — সম্পাঃ

ব্যক্তি এবং তাঁর নির্বাচন ব্যাপারটা হল সার্বভৌম জনগণের হাতে প্রতি চার বৎসরে একবার খেলার তুরুপের তাস। জাতির সঙ্গে নির্বাচিত জাতীয় সভার সম্পর্ক আধ্যাত্মিক, কিন্তু জাতির সঙ্গে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ব্যক্তিগত। বিভিন্ন প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় সভা অবশ্য জাতির মানসের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির মধ্যে জাতির এই জাতীয় মানস মূর্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় সভার তুলনায় তাঁর অধিকারটা দিব্যস্বত্ব গোছের; তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন জনগণের আশীর্বাদে।

সমুদ্রের দেবী থেটিস একিলিসের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মুকুলিত যৌবনেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। একিলিসের মতো দুর্বল স্থল ছিল সংবিধানের, তেমনি একিলিসের মতোই সংবিধানেরও ছিল নিশ্চিত অকাল-মৃত্যুর পূর্ববোধ। সংবিধান-রচয়িতা বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা তাদের আদর্শ প্রজাতন্ত্রের দিব্যশিখর থেকে ইহলোকের দিকে একবারটি তাকালেই উপলব্ধি করতে পারত তাদের বিধানিক মহা শিল্পকর্মসৃষ্টি যতই শেষ হয়ে আসছিল ততই প্রতিদিন রাজতন্ত্রী, বোনাপার্টপন্থী, গণতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের ঔদ্ধত্য, আর তাদের নিজেদের অপযশও কতখানি বেড়ে চলল, সে-বিষয়ে গুপ্তকথা তাদের জানাতে সমুদ্রশয্যা ত্যাগ করে থেটিসকে উঠে আসতে হত না। তারা নিয়তিকে ঠকাতে চেয়েছিল সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদ দিয়ে, তাতে একটা ধূর্ত শর্তের সাহায্যে, যাতে সংবিধান সংশোধনের যে কোন প্রস্তাবের পক্ষে অন্ততপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের সমর্থন থাকতে হবে, আর এই ভোট পড়া চাই পর পর তিনটি বিতর্কে এবং সেইসব বিতর্কের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে গোটা এক মাস, অধিকন্তু আরও একটি শর্ত ছিল এই যে, জাতীয় সভার অন্তত পাঁচ-শ' সদস্যের ভোট দেওয়া চাই। ভবিষ্যদদ্রষ্টার মতো যা তারা তখনই মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল সেরকম একটা পার্লামেণ্টী সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেও ক্ষমতাটা তারা যাতে খাটাতে পারে, যে-ক্ষমতা তখন পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্য এবং সরকারী কর্তৃত্বের সমস্ত উপায়-সংগতি দখলে থাকা সত্ত্বেও তাদের দুর্বল হাত থেকে দিন দিন ক্রমেই আরও বেশি পরিমাণে খসে পড়ছিল, তারই একটা অক্ষম চেষ্টা মাত্র করা হয়েছিল ঐভাবে।

পরিশেষে এই সংবিধান একটা ভাবালুপনার নাটকীয় অনুচ্ছেদে 'সমগ্র ফরাসী জাতি এবং প্রত্যেকটি ফরাসীর সতর্কতা এবং দেশপ্রেমের নিকট'

নিজের ভার সঁপে দেয়, যদিও আগেই আর-একটি অনুচ্ছেদে 'সতর্কদের' এবং 'দেশপ্রেমিকদের' তুলে দিয়েছিল ঐ উদ্দেশ্যেই উদ্ভাবিত 'উচ্চ আদালতের' ('haute cour') সস্নেহ ও অতি সযত্ন তদারকে।

এমনই ছিল ১৮৪৮ সালের সংবিধান — যেটা ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর কোন মাথা দিয়ে ভূপাতিত হয় নি, সেটার পতন ঘটেছিল শুধু একটি টুপির ছোঁয়ায়; অবশ্য সেটা ছিল নেপোলিয়ন-মার্কা ত্রিকোণ টুপি।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যতক্ষণ সভায় এই সংবিধান রচনা, সেটা নিয়ে আলোচনা এবং ভোটগ্রহণে ব্যস্ত ছিল, সভাগৃহের বাইরে সেই সময়ে কাভেনিয়াক **প্যারিসে অবরোধের অবস্থা** বজায় রেখেছিলেন। সংবিধান-সভার প্রজাতান্ত্রিক সৃষ্টির প্রসববেদনায় প্যারিসে অবরোধের অবস্থা ধাত্রীর কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে যদি-বা সঙ্গিনের খোঁচায় সংবিধানের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে থাকে, এই কথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না যে, তেমনি সঙ্গিনেরই সাহায্যে, উপরন্তু জনগণের বিরুদ্ধে তা চালিয়েই, সেটাকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করতে হয়েছিল এবং সেটাকে ভূমিষ্ঠ করাতেও হয়েছিল সঙ্গিনেরই সাহায্যে। 'গণ্যমান্য প্রজাতন্ত্রীদের' পূর্বপুরুষরা তাদের প্রতীক তেরঙা পতাকাকে ইউরোপ সফরে পাঠিয়েছিল। এখন এরা নিজেরাও উদ্ভাবন করল এমন এক বস্তু, যা নিজে থেকেই সারা মহাদেশে নিজের পথ করে নিয়েছিল, কিন্তু সর্বদাই নব অনুরাগে আবার ফ্রান্সে ফিরে এসে এতদিনে ফ্রান্সের অর্ধেক জেলাতে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে — সেটা হল **অবরোধের অবস্থা।** অপূর্ব এই উদ্ভাবনটি ফরাসী বিপ্লবের সময়ে উদ্ভূত প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে বারবার প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যারাক আর ময়দানের ছাউনি, যা থেকে থেকে এইভাবে ফরাসী সমাজের কপালে জলপট্টির মতো চাপিয়ে মাথা ঠান্ডা এবং চুপ করিয়ে রাখা হত; তরবারি আর বন্দুক, যেগুলোকে থেকে থেকে বিচারক আর শাসক, অভিভাবক আর সেন্সর, পুলিস আর রাত-চৌকির কাজ করতে দেওয়া হত; গোঁফ আর উর্দি, যেটাকে থেকে থেকে সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর আচার্য বলে তূর্যনিনাদ করা হত — সেই ব্যারাক আর ছাউনি, সেই তরবারি আর বন্দুক, সেই গোঁফ আর উর্দির মাথায় অবশেষে এই ধারণার উদয় কি অবশ্যম্ভাবী ছিল না যে, নিজেদের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ রাজ বলে ঘোষণা করে, স্বশাসনের হাঙ্গাম থেকে সমাজকে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়ে একেবারে বরাবরের

মতই সমাজকে ত্রাণ করাই তো বরং ভাল? ব্যারাক আর ময়দানের ছাউনি, তরবারি আর বন্দুক, গোঁফ আর উর্দির পক্ষে এই ধারণার উদয় অবশ্যম্ভাবী ছিল আরও এই কারণে যে, সেক্ষেত্রে এই অপেক্ষাকৃত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আরও বেশি নগদ পাওনা তারা আশা করতে পারে, অথচ অমুক কিংবা তমুক বুর্জোয়া উপদলের নির্দেশক্রমে মাঝে মাঝে অবরোধের অবস্থা এবং সমাজের স্বল্পকালস্থায়ী পরিত্রাণ থেকে জনকয়েক হতাহত এবং কিছুটা সপ্রশংস বুর্জোয়া মুখভঙ্গি ছাড়া আসল মাল কমই জোটে। সৈন্যবাহিনী অবশেষে একদিন নিজ স্বার্থে এবং নিজের লাভের খাতিরে অবরোধের অবস্থার খেলা খেলতে এবং সেইসঙ্গে বুর্জোয়াদের তহবিলটাকে অবরোধ করতে পারে তো? তদুপরি, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় এই যে, কাভেনিয়াকের অধীনে যিনি ১৫,০০০ বিদ্রোহীকে বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সামরিক কমিশনের সভাপতি সেই **কর্নেল বার্নার্ড** ঠিক এখনই প্যারিসে সক্রিয় সামরিক কমিশনগুলির নেতৃত্বে রয়েছেন আবার।

গণ্যমান্য, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা একদিকে যেমন প্যারিসের অবরোধের অবস্থার মধ্যে, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের প্রীটোরীয় (pretorians) বাহিনীর (২৯) লালনক্ষেত্র গড়েছিল, অন্যদিকে তারা প্রশংসাভাজন এই কারণে যে, লুই ফিলিপের রাজত্বকালের মতো জাতীয় ভাবপ্রবণতার আতিশয্য না করে তারা এখন জাতীয় ক্ষমতার কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে হীনতাস্বীকার করল এবং ইতালিকে মুক্ত করার বদলে অস্ট্রিয়া আর নেপল্‌স্‌-কে দ্বিতীয় বার ইতালি জয় করতে দিল (৩০)। ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি পদে লুই বোনাপার্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কাভেনিয়াকের একনায়কত্ব এবং সংবিধান-সভার অবসান হয়।

সংবিধানের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে: 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পক্ষে কখনও ফরাসী নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা খুইয়ে বসা চলবে না।' ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাসী নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা খুইয়েছিলেন শুধু তাই নয়, একদা তিনি ইংলন্ডে স্পেশ্যাল কন্‌স্টব্‌ল ছিলেন শুধু তাই নয়, উপরন্তু তিনি সুইস নাগরিকও হয়েছিলেন (৩১)।

১০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের তাৎপর্য আমি অন্যত্র বিবৃত করেছি।* সেই প্রসঙ্গে এখন আবার ফিরে যাব না। এই কথা বলাই এখানে যথেষ্ট যে, ঘটনাটা ছিল দেশের অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মূল্য যাদের দিতে হয়েছিল সেই **কৃষক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া, শহরের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের প্রতিক্রিয়া**। এই ঘটনা বিপুল সমর্থন পেল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, কারণ *National*-এর প্রজাতন্ত্রীরা তাদের জন্যে গৌরব অথবা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক কোনটারই ব্যবস্থা রাখে নি; সমর্থন পেল বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাছে, রাজতন্ত্রের সেতুরূপে বোনাপার্টকে তারা অভ্যর্থনা করল; সমর্থন পেল প্রলেতারিয়ানদের এবং পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে, যেহেতু তারা তাঁকে সংবর্ধনা করল কাভেনিয়াককে শায়েস্তা করার কশা হিসেবে। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক নিয়ে আরও খুঁটিয়ে আলোচনার সুযোগ পরে পাওয়া যাবে।

১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংবিধান-সভা ভেঙে যাওয়া অবধি কালপর্যায়টা নিয়ে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের পতনের ইতিহাস। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে রঙ্গভূমি থেকে বিতাড়িত এবং গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদের তখনকার মতো স্তব্ধ করবার পর তারা নিজেরাই বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহত্তম অংশের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়ে — এরা প্রায়শই প্রজাতন্ত্রকে **আপন সম্পত্তি** হিসেবে দখল করে নিল। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর এই বিরাট অংশ ছিল **রাজতন্ত্রী। রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনার** (৩২) শাসনের আমলে এদের একটা অংশ, বৃহৎ জমিদারের দল, শাসন চালিয়েছিল, তাই এরা ছিল **লেজিটিমিস্ট**। অন্য অংশটি — ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ শিল্পপতিরা — জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে রাজ্যশাসন করেছিল, অতএব তারা ছিল **অর্লিয়ান্সী** (৩৩)। সৈন্যবাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, আইনজীবী সম্প্রদায়, অ্যাকাডেমি এবং সংবাদপত্র জগতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখা গেল উভয় পক্ষেই, যদিও বিভিন্ন অনুপাতে। এই যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, যা বুরবোঁ বা **অর্লিয়ান্স** কারও নয়, কেবল **পুঁজির** নামাঙ্কিত, সেটার মধ্যে তারা এমন একটা রাষ্ট্ররূপ

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৩৩-১৩৬ দ্রঃ। — সম্পাঃ

পেল যেখানে তারা মিলিতভাবে শাসন চালাতে পারে। জুন অভ্যুত্থান ইতিপূর্বেই তাদের শৃঙ্খলা পার্টিতে এক করেছিল। তখন প্রয়োজন হল, প্রথমত, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের যে চক্র তখনও জাতীয় সভার আসনগুলি দখল করে ছিল, তাদের অপসারণ। জনগণের বিরুদ্ধে দৈহিক শক্তির অপব্যবহারের সময়ে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা যেমন নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, এখন পশ্চাদপসারণের মুহূর্তে, যখন নির্বাহী ক্ষমতা এবং রাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে তদের প্রজাতান্ত্রিকতা আর আইন প্রণয়নের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিল, তখন তারা যেন ঠিক সেই অনুপাতেই কাপুরুষ, মিনমিনে, ভগ্নচিত্ত এবং সংগ্রামে অপারক হয়ে পড়ল। তাদের অবলুপ্তির কলঙ্ককর ইতিহাসের বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তারা বশীভূত হল না, তাদের অস্তিত্বই মুছে গেল। তাদের ইতিহাসের চিরসমাপ্তি ঘটল; পরবর্তী কালপর্যায়ে সভার ভিতরেও এবং বাইরেও তারা রইল শুধু স্মৃতিরূপেই; আবার যখন প্রজাতন্ত্রের শুধু নামটুকু বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে, আর যখনই বৈপ্লবিক সংঘাত নিম্নতম মাত্রায় নেমে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, সেই সময়ে ঐসব স্মৃতিতে প্রাণ ফিরে আসে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, যে *National* পত্রিকার নামে এই দলটির নামকরণ হয়েছিল, সেই পত্রিকা পরবর্তী কালে সমাজতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

এই কালপর্যায় সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের সেই দুটি শক্তির দিকে একবার পিছনের দিকে তাকাতে হবে, যাদের একটি অন্যটিকে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর বিনাশ করে, যদিও ১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান-সভার নিষ্ক্রমণ পর্যন্ত তদের ছিল দাম্পত্যসম্পর্কই। একদিকে লুই বোনাপার্ট, অন্যদিকে সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের দল, শৃঙ্খলা পার্টি অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টির কথাই আমি বলছি। রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হয়েই লুই বোনাপার্ট তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা গঠন করে সেটার নেতৃত্ব দিলেন অদিলোঁ বারোর হাতে — বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইনিই পার্লামেন্টীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচেয়ে উদারপন্থী উপদলের পুরান নেতা। মন্ত্রিত্বের যে ছায়ামূর্তি ১৮৩০ সাল থেকেই তাঁর উপর ভর করে ছিল, শ্রীযুক্ত বারো অবশেষে সেই কার্যভার পেলেন, অধিকন্তু তিনি পেলেন প্রধানমন্ত্রিত্ব; কিন্তু লুই ফিলিপের আমলে যেমনটি তিনি কল্পনা করেছিলেন সেইভাবে

পার্লামেণ্টীয় প্রতিপক্ষের সবচেয়ে অগ্রসর নেতারূপে নয়, বরং একটা পার্লামেণ্টের প্রাণনাশের দায়িত্ব নিয়ে, তাঁর প্রধানতম শত্রু জেশুইট এবং লেজিটিমিস্টদের সহযোগীরূপে। নববধূকে তিনি অবশেষে ঘরে আনলেন, কিন্তু তার আগে সে বারবধূতে পরিণত হয়েছে। বোনাপার্ট যেন নিজেকে একেবারে মুছে ফেললেন, শৃঙ্খলা পার্টি তাঁর হয়ে কাজ করতে লাগল।

মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই রোম অভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, ঠিক হল জাতীয় সভার অজ্ঞাতসারে এই অভিযান পাঠান হবে, আর জাতীয় সভার কাছ থেকে সেটার জন্যে আর্থিক সংস্থান ছিনিয়ে নিতে হবে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে। এইভাবে জাতীয় সভাকে প্রতারণা করে এবং রোমের বৈপ্লবিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদেশের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তিগুলির সঙ্গে গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে এদের কার্যারম্ভ হল। ঠিক একই প্রণালীতে এবং একই কৌশলে রাজতান্ত্রিক বিধান-সভা এবং সেটার নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বোনাপার্ট তাঁর ২ ডিসেম্বরের কূদেতার আয়োজন করেছিলেন। ১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা যারা গঠন করেছিল সেই পার্টিই ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর জাতীয় বিধান-সভায় সংখ্যাধিক ছিল, এই কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

অগস্ট মাসে সংবিধান-সভা স্থির করেছিল সংবিধানের পরিপূরক একগোছা বুনিয়াদী আইন রচনা এবং বলবৎ জারি করার পরেই মাত্র সেটা ভেঙে যাবে। ১৮৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি শৃঙ্খলা পার্টি রাতো নামে একজন ডেপুটিকে দিয়ে প্রস্তাব আনাল যে, বুনিয়াদী আইন ছেড়ে দিয়ে সভা বরং **আত্মলোপের** সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। অদিলোঁ বারোর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভাই কেবল নয়, জাতীয় সভার রাজতন্ত্রী সদস্যরা সকলেই তখন ধমকের ভঙ্গিতে সভাকে জানিয়ে দিল যে, ক্রেডিট ফিরিয়ে আনার জন্যে, শৃঙ্খলার সংহতির জন্যে, অনির্দিষ্ট অস্থায়ী বন্দোবস্ত শেষ করে দিয়ে স্পষ্ট-নিশ্চিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সভার বিলুপ্তি প্রয়োজন; সভার অস্তিত্ব নতুন সরকারের ফলপ্রসূতায় বিঘ্নস্বরূপ; কেবল বিদ্বেষবশতই সেটা নিজ অস্তিত্ব চালিয়ে যেতে চায়; সেটা সম্বন্ধে দেশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। বিধানিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে এইসব কটূক্তি বোনাপার্ট লক্ষ্য করে গেলেন, মুখস্থ করে রাখলেন, এবং ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে পার্লামেণ্টীয় রাজতন্ত্রীদের সামনে প্রমাণ করে দিলেন

যে, তাদের কাছেই তিনি পাঠ গ্রহণ করেছেন। তাদেরই ধরতাই বুলিগুলিকে তিনি তাদের বিরুদ্ধে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

বারো মন্ত্রিসভা এবং শৃঙ্খলা পার্টি আরও এগিয়ে গেল। ফ্রান্সের সর্বত্র তারা জাতীয় সভার কাছে আবেদনপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করল, সেগুলি ভদ্র ভাষায় সভাকে পিট্টান দিতে অনুরোধ জানায়। এইভাবে তারা জনগণের আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে সংগঠিত অভিব্যক্তিস্বরূপ জাতীয় সভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগুনে টেনে আনল অসংগঠিত জনসাধারণকে। পার্লামেণ্টীয় পরিষদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতি আবেদনের শিক্ষা তারাই দিল বোনাপার্টকে। অবশেষে এল ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি — সংবিধান-সভার আত্মলোপ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার দিন। জাতীয় সভা দেখল যে-ইমারতে সেটার অধিবেশন বসত সেটা সৈন্যদলের দখলে; জাতীয় রক্ষিদলের এবং লাইন সৈন্যদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যাঁর হাতে একত্র হয়েছিল, শৃঙ্খলা পার্টির সেনাপতি সেই শাঙ্গার্নিয়ে প্যারিসে একটি বিরাট সামরিক পরিদর্শন অনুষ্ঠান করলেন, যেন একটা যুদ্ধ প্রত্যাসন্ন, আর সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা সংবিধান-সভাকে ভয় দেখাল যে, সেটা অনিচ্ছুক প্রতিপন্ন হলে বলপ্রয়োগ করা হবে। সংবিধান-সভা ইচ্ছুকই ছিল, দর কষাকষি করে পেল অতি স্বল্পকালের একটু আয়ুবৃদ্ধি। ২৯ জানুয়ারি প্রকৃতপক্ষে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখের সেই কুদেতা ছাড়া আর কী? তবে এটা হল প্রজাতান্ত্রিক জাতীয় সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সহযোগিতায় রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতাদখল। রাজতন্ত্রী ভদ্রলোকেরা লক্ষ্য করলেন না অথবা লক্ষ্য করতে চাইলেন না যে, ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারির সুযোগ নিয়ে বোনাপার্ট টুইলেরিস-এর সামনে তাঁর সমক্ষে সৈন্যবাহিনীর একাংশের সম্মানপ্রদর্শনের কুচকাওয়াজ করিয়েছিলেন এবং পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সামরিক ক্ষমতার এই প্রথম প্রকাশ্য তলব সাগ্রহে ব্যবহার করে কালিগুলার (৩৪) পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকেরা অবশ্য দেখছিলেন একমাত্র তাঁদের শাঙ্গার্নিয়েকে।

শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক বলপ্রয়োগে সংবিধান-সভার জীবনসংক্ষেপের একটি বিশেষ কারণ হল সংবিধানের পরিপূরক বুনিয়াদী আইনগুলি, যথা শিক্ষা আর ধর্মাচার সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের পক্ষে সবিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছিল এইসব আইন প্রণয়ন নিজেদের হাতে

রাখা, যারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সেই প্রজাতন্ত্রীদের হাতে নয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সংক্রান্ত একটি আইনও ছিল এইসব বুনিয়াদী আইনের মধ্যে। ১৮৫১ সালে বিধান-সভা যখন ঠিক এই আইনের খসড়া রচনায় ব্যাপৃত, তখনই বোনাপার্ট সেই আঘাতটাকে (coup) আগে থেকে বিকল করে দিলেন ২ ডিসেম্বরের আঘাত দিয়ে। ১৮৫১ সালে তাদের পার্লামেণ্টীয় শীতকালীন অভিযানে সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা এই 'দায়িত্ব আইন', তদুপরি সন্দিগ্ধ, শত্রুভাবাপন্ন, প্রজাতান্ত্রিক সভা কর্তৃক রচিত সেই আইন হাতে পেলে কী মূল্যই তারা না দিত!

১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে সংবিধান-সভা স্বহস্তে সেটার শেষ অস্ত্র চূর্ণ করার পরে বারো মন্ত্রিসভা এবং শৃঙ্খলা-বান্ধবেরা সেটাকে তাড়া করে হত্যা করল, সেটাকে অপদস্থ করার কিছুই বাকি রাখল না, এবং সেটার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা যেটুকু বাকি ছিল তাও নিঃশেষ হয় এমন কয়েকটি আইন এই অথর্ব আত্মবিশ্বাসহীন সভার কাছ থেকে আদায় করে নিল। বোনাপার্ট ছিলেন তাঁর নেপোলিয়নীয় বদ্ধ ধারণায় মগ্ন; পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার এই অবমাননার প্রকাশ্যে সুযোগ নেবার মতো যথেষ্ট নির্লজ্জতা তাঁর ছিল। কেননা ১৮৪৯ সালের ৮ মে যখন জাতীয় সভা উদিনোর চিভিতা-ভেকিয়া* দখলের দরুন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, রোম অভিযানকে সেটার কথিত লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনতে মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দিয়েছিল, সেই সন্ধ্যাতেই বোনাপার্ট উদিনোকে লেখা তাঁর একটি চিঠি *Moniteur* পত্রিকায় (৩৫) প্রকাশ ক'রে বীরোচিত কীর্তির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং পার্লামেণ্টী মসীযোদ্ধাদের থেকে বিপরীত ধরনে তিনি তখনই সৈন্যবাহিনীর মহৎ রক্ষকরূপে নিজেকে জাহির করেন। রাজতন্ত্রীরা এতে মৃদু হেসেছিল। তারা তাঁকে নিজেদের নিতান্তই নির্বোধ শিকার রূপেই দেখেছিল। অবশেষে যখন বিধান-সভার অধ্যক্ষ মারাস্ত সভার নিরাপত্তা সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যে সন্দিহান হয়ে সংবিধানের উপর নির্ভর করে একটি কর্নেল এবং তার সৈন্যদলের পাহারা তলব করলেন, তখন এই কর্নেলটি আপত্তি ক'রে নিয়মানুবর্তিতার দোহাই দেয় এবং মারাস্তকে

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৪৮-১৫১

শাঙ্গার্নিয়ের কাছে যেতে বলে, আর শাঙ্গার্নিয়ে মারাস্তের অনুরোধ ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য ক'রে বলেন, baïonnettes intelligentes* তাঁর পছন্দ নয়। ১৮৫১ সালের নভেম্বরে সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা যখন বোনাপার্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই শুরু করতে চেয়েছিল, তখন তাদের কুখ্যাত **কোয়েস্টর বিল্**-এ (৩৬) জাতীয় সভার অধ্যক্ষের সরাসরি সৈন্য তলবের নীতি তারা বলবৎ করতে চেয়েছিল। তাদের একজন জেনারেল ল্য ফ্লো এই বিল্-এ স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। বৃথাই শাঙ্গার্নিয়ে এঁর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, প্রাক্তন সংবিধান-সভার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণতার প্রতি তিয়ের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন বৃথাই। শাঙ্গার্নিয়ে মারাস্তকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, এখন **যুদ্ধমন্ত্রী সাঁত-আর্নো** তাঁকে সেইভাবেই উত্তর দিলেন — 'পর্বতের' সপ্রশংস অভিনন্দনও তাতে লাভ করলেন!

শৃঙ্খলা পার্টি জাতীয় সভায় পরিণত হবার আগে কেবল মন্ত্রিসভা থাকার সময়টুকুতেই এইভাবে **পার্লামেণ্টীয় শাসনতন্ত্রকে** নিজেরাই কলঙ্কিত করেছিল। অথচ ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর দিনটি যখন **ফ্রান্স** থেকে এই শাসনতন্ত্রকে নির্বাসিত করে তখন এরাই করে উঠল হৈচৈ!

এই শাসনতন্ত্রের শুভযাত্রা কামনা করি আমরা।

৩

১৮৪৯ সালের ২৮ মে জাতীয় বিধান-সভা বসে। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সেটা মিলিয়ে যায়। এই সময়টা হল **নিয়মতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের** জীবনকাল।

প্রথম ফরাসী বিপ্লবে **নিয়মতন্ত্রীদের** শাসনের পর এসেছিল **জিরণ্ডিনদের** শাসন এবং **জিরণ্ডিনদের** পরে এসেছিল **জ্যাকোবিনদের** শাসন (৩৭)। এগুলির প্রত্যেকটা পার্টি নির্ভর করেছে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পার্টির সমর্থনের উপর। যখনই কোন পার্টি বিপ্লবকে এতটা এগিয়ে নিয়েছে যাতে সেটার অগ্রগামী হওয়া দূরে থাক, সেটাকে আর অনুসরণ করতেও পার্টিটি অপারক

---

* বুদ্ধিজীবী সঙ্গিন। — সম্পাঃ

হয়েছে, তখন তার পিছনের অপেক্ষাকৃত সাহসী মিত্র পার্টিটি তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছে গিলোটিনে। এইভাবে বিপ্লব এগিয়েছে ঊর্ধ্বগামী পথে।

১৮৪৮ সালের বিপ্লবে এর ঠিক বিপরীত অবস্থাই দেখা যায়। প্রলেতারিয়ান পার্টি দেখা দেয় পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টির লেজুড় হিসেবে। ১৬ এপ্রিল (৩৮), ১৫ মে এবং জুনের দিনগুলিতে শেষোক্ত পার্টি সেটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বর্জন করে। গণতান্ত্রিক পার্টিটি আবার বুর্জোয়া-প্রজাতান্ত্রিক পার্টির কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়েছিল। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করা মাত্রই তাদের এই বিরক্তিকর সঙ্গীটিকে ঝেড়ে ফেলে নিজেরাই ভর করে শৃঙ্খলা পার্টির কাঁধে। শৃঙ্খলা পার্টি তখন কাঁধঝাড়া দিয়ে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের উল্টে পড়তে দিয়ে নিজেরা চ'ড়ে বসে সামরিক শক্তির ঘাড়ে। তারা ভাবছিল কাঁধেই বসে আছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তারা দেখে কাঁধ সঙ্গিনে পরিণত হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা পার্টি পশ্চাতে যে পার্টিটি ঠেলে আসছে তাকে পদাঘাত করে এবং সম্মুখস্থ যে পার্টির উপর ভর করতে যায় সেটার ঠেলা খায়। এহেন হাস্যকর অবস্থানে সেটা ভারসাম্য রাখতে পারে না এবং অনিবার্য কয়েকটি মুখভঙ্গি সহকারে বিচিত্র অঙ্গসঞ্চালন ক'রে ধরাশায়ী হয়, তাতে আর আশ্চর্য কী! অতএব বিপ্লবের পথ এখানে অধোগামী। বিপ্লবের এই পশ্চাদ্‌গতি আরম্ভ হয় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ব্যারিকেড অপসারিত এবং প্রথম বৈপ্লবিক কর্তৃত্ব গঠিত হবার আগে।

আমাদের আলোচ্য পর্বটি হল বিভিন্ন উৎকট বৈপরীত্যের অতি জগাখিচুড়ি সংমিশ্রণ: সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নিয়মতন্ত্রীরা; বিপ্লবীরা, যারা নিজেদের কথামতেই নিয়মতন্ত্রী; সর্বশক্তিমত্তালিপ্সু, অথচ সর্বদাই পার্লামেণ্টীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ জাতীয় সভা; এক 'পর্বত' দল, ধৈর্যধারণই যেটার ব্রত, আর বর্তমান পরাজয়কে যেটা খণ্ডন করতে চায় আগামী জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে; এমনসব রাজতন্ত্রী যারা প্রজাতন্ত্রের patres conscripti,* তারা যাদের অনুগামী সেই

* সেনেটর। — সম্পাঃ

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশদুটিকে বিদেশে রাখতে এবং ঘৃণার পাত্র প্রজাতন্ত্রকে ফ্রান্সে বজায় রাখতে তারা ঘটনাচক্রে বাধ্য; এমন এক নির্বাহী ক্ষমতা যেটা নিজ দুর্বলতায়ই বল এবং নিজের পয়দা-করা অবজ্ঞাকে মান্যতা হিসেবে দেখে; এমন এক প্রজাতন্ত্র যা সাম্রাজিক লেবেল-মারা দুটি রাজতন্ত্রের, অর্থাৎ পুনঃস্থাপিত এবং জুলাই রাজতন্ত্রের সংযুক্ত জঘন্যতা মাত্র; এমনসব মৈত্রী যেগুলির প্রথম শর্ত হল বিচ্ছেদ; এমনসব সংগ্রাম যেগুলির প্রথম নিয়ম হল অনিষ্পত্তি; শান্তির নামে উদ্দাম উন্মত্ত শূন্যগর্ভ আলোড়ন, আর বিপ্লবের নামে শান্তির সুগম্ভীর প্রচার; সত্যলেশহীন আবেগ এবং আবেগহীন সত্য; কীর্তিহীন বীর, আর ঘটনাবর্জিত ইতিহাস; এমন বিকাশ, যেটার একমাত্র চালিকাশক্তি যেন দিন-পঞ্জিকা, আর যা একই উত্তেজনা এবং একই প্রশমনের অবিরাম পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তিকর; এমনসব বিরুদ্ধতা, যেগুলি কিছুদিন পরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে যেন তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে কেবল ফয়সালায় পৌঁছতে না পেরে সরে যাবার জন্যেই; সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত প্রচেষ্টা, আর পৃথিবীর অবসানের আশঙ্কায় কূপমণ্ডূক ভীতি এবং সেই সঙ্গে বিশ্বত্রাতাদের হীনতম ঘোঁট আর দরবারী প্রহসনের অভিনয় — এদের laisser-aller* নীতি দেখে 'শেষ বিচারের দিনের' চেয়ে বেশি মনে পড়ে ফ্রোন্দের (৩৯) কথা; ফ্রান্সের প্রাধিকারী সমষ্টিগত প্রতিভা একটিমাত্র ব্যক্তির ধূর্ত নির্বুদ্ধিতা দিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত; সর্বজনীন ভোটাধিকার মারফত ব্যক্ত জাতির যৌথ ইচ্ছা প্রতিবারেই জনস্বার্থের ঝানু শত্রুদের মধ্যেই যথাযোগ্য আত্মপ্রকাশের সন্ধান করে এবং অবশেষে এক বোম্বেটের স্বৈর-ইচ্ছার মধ্যেই তার অভিব্যক্তি। ইতিহাসের কোন অধ্যায় যদি ধূসরের উপর ধূসর বর্ণে চিত্রিত হয়ে থাকে তবে সে হল এই অধ্যায়। মানুষ আর ঘটনা যেন ওল্টান শ্লেমিল-এর রূপে অর্থাৎ কায়াহীন ছায়ারূপে দেখা দিচ্ছে। বিপ্লব আপনিই সেটার বাহকদের পঙ্গু করে দিচ্ছে এবং উদগ্র বলবত্তায় সমৃদ্ধ করছে শুধু নিজ শত্রুদেরই। যে 'লাল ভূত'কে প্রতিবিপ্লবীরা ক্রমাগত নামায় আর তাড়ায়, সেটার আবির্ভাব অবশেষে হল, কিন্তু নৈরাজ্যের ফ্রিজীয় (Phrygian) উষ্ণীষে (৪০) নয়, শৃঙ্খলার উর্দিতে, লাল পায়জামায়।

---

* ঘটনা তার নিজের গতিতে চলুক। — সম্পাঃ

আমরা দেখেছি ১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁর 'আরোহণ দিনে' বোনাপার্ট যে মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেছিলেন সেটি ছিল শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা, লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সী জোটের মন্ত্রিসভা। এই বারো-ফলু মন্ত্রিসভা মোটের উপরে বলপ্রয়োগেই প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভার জীবন সংক্ষেপ করে তার পরেও জীবিত ছিল এবং হাল ধরে ছিল। সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের সেনাপতি শাঙ্গার্নিয়ে তখনও প্রথম সামরিক ডিভিশন এবং প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদলের নেতৃত্ব স্বহস্তে সংযুক্ত রেখেছিলেন। পরিশেষে সাধারণ নির্বাচনে শৃঙ্খলা পার্টি জাতীয় সভায় বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করল। এইবারে লুই ফিলিপের ডেপুটি আর ওমরাহরা লেজিটিমিস্টদের সেই পবিত্রকৃত বাহিনীর সম্মুখীন হল যাদের জন্যে দেশবাসীর বহু ভোটপত্র রাজনৈতিক রঙ্গভূমির প্রবেশপত্রে পরিণত হয়েছিল। বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা একটি স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টীয় দল গঠনের পক্ষে সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। তারা এল শৃঙ্খলা পার্টির শুধু mauvaise queue* হয়ে। অতএব শৃঙ্খলা পার্টির হাতে রইল শাসন-ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনী এবং বিধানিক সংস্থা, এককথায় সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। যতে এদের শাসনটা প্রতীয়মান হল জনগণের অভিপ্রায় রূপে সেই সাধারণ নির্বাচন এবং ইউরোপের সমগ্র মূলভূমিতে প্রতিবিপ্লবের যুগপৎ জয়লাভের ফলে তাদের নৈতিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটল।

ইতিপূর্বে কোন পার্টি এর চেয়ে বেশি শক্তিসামর্থ্য নিয়ে কিংবা অধিকতর অনুকূল পরিবেশে অভিযান আরম্ভ করে নি।

নৌকাডুবির পর **বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা** দেখল তারা জাতীয় বিধান-সভায় মাত্র পঞ্চাশ জনের একটি চক্রে পর্যবসিত হয়েছে; তাদের নেতৃত্বে রইলেন আফ্রিকাখ্যাত সেনাপতিগণ কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়ের এবং বেদো। **'পর্বত'** এইবারে কিন্তু বিরাট বিরোধী দল গঠন করল। **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক** পার্টি নিজেদের এই পার্লামেণ্টীয় দীক্ষানাম গ্রহণ করেছিল। জাতীয় সভার সাত-শ' পঞ্চাশ ভোটের মধ্যে দু'শ'র বেশি ভোট হাতে থাকার ফলে তারা শৃঙ্খলা পার্টির তিনটি উপদলের যে কোন একটির অন্তত সমান শক্তিশালী

---

* অমঙ্গলে লেজুড়। — সম্পাঃ

হল। রাজতন্ত্রীদের গোটা সম্মিলনীর তুলনায় এদের সংখ্যাল্পতার যেন ক্ষতিপূরণ করেছিল কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতি। বিভিন্ন জেলার নির্বাচনে দেখা গেল, গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে তাদের বেশ কিছু অনুগামী জুটল, শুধু তাই নয়। প্যারিসের প্রায় সমস্ত ডেপুটিই এই দলভুক্ত ছিল; সৈন্যবাহিনী তিনজন নন-কমিশণ্ড অফিসারকে নির্বাচিত করে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আস্থা প্রকাশ করল; আর শৃঙ্খলা পার্টির কোন ডেপুটির বেলায় যা ঘটে নি, 'পর্বতের' নেতা লেদ্রু-রলাঁ পাঁচ-পাঁচটি জেলার মিলিত ভোটে পার্লামেণ্টীয় আভিজাত্যে উন্নীত হলেন। তাই, রাজতন্ত্রীদের অনিবার্য অন্তর্বিরোধ এবং বোনাপার্টের সঙ্গে সমগ্র শৃঙ্খলা পার্টির বিরোধের অবস্থা দেখে মনে হল ১৮৪৯ সালের ২৮ মে তারিখে সাফল্যের সমস্ত উপকরণই 'পর্বতের' সম্মুখে ছিল। পক্ষকাল পরে তারা খুইয়ে বসল সব কিছু, সম্মান সমেত।

পার্লামেণ্টীয় ইতিহাস নিয়ে আরও আলোচনার আগে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন আলোচ্য যুগের সমগ্র চরিত্র সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো এড়াবার জন্যে। গণতন্ত্রীদের দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, জাতীয় বিধান-সভার কালপর্যায়ে এবং সংবিধান-সভার কালপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সমস্যা ছিল একই: প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে সাধারণ সংগ্রাম। গণতন্ত্রীরা এই সময়কার ঘটনার গতিকে চুম্বকে প্রকাশ করে একটিমাত্র বুলিতে: **'প্রতিক্রিয়া'** — রাত্রি, যখন বিড়ালমাত্রকেই ধূসর বর্ণ দেখায় — এবং এতে চৌকিদারের মামুলী বাঁধাগৎ তাদের সমানে আউড়ে যাওয়া চলে। অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে শৃঙ্খলা পার্টিকে বিভিন্ন রাজতান্ত্রিক উপচক্রের একটা গোলকধাঁধা বলে মনে হয় — তার প্রত্যেকটা বিপক্ষদলের দাবিদারকে বাদ দিয়ে নিজস্ব দাবিদারকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টায় পরস্পরের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটছিল শুধু তাই নয়, 'প্রজাতন্ত্রের' বিরুদ্ধে একই বিদ্বেষ এবং মিলিত আক্রমণে তারা আবার সবাই ছিল একজোট। এই রাজতান্ত্রিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'পর্বত' দেখা দেয় 'প্রজাতন্ত্রের' প্রতিনিধি রূপে। শৃঙ্খলা পার্টি যেন মুদ্রণ, সংগঠন, প্রভৃতির বিরুদ্ধে এমন এক 'প্রতিক্রিয়ায়' অবিরত লিপ্ত, যা প্রাশিয়ার তুলনায় কমও নয় বেশিও নয়, আর প্রাশিয়ার মতোই তা চালান হয় আমলাতন্ত্র, সশস্ত্র পুলিস (gendarmerie) এবং আদালতের বর্বর পুলিসী হস্তক্ষেপের আকারে। 'পর্বত' যেন আবার

সমানই অবিরত এইসব আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং, তাতে করে, দেড়-শ' বছর ধরে সমস্ত তথাকথিত জনগণের পার্টি মোটামুটি যা করেছে সেইভাবে 'মানুষের শাশ্বত অধিকার' রক্ষায় ব্যাপৃত। কিন্তু পরিস্থিতি এবং পার্টিগুলিকে আরও খুঁটিয়ে দেখলে মিলিয়ে যায় এই বাহ্য রূপটি, যা ঢাকা দিয়ে রেখেছে **শ্রেণী-সংগ্রাম** এবং এই কালপর্যায়ের বিশিষ্ট চেহারাটাকে।

আমরা বলেছি, লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীরা ছিল শৃঙ্খলা পার্টির দুই বৃহৎ উপদল। এই দুটি উপদলকে যা সিংহাসনে নিজ-নিজ দাবিদারের সঙ্গে এঁটে ধরে রেখেছিল, এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তা কি শুধু পদ্মফুল (৪১) আর তেরঙা পতাকা, বুরবোঁ আর অর্লিয়ান্স বংশ, রাজতান্ত্রিকতার বিভিন্ন ছোপ, কিংবা আদৌ রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য? বুরবোঁদের আমলে যাজক আর অনুচরবৃন্দ সমেত বৃহৎ ভূমিসম্পত্তি শাসন চালিয়েছে; অর্লিয়ান্স বংশের আমলে শাসন চালিয়েছে ফিনান্স অভিজাতবর্গ, বৃহদায়তনের শিল্প, বৃহদায়তনের বাণিজ্য, অর্থাৎ পুঁজি, সেটার সঙ্গে আইনজীবী, অধ্যাপক এবং সুভাষী বাগ্মী অনুচরবৃন্দ। লেজিটিমেট রাজতন্ত্র ছিল ভূমিসম্পত্তির মালিকদের বংশানুক্রমিক শাসনের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি মাত্র, যখন জুলাই রাজতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া ভুঁইফোঁড়দের বেদখল-করা ক্ষমতার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং এই দুটি উপদলকে যা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল সেটা কোন তথাকথিত নীতি নয়, সেটা হল তাদের জীবনযাত্রার বৈষয়িক পরিবেশ, দুই ভিন্ন রকমের মালিকানা, শহর আর গ্রামের মধ্যে সেই সাবেকী বৈসাদৃশ্য, পুঁজি আর ভূমিসম্পত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব। সেইসঙ্গে, অতীতের স্মৃতি, ব্যক্তিগত শত্রুতা, আশঙ্কা আর আশা, সংস্কার আর মোহ, অনুরাগ আর বিরাগ, প্রত্যয়, ধর্মীয় আর নীতির বিধি তাদের অমুক কিংবা তমুক রাজবংশের সঙ্গে গ্রথিত রেখেছিল, এ কথা কে অস্বীকার করবে? বিভিন্ন ধরনের মালিকানার উপর, জীবনযাত্রার সামাজিক পরিবেশের উপর বিভিন্ন স্পষ্ট-পৃথক আর বিশিষ্ট অনুভূতি, মোহ, চিন্তনপ্রণালী এবং জীবনাদর্শ নিয়ে গড়ে ওঠে একটা গোটা উপরিকাঠাম। সমগ্র শ্রেণী সেটার বৈষয়িক ভিত্তি এবং তদনুযায়ী সামাজিক সম্পর্ক থেকে সেগুলোকে সৃষ্টি করে এবং রূপদান করে। ঐতিহ্য আর শিক্ষাদীক্ষা থেকে সেগুলোকে আহরণ ক'রে ব্যক্তিবিশেষ মনে করতে পারে তার কর্মের আসল প্রেরণা এবং

আরম্ভস্থল সেগুলোই। অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্ট দুটি উপদলের প্রত্যেকে যদিও নিজেকে এবং অন্যটাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, এক-একটা রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্যই তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, পরবর্তীকালের ঘটনা কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে বরং তাদের স্বার্থের বিভিন্নতাই ছিল দুটি রাজপরিবারের মিলনের প্রতিবন্ধক। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন কেউ নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে এবং বলে, আর সে আসলে কী এবং কী করে এই দুইয়ের মধ্যে তফাত করতে হয়, তেমনি ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলিতেও বিভিন্ন পার্টির প্রকৃত গঠন আর আসল স্বার্থ থেকে সেগুলির কথা আর খোশখেয়ালের পার্থক্য, সেগুলির বাস্তবতা থেকে নিজেদের সম্বন্ধে সেগুলির ধারণার পার্থক্য নির্ণয় করা দরকার আরও বেশি পরিমাণে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টরা পাশাপাশি পড়ল সমান-সমান দাবি নিয়ে। প্রত্যেকটা পক্ষ অন্যটির বিরুদ্ধে **নিজস্ব** রাজবংশের **পুনঃস্থাপনা** ঘটানোর অভিলাষী ছিল তার অর্থ শুধু এই যে, **বুর্জোয়ারা যে-দুটি বৃহৎ স্বার্থে** দ্বিধাবিভক্ত — ভূমিসম্পত্তি এবং পুঁজি — তার প্রত্যেকটা আপন আধিপত্য পুনঃস্থাপন করে অন্যটিকে অধীন করতে চাইছিল। দুটি বুর্জোয়া স্বার্থের কথা বলছি, তার কারণ সামন্ততান্ত্রিক ছিনালি আর বংশাভিমান সত্ত্বেও বৃহৎ ভূমিসম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া হয়ে পড়েছে আধুনিক সমাজের বিকাশের ফলে। এইভাবে ইংলণ্ডের টোরিরা বহুকাল যাবৎ কল্পনা করে আসছিল তারা রাজতন্ত্র, ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং পুরনো ইংরেজী সংবিধানের চমৎকারিত্বে উৎসাহী, শেষ পর্যন্ত বিপদের দিন এসে তাদের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করে নিল যে, তারা উৎসাহী শুধু **মালগুজারি** নিয়ে।

সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে লাগল পত্র-পত্রিকায়, এম্‌স্‌-এ, ক্ল্যারমণ্টে (৪২), পার্লামেণ্টের বাইরে। যবনিকার অন্তরালে তারা পুনর্বার তাদের পুরনো অর্লিয়ান্সী অথবা লেজিটিমিস্ট উর্দি পরে আর একবার পুরনো দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হল আবার। কিন্তু প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে, মহা জাঁকজমকের অনুষ্ঠানে, বৃহৎ পার্লামেণ্টীয় পার্টি হিসেবে তারা নিজ-নিজ রাজপরিবারকে প্রণতি জানিয়েই ক্ষান্ত থাকল এবং রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপনা অনন্তকালের মতো মুলতবি রাখল। আসল কাজ তারা করে গেল **শৃঙ্খলা পার্টি** রূপে, অর্থাৎ **রাজনৈতিক** নামের বদলে একটি **সামাজিক**

নাম নিয়ে; রোমান্সের উদ্দেশে অভিযাত্রী রাজকুমারীদের রূপে নয় — বুর্জোয়া বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে; প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীরূপে নয় — অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে। আর শৃঙ্খলা পার্টি হিসেবে তারা এমনকি পুনঃস্থাপিত অথবা জুলাই রাজতন্ত্রের আমলের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর উপর অবাধ এবং কঠোর আধিপত্য খাটাল; এই আধিপত্য সাধারণভাবে সম্ভব ছিল কেবল পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের রূপেই, কারণ একমাত্র এই রূপের মাধ্যমেই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহৎ দুটি বিভাগ ঐক্যবদ্ধ হতে এবং এইভাবে তাদের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত কোন চক্রের বদলে সমগ্র শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠাকে প্রাথমিক কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে পারত। তৎসত্ত্বেও যদি তারা শৃঙ্খলা পার্টি হিসেবে আবার প্রজাতন্ত্রের অবমাননা এবং সেটা সম্পর্কে বীতরাগ প্রকাশ করে থাকে, সেটা ঘটেছিল রাজতান্ত্রিক স্মৃতি থেকেই শুধু নয়। সহজজ্ঞানেই তারা বুঝেছিল প্রজাতন্ত্র তাদের রাজনৈতিক শাসনকে পূর্ণতা দেয় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে সেই শাসনের সামাজিক ভিত্তিটাকে ক্ষুণ্ণ করে, কারণ তখন তাদের অধীন শ্রেণীগুলির সম্মুখীন হতে এবং তাদের সঙ্গে লড়তে হবে মধ্যস্থ ছাড়াই, রাজমুকুট থেকে যোগান আড়াল ছাড়াই, আর নিজেদের মধ্যে এবং রাজতন্ত্রের সঙ্গে গৌণ সংঘর্ষগুলি দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ভিন্নমুখ করতে অপারক হলেও। একটা দুর্বলতাবোধের দরুনই তারা নিজেদের শ্রেণীগত শাসনের বিশুদ্ধ পরিবেশ থেকে ছিটকে সরে আসে এবং সেই শাসনের অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ, অপেক্ষাকৃত অপরিণত, আর ঠিক সেই কারণেই কম বিপজ্জনক পূর্ববর্তী রূপের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের যতবার তাদের বৈর-অবস্থানে দাঁড়ান সিংহাসনের দাবিদারের সঙ্গে, বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘাত বাধে, যতবারই তারা মনে করে নির্বাহী ক্ষমতাটা তাদের পার্লামেণ্টীয় সর্বশক্তিমত্তাকে বিপন্ন করেছে, এবং কাজেই যতবার তাদের শাসনের সমর্থনে রাজনৈতিক স্বত্ব পেশ করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, ততবারই তারা এগিয়ে গেছে **রাজতন্ত্রী** হিসেবে নয়, **প্রজাতন্ত্রী** রূপে, এগিয়েছেন অর্লিয়ান্সী তিয়ের, যিনি জাতীয় সভাকে হুঁশিয়ারি জানান এই বলে যে, প্রজাতন্ত্র তাদের মধ্যে বিভেদ ঘটায় সবচেয়ে কম, আর এগিয়েছেন তাঁর থেকে শুরু করে লেজিটিমিস্ট বেরিয়ের পর্যন্ত, যিনি ১৮৫১ সালের

২ ডিসেম্বর তেরঙা কটিবন্ধনী জড়িয়ে জন-প্রতিনিধিরূপে দশম ওয়ার্ডের টাউন-হলের সামনে সমবেত জনতাকে প্রজাতন্ত্রের নামে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা শোনান। সন্দেহ নেই যে, প্রতিধ্বনিতে টিটকারি ছিল: পঞ্চম হেনরি! পঞ্চম হেনরি!

মিলিত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে গঠিত হয়েছিল পেটি বুর্জোয়া এবং শ্রমিকদের জোট — তথাকথিত **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক** পার্টি। পেটি বুর্জোয়ারা দেখল, ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলির পরে তারা যোগ্য পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের বৈষয়িক স্বার্থ হয়েছে বিপন্ন, এবং এই স্বার্থসিদ্ধি ঘটাবার জন্য আবশ্যক গণতান্ত্রিক গ্যারাণ্টি সম্বন্ধে প্রতিবিপ্লব প্রশ্ন তুলেছে। সুতরাং তারা শ্রমিকদের আরও কাছে ঘেঁষল। পক্ষান্তরে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একনায়কত্বের দিনে ঠেলা খেয়ে একপাশে পড়া তাদের পার্লামেণ্টীয় প্রতিনিধি 'পর্বত' সংবিধান-সভার জীবনকালের শেষার্ধে বোনাপার্ট এবং রাজতন্ত্রী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নষ্ট জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে তারা মৈত্রীজোট বাঁধে। ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনর্মিলনের উৎসব চলেছিল ভোজসভাগুলিতে। খসড়া হয়েছিল যুক্ত কার্যসূচির, বিভিন্ন যুক্ত নির্বাচন-কমিটি গড়া হয়েছিল এবং সম্মিলিতভাবে প্রার্থী-তালিকা পেশ করা হয়েছিল। প্রলেতারিয়েতের সামাজিক দাবিগুলির বৈপ্লবিক সূচিমুখটাকে ভেঙে ফেলে সেগুলিকে মুচড়ে গণতান্ত্রিক করে তোলা হয়েছিল, আর পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক রূপটি খসিয়ে এগিয়ে ধরা হয়েছিল সেগুলির সমাজতান্ত্রিক সূচিমুখটাকে। এইভাবে উদয় হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি। এই সংযুক্তির ফলস্বরূপ উদ্ভূত নতুন 'পর্বতে' রইল শ্রমিক শ্রেণীর কিছু ফালতু লোক এবং কিছু কিছু সংকীর্ণতাবাদী সমাজতন্ত্রী ছাড়া পুরনো 'পর্বতের' সেই একই লোকেরা, শুধু সংখ্যায় হল প্রবলতর। কিন্তু সেটা যে-শ্রেণীর প্রতিনিধি, বিবর্তনের ধারায় তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটেছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিশিষ্ট চরিত্রটা চুম্বকে এই যে, গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি দাবি করা হয় পুঁজি আর মজুরি-শ্রম এই দুই চরম বিপরীতের অবসানের উপায় হিসেবে নয় — এই দুইয়ের বিরুদ্ধতা লাঘব করে সেটাকে সামঞ্জস্যে রূপান্তরিত করার উপায়

হিসেবে। এই লক্ষ্য সাধনের প্রস্তাবিত উপায় যতই বিভিন্ন হোক, অল্প-বিস্তর বৈপ্লবিক ধারণা দিয়ে তা যতই সজ্জিত থাক, মর্মবস্তুটা থেকে যায় একই। সে মর্মবস্তু হল গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজের রূপান্তর, কিন্তু সে-রূপান্তর পেটি বুর্জোয়াদের চৌহদ্দির ভিতরেই। এমন সঙ্কীর্ণ ধারণা কিন্তু করা চলে না যে, পেটি বুর্জোয়ারা নীতিগতভাবেই আত্মসর্বস্ব শ্রেণী-স্বার্থ বলবৎ করতে চায়। তারা বরং বিশ্বাস করে যে, তাদের নিজেদের মুক্তির **বিশেষ** পরিবেশই হল সেই **সাধারণ** পরিবেশ, একমাত্র যেটার কাঠামের ভিতরেই আধুনিক সমাজের পরিত্রাণ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের সকলকে আসলে দোকানদার বা তাদের উৎসাহী সমর্থক মনে করাও সমানই অনুচিত। শিক্ষাদীক্ষা এবং ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে এদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। এরা পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে এই কারণে যে, পেটি বুর্জোয়ারা জীবনের ক্ষেত্রে যে সীমারেখা অতিক্রম করে না, এরা মানস ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা অতিক্রম করে না, কাজেই বৈষয়িক স্বার্থ আর সামাজিক অবস্থার চাপ যেসব সমস্যা আর সমাধানের দিকে পেটি বুর্জোয়াদের কার্যত যেতে বাধ্য করে, এরা তত্ত্বগতভাবে সেইসব সমস্যা আর সমাধানেই পৌঁছয়। সাধারণভাবে, কোন শ্রেণীর সঙ্গে সেই শ্রেণীর **রাজনৈতিক** এবং **সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের** সম্পর্কটা এইরকমই হয়।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'পর্বত' ক্রমাগত শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র এবং তথাকথিত মানুষের অধিকারসমূহ নিয়ে লড়াই করেছে বটে, কিন্তু সেটার আখেরী লক্ষ্য প্রজাতন্ত্র অথবা মানবিক অধিকার কোনটাই নয়, ঠিক যেমন কোন সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে তাদের প্রতিরোধের অর্থ এই নয় যে, অস্ত্রগুলি দখল করে রাখার উদ্দেশ্যেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

জাতীয় সভার অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্খলা পার্টি 'পর্বতকে' প্ররোচিত করল। বুর্জোয়া শ্রেণী বৎসরকাল আগে যেমন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে হিসাবনিকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল, ঠিক সেইভাবেই এখন তারা গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদেরও শেষ করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করল। শুধু বিপক্ষের অবস্থাটা ছিল পৃথক। প্রলেতারীয়

পার্টির শক্তি ছিল রাস্তায়, পেটি বুর্জোয়ার শক্তি জাতীয় সভারই ভিতরে। অতএব তাদের ভুলিয়ে জাতীয় সভার বাইরে রাস্তায় টেনে এনে, কালপ্রবাহে এবং ঘটনাক্রমে তাদের পার্লামেণ্টীয় শক্তি সুসংহত হবার আগেই তাদেরই হাত দিয়ে সে শক্তিকে চূর্ণ করান নিয়েই হল প্রশ্নটা। আর 'পর্বত' হঠকারী হয়ে ফাঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফরাসী সৈন্যদের* রোমে গোলাবর্ষণের ঘটনাটিকে চেপে করা হল। এই ব্যাপারে সংবিধানের ৫ ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছিল; কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সৈন্য লাগান সেই ধারায় ছিল নিষিদ্ধ। উপরন্তু, জাতীয় সভার অনুমতি ছাড়া নির্বাহী কর্তৃপক্ষের যুদ্ধ ঘোষণা নিষিদ্ধ ছিল ৫৪ ধারায়, আর ৮ মে তারিখের সিদ্ধান্তে সংবিধান-সভা রোম অভিযানের নিন্দা করেছিল। এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে লেদ্রু-রলাঁ ১৮৪৯ সালের ১১ জুন বোনাপার্ট এবং তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব আনলেন। তিয়েরএর হুল-ফোটান কথায় উত্যক্ত হয়ে তিনি সত্যিসত্যিই বেসামাল হয়ে সর্বপ্রকারে, এমনকি অস্ত্রধারণ করেও সংবিধান রক্ষা করবেন বলে হুমকি দিলেন। 'পর্বতের' একেবারে সবাই একযোগে উঠে এই অস্ত্রধারণের আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করল। ১২ জুন জাতীয় সভা অভিশংসন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে এবং 'পর্বত' পার্লামেণ্ট থেকে বেরিয়ে যায়। ১৩ জুনের ঘটনাবলি সবার জানা: বোনাপার্ট এবং তাঁর মন্ত্রীদের 'সংবিধান-বহির্ভূত' ঘোষণা করে 'পর্বতের' একাংশের বিবৃতি; গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিদলের রাস্তায় মিছিল, নিরস্ত্র থাকায় শাঙ্গার্নিয়ের সৈন্যদলের সম্মুখীন হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'পর্বতের' একটি অংশ বিদেশে পলায়ন করল; অন্য একাংশ বুর্জে শহরে (৪৩) উচ্চ আদালতে অভিযুক্ত হল, এবং একটি পার্লামেণ্টীয় প্রবিধান অনুসারে বাদবাকিদের দেওয়া হল জাতীয় সভার অধ্যক্ষের শিক্ষকসুলভ কড়া হেপাজতে। প্যারিসে আবার অবরোধের অবস্থা ঘোষিত হল এবং ভেঙে দেওয়া হল প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদলের গণতান্ত্রিক অংশটিকে। এইভাবে পার্লামেণ্টে 'পর্বতের' এবং প্যারিসে পেটি বুর্জোয়াদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে গেল।

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৪৮-১৫১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

১৩ জুন দিনটি লিয়োঁ শহরে শ্রমিকদের একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের সংকেত দিয়েছিল: চারপাশের পাঁচটি জেলা সমেত সেখানেও অবরোধের অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল, আর তখন অবধি সেই অবস্থা চালু থাকে।

'পর্বতের' বেশির ভাগ বিবৃতির শরিক হতে নারাজ হয়ে সেটার সেনামুখকে বিপদের মুখে পরিত্যাগ করে সরে দাঁড়ায়। খবরের কাগজগুলিও সরে পড়েছিল, দুটি মাত্র পত্রিকা pronunciamento* টা প্রকাশ করতে সাহস করেছিল। জাতীয় রক্ষিদল হয় সরে রইল, কিংবা যেখানে এগিয়ে গেল সেখানে ব্যারিকেড নির্মাণে বাধা দিল, এইভাবে পেটি বুর্জোয়ারা তাদের প্রতিনিধিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। ঐ প্রতিনিধিরা আবার পেটি বুর্জোয়াদের বোকা বানিয়েছিল: সৈন্যবাহিনী থেকে তাদের কথিত মিত্রদের কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না। পরিশেষে, গণতান্ত্রিক পার্টি প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয়ের বদলে বরং নিজেদের দুর্বলতাই তাদের মধ্যে সংক্রামিত করে বসল এবং গণতন্ত্রীদের মহৎ কীর্তিকলাপের ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, সেইভাবে নেতারা তাদের 'জনগণ' সম্পর্কে দলত্যাগের অভিযোগ, আর জনগণ তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগ আনতে পেরে পরিতৃপ্তি লাভ করল।

'পর্বতের' আসন্ন অভিযানের মতো এত সোরগোল তুলে সংগ্রামের ঘোষণা খুব কমই হয়েছে; গণতন্ত্রের অনিবার্য জয়লাভ সম্বন্ধে যেমনটা এত নিশ্চয়তার সঙ্গে বা এত আগে থাকতে কোন ঘটনার এমন তূর্যনিনাদ কমই ঘটেছে। সন্দেহ নেই যে, তূর্যনিনাদে গণতন্ত্রীদের খুবই বিশ্বাস, তারই ঝাপটায় তো জেরিকোর (88) প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল। আর যখনই স্বৈরতন্ত্রের দুর্গ-প্রাচীরের সামনে তাদের দাঁড়াতে হয় তখনই তারা ঐ অলৌকিক কাণ্ডটার অনুকরণ করতে চায়। পার্লামেন্টে জয়লাভের ইচ্ছা থাকলে 'পর্বতের' পক্ষে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানান উচিত হয় নি। পার্লামেন্টে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানাবার পরে উচিত হয় নি রাস্তায় পার্লামেন্টীয় রীতি অনুসরণ। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলটাকে গুরুত্ব দিয়ে ধরা হয়ে থাকলে, সেটা সামরিক অভ্যর্থনা পাবে তা আগে না

---

* বিদ্রোহীদের ঘোষণাপত্র। — সম্পাঃ

বোঝাতো হয়েছিল চরম নির্বুদ্ধিতা। প্রকৃত সংগ্রামই যদি মনস্থ করা হয়ে থাকে তাহলে যা দিয়ে লড়াইটা চালাতে হত সেই অস্ত্রশস্ত্র বর্জনের ধারণাটা ছিল উদ্ভট। কিন্তু পেটি বুর্জোয়াদের এবং তাদের গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের বৈপ্লবিক হুমকি বিপক্ষকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করার চেষ্টা মাত্র। আর যখন তারা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে, এমনভাবে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে যাতে হুমকি কার্যকর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তখন সেটা করা হল এমন দ্ব্যর্থকভাবে যাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়গুলিকেই সর্বাগ্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়, আর খোঁজ পড়ে আত্মসমর্পণের ওজরের জন্যে। যে তূর্যনিনাদে লড়াইয়ের ঘোষণা হয়েছিল সেটা সংগ্রাম শুরু হতে-না-হতেই ভীরু খেঁকুনিতে পর্যবসিত হল, অভিনেতারা নিজেদের ভূমিকায় আর গুরুত্ব দিল না, ঘটনাপ্রবাহ একেবারে চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মতো।

কোন পার্টিই নিজেদের উপায়াদিকে গণতন্ত্রীদের মতো এত অতিরঞ্জিত করে দেখে না; বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এত লঘুচেতা আত্মপ্রবঞ্চনা করে না কেউই। যেহেতু সৈন্যদের একাংশ তাদের ভোট দিয়েছিল, তাই 'পর্বত' নিশ্চিত ছিল তাদের পক্ষে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করবে। সেটা কোন্ উপলক্ষে? সৈন্যদের দৃষ্টিতে যে উপলক্ষের একমাত্র তাৎপর্য হল — বিপ্লবপন্থীরা ফরাসী সৈন্যদের বিপক্ষে রোমক সৈন্যদের সমর্থন করেছে। অন্যদিকে, ১৮৪৮-এর জুন মাসের স্মৃতি তখনও এত জাগ্রত যে, জাতীয় রক্ষিদলের প্রতি প্রলেতারিয়েতের সুগভীর বিতৃষ্ণা এবং গণতন্ত্রী সর্দারদের সম্পর্কে গুপ্ত সমিতির সর্দারদের চরম অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। এইসব পার্থক্য দূর করতে হলে কোন মহৎ সাধারণী স্বার্থ বিপন্ন হওয়া চাই। সংবিধানের একটি বিমূর্ত অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের ফলে তেমন কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে পারে নি। গণতন্ত্রীদের নিজেদের নিশ্চিত উক্তি অনুসারেই, সংবিধান বারবার লঙ্ঘিত হয় নি কি? সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকাগুলি কি সেটাকে প্রতিবৈপ্লবিক জোড়াতালি বলে দেগে দেয় নি? কিন্তু গণতন্ত্রীরা যেহেতু পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, অর্থাৎ এমন একটি **পরিবর্তিশীল শ্রেণীর** প্রতিনিধি যেটার ভিতরে দুটি শ্রেণীর স্বার্থ যুগপৎ পরস্পরের ধার ভোঁতা করে দেয়, তাই তারা নিজেদের সাধারণভাবে শ্রেণীবৈরের ঊর্ধ্বে

অবস্থিত বলে কল্পনা করে থাকে। গণতন্ত্রীরা একথা স্বীকার করে যে, বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত একটি শ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখীন, কিন্তু জাতির বাকিসব সমগ্র অংশের সঙ্গে মিলে তারাই জনগণ। তারা প্রতিনিধিত্ব করে জনগণের অধিকারেরই, জনস্বার্থের সঙ্গেই তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তাই যখন সংগ্রাম আসন্ন তখন বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থিতি এবং স্বার্থ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন তাদের হয় না। নিজেদের উপায়-উপকরণ খুঁটিয়ে বিচার করাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। তারা শুধু সঙ্কেতটা দিলেই অমনি জনগণ অফুরন্ত উপায়-উপকরণ নিয়ে অত্যাচারীদের আক্রমণ করবে। তাই কার্যক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাদের স্বার্থ আগ্রহ জাগাবার মতো নয়, এবং তাদের ক্ষমতা ক্লীবতামাত্র, তবে তার জন্যে দায়ী হচ্ছে হয় সেই অপকারী কূটতার্কিকেরা যারা অবিভাজ্য জনগণকে বিভিন্ন বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত করে, নয়ত সৈন্যবাহিনী, যাদের এতই বর্বর আর অন্ধ করে ফেলা হয়েছে যাতে তারা বুঝতেই পারে নি যে, গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ লক্ষ্যগুলি তাদের নিজেদেরই পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট, কিংবা কার্যকালে কোন খুঁটিনাটি ভুলের জন্যেই সমস্ত পণ্ড হল, অথবা অভাবিত কোন আপতিকতার ফলেই এবারের খেলটা মাটি হয়ে গেল। যা-ই হোক, চরম লজ্জাকর পরাজয় থেকেও গণতন্ত্রীরা বেরিয়ে আসে প্রবেশকালে যেমন অপাপবিদ্ধ ছিল ঠিক তেমনি নিষ্কলঙ্কভাবে; উপরন্তু, এই নবার্জিত বিশ্বাস তারা জুটিয়ে আনে যে, তাদের জয় হবেই, সেইজন্যে তাদের নিজেদের এবং তাদের পার্টিকে পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে তা নয়, বরং উল্টে পরিস্থিতিকেই তাদের পক্ষে উপযোগী হয়ে সুপরিণত হয়ে উঠতে হবে।

অতএব, 'পর্বত' অবক্ষয় আর ভগ্নদশায় পড়লেও এবং নতুন পার্লামেণ্টীয় প্রবিধানে লাঞ্ছিত হলেও ভাবার কারণ নেই যে, সেটা খুব কাতর হয়ে পড়েছিল। ১৩ জুন সেটার সর্দাররা অপসৃত হলেও তাতে করে অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম মেকদারের কিছু লোকের স্থান হল, যারা নতুন পদে কৃতার্থ বোধ করল। পার্লামেণ্টে তাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে যদি বা আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না, নৈতিক ক্রোধ প্রদর্শনে এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ গলাবাজিতে নিজেদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখার অধিকার তারা পেয়ে গেল। শৃঙ্খলা পার্টি যদি বিপ্লবের সর্বশেষ স্বীকৃত প্রতিনিধিরূপে এই দলের মধ্যে নৈরাজ্যের সমস্ত

বিভীষিকার মূর্তরূপ দেখার ভান করে, তবে আসলে এরা আরও জোলো, আরও নম্র হয়ে থাকতেই তো পারত। ১৩ জুনের পরাজয়ের জন্যে অবশ্য তারা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছিল এই গভীর উক্তি দিয়ে: সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের দুঃসাহস যদি ওদের হয়, তাহলে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব আমরা কোন্ ধাতুতে তৈরি! Nous verrons!*

'পর্বতের' যেসব সদস্য বিদেশে পলায়ন করেছিল তাদের সম্পর্কে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, লেদ্রু-রলাঁ মাত্র একপক্ষকালের মধ্যেই তাঁর নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী পার্টিটির প্রতিকারহীন সর্বনাশ করতে পেরেছিলেন বলে তখন তিনি এক প্রবাসী ফরাসী সরকার গঠনের জন্যে তাঁর উদ্দেশে ডাক এসেছে বলে অনুভব করলেন, আর বিপ্লবে যে-পরিমাণে ভাটার টান পড়ল এবং সরকারী ফ্রান্সের সরকারী হোমরা-চোমরারা যতই বামনের রূপ ধারণ করতে থাকল, ঘটনাক্ষেত্র থেকে দূরে অপসারিত তাঁর মূর্তি ততই যেন বাড়তে লাগল, ১৮৫২ সালে তিনি প্রজাতন্ত্রী দাবিদার রূপে দাঁড়াতে পারলেন, ভালোকিয়া এবং অন্যান্য জাতির উদ্দেশে নিয়মিত প্রকাশিত পরিপত্রে তিনি মহাদেশের স্বৈরাচারী শাসকদের ভয় দেখাতে লাগলেন নিজের এবং সহযোগীদের নানাবিধ কৃতির কথা তুলে। প্রুধোঁ যখন এই ভদ্রলোকদের বলে ওঠেন: 'Vous n'êtes que des blagueurs!'** তাঁর কি একেবারে ভুল হয়েছিল?

১৩ জুন শৃঙ্খলা পার্টি 'পর্বতকে' চূর্ণ করল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু **জাতীয় সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্তের কাছে সংবিধানের অধীনতা** ঘটাল। প্রজাতন্ত্রকে তারা দেখল এইভাবে: এখানে বুর্জোয়া শ্রেণী পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন করে, রাজতন্ত্রে যেমন নির্বাহী ক্ষমতার প্রতিষেধ (veto) অথবা পার্লামেণ্ট ভেঙে দেবার ক্ষমতা থাকে তেমন কোন বাধা তাদের এখানে নেই। এই হল তিয়েরের অভিধায় **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র**। কিন্তু ১৩ জুন বুর্জোয়া শ্রেণী পার্লামেণ্টের কক্ষমধ্যে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠলেও, সর্বাধিক জনপ্রিয় অংশটিকে পার্লামেণ্ট থেকে বহিষ্কৃত করে

---

* আমরা দেখে নেব। — সম্পাঃ

** 'তোমরা বাকাবাগীশ ছাড়া কিছু নও।' — সম্পাঃ

নির্বাহী ক্ষমতা এবং জনগণের সামনে পার্লামেন্টকেই তারা সেইসঙ্গে দুরারোগ্য দুর্বলতাগ্রস্ত করল না কি? আদালত দাবি করা মাত্র নির্বিবাদে বহু ডেপুটিকে সমর্পণ করে তারা নিজেদের পার্লামেন্টীয় রেহাই লোপ করল। 'পর্বতকে' যেসব অপমানজনক বাধা-নিষেধের অধীন করা হল তাতে আলাদা আলাদা জন-প্রতিনিধিদের যে পরিমাণ মর্যাদাহানি ঘটল, সেই অনুপাতে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির মর্যাদা বাড়ল। সংবিধানিক সনদ সংরক্ষণের লক্ষ্য অনুযায়ী অভ্যুত্থানকে সমাজ উচ্ছেদকল্পে অরাজকতা বলে কলঙ্কচিহ্নিত করা হল — নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন করলে সেক্ষেত্রে তাদের অভ্যুত্থানের শরণ নেবার সম্ভাবনা রহিত হয়ে গেল তাতে করে। আর ইতিহাসের এমনই পরিহাস, বোনাপার্টের নির্দেশে যে সেনাপতি রোমে গোলাবর্ষণ ক'রে ১৩ জুনের নিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ উপলক্ষ্য যুগিয়েছিল, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সেই **উদিনো-কেই** বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধানের তরফে সেনাপতিরূপে জনগণের কাছে উপস্থিত করার সকাতর এবং ব্যর্থ চেষ্টা শৃঙ্খলা পার্টিকে করতে হয়েছিল। জাতীয় রক্ষিদলের একটা দঙ্গল, যেটা ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের অধীন, সেটার সর্দার হয়ে যিনি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রের দপ্তরে বর্বর হামলা চালিয়ে জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে প্রশংসিত হয়েছিলেন —১৩ জুনের আর একজন বীরনায়ক **ভিয়েরা** — সেই ভিয়েরাই বোনাপার্টের ষড়যন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাতীয় সভার অন্তিম মুহূর্তে জাতীয় রক্ষিদলের সাহায্য থেকে সেটাকে বঞ্চিত করার ঘটনায় বিশিষ্ট ভূমিকা নেন।

১৩ জুনের আরও একটি অর্থ ছিল। 'পর্বত' জোর করে বোনাপার্টকে অভিশংসিত করতে চেয়েছিল। সুতরাং এদের পরাজয়ের অর্থ হল বোনাপার্টের প্রত্যক্ষ জয়, গণতন্ত্রী শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত জয়। শৃঙ্খলা পার্টি জয়লাভ করল, বোনাপার্টের পক্ষে সেটাকে ভাঙিয়ে খাওয়াই যথেষ্ট ছিল। তিনি তাই করলেন। ১৪ জুন প্যারিসের প্রাচীরগাত্রে একটি ঘোষণাপত্র দেখা গেল, এতে বলা হল, রাষ্ট্রপতি যেন বড়ই কুণ্ঠায়, যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবল ঘটনার চাপেই বাধ্য হয়ে নিভৃতবাস থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং তাঁর সততা সম্পর্কে অন্যায় সন্দেহ করা হয়েছে এমনি ভঙ্গি ধরে নালিশ জানালেন যে, প্রতিপক্ষীয়রা অকারণে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করেছে, আর শৃঙ্খলার

আদর্শের সঙ্গে একাত্মবোধের ভাব দেখিয়ে আসলে শৃঙ্খলার আদর্শকেই নিজের থেকে অভিন্ন করে দেখালেন। তাছাড়া, জাতীয় সভা পরবর্তীকালে রোম অভিযান অনুমোদন করেছিল তা সত্য, কিন্তু বোনাপার্টই এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভ্যাটিকানে যাজকশিরোমণি স্যামুয়েলকে পুনরধিষ্ঠিত করে তিনি টুইলেরিস-এ রাজা ডেভিড হিসেবে প্রবেশের আশা রাখতে পারতেন (৪৫)। যাজকদের তিনি নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছিলেন।

আমরা দেখেছি ১৩ জুনের বিদ্রোহ রাস্তায় শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জয়মাল্য অর্জনের ব্যাপার ছিল না। তৎসত্ত্বেও বীর আর ঘটনার অমন অনটনের যুগেও শৃঙ্খলা পার্টি রক্তপাতহীন সংগ্রামটাকে দ্বিতীয় অস্টারলিজে (৪৬) পরিণত করল। বক্তৃতামঞ্চে এবং সংবাদপত্রে নৈরাজ্যের অক্ষমতার প্রতিভূ জনগণের বিপক্ষে শৃঙ্খলার শক্তি হিসেবে সৈন্যবাহিনীর তারিফ করা হল, আর 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর' বলে ভূয়সী প্রশংসা করা হল শাঙ্গার্নিয়েকে, যিনি নিজেও অবশেষে এ প্রতারণায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর যেসব বিভাগ সম্পর্কে সন্দেহের কারণ ছিল সেগুলি গোপনে প্যারিস থেকে স্থানান্তরিত হল, নির্বাচনে যেসব রেজিমেণ্ট সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল সেগুলি নির্বাসিত হল ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়ায়, সৈন্যদের মধ্যে যারা দুর্দান্ত তাদের পাঠান হল শাস্তিমূলক বিশেষ বিভাগে, এবং পরিশেষে সুপরিকল্পিতভাবে বিচ্ছিন্ন করা হল ব্যারাক থেকে সংবাদপত্রের জগৎকে এবং বুর্জোয়া সমাজ থেকে ব্যারাককে।

এখানে আমরা ফরাসী জাতীয় রক্ষিদলের ইতিহাসের চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে এসে পড়লাম। পুনঃস্থাপিত রাজতান্ত্রিক আমলের উচ্ছেদে ১৮৩০ সালে এদের ভূমিকাই ছিল চূড়ান্ত। লুই ফিলিপের আমলে যেসব বিদ্রোহে জাতীয় রক্ষিদল সৈন্যবাহিনীর পক্ষে ছিল তার প্রত্যেকটি ব্যর্থ হয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে এরা যখন বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় এবং লুই ফিলিপ সম্পর্কে দ্ব্যর্থক মনোভাব দেখাল, তখন রাজা আশা ছেড়ে দেন, আর সত্যই তাঁর দিন ফুরিয়ে যায়। এইভাবে এই বদ্ধমূল ধারণা দেখা দেয় যে, জাতীয় রক্ষিদল ছাড়া বিপ্লবের জয়, অথবা জাতীয় রক্ষিদলের বিরুদ্ধে

সৈন্যবাহিনীর জয় হতে পারে না। অসামরিকদের সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে এই ছিল সৈন্যবাহিনীর কুসংস্কার। ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলিতে সমগ্র জাতীয় রক্ষিদল লাইন সৈন্যদলের সঙ্গে মিলে অভ্যুত্থান দমনের ফলে এই কুসংস্কার আরও সুদৃঢ় হয়। বোনাপার্টের কার্যভার গ্রহণের পরে শাঙ্গার্নিয়ের হাতে এই রক্ষিদলের সৈনাপত্য এবং প্রথম সামরিক ডিভিশনের সৈনাপত্য সংবিধানবিরুদ্ধ উপায়ে একত্র করায় জাতীয় রক্ষিদলের অবস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এতে জাতীয় রক্ষিদলের সৈনাপত্য যেমন সামরিক প্রধান সেনাপতির একটা অঙ্গ হিসেবে দেখা দিল, তেমনি জাতীয় রক্ষিদলটাকেই মনে হতে লাগল লাইন সৈন্যবাহিনীর লেজুড়মাত্র। শেষ পর্যন্ত ১৩ জুন জাতীয় রক্ষিদলের ক্ষমতা চূর্ণ হয়ে গেল, তার কারণ এইমাত্র নয় যে, রক্ষিদলকে আংশিকভাবে ভেঙে দেওয়া হল, আর তখন থেকে সারা ফ্রান্সে মাঝে মাঝে এ ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে শেষে সেটার কয়েকটি টুকরোমাত্র বাকি রইল। ১৩ জুনের মিছিল ছিল সর্বোপরি গণতন্ত্রী জাতীয় রক্ষিদলের মিছিল। সৈন্যবাহিনীর বিপক্ষে সেদিন অবশ্য তারা অস্ত্রবহন করে নি, রক্ষিদলের উর্দি পরিধান করেছিল, কিন্তু এই উর্দিটাই ছিল তাদের রক্ষাকবচ। সৈন্যরা নিশ্চিত বুঝল যে, এই উর্দি অন্য যে কোন পশমী বস্ত্রখণ্ডেরই মতো। যাদু কেটে গেল। ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলিতে বুর্জোয়ারা এবং পেটি বুর্জোয়ারা জাতীয় রক্ষিদল হিসেবে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল; ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন বুর্জোয়ারা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদলকে ছত্রভঙ্গ করতে দিল; ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর বুর্জোয়াদেরই জাতীয় রক্ষিদল লোপ পেল, আর বোনাপার্ট অতঃপর সেটাকে ভেঙে দেবার নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে সেই সত্যটাকে বিধিবদ্ধ করলেন মাত্র। এইভাবে বুর্জোয়ারা নিজেরাই সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের শেষ অস্ত্রখানা ভেঙে ফেলেছিল, কিন্তু ভাঙতে হয়েছিল সেইমাত্র পেটি বুর্জোয়ারা তার সামন্ত প্রজার মতো প্রভুর পিছনে নয়, দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়াদের সামনে বিদ্রোহীরূপে; আর সাধারণভাবে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সমস্ত উপায় তারা স্বহস্তেই ধ্বংস করতে বাধ্য হয় যে-মুহূর্তে তারা নিজেরাই হয়ে ওঠে স্বৈরশাসক।

ইতোমধ্যে, ১৮৪৮ সালে যে ক্ষমতা হস্তচ্যুত বলে মনে হবার পর ১৮৪৯ সালে বাধ-বন্ধমুক্ত অবস্থায় আবার ফিরে আসে, শৃঙ্খলা পার্টি সেই ক্ষমতা পুনর্জয়ের ঘটনা উদযাপন করেছিল, সেইসব অনুষ্ঠান ছিল — প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি কটূক্তিবর্ষণ; তাদের নিজেদের নেতাদের ঘটান বিপ্লব সমেত ভবিষ্য, বর্তমান এবং অতীত সমস্ত বিপ্লবের উদ্দেশে অভিসম্পাত-বৃষ্টি; আর সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সংগঠনের অধিকার হরণ এবং অবরোধের অবস্থাকে স্বাভাবিক ব্যবস্থারূপে বিধিবদ্ধ করার আইন। এরপর অগস্টের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যন্ত জাতীয় সভার অধিবেশন মুলতবি রইল, সেটা অনুপস্থিতিকালের জন্যে একটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করে গেল। এই বিরতির সময়ে লেজিটিমিস্টরা এম্‌স্‌-এর সঙ্গে, অর্লিয়ান্সীরা ক্ল্যারমন্টের সঙ্গে চক্রান্ত চালাতে থাকল, বোনাপার্ট চক্রান্ত চালালেন রাজকীয় সফর দিয়ে, আর জেলা পরিষদগুলি চক্রান্ত চালাল সংবিধান সংশোধনের আলোচনা মারফত। জাতীয় সভার মাঝে মাঝে বিরতির সময়ে এসব ব্যাপার নিয়মিতভাবেই ঘটে থাকে, যা প্রকৃত ঘটনার পর্যায়ে উঠলেই আলোচ্য। এখানে একটি কথামাত্র যোগ করা যায়, শৃঙ্খলা পার্টি যখন সেটার রাজতান্ত্রিক অংশদ্বয়ে বিভক্ত হয়ে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ ক'রে সর্বসাধারণের কাছে নিজেদের কলঙ্কিত করছিল, এমন সময়ে জাতীয় সভার পক্ষে বেশ কিছুকালের মতো যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান ক'রে প্রজাতন্ত্রের শীর্ষদেশে দ্রষ্টব্য হিসেবে লুই বোনাপার্টের একক যদিচ শোচনীয় মূর্তিকে রেখে যাওয়া সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ হয় নি। যতবার এইসব বিরতির সময়ে **পার্লামেণ্টের** তালগোল পাকান কলরব থেমে গিয়ে সেটার অবয়ব জাতির মাঝে মিশে গেছে, তখন এটা নিঃসন্দেহে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, এই প্রজাতন্ত্রের আসল রূপটি সম্পূর্ণ করতে অভাব ছিল শুধু একটি জিনিসের: **পূর্বোক্তের** বিরতি চিরস্থায়ী করা এবং **শেষোক্তের** মূলমন্ত্র মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা: পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ বাহিনী!

৪

১৮৪৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে জাতীয় সভার আরও এক অধিবেশন হয়। ১ নভেম্বর একটি বাণীতে বারো-ফালু মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা করে বোনাপার্ট সভাকে সচকিত করেন। বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের যেভাবে বরখাস্ত করলেন তেমন কাটখোট্টা রকমে কেউ কখনও নিজের তাঁবেদারদের বরখাস্ত করে নি। জাতীয় সভাকে যে-পদাঘাত করতে মনস্থ করা হয়েছিল সেটা আপাতত দেওয়া হল বারো অ্যান্ড কোম্পানিকে।

আমরা দেখেছি, বারো মন্ত্রিসভা ছিল লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে গঠিত — শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভার বিলুপ্তি, রোম অভিযানের ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক পার্টি উচ্ছেদের জন্যে বোনাপার্টের দরকার ছিল এই মন্ত্রিসভার। এই মন্ত্রিসভার আড়ালে তিনি নিজেকে যেন আপাতদৃষ্টিতে মুছে দিয়েছিলেন, শৃঙ্খলা পার্টির হাতে সরকারী ক্ষমতা সমর্পণ করেছিলেন, আর লুই ফিলিপের আমলে এক দায়িত্বশীল পত্রিকা-সম্পাদক যে বিনয়ী ভূমিকার মুখোস ধারণ করেছিলেন সেই খড়ের মানুষের মুখোসটি তিনি পরেছিলেন। সে মুখোস যখন নিজ চেহারা ঢেকে রাখার হাল্কা আবরণের বদলে যা চেহারা দেখাতে দেয় না এমন লোহার মুখোসে পরিণত হল তখন তিনি সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্রজাতান্ত্রিক জাতীয় সভাকে শৃঙ্খলা পার্টির নামে উড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি বারো মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেছিলেন; সেটাকে তিনি বরখাস্ত করলেন শৃঙ্খলা পার্টির জাতীয় সভা থেকে স্বতন্ত্র করে নিজের নাম জাহির করার জন্যে।

মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার আপাতগ্রাহ্য অজুহাতের অভাব ছিল না। জাতীয় সভার পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিও একটা ক্ষমতা হিসেবে প্রতীয়মান হোক, এটুকু সৌজন্য প্রদর্শনেও বারো মন্ত্রিসভা অবহেলা করে। জাতীয় সভার বিরতিকালে বোনাপার্ট এদগার নে-র কাছে লেখা একখানা চিঠি প্রকাশ করেন, তাতে তিনি যেন পোপের* অনুদার মনোভাবের প্রতি বিরাগ

---

* ৯ম পায়েস। — সম্পাঃ

দেখালেন, ঠিক যেভাবে সংবিধান-সভার বিরোধিতা করে তিনি রোম প্রজাতন্ত্র আক্রমণের জন্যে* উদিনোকে প্রশংসা করে একখানা চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় সভা এবার যখন রোম অভিযানের ব্যয় মঞ্জুর করল, তখন ভিক্তর হ্যুগো তথাকথিত উদারনীতি হেতুর জন্যে চিঠিখানা উত্থাপন করেছিলেন। শৃঙ্খলা পার্টি অবজ্ঞাসূচক অবিশ্বাসের চীৎকারে বোনাপার্টের মতামতের যে কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকতে পারে এই ধারণাটাকেই উড়িয়ে দিল। একজন মন্ত্রীও তাঁর হয়ে লড়তে এগিয়ে এল না। আর একবার বারো তাঁর সুবিদিত ফাঁপা বাগাড়ম্বরে মঞ্চ থেকে রোষবাক্য বর্ষণ করে বসেছিলেন 'জঘন্য চক্রান্ত' নিয়ে, যা তাঁর মতে চলছিল রাষ্ট্রপতির নিকটতম পার্শ্বচরদের মধ্যে। পরিশেষে, মন্ত্রিসভা জাতীয় সভার কাছ থেকে অর্লিয়ান্সের ডাচেস-এর জন্যে বৈধব্য-ভাতা আদায় করে নিল, কিন্তু রাষ্ট্রপতির ভাতা বাড়াবার সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। বোনাপার্টের মধ্যে সাম্রাজ্যের দাবিদার আর ভাগ্যহীন বেপরোয়া মানুষ এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল যাতে তাঁকে সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করতে হবে এই মস্ত ধারণাটার পরিপূরক হিসেবে সর্বদাই ছিল আর-একটা মস্ত ধারণা: ফরাসী জাতির ব্রতই হল তাঁর ঋণ শোধ করা।

বারো-ফাল্যু মন্ত্রিসভা ছিল বোনাপার্টের পয়দা-করা প্রথম এবং শেষ **পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা।** সুতরাং সেটাকে খারিজ করাটা হল একটি সন্ধিক্ষণ। পার্লামেণ্টীয় রাজ বজায় রাখার জন্যে যে পদটি অপরিহার্য সেই নির্বাহী ক্ষমতার হাতলটি এর সঙ্গে সঙ্গে খোয়াল শৃঙ্খলা পার্টি, যা সেটা কখনও আবার জিতে নিতে পারে নি। এটা সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, ফ্রান্সের মতো দেশে, যেখানে পাঁচ লক্ষাধিক কর্মচারীর একটি বাহিনী হাতে থাকায় নির্বাহী ক্ষমতার স্বার্থ আর জীবিকার একটি বিরাট রাশিকে অনবরত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে রাখে; নাগরিক সমাজে জীবনের সর্বাত্মক অভিব্যক্তি থেকে সামান্যতম প্রাণস্পন্দন পর্যন্ত, অস্তিত্বের ব্যাপকতম ধরন থেকে ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব জীবনযাত্রা পর্যন্ত সর্বস্তরে সমাজকে রাষ্ট্র যেখানে পাশবদ্ধ করে, নিয়ন্ত্রিত আর সমন্বিত করে, সেটার তদারক করে, সেটাকে শিক্ষাদীক্ষা দেয়; অতি অসাধারণ কেন্দ্রীকরণের ফলে যেখানে এই পরগাছা

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৪৯-১৫১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

সংস্থাটি এমন সর্বব্যাপী আর সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠে, এমন ত্বরিত চলনশক্তি আর স্থিতিস্থাপকতার ক্ষমতা অর্জন করে, যেটার অনুরূপতা মেলে কেবল বস্তুত সমাজদেহটার নিরুপায় নির্ভর আর শিথিল নিরাকারের মাঝে — এটা স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, এমন দেশে জাতীয় সভা মন্ত্রিপদগুলির উপরে কর্তৃত্ব হারালে সমস্ত সত্যিকারের প্রভাব খুইয়ে বসে, যদি সেটা একই সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনকে সরলতর করে না আনে, কর্মচারী বাহিনীকে যথাসম্ভব হ্রাস না করে, আর শেষ কথা, সমাজ আর জনমতকে যদি সরকারী ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র করে ঐ দুইয়ের নিজ-নিজ সংস্থা সৃষ্টি করতে না দেয়। কিন্তু বহু শাখাপ্রশাখা সহ এই সুবিস্তৃত রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বজায় রাখার সঙ্গেই তো ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর **বৈষয়িক স্বার্থ** নিবিড়তম বন্ধনে জড়িত। এখানে তারা নিজেদের অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্যে কর্মসংস্থান করে, এবং মুনাফা, সুদ, খাজনা আর নানাবিধ দক্ষিণার রূপে যেটুকু পকেটস্থ করা যায় না সেটাকে সরকারী মাইনের আকারে পুষিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে, তাদের **রাজনৈতিক স্বার্থ** তাদের বাধ্য করেছে দমন-পীড়নের ব্যবস্থাবলি এবং কাজেই রাষ্ট্রশক্তির উপায়-উপকরণ আর লোক-লশকর প্রতিদিন বাড়িয়ে চলতে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালাতে হয়েছে এবং সামাজিক আন্দোলনের স্বতন্ত্র সংস্থাগুলিকে যখন কেটে একেবারে বাদ দিতে পারে নি সেক্ষেত্রে সন্দিগ্ধচিত্তে সেগুলির অঙ্গচ্ছেদ করতে, সেগুলিকে পঙ্গু করে ফেলতে হয়েছে। এইভাবে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী সেটার শ্রেণীগত অবস্থিতির দরুন একদিকে সমস্ত পার্লামেন্টীয় ক্ষমতার, তাই তাদের নিজেদেরও ক্ষমতার অপরিহার্য পরিবেশ লোপ করতে, এবং অন্যদিকে সেটার বিরুদ্ধ নির্বাহী ক্ষমতাটাকে অদম্য করে তুলতে বাধ্য হয়েছিল।

নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে বলা হত দ'অপুল মন্ত্রিসভা। জেনারেল দ'অপুল প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন, সে অর্থে নয়। বারোকে বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বরং বোনাপার্ট এই সম্মানিত পদটাকে উঠিয়ে দেন; বাস্তবিকই এই পদটা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসেবে আইনত অকিঞ্চিৎকর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল, তা আবার এমনই নিয়মতান্ত্রিক রাজা যার সিংহাসন কিংবা রাজমুকুট নেই, নেই রাজদণ্ড কিংবা তরবারি, দায়িত্বহীনতার সুবিধা কিংবা উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পদের অলঙ্ঘনীয়তা নেই, আর চরম অসুবিধার কথা,

নেই সিভিল লিস্টের (Civil List) জন্যে ভাতা বরাদ্দ। দ'অপ্‌্‌ল মন্ত্রিসভাতে পার্লামেণ্টীয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সদস্য একজনই ছিলেন — সুদখোর মহাজন ফুল্দ্‌, ফিনান্স অভিজাতবর্গের উচ্চস্তরের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর ভাগে পড়ল অর্থদপ্তর। প্যারিসের ফটকাবাজারে শেয়ারের দরগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যায় ১৮৪৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে বোনাপার্টিস্ট প্রতিষ্ঠার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকারী সিকিউরিটির দাম ওঠে-পড়ে। ফটকাবাজারকে এইভাবে মিত্র হিসেবে পেলেন বোনাপার্ট, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের পুলিস কর্তার পদে কার্লিয়েকে নিযুক্ত করে পুলিস বাহিনীকে হস্তগত করে নিলেন।

অবশ্য কেবল ঘটনাস্রোতের মধ্যেই এই মন্ত্রিবদলের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছিল। শুরুতে, বোনাপার্ট এক-পা এগুলেন, কিন্তু আরও বেশি লক্ষণীয়ভাবে তাঁকে হঠতে হল। তাঁর রুক্ষ বাণীটার পরে এল জাতীয় সভার প্রতি হীনানুগত্যের ঘোষণা। যতবার মন্ত্রীরা সাহস করে তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালকে বিধানিক প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করার দ্বিধাগ্রস্ত চেষ্টা করেছেন, ততবারই মনে হয়েছে তাঁরা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়ে হাস্যকর দায়িত্বপালনে প্রবৃত্ত হয়েছেন যেটার অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতা সম্পর্কে তাঁরা আগেই নিশ্চিত। যতবার বোনাপার্ট মন্ত্রীদের অজ্ঞাতসারে নিজ অভিপ্রায় হঠাৎ-হঠাৎ বলে ফেলেছেন এবং তাঁর 'idées napoléoniennes' (৪৭) নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ততবার তাঁর নিজেরই মন্ত্রীরা জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে তাঁকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর জবরদখলী বাসনা শ্রুতিগোচর হত যেন কেবল যাতে তাঁর শত্রুদের কুটিল হাসি স্তব্ধ না হয়। তিনি প্রতিভাধর, যাকে কেউ চিনতে পারল না, যাকে সর্বসাধারণই বোকা মনে করে — এমনটা হল তাঁর আচরণ। এই সময়ে তিনি যে-পরিমাণে সমস্ত শ্রেণীর অবজ্ঞাভাজন হয়েছিলেন ততখানি আর কখনও নয়। বুর্জোয়া শ্রেণী আর কখনও অত অখণ্ড প্রতাপে শাসন করে নি, আধিপত্যের চিহ্নগুলোকে তারা অত জাঁকিয়ে ফুটিয়ে তোলে নি আর কখনও।

এদের বিধানিক কার্যকলাপের ইতিহাস এখানে লেখার প্রয়োজন দেখি না, সেটা চুম্বকে রয়েছে এই সময়ের দুটো আইনে: **মদ্য-কর** পুনঃপ্রবর্তনের আইন এবং ধর্মে অনাস্থা দূর করার **শিক্ষা আইন**। এতে মদ্যপান ফরাসীদের

পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলেও সৎ জীবনের বারি তারা আরও প্রচুর পরিমাণে পেতে লাগল। মদ্য-কর আইনে যদি বুর্জোয়া শ্রেণী ফরাসীদের পুরনো ঘৃণ্য কর-ব্যবস্থাকে অলংঘনীয় ঘোষণা করে থাকে, তবে জনসাধারণের মধ্যে সেই কর-ব্যবস্থা মেনে নেবার উপযোগী সাবেকী মনোবৃত্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা হল শিক্ষা আইনের সাহায্যে। অর্লিয়ান্সীরা, উদারপন্থী বুর্জোয়ারা, ভল্টেয়ারবাদ এবং পাশ্চিমশালী দর্শনের এই পুরনো মন্ত্রশিষ্যরা কীভাবে তাদের বংশানুক্রমিক শত্রু জেশুইটদের হাতে ফরাসী মানসের তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিল দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। কিন্তু রাজসিংহাসনের দাবিদার নিয়ে অর্লিয়ান্সী এবং লেজিটিমিস্টরা যতই পৃথক হয়ে যাক, তারা বুঝেছিল তাদের যুগ্মশাসন নিরাপদ করতে হলে দুটো যুগের দমন-পীড়নের উপায়গুলোকে একত্র করতে হবে, জুলাই রাজতন্ত্রের দমন-ব্যবস্থাটাকে পরিপূর্ণ এবং আরও শক্তিশালী করতে হবে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন পর্বের দমন-ব্যবস্থা দিয়ে।

সমস্ত আশাভঙ্গের পরে, একদিকে শস্যের দামের নিম্নহার এবং অন্যদিকে কর আর মর্টগেজ ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝায় চূড়ান্ত মাত্রায় নিষ্পেষিত কৃষকেরা জেলায় জেলায় চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। প্রত্যুত্তরে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান করে তাদের করা হল যাজকদের অধীন, পৌরপ্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের জেলাশাসকদের (prefects) অধীন করা হল, তাছাড়া একটা গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থার অধীন করা হল সবাইকে। প্যারিসে এবং বড় শহরগুলিতে প্রতিক্রিয়ার মূর্তিটা যুগোচিত ছিল এবং সেটার আঘাতের চেয়ে আস্ফালনই ছিল বেশি। গ্রামাঞ্চলে সেটা হয়ে দাঁড়াল মূঢ়, স্থূল, নীচ, একঘেয়ে আর বিরক্তিকর — এককথায় সশস্ত্র পুলিস। যাজকমণ্ডলীর কর্তৃত্ব দিয়ে পুতে তিন-বছরের এই পুলিসী রাজ অপরিণত জনতার মনোবল ভেঙে দেবেই, সেটা বোঝাই যায়।

জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে শৃংখলা পার্টি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যতই ক্রোধ এবং আবেগময় আক্রমণ চালাক না কেন, তাদের বক্তব্য কিন্তু ছিল ঠিক সেই খ্রীষ্টানদের মতোই একস্বরা, যাদের উক্তি শুধু: হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না! যেমন সংবাদপত্রে তেমনি বক্তৃতামঞ্চেও একস্বরা। যার উত্তর আগেই জানা এমন ধাঁধার মতো নীরস। প্রশ্নটা যা নিয়েই হোক — আবেদন পেশ করার

অধিকার কিংবা মদ্য-কর, মুদ্রণের স্বাধীনতা অথবা অবাধ বাণিজ্য, ক্লাব অথবা মিউনিসিপাল সনদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ কিংবা রাষ্ট্রীয় বাজেট নিয়ন্ত্রণ -- প্রতিক্ষেত্রেই বারবার স্লোগান অবিরাম পুনরাবৃত্ত একই, সর্বদাই একই বিষয়বস্তু, রায়টা সদাপ্রস্তুত এবং অনিবার্যভাবে তা হল: **'সমাজতন্ত্র!'** এমনকি বুর্জোয়া উদারনীতিকে পর্যন্ত **সমাজতান্ত্রিক** বলে ঘোষণা করা হয়, বুর্জোয়া জ্ঞানান্বেষণও **সমাজতান্ত্রিক**, বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সংস্কার -- **সমাজতান্ত্রিক**। যেখানে আগে থেকে খাল রয়েছে সেখানে রেলপথ নির্মাণ **সমাজতান্ত্রিক**; আর কিরীচাঘাতের মুখে লাঠি-হাতে আত্মরক্ষাও **সমাজতন্ত্র**।

এটা কেবল শব্দালঙ্কার, ফ্যাশন বা পার্টিগত কৌশল নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর এটা বোঝার মতো যথাযথ অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, সামন্ততন্ত্রের বিপক্ষে তাদের নির্মিত সমস্ত অস্ত্রের সূচীমুখ তাদেরই বিরুদ্ধে ঘুরে গেছে, শিক্ষাদীক্ষার যত উপায় তারা পয়দা করেছিল সবই বিদ্রোহী হয়েছে তাদের নিজস্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে, তাদের সৃষ্টি করা সমস্ত দেবতা তাদের ত্যাগ করেছে। তারা বুঝেছিল সমস্ত তথাকথিত বুর্জোয়া স্বাধীনতা আর প্রগতির সংস্থা তাদের **শ্রেণী-শাসনকে** সেটার সামাজিক ভিত্তিমূলে এবং রাজনৈতিক শীর্ষদেশে যুগপৎ আক্রমণ করে বিপন্ন করছে, কাজেই সেগুলো **'সমাজতান্ত্রিক'** হয়ে পড়েছে। এই বিপদ এবং আক্রমণের মধ্যে তারা সমাজতন্ত্রের গূঢ় তথ্যটা ঠিকই ধরেছিল; তথাকথিত সমাজতন্ত্র যতটা আত্মবিচার করতে জানে তার চেয়ে সঠিকভাবে সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য এবং প্রবণতার বিচার তারা করতে পারে; তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভাবাকুল বিলাপই করুক অথবা ভবিষ্য স্বর্ণযুগ এবং বিশ্বমানবের ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে খ্রীষ্টানী ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী করুক, কিংবা মানস, শিক্ষা বা মুক্তি সম্পর্কে মানবতাধর্মী বচনই বিলাক, অথবা তত্ত্ববাগীশের মতো সর্বশ্রেণীর মিলমিশ আর কল্যাণের ব্যবস্থা বানিয়েই তুলুক, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের প্রতি এত ঔদাসীন্যভরে কঠিনহৃদয় হয়ে ওঠে কেন সেটা তাই তারা বুঝতে পারে না। তবু বুর্জোয়া শ্রেণী যেটা ধরতে পারে নি তা হল এই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তটা যে, তাদের নিজস্ব **পার্লামেন্টীয় রাজও**, সাধারণভাবে তাদের **রাজনৈতিক শাসনও** তখন **সমাজতান্ত্রিক** বলে নিন্দার ঢালাও ফতোয়া পেতে বাধ্য। যতকাল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন সম্পূর্ণ সংগঠিত হয় নি, যতকাল তা বিশুদ্ধ

রাজনৈতিক অভিব্যক্তি লাভ করে নি, ততকাল অন্যান্য শ্রেণীর বৈরিতাও সেটার বিশুদ্ধ আকারে দেখা দিতে পারে নি, এবং যেখানে সেটা দেখা দিয়েছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রাম যাতে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয় সেই বিপজ্জনক ধারায় চলতে পারে নি। সমাজে যে কোন প্রাণের স্পন্দন দেখলে তাদের যখন মনে হয় 'শান্তি' বিপন্ন, তাহলে কী করে তারা সমাজের শীর্ষস্থানে বজায় রাখতে চাইতে পারে একটা **অশান্তির রাজ**, তাদের নিজ রাজ, **পার্লামেণ্টীয় রাজ**, তাদের জনৈক মুখপাত্রের ভাষায় যেটাকে বেঁচে থাকতে হয় সংগ্রামের মধ্যে এবং সংগ্রাম করেই? পার্লামেণ্টীয় রাজ টিকে থাকে আলোচনার উপরে; কী করে তারা আলোচনা নিষিদ্ধ করবে? প্রতিটি স্বার্থ, প্রতিটি সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান এখানে সাধারণ ভাব-ধারণায় রূপান্তরিত হয়, ভাব-ধারণা হিসেবে তা নিয়ে বিতর্ক চলে; তাহলে কোন স্বার্থ, কোন প্রথা-প্রতিষ্ঠান কী উপায়ে এখানে চিন্তার ঊর্ধ্বে বজায় থাকতে, বিশ্বাসের প্রতীকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে? সভামঞ্চে বক্তাদের বাক্‌যুদ্ধ খবরের কাগজের কলমবাজি জাগিয়ে তোলে; পার্লামেণ্টের বিতর্কসভার পরিপূরক হয়ে আসে বৈঠকখানা আর শুঁড়িখানার বিতর্ক ক্লাবগুলো, তাতে অন্যথা হয় না; যে প্রতিনিধিরা নিয়ত জনমতের দরবারে আবেদন জানায়, তারা আবেদনপত্রে ঠিক মনের কথাটা বলার অধিকার দেয় জনমতকে। পার্লামেণ্টীয় রাজ সবকিছু ছেড়ে দেয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের উপর; তাহলে পার্লামেণ্টের বাইরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা মীমাংসা করতে চাইবে না, সেটা কেমন করে হয়? রাষ্ট্রের চূড়ায় বসে বেহালা বাজালে নিচে সবাই নৃত্য করবে, এ ছাড়া আর কী-ই বা আশা করা যায়?

আগে যেটাকে **উদারনৈতিক** বলে পদিয়েছে সেটাতে ইতোমধ্যে **সমাজতান্ত্রিক** বলে কলঙ্ক দেগে দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীকার করছে যে, নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই তাদের **নিজেদের শাসনের** বিপদ থেকে অব্যাহতি চাই; দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথমেই দেশের বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকে চিরশান্তি দিতে হবে; সেটার সামাজিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সেটার রাজনৈতিক ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া চাই; বুর্জোয়ারা ব্যক্তি হিসেবে অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ করে চলতে এবং নিরুপদ্রবে সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা উপভোগ করতে থাকতে পারে একমাত্র এই শর্তে যে, অন্যান্য শ্রেণীর

সঙ্গে তাদের শ্রেণীকেও সমানই রাজনৈতিক নাস্তিত্বে পর্যবসিত হতে হবে; বুর্জোয়াদের তহবিলটা বাঁচাতে হলে রাজমুকুটে অধিকার খোয়াতে হবে, আর যে তরবারি তাদের নিরাপদে রাখবে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ডামোক্লিসের খড়্গের মতো নিজেদেরই মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

নাগরিক-সাধারণের স্বার্থের ক্ষেত্রে জাতীয় সভা এমনই বন্ধ্যা প্রতিপন্ন হল যাতে উদাহরণস্বরূপ প্যারিস-আভিনোঁ রেলপথ সম্বন্ধে ১৮৫০ সালের শীতকালে শুরু করা আলোচনা ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখেও শেষ করার মতো পরিণত হয়ে ওঠে নি। সভা যেখানে দমন-পীড়ন চালায় নি অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ ধরে নি সেখানেই চিকিৎসার অসাধ্য বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা যখন আংশিকভাবে শৃঙ্খলা পার্টির মানসতা অনুসারে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়, এবং সেই আইন বলবৎ করা এবং পরিচালনায় শৃঙ্খলা পার্টির রূঢ়তাকেও আংশিকভাবে ছাড়িয়ে যায়, বোনাপার্ট তখন শিশুসুলভ নির্বোধ প্রস্তাব উপস্থিত করে জনপ্রিয়তা অর্জন এবং জাতীয় সভার প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন, আর ইঙ্গিত করেছিলেন যে, এমন গুপ্ত ভান্ডার আছে যেটার লুক্কায়িত রত্নসম্ভার যেন কোন অবস্থার দরুন শুধু সাময়িকভাবেই ফরাসী জনগণের হাতে আসতে পারছিল না। নন-কমিশন্ড অফিসারদের দৈনিক চার-সু বেতনবৃদ্ধির হুকুমটা ছিল এই ধরনের একটা প্রস্তাব। এইরকমেরই ছিল শ্রমিকদের জন্যে একটা সততাভিত্তিক ঋণ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব। দান হিসেবে টাকা এবং ঋণ হিসেবে টাকা — এই ধরনের সম্ভাবনা দেখিয়েই তিনি জনগণকে প্রলুব্ধ করবার আশা করেছিলেন। দান ও ঋণ — উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের অর্থবিজ্ঞান এতেই সীমাবদ্ধ। বোনাপার্ট শুধু এই ধরনের কলকাঠি নাড়তেই জানতেন। জনগণের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে এমন নির্বোধের মতো ফটকা সিংহাসনের আর কোন দাবিদার কখনও খেলে নি।

জাতীয় সভার ঘাড় ভেঙে জনপ্রিয়তা অর্জনের এইসব সন্দেহাতীত চেষ্টা প্রসঙ্গে, এবং ঋণভারের অঙ্কুশ যাকে অগ্রগমনে বাধ্য করছে অথচ কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠিত সুনাম যাকে নিরস্ত করছে না এহেন এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির মরিয়া কূদেতা করার হঠকারিতার ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্বন্ধে জাতীয়

সভা বারবার ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। শৃঙ্খলা পার্টি এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে বিরোধ ভয়াবহ আকার ধারণ করল, এমন সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা অনুতপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আবার তাদের ক্রোড়ে এনে ফেলল। **১৮৫০ সালের ১০ মার্চের উপনির্বাচনের** কথাই আমরা বলছি। ১৩ জুনের পরে কিছু প্রতিনিধির কারাদণ্ড অথবা নির্বাসনের ফলে যেসব আসন শূন্য হয়েছিল সেগুলি পূর্ণ করার জন্যে এই নির্বাচন হয়। প্যারিস কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রার্থীদেরই নির্বাচিত করেছিল। এমনকি প্যারিসের অধিকাংশ ভোট জড় করা হয়েছিল ১৮৪৮-এর জুনের এক বিদ্রোহীর পক্ষে, দ্য ফ্লত-এর পক্ষে। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে প্যারিসের পেটি বুর্জোয়ারা ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় এইভাবে। মনে হল তারা যেন বিপদের মুহূর্তে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে গিয়েছিল কেবল ভবিষ্যতে অধিকতর অনুকূল কোন পরিস্থিতিতে আরও সংখ্যাবহুল জঙ্গী বাহিনী নিয়ে অধিকতর সাহসী রণধ্বনি তুলে সেখানে ফিরে আসার জন্যেই। একটা পরিস্থিতি যেন এই নির্বাচনী জয় থেকে উদ্ভূত বিপদটাকে বাড়িয়ে তুলল। প্যারিসে সৈন্যরা জুনের এই বিদ্রোহীকে ভোট দিল বোনাপার্টের অন্যতম মন্ত্রী লা ইত-এর বিপক্ষে, আর জেলাগুলিতে তারা ভোট দিল প্রধানত 'পর্বতের' প্রার্থীদের — প্যারিসের মতো চূড়ান্তভাবে না হলেও, জেলাগুলোতেও 'পর্বত' তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রাধান্য রক্ষা করতে পেরেছিল।

বোনাপার্ট দেখলেন বিপ্লব হঠাৎ আবার তাঁর সামনে এসে পড়েছে। যেমন ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি, যেমন ১৮৪৯-এর ১৩ জুন, তেমনি ১৮৫০ সালের ১০ মার্চ তিনি শৃঙ্খলা পার্টির আড়ালে অদৃশ্য হলেন। তিনি প্রণতি জানালেন, কাপুরুষের মতো ক্ষমাভিক্ষা করলেন, পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু দলের নির্দেশক্রমে তাদের মনঃপূত যে কোন মন্ত্রিসভা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেন, এমনকি অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টদের নেতাদের — তিয়ের, বেরিয়ে, ব্রলি, মলে-দের, সংক্ষেপে তথাকথিত বারগ্রেভদের (৪৮) রাষ্ট্রের হাল ধরতেই মিনতি জানালেন। এই যে সুযোগ আর কখনও আসবে না শৃঙ্খলা পার্টি সেটার সদ্ব্যবহার করতে পারল না। প্রস্তাবিত ক্ষমতা সাহসের সঙ্গে অধিকার করা দূরে থাক, তারা ১ নভেম্বর বিতাড়িত মন্ত্রিসভার পুনর্নিয়োগে পর্যন্ত বোনাপার্টকে বাধ্য করল না; মার্জনা দিয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত করে এবং

দ'অপ্র্ল মন্ত্রিসভায় শ্রীয্ক্ত **বারোশ-কে** জ্বড়ে দিয়েই তারা সন্তুষ্ট রইল। সরকারী অভিশংসক হিসেবে এই বারোশ বুর্জোর হাই কোর্টে তর্জন-গর্জন করেছিলেন, প্রথমে ১৫ মে-র বিপ্লবপন্থীদের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় বার ১৩ জ্বনের গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় সভার জীবননাশ চেষ্টার অভিযোগে। বোনাপার্টের অন্য কোন মন্ত্রী পরবর্তীকালে জাতীয় সভার অবমাননায় এঁর চেয়ে বেশি ভূমিকা নেন নি, আর ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের পর আবার আমরা এঁকে দেখতে পাই চড়া বেতনে স্বচ্ছন্দে অধিষ্ঠিত সেনেটের সহ-সভাপতিরূপে। বিপ্লবপন্থীদের ঝোলে তিনি থ্বথ্ব ফেলেছিলেন যাতে বোনাপার্ট সেটা লেহন করে নিতে পারেন।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি যেন নিজেদের জয়লাভ সম্পর্কে আবার সন্দেহসৃষ্টি ক'রে সেটার সূচিমুখ ভোঁতা করে ফেলার অছিলারই সন্ধান করছিল। প্যারিসের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্যতম ভিদাল একই সঙ্গে স্ট্রাসবুর্গে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্যারিসের আসনটি ত্যাগ করে স্ট্রাসবুর্গের আসন গ্রহণ করতে তাঁকে রাজী করা হল। এইভাবে নির্বাচনে জয়লাভটাকে চূড়ান্ত না করে তুলে এবং তাতে করে অবিলম্বে পার্লামেন্টে শৃংখলা পার্টিকে দ্বন্দ্বে নামতে বাধ্য না করে, জনগণের উৎসাহ এবং সৈন্যবাহিনীতে অনুকূল মেজাজের এই মুহূর্তে ঐভাবে প্রতিপক্ষকে লড়াই করতে বাধ্য করার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পার্টি মার্চ-এপ্রিল মাসে একটা নতুন নির্বাচনী অভিযানে প্যারিসকে ক্লান্ত করে দিল, অস্থায়ী নির্বাচনের এই পৌনঃপুনিক খেলায় জনগণের জাগ্রত উত্তেজনাকে নিভে যেতে দিল, বৈপ্লবিক উদ্যমকে পরিতৃপ্ত হতে দিল নিয়মতান্ত্রিক সাফল্যে, তুচ্ছ ঘোঁট আর ফাঁকা বক্তৃতা এবং মেকি আন্দোলনের মধ্যে সেটাকে বিলীন হয়ে যেতে দিল, বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমবেত এবং প্রস্তুত হবার সুযোগ দিল, আর শেষে, মার্চের নির্বাচনের তাৎপর্যকে ক্ষীণ করে দিল এপ্রিলের উপনির্বাচনে একটা ভাবালু ভাষ্য দিয়ে, সেটা এজেন স্যু-র। এককথায়, ১০ মার্চকে তারা 'এপ্রিল ফুল্' করে ছেড়েছিল।

পার্লামেন্টে সংখ্যাগুরু অংশ তাদের প্রতিপক্ষের দুর্বলতা টের পেল। এদের সতেরো জন বারগ্রেভ, যাদের উপর বোনাপার্ট ছেড়ে দিয়েছিলেন আক্রমণের পরিচালনা আর দায়িত্ব, তারা একটা নতুন নির্বাচনী আইন রচনা

করল; আইনটা উত্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হল এ সম্মান পাবার জন্যে তিনি মিনতি করেছিলেন ম. ফশে-কে, ৮ মে তাঁর উত্থাপিত এই আইনে সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল হল, নির্বাচন-এলাকাতে নির্বাচকদের তিন বছর বসবাসের শর্ত আরোপ করা হল এবং, শেষে, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বসবাসের প্রমাণটাকে মালিকদের সার্টিফিকেটের সাপেক্ষ করা হল।

নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণতন্ত্রীরা যেমন বৈপ্লবিক কায়দায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে তুমুল কান্ড করেছিল, ঠিক তেমনি যখন সেই জয়ের গুরুত্বটাকে অস্ত্রহাতে প্রমাণ করার প্রয়োজন হল, তখন তারা নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় উপদেশ ছড়াল শৃঙ্খলা, সমুন্নত প্রশান্তি (calme majestueux) আর বৈধ কার্যক্রমের জন্যে, অর্থাৎ আইন হিসেবে চেপে-বসা প্রতিবিপ্লবের সংকল্পের কাছে নির্বিচার বশ্যতাস্বীকারের জন্যে। বিতর্কের সময়ে 'পর্বত' শৃঙ্খলা পার্টির বৈপ্লবিক আবেগচাঞ্চল্যের বিরুদ্ধে আইন মেনে-চলা কূপমন্ডুকের আবেগহীন মনোভাব জাহির ক'রে, এবং সে-পার্টিটা বৈপ্লবিক কায়দায় চলছে এই ভয়াবহ অনুযোগ দিয়ে সেটাকে ধরাশায়ী ক'রে 'পর্বত' শৃঙ্খলা পার্টিকে লজ্জা দিল। এমনকি নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা পর্যন্ত শোভন এবং সুবিবেচনাপূর্ণ আচরণ দিয়ে সযত্নে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেল যে, তাদের নৈরাজ্যবাদী বলে ধিক্কার দেওয়া অথবা তাদের নির্বাচনকে বিপ্লবের জয় হিসেবে গণ্য করা কী ভয়ানক ভুল! নতুন নির্বাচনী আইন গৃহীত হল ৩১ মে। গোপনে রাষ্ট্রপতির পকেটে একখানা প্রতিবাদলিপি ঢুকিয়ে দিয়ে 'পর্বত' ক্ষান্ত হল। নির্বাচনী আইনের পরে এল মুদ্রণ সংক্রান্ত একটা নতুন আইন (৪৯), তাতে বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের যথাযোগ্য নিয়তিই বটে। *National* আর *La Presse* (৫০) এই দুটি বুর্জোয়া মুখপত্র এই মহাপ্লাবনের পর টিকে রইল বিপ্লবের সবচেয়ে আগুয়ান ঘাঁটি হিসেবে।

আমরা দেখেছি কীভাবে মার্চ-এপ্রিল মাসে গণতন্ত্রী নেতারা সর্ববিধ চেষ্টা করেন প্যারিসের জনগণকে এক নকল লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলতে, কীভাবে ৮ মে-র পরে তাঁরা সবকিছু করেন তাদের প্রকৃত লড়াই থেকে বিরত করার জন্যে। তাছাড়া ভোলা চলে না যে, ১৮৫০ সাল ছিল শিল্পে আর বাণিজ্যে বাড়-বাড়ন্তের সবচেয়ে চমৎকার বছরগুলিরই একটা, তাই প্যারিসের

প্রলেতারিয়েতের জুটেছিল পূর্ণ কর্মসংস্থান। কিন্তু ১৮৫০ সালের ৩১ মে তারিখের নির্বাচনী আইন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ থেকে একেবারেই বন্ধ দিল। সংগ্রামের রঙ্গভূমি থেকেই সেটা তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে শ্রমিকরা যেমন অপাঙক্তেয় ছিল, আবার তাদের সেই অবস্থায় ঠেলে ফেলা হল। এমন একটা ঘটনা সত্ত্বেও গণতন্ত্রীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নিজেদের বৈপ্লবিক শ্রেণী-স্বার্থ ভুলে গিয়ে তারা একটা বিজেতা শক্তি হিসেবে দাঁড়াবার সম্মান বিসর্জন দিল, নিজ অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করল, প্রমাণ করে দিল যে, ১৮৪৮-এর জুন মাসের পরাজয় তাদের বছরের পর বছরের মতো সংগ্রামের বাইরে ঠেলে দিয়েছে, আপাতত ইতিহাসের প্রক্রিয়াটা ফের চলতে থাকবে তাদের মাথার **উপর দিয়ে**। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র ১৩ জুন চীৎকার করে উঠেছিল, 'সর্বজনীন ভোটাধিকারকে আক্রমণ করলে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব!', তারা এখন নিজেদের প্রবোধ দিল এই বলে যে, প্রতিবৈপ্লবিক যে আঘাত তাদের উপরে পড়ল সেটা কোন আঘাতই নয়, আর ৩১ মে-র আইনটা আইনই নয়। ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার প্রত্যেক ফরাসী নাগরিক ভোটঘরে হাজির হবে একহাতে ভোটপত্রী, অন্য হাতে তরোয়াল নিয়ে — এই ভবিষ্যদ্বাণী করেই তারা সন্তুষ্ট থাকল। শেষে, সৈন্যবাহিনীর বড়কর্তারা ১৮৫০ সালের মার্চ আর এপ্রিলের নির্বাচনের জন্যে সৈন্যদের শাস্তি দিলেন, ঠিক যেভাবে ১৮৪৯ সালের ২৮ মে-র নির্বাচনের জন্যে তারা শিক্ষা পেয়েছিল। এবার কিন্তু তারা স্থিরনিশ্চিতভাবে বলল, 'বিপ্লব আর তৃতীয় বার আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।'

১৮৫০ সালের ৩১ মে-র আইন হল বুর্জোয়া শ্রেণীর কুদেতা। ইতিপূর্বে বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় জয়লাভের একটা অস্থায়ী চরিত্র ছিল। তৎকালীন জাতীয় সভা রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেই সেসব জয় বিপন্ন হয়ে পড়ত। নতুন সাধারণ নির্বাচনের অনিশ্চয়তার উপরে সেগুলো নির্ভর করত, আর ১৮৪৮ সালের পরবর্তী নির্বাচনগুলির ইতিহাসে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর বাস্তব আধিপত্য যত বেড়েছে, জনগণের উপর তাদের নৈতিক কর্তৃত্ব ততই কমেছে। ১০ মার্চ তারিখে সর্বজনীন ভোটাধিকার বুর্জোয়া আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানায়, তার প্রত্যুত্তরে বুর্জোয়া শ্রেণী

সর্বজনীন ভোটাধিকারকে আইনবহির্ভূত করে দিল। ৩১ মে-র আইনটা তাই ছিল শ্রেণী-সংগ্রামের জন্যে একটা অত্যাবশ্যক বস্তু। পক্ষান্তরে, সংবিধানের কড়ারে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আইনত সিদ্ধ হতে হলে অন্তত বিশ লক্ষ ভোট পাওয়া চাই। রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীদের একজনও এই ন্যূনতম ভোট না পেলে যে পাঁচ জন প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান তাঁদের একজনকে জাতীয় সভা রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত করবে। সংবিধান-সভা যখন এই আইন করেছিল তখন নির্বাচক-তালিকায় এক কোটি নাম লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং সংবিধান-সভার অভিমত অনুসারে, ভোটাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের এক-পঞ্চমাংশের ভোটই রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আইনত সিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ৩১ মে-র আইন নির্বাচক-তালিকা থেকে অন্তত ৩০ লক্ষ নাম কেটে দিল, ভোটাধিকারী লোকের সংখ্যা কমিয়ে আনল ৭০ লক্ষে, অথচ তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যে বিশ লক্ষ ভোটের ন্যূনতম বৈধ সংখ্যাটা বজায় রেখে দিল; তাতে ন্যূনতম বৈধ সংখ্যাটা মোট কার্যকর ভোটের পঞ্চমাংশ থেকে বেড়ে প্রায় তৃতীয়াংশ হয়ে দাঁড়াল, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন জনগণের হাত থেকে জাতীয় সভার হাতে লুকিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সব কিছু করা হল। এইভাবে ৩১ মে-র আইনের সাহায্যে জাতীয় সভা নির্বাচন এবং প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সমাজের স্থিতিশীল অংশের হাতে সঁপে দিয়ে শৃঙ্খলা পার্টি যেন তাদের শাসন দ্বিগুণ নিরাপদ করে নিল।

৫

যেইমাত্র বৈপ্লবিক সংকট নিরাপদে পার হওয়া গেল এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার লোপ হল, অমনি জাতীয় সভা এবং বোনাপার্টের মধ্যে সংগ্রাম আবার শুরু হল।

সংবিধান বোনাপার্টের বেতন ৬,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক ধার্য করেছিল। নিজ পদে আসীন হয়ে সবে ছয় মাসের মধ্যেই তিনি অংকটা দ্বিগুণ করতে সমর্থ হন। জাতীয় সংবিধান-সভার কাছ থেকে অদিলোঁ বারো তথাকথিত প্রতিনিধিত্ব ভাতা বাবত বছরে অতিরিক্ত ৬,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক নিঙড়ে আদায় করতে পেরেছিলেন। ১৩ জুনের পরে বোনাপার্ট অনুরূপ দাবি আবার উত্থাপনের

ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু বারো-র কাছ থেকে এবার সাড়া পাওয়া গেল না। ৩১ মে-র পরে তিনি কালবিলম্ব না করে অনুকূল মুহূর্তটাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর মন্ত্রীদের দিয়ে জাতীয় সভায় সিভিল লিস্ট বাবত ত্রিশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক বরাদ্দের প্রস্তাব আনলেন। দীর্ঘকালের বেপরোয়া ভবঘুরে জীবনের ফলে তাঁর খুবই বিকশিত একটা ইন্দ্রিয়স্থান গড়ে উঠেছিল, সেটা দিয়ে তিনি টের পেতেন কোন্ দুর্বল মুহূর্তে তিনি তাঁর বুর্জোয়াদের কাছ থেকে টাকা নিঙড়ে বার করতে পারবেন। রীতিমতো chantage* চালিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাহায্যে এবং জ্ঞাতসারেই জাতীয় সভা জনগণের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছিল। তিনি ভয় দেখালেন, থলির মুখ আল্‌গা করে বাৎসরিক ত্রিশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে জাতীয় সভা তাঁর নীরবতা ক্রয় না করলে তিনি জনগণের দরবারে সেটার অপরাধ নিয়ে অভিযোগ তুলে ধরবেন। সভা ত্রিশ লক্ষ ফরাসীর ভোটাধিকার হরণ করেছিল। অচল-করে-দেওয়া ফরাসীদের মাথাপিছু তিনি একটি করে সচল ফ্র্যাঙ্ক চাইলেন, অর্থাৎ ঠিক ত্রিশ লক্ষটি ফ্র্যাঙ্ক। ষাট লক্ষ মানুষের ভোটে নির্বাচিত তিনি; তিনি বললেন, যেসব ভোট থেকে পূর্বাহ্নেই তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেজন্যে ক্ষতিপূরণ চাই। জাতীয় সভার কমিশন নাছোড়বান্দার আবদার অগ্রাহ্য করল। বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলি ভয় দেখাতে লাগল। জাতীয় সভা নীতিগতভাবে জাতির বহুলাংশের সঙ্গে স্পষ্টত সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কি তাদের পক্ষে সম্ভব? বাৎসরিক সিভিল লিস্ট সভা প্রত্যাখ্যান করল বটে, কিন্তু এই একবারের মতো মঞ্জুর করল একুশ লক্ষ ষাট হাজার ফ্র্যাঙ্ক উপরিভাতা। এইভাবে সভা দুনো দুর্বলতার অপরাধ করে বসল: অর্থ মঞ্জুর করল, অথচ সেইসঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করে ফাঁস করে দিল যে মঞ্জুরিটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। পরে আমরা দেখব কী কারণে বোনাপার্টের এই টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার লোপের ঠিক পরেই এই যে বিরক্তিকর পরিণাম ঘটল, যাতে বোনাপার্ট মার্চ-এপ্রিলের সংকটকালীন নম্রভাবের বদলে জবরদখলী পার্লামেন্টের প্রতি লড়িয়ে ঔদ্ধত্য দেখালেন, তার পরে জাতীয় সভা ১১ অগস্ট থেকে ১১ নভেম্বর তিন মাসের জন্যে

* ব্ল্যাকমেল। — সম্পাঃ

মুলতবি রইল। নিজের জায়গায় সভা রেখে গেল আটাশ জন সদস্যের একটি স্থায়ী কমিশন, যেটার মধ্যে একজনও বোনাপার্টপন্থী ছিল না, ছিল কিন্তু নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী কয়েকজন। ১৮৪৯-এর স্থায়ী কমিশনে ছিল কেবল 'শৃঙ্খলা'ওয়ালারা এবং বোনাপার্টপন্থীরা। কিন্তু তখন শৃঙ্খলা পার্টি স্থায়িভাবে ঘোষণা করেছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে। এবার পার্লামেন্টীয় প্রজাতন্ত্র স্থায়িভাবে ঘোষণা করল রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে। ৩১ মে-র আইনের পরে তিনিই রইলেন শৃঙ্খলা পার্টির সামনে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

১৮৫০ সালের নভেম্বরে আবার জাতীয় সভার অধিবেশন বসলে মনে হল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেটার ইতিপূর্বে যেসব খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে তার বদলে শক্তিদ্বয়ের মধ্যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে এক বিরাট, নির্মম সংগ্রাম, জীবনমরণ সংগ্রাম।

১৮৪৯ সালের মতো এই বছরও পার্লামেন্টের বিরতিকালে শৃঙ্খলা পার্টি সেটার বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে প্রত্যেকটা উপদল রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের নিজ ঘোঁট পাকাচ্ছিল, যা লুই ফিলিপের মৃত্যুর ফলে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। লেজিটিমিস্টদের রাজা পঞ্চম হেনরি এমনকি প্যারিসে অবস্থিত একটি মন্ত্রিসভা পর্যন্ত যথাবিধি মনোনীত করেছিলেন, যাতে স্থান পেয়েছিলেন স্থায়ী কমিশনের কোন কোন সদস্য। কাজেই অন্য দিকে বোনাপার্টও তখন ফ্রান্সের জেলাগুলিতে সফর করার, এবং নিজ উপস্থিতি দিয়ে বাধিত শহরের মেজাজ অনুসারে কখনও অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও-বা অল্পবিস্তর প্রকাশ্যে নিজের পুনঃস্থাপনার পরিকল্পনা ব্যক্ত করে নিজের জন্যে ভোট সংগ্রহের অভিযান চালাবার অধিকার পেলেন। এইসব শোভাযাত্রাকে মহান সরকারী *Moniteur* পত্রিকা এবং বোনাপার্টের ব্যক্তিগত খুদে *Moniteur*গুলি স্বভাবতই জয়-শোভাযাত্রা বলে ঘোষণা করতে থাকল, এগুলিতে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকত **১০ ডিসেম্বর সমিতির** লোকজন। এই সমিতির সূত্রপাত হয় ১৮৪৯ সালে। হিতৈষী সমিতি স্থাপনের অছিলায় প্যারিসের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত** সম্প্রদায়কে কয়েকটি গুপ্ত বিভাগে সংগঠিত করা হয়েছিল, প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বে ছিল বোনাপার্টপন্থী দালালরা এবং সবটার কর্তা ছিল জনৈক বোনাপার্টপন্থী জেনারেল। যাদের জীবিকানির্বাহের উপায় এবং বংশপরিচয় সন্দেহজনক

সেই খয়া roué বদস্বভাবের লোকদের পাশাপাশি, বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছন্ন ভাগ্যান্বেষী উপাঙ্গগুলোর পাশাপাশি ছিল ভবঘুরের দল, বরখাস্ত সৈনিক, ছাড়া-পাওয়া জেলঘুঘুরা, পলাতক কয়েদী, ঠগ, জুয়াচোর, লাজারোনি (৫১), পকেটমার, ধোঁকাবাজ, জুয়াড়ী, বেশ্যার দালাল, বেশ্যালয়ের মালিক, মুটে মজুর, কলমচি, রাস্তার বাজনদার, ন্যাকড়া কুড়ুনী, ছুরি-শানওয়ালা, ঝালাইকার, ভিখারী — সংক্ষেপে, ফরাসীরা যাকে বলে la bohème সেই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অনির্দিষ্ট, ভেঙে-পড়া জনতার সবটা। এই জ্ঞাতিবর্গ থেকে বোনাপার্ট গড়েছিলেন ১০ ডিসেম্বর সমিতির কেন্দ্রী উপাদানটা। 'হিতৈষী সমিতি' — সেটা ততখানি যাতে বোনাপার্টেরই মতো এর সমস্ত লোক মেহনতী জাতির ঘাড়ে চেপে নিজেদের সুবিধে করে নেবার প্রয়োজনটা অনুভব করত। এই বোনাপার্ট, যিনি হয়ে উঠলেন লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের সর্দার, যিনি একমাত্র এখানেই পুনরাবিষ্কার করলেন তাঁর অন্বিষ্ট ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপক রূপটাকে, যিনি সর্বশ্রেণী থেকে ঝড়তি-পড়তি এই নোংরা আবর্জনাস্তূপের মধ্যেই চিনতে পারলেন সেই শ্রেণীটিকে একমাত্র যেটার উপর তিনি সর্বতোভাবে ভর করতে পারেন, ইনিই আসল বোনাপার্ট, ডাহা বোনাপার্ট। ঘাগী ধূর্ত এই বদস্বভাবের লোকটার দৃষ্টিতে জাতিসমূহের জীবনের ঐতিহাসিক জীবন এবং সেগুলির রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ হল সবচেয়ে ইতর অর্থে কৌতুক নাট্য মাত্র, সঙের অনুষ্ঠান, জমকালো সাজপোশাক, উক্তি এবং ভঙ্গিমা হল অতি হীন পেজোমি আড়াল করার উপায় মাত্র। তাই ঘটেছিল তাঁর স্ট্রাসবুর্গ অভিযানে, যেখানে নেপোলিয়নীয় ঈগলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল একটা তালিম-দেওয়া সুইশ শকুন। বুলোনা-এ ঝটকা-প্রবেশের সময়ে তিনি লন্ডনের কিছু চাপরাসিকে ফরাসী উর্দি পরিয়েছিলেন। এরাই হয়েছিল তাঁর সৈন্যবাহিনী (৫২)। ১০ ডিসেম্বর সমিতিতে তিনি জড় করলেন দশ হাজার পাজি-বদমাশকে, যাদের নামার কথা জনগণের ভূমিকায়, যেমনটা নিক্ বটম ছিল সিংহের ভূমিকায়।* ফরাসী নাট্যশাস্ত্রের পণ্ডিতী আদবকায়দা এতটুকু লঙ্ঘন না করে জগতের সবচেয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে

---

* শেক্সপিয়রের 'A Midsummer Night's Dream' কমেডির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

বুর্জোয়ারা যখন নিজেরাই একেবারে পূর্ণাঙ্গ একখানা কৌতুক নাট্য অভিনয় করে চলেছে এবং নিজেদের জাঁকের অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য সম্পর্কে নিজেরাই আধা-প্রতারিত, আধা-নিশ্চিত হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে যে আড়ভেণ্চারার কৌতুক নাট্যটাকে নিছক কৌতুক-নাট্য বলেই নিয়েছে তাঁর জয় তো অবধারিত। তিনি যখন গুরুগম্ভীর প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে অপসারিত করলেন, তিনি যখন স্বয়ং তাঁর সম্রাটের ভূমিকাটাকে গুরুত্ব দিয়ে ধরলেন এবং নেপোলিয়নের মুখোশ পরে ভাবলেন তিনিই প্রকৃত নেপোলিয়ন, শুধু তখনই তিনি জগৎ সম্বন্ধে নিজের ধারণার শিকার হয়ে পড়লেন, ভারিক্কি ভাঁড়টি তখন আর পৃথিবীর ইতিহাসকে কৌতুক-নাট্য বলে মনে করলেন না, নিজের কৌতুক-নাট্যকেই পৃথিবীর ইতিহাস বলে গণ্য করলেন। সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের কাছে যেমনটা ছিল জাতীয় কর্মশালা (ateliers),* বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের কাছে যেমনটা ছিল সচল রক্ষিদল,** বোনাপার্টের পক্ষে বিশেষক এই দলীয় লড়ায়ে বাহিনী ১০ ডিসেম্বর সমিতিও তাঁর কাছে ঠিক তেমনই। তাঁর সফরের সময় রেলপথ ভর্তি করে থাকত সমিতির দঙ্গলগুলো, তাদের কাজ ছিল তাঁর জন্যে উপস্থিতমতো জনসাধারণ বানিয়ে দেওয়া, তারা গণ-উদ্দীপনা মঞ্চস্থ করত, vive l'Empereur ['সম্রাটের জয়'] গর্জন তুলত, প্রজাতন্ত্রীদের অপমান করত, ঠেঙ্গাত — অবশ্য পুলিস পাহারায়। তাঁর প্যারিসে ফিরে আসার সময়ে এদের হতে হত অগ্রবাহিনী; পাল্টা বিক্ষোভপ্রদর্শন আগে থাকতে নিবারণ কিংবা ছত্রভঙ্গ করতে হত তাদের। ১০ ডিসেম্বর সমিতি তাঁর সম্পত্তি, তাঁরই হাতে গড়া, একান্ত তাঁরই নিজস্ব কল্পনা। তিনি অন্যান্য যা কিছু আত্মসাৎ করেছেন তা তাঁর হাতে এসে পড়েছে ঘটনাচক্রে; আর যাকিছু তিনি করেছেন তা তাঁর হয়ে করে দিয়েছে ঘটনাচক্রই, অথবা অপরের কৃতির নকল করেই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে, নাগরিকদের সামনে শৃঙ্খলা, ধর্ম, পরিবার আর সম্পত্তি সম্পর্কে সরকারী বুলি নিয়ে এবং নিজের পিছনে শুফ্‌টার্লে আর স্পিগেলবের্গদের গুপ্ত সমিতি, অরাজকতা, বেশ্যাবৃত্তি এবং চৌর্যের সমিতি নিয়ে বোনাপার্ট — সেই হল মৌলিক রচয়িতা হিসেবে

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১১১-১১২ দ্রঃ। — সম্পাঃ

** ঐ। পৃঃ ১১০-১১১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

বোনাপার্ট স্বয়ং, আর ১০ ডিসেম্বর সমিতির ইতিহাস তাঁর নিজেরই ইতিহাস।

ব্যতিক্রম হিসেবেই ঘটনাক্রমে শৃঙ্খলা পার্টির জন-প্রতিনিধিদের উপরে এই ডিসেম্বর-ওয়ালাদের লগুড়ের আঘাত পড়েছিল। কেবল তাই নয়। জাতীয় সভায় মোতায়েন এবং সেটার নিরাপত্তারক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিস কমিশনার ইয়োন কোন এক আলে-র জবানবন্দি অনুসারে স্থায়ী কমিশনকে জানালেন যে ডিসেম্বর-ওয়ালাদের একাংশ জেনারেল শাঙ্গার্নিয়ে এবং জাতীয় সভার অধ্যক্ষ দ্যুপাঁ-কে হত্যা করতে মনস্থ করেছে, অপকর্মটা কারা করবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত দ্যুপাঁর আতঙ্কটা বোঝাই যায়। ১০ ডিসেম্বর সমিতি সম্পর্কে পার্লামেণ্টীয় তদন্ত, অর্থাৎ বোনাপার্টের গোপন জগতে কলুষ হস্তক্ষেপ অনিবার্য মনে হল। জাতীয় সভার অধিবেশনের ঠিক আগে বোনাপার্ট সুবিবেচকের মতো তাঁর সমিতিটা ভেঙে দেন, স্বভাবতই কাগজে-কলমে মাত্র, যেহেতু ১৮৫১ সালের শেষের দিকে একটা বিস্তারিত স্মারকলিপিতে পুলিসের বড়কর্তা কার্লিয়ে তখন ডিসেম্বর-ওয়ালাদের যথার্থই ভেঙে দেবার জন্যে তাঁকে রাজী করতে বৃথাই চেষ্টা করেন।

১০ ডিসেম্বর সমিতিটা বোনাপার্টের নিজস্ব ফৌজ হয়ে থাকা চাই — যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে একটা ১০ ডিসেম্বর সমিতিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। জাতীয় সভা মুলতবি রাখার অল্পকাল পরে এবং সেটার কাছ থেকে সদ্য ছিনিয়ে-নেওয়া টাকা দিয়েই বোনাপার্ট এই চেষ্টা করেন প্রথম বার। অদৃষ্টবাদী হিসেবে তাঁর দৃঢ় ধারণা এই যে, এমন কোন কোন ঊর্ধ্বতন শক্তি আছে যেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষ, বিশেষত সৈন্যরা দাঁড়াতে পারে না। এগুলোর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান শক্তি হিসেবে তিনি গণ্য করলেন চুরুট আর শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখির মাংস আর রসুন-সসেজ। সুতরাং তিনি প্রথমে রাষ্ট্রপতির বাসস্থান প্যালে দা ইলিজে চুরুট আর শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখির মাংস আর রসুন-সসেজ দিয়ে অফিসার এবং নন-কমিশণ্ড অফিসারদের আপ্যায়ন করলেন। ৩ অক্টোবর সাঁ মর-এ সেনাবাহিনী পরিদর্শনকালে তিনি সৈনিক-সাধারণের বেলায়ও এই কুশলী চালের পুনরাবৃত্তি করেন, আর ১০ অক্টোবর সাতোরি-তে সেনাদলের কুচকাওয়াজে একই কুশলী চাল — আরও ব্যাপক পরিসরে। খুড়ো-মশায়ের

স্মরণে ছিল আলেকজান্ডরের এশিয়া অভিযানের কাহিনী, ভাইপো মনে রাখলেন একই ভূমিতে ব্যাকেস্-এর বিজয়-শোভাযাত্রার কথা। আলেকজান্ডর অবশ্য অর্ধ-দেবতা ছিলেন, কিন্তু ব্যাকেস্ তো দেবতাই, তদুপরি ১০ ডিসেম্বর সমিতির ইষ্টদেবতাও বটেন।

৩ অক্টোবরের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের পরে স্থায়ী কমিশন যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে তলব করে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন এ ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ আর ঘটবে না। ১০ অক্টোবর বোনাপার্ট কীভাবে দ'অপুলের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন তা আমরা জানি। প্যারিসের ফৌজের প্রধান সেনাপতি হিসেবে শাঙ্গার্নিয়ে উভয় পরিদর্শন পরিচালনা করেছিলেন। একাধারে স্থায়ী কমিশনের সভ্য, জাতীয় রক্ষিদলের দলপতি, ২৯ জানুয়ারি এবং ১৩ জুনের 'ত্রাতা', 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর', রাষ্ট্রপতি-মর্যাদার জন্যে শৃঙ্খলা পার্টির প্রার্থী, দুটো রাজতন্ত্রের 'মঙ্ক'* বলে সন্দেহভাজন এই শাঙ্গার্নিয়ে তদবধি কখনও নিজেকে যুদ্ধমন্ত্রীর অধীন বলে স্বীকার করেন নি, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানকে সর্বদাই প্রকাশ্যে উপহাস করেছেন, এবং দ্ব্যর্থক উদ্ধত অভিভাবকত্বের ভাব নিয়ে বোনাপার্টের অনুসরণ করেছেন। এখন তিনি যুদ্ধমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিয়মানুবর্তিতার জন্যে এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধানের জন্যে প্রজ্বলিত উদ্দীপনায় জ্বলতে থাকলেন। ১০ অক্টোবর অশ্বারোহী বাহিনীর একাংশ যখন 'Vive Napoléon! Vivent les saucissons!' ['নেপোলিয়ন জিন্দাবাদ! সসেজ জিন্দাবাদ!'] ধ্বনি তুলেছিল তখন শাঙ্গার্নিয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তাঁর বন্ধু নেইমেয়ারের পরিচালিত পদাতিক বাহিনী অন্তত মার্চ-পাস্টের সময়ে হিমশীতল স্তব্ধতা রক্ষা করে। এর শাস্তি হল, বোনাপার্টের প্ররোচনায় যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল নেইমেয়ারকে চতুর্দশ আর পঞ্চদশ সামরিক ডিভিশনের সেনাপতিত্বে নিয়োগের অছিলায় তাঁর প্যারিসের পদ থেকে অব্যাহতি দিলেন। নেইমেয়ার এই পদ-বিনিময় প্রত্যাখ্যান করায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অপরপক্ষে শাঙ্গার্নিয়ে ২ নভেম্বর একটি হুকুমনামা

---

* ইংলন্ডের সিংহাসন পুনরধিকার করতে ২য় চার্লস-এর সহায়ক ব্রিটিশ জেনারেল জর্জ মঙ্ক (১৮০৮-১৮৭০)-এর কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

প্রকাশ করে সৈন্যদের হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় কোন রাজনৈতিক ধ্বনি কিংবা মনোভাব-প্রকাশ নিষেধ করে দিলেন। ইলিজে কাগজগুলি (৫৩) শাঙ্গার্নিয়েকে আক্রমণ করল, শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি আক্রমণ করল বোনাপার্টকে; স্থায়ী কমিশন ঘন ঘন গোপন বৈঠক বসাল, দেশ বিপদাপন্ন বলে ঘোষণার প্রস্তাব সেখানে উঠল বারংবার; সৈন্যবাহিনী যেন বিভক্ত হয়ে পড়ল দুই বিরুদ্ধ শিবিরে, তাতে দুটো বিরুদ্ধ সেনানীমণ্ডলী, একটার অবস্থান বোনাপার্টের বাসভবন প্যালে দা ইলিজে-তে, অপরটি শাঙ্গার্নিয়ের বাসস্থান টুইলেরিস-এ। মনে হল যুদ্ধের সঙ্কেতটা দেবার জন্যে জাতীয় সভার অধিবেশনটাই শুধু বাকি। বোনাপার্ট এবং শাঙ্গার্নিয়ের মধ্যে এই সংঘাতটাকে ফরাসী জনসাধারণ দেখল সেই ইংরেজ সাংবাদিকের দৃষ্টিতে, যিনি ব্যাপারটি বর্ণনা করেন এইভাবে:

'ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিচারিকারা বিপ্লবের উত্তপ্ত লাভা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিচ্ছে পুরনো ঝাঁটা দিয়ে, আর কাজটা করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে কোন্দল করে চলছে।'

ইতিমধ্যে বোনাপার্ট যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে তাড়াতাড়ি অপসারিত করে ঝটিতি আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে তাঁর জায়গায় জেনারেল শ্রাম-কে নিযুক্ত করেছিলেন যুদ্ধমন্ত্রিপদে। ১২ নভেম্বর তিনি জাতীয় সভার উদ্দেশে একটা বাণী পাঠালেন, সেটা মার্কিন ধাঁচে দীর্ঘ শব্দবহুল, খুঁটিনাটিতে ভারাক্রান্ত, শৃঙ্খলা-সুরভিত, পুনর্মিলনকামী, সংবিধান-মান্যপ্রয়াসী, তাতে আলোচনা সব কিছুই নিয়ে রয়েছে, শুধু সেই মুহূর্তের questions brûlantes [সুতীব্র সমস্যাগুলি] বাদে। এই বাণীতে তিনি যেন প্রসঙ্গত মন্তব্য করলেন যে, সংবিধানের সুস্পষ্ট ধারা অনুসারে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন। নিম্নলিখিত অতি সুগম্ভীর কথায় বাণীটি শেষ হয়েছিল:

'ফ্রান্স চায় সর্বোপরি শান্তি... কিন্তু আমি শপথবদ্ধ, তাতে আমার জন্য যে সংকীর্ণ চৌহদ্দি নির্দিষ্ট করা আছে সেখানেই আমি গণ্ডিবদ্ধ থাকব... জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং আমার ক্ষমতার জন্যে একমাত্র তাদেরই কাছে বাধিত আমি যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে আমি তাদের বৈধ উপায়ে প্রকাশিত ইচ্ছার কাছে সর্বদাই নতিস্বীকার

করব। এই অধিবেশনে আপনারা যদি সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে একটি সংবিধান-সভা নির্বাহী ক্ষমতার অবস্থিতি নিয়মন করবে। অন্যথায় ১৮৫২ সালে জনগণ বিধিসম্মতভাবে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সমাধান যাই হোক, আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়া থাক, যাতে উত্তেজনা, কোন আপতিক ঘটনা অথবা বলপ্রয়োগ দিয়ে কখনও একটি মহান জাতির ভাগ্যনির্ধারিত না হয়... সর্বোপরি যে প্রশ্নটা আমার মনোযোগ জুড়ে রয়েছে সেটা এই নয় যে, ১৮৫২ সালে কে ফ্রান্স শাসন করবে, সেটা হল, মধ্যবর্তী কালপর্যায়টা যাতে আলোড়ন কিংবা উপদ্রব ছাড়াই অতিবাহিত হতে পারে, সেজন্যে আমার হাতে অবশিষ্ট সময়টুকু কীভাবে ব্যবহার করা যায়। আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে আমার হৃদয় উন্মোচন করলাম, আমার সরলতায় আস্থা দিয়ে এবং আমার শুভ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দিয়ে আপনারা সাড়া দেবেন; অন্য সব কিছু রইল ঈশ্বরেরই হাতে।"

বুর্জোয়াদের ভদ্রজনোচিত, কপট-নম্র, সাধুভাবের মামুলি কথার নিগূঢ়তম অর্থ প্রকাশ পেল ১০ ডিসেম্বর সমিতির স্বৈরাচারী নায়ক, সাঁ মর আর সাতোরি-র বনভোজনের নায়কের মুখে।

শৃঙ্খলা পার্টির বারগ্রেভরা মুহূর্তের জন্যেও এই হৃদয়-উন্মোচনের জন্যে প্রাপ্য আস্থার প্রশ্নে বিভ্রান্ত হল না। শপথ সম্পর্কে তারা বহুদিন থেকেই আস্থাহীন; রাজনৈতিক মিথ্যাচারে অভিজ্ঞ এবং নিপুণ অনেক লোক তাদের দলে ছিল। সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটিও তাদের শুনতে ভুল হয় নি। বিরক্তির সঙ্গে তারা লক্ষ্য করল যে, সদ্য গৃহীত আইনগুলোর এলোমেলো তালিকা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনটিকে, অর্থাৎ নির্বাচনী আইনটিকে সুপরিকল্পিত নীরবতার সঙ্গে বাদ দেওয়া হয়েছে, উপরন্তু, সংবিধান সংশোধিত না হলে ১৮৫২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভার জনগণের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নির্বাচনী আইনটি ছিল শৃঙ্খলা পার্টির পায়ে শিকল-বাঁধা সীসের গোলা, তার ফলে তাদের পক্ষে হাঁটাচলা ছিল অসম্ভব, আর সামনে চড়াও অভিযান তো আরও অসম্ভব! তাছাড়া ১০ ডিসেম্বর সমিতিকে সরকারীভাবে ভেঙে দিয়ে এবং যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে পদচ্যুত করে বোনাপার্ট যত দোষ নন্দ ঘোষদের স্বহস্তে বলি দিয়েছিলেন দেশের বেদীমূলে। প্রত্যাশিত সংঘর্ষের ধারটা তিনি ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। শেষে, শৃঙ্খলা পার্টি নিজেই নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে কোন রকম চূড়ান্ত সংঘাত এড়িয়ে যেতে, প্রশমিত করতে, ধামাচাপা দিতে উৎকণ্ঠিত ছিল।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে জয় খেয়ে যাবার ভয়ে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপ্লবের ফলটি নিয়ে যেতে দিল। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' ফেব্রুয়ারির পর থেকে* শৃঙ্খলা পার্টি বিপ্লবকে চীৎকার করে এই কথাটাই শুনিয়ে এসেছে, এখন সেই কথাই আবার বোনাপার্টের বাণী শুনিয়ে দিল শৃঙ্খলা পার্টিকে। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' বোনাপার্ট এমন সব কাজ করলেন যার উদ্দেশ্য জবরদখল, কিন্তু শৃঙ্খলা পার্টি ঐসব কাজ নিয়ে সোরগোল তুললে অথবা বায়ুরোগগ্রস্তের মতো তার মানে করলে 'অশান্তি' সৃষ্টি করবে। সাতোরি-র সসেজ ইঁদুরের মতনই শান্ত, যখন কেউ তার কথা তুলছে না। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' অতএব বোনাপার্ট শান্তিতে যথেচ্ছাচারের সুযোগ দাবি করলেন, আর পার্লামেণ্টীয় পার্টি দ্বিবিধ ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল — আবার বৈপ্লবিক অশান্তি উদ্রেকের ভয় এবং নিজ শ্রেণীর দৃষ্টিতে, বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিতে নিজেরাই অশান্তির প্ররোচক প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়। কাজেই, ফ্রান্স যেহেতু সর্বোপরি শান্তি চায়, তাই বোনাপার্ট তাঁর বাণীতে 'শান্তির' কথা বলার পরে শৃঙ্খলা পার্টি প্রত্যুত্তরে 'যুদ্ধ' বলার সাহস পেল না। জাতীয় সভার উদ্বোধনকালে মস্ত মস্ত কেলেঙ্কারির দৃশ্য আশা করেছিল জনসাধারণ, কিন্তু সে আশায় তারা বঞ্চিত হল। বিরোধীপক্ষের যে প্রতিনিধিরা অক্টোবরের ঘটনাবলি সম্পর্কে স্থায়ী কমিশনের কার্যবিবরণ পেশ করার দাবি করেছিল, তারা সংখ্যাগুরু পক্ষের ভোটে পরাজিত হল। যেসব বিতর্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারত, সেগুলিকে নীতিগতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হল। ১৮৫০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে জাতীয় সভার কার্যাবলিতে আকর্ষণী ছিল না কিছুই।

অবশেষে ডিসেম্বরের শেষের দিকে পার্লামেণ্টের কয়েকটা বিশেষ অধিকারকে কেন্দ্র করে এলোমেলো যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই আন্দোলনটা আটকা পড়ে গেল শক্তিদ্বয়ের বিশেষ অধিকার নিয়ে তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে, কেননা সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করে বুর্জোয়া শ্রেণী সাময়িকভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিল।

অন্যতম জন-প্রতিনিধি মগাঁ-র বিরুদ্ধে ঋণের অভিযোগে আদালতের একটা রায় পাওয়া গিয়েছিল। আদালতের সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে

* ১৮৪৮ সালের। — সম্পাঃ

বিচারবিভাগের মন্ত্রী রুয়ের বলেছিলেন দেনদারের নামে অবিলম্বে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি করা উচিত। এইভাবে মগাঁকে দেনদারদের জেলে আটক করা হল। এই আক্রমণের খবর পেয়ে জাতীয় সভা জ্বলে উঠল। অবিলম্বে তাঁর মুক্তির আদেশ জাতীয় সভা জারি করল শুধু তাই নয়, সভার নিজস্ব করণিক পাঠিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই তাঁকে বলপূর্বক ক্লিশি থেকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে নিজেদের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্যে এবং 'পর্বতের' ঝঞ্ঝাটে লোকেদের জন্যে দরকার পড়লে একটা আশ্রম খোলার কথা মনে রেখে সভা ঘোষণা করল সেটার সম্মতিক্রমে জন-প্রতিনিধিদের ঋণের দায়ে জেলে দেওয়া চলবে। রাষ্ট্রপতিকেও ঋণের দায়ে কয়েদখানায় আটক করা চলতে পারবে, এই নির্দেশটা দিতে সভা ভুলে গেল। নিজ সংস্থার সদস্যদের ঘিরে অব্যাহতির (immunity) যে ছায়াটুকু বাকি ছিল, সেটুকু পর্যন্ত এবার নষ্ট হতে দেওয়া হল।

স্মরণে থাকতে পারে, আলে নামে একজনের দেওয়া খবর অনুসারে পুলিস কমিশনার ইয়োন দ্যুপাঁ এবং শাঙ্গার্নিয়েকে হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য অভিযোগ তুলেছিলেন ডিসেম্বর-ওয়ালাদের একাংশের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে প্রথম বৈঠকেই কোয়েস্টররা প্রস্তাব করে, জাতীয় সভার নিজস্ব বাজেট থেকে, সম্পূর্ণভাবে পুলিসের বড়কর্তার আওতার বাইরে পার্লামেন্টের একটি নিজস্ব পুলিসবাহিনী গঠন করা হোক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বারোশ তাঁর এলাকায় এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। শোচনীয় একটা আপস করে ঠিক হল যে, সভার স্বতন্ত্র পুলিস কমিশনারের খরচ অবশ্য সভার নিজস্ব বাজেট থেকেই চলবে, তার নিয়োগ এবং অপসারণ কোয়েস্টরদের হাতেই থাকবে বটে, কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পূর্ব-সম্মতি নিয়ে। ইতোমধ্যে সরকার আলে-র বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা করে; সেখানে তার দেওয়া তথ্যকে ধাপ্পা বলে প্রতিপন্ন করা এবং সরকারী অভিশংসকের জবানি দ্যুপাঁ, শাঙ্গার্নিয়ে, ইয়োন এবং গোটা জাতীয় সভাকে পর্যন্ত উপহাস করা সহজ হয়। তারপরেই ২৯ ডিসেম্বর মন্ত্রী বারোশ দ্যুপাঁর কাছে লেখা চিঠিতে ইয়োনকে বরখাস্ত করার দাবি করেন। জাতীয় সভার ব্যুরো ইয়োনকে পদে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও জাতীয় সভা যেহেতু মগাঁ-র ব্যাপারে জোর দেখিয়ে ভড়কে গিয়েছিল, এবং সাহসে ভর করে নির্বাহী ক্ষমতাকে আঘাত

করলে দুই দফা প্রত্যাঘাতে অভ্যস্ত ছিল, তাই এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করল না। সরকারী কাজে উৎসাহের পুরস্কার হিসেবে ইয়োনকে বরখাস্ত করা হল, এবং যে ব্যক্তি রাত্রিকালের সংকল্প দিনে পালন করার বদলে দিবালোকে সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে রাত্রে সেটাকে বলবৎ করে তার বিরুদ্ধে অপরিহার্য একটি পার্লামেণ্টীয় অধিকার থেকে সভা নিজেকে বঞ্চিত করল।

আমরা দেখেছি নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাসে বড় বড় উল্লেখযোগ্য উপলক্ষে জাতীয় সভা নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে যেত কিংবা থামিয়ে দিত। এখন দেখা গেল তুচ্ছতম কারণেও তারা লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছে। মগাঁ-র ঘটনায় তারা জন-প্রতিনিধিদের ঋণের দায়ে জেলে দেবার নীতি অনুমোদন করল, কিন্তু কেবল নিজের পক্ষে আপত্তিকর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেই তা প্রয়োগের অধিকার সংরক্ষিত রাখল নিজের হাতে, এবং এই জঘন্য অধিকারটুকু নিয়েই বিচারমন্ত্রীর সঙ্গে কোন্দল বাধাল। হত্যা-ষড়যন্ত্রের অভিযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ১০ ডিসেম্বর সমিতি সম্বন্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে প্যারিসের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের** দলপতিরূপে বোনাপার্টের প্রকৃত চরিত্রের আবরণটুকু চিরকালের মতো ফ্রান্স এবং ইউরোপের সামনে খুলে ধরার বদলে তারা এই বিরোধকে এমন পর্যায়ে নেমে যেতে দিল যেখানে তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতান্তরের একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়াল পুলিস কমিশনারের নিয়োগ এবং অপসারণের ক্ষমতা থাকবে কার হাতে এই নিয়ে। সুতরাং এই গোটা পর্ব ধরে আমরা দেখছি শৃঙ্খলা পার্টি তাদের দ্বৈতাবস্থার ফলে নির্বাহী ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইকে বিক্ষিপ্ত এবং বিখণ্ডিত করে দিতে বাধ্য হচ্ছে এখতিয়ারের তুচ্ছ কলহে, সামান্য মামলাবাজিতে, আইনের চুলচেরা বিচারে এবং সীমানার ঝগড়ায় -- বহিরঙ্গের অতি হাস্যকর ব্যাপারগুলিকেই করে তুলছে তাদের ক্রিয়াকলাপের সারবস্তু। যে মুহূর্তে সংঘাতটার কোন নীতিগত তাৎপর্য থাকছে, যখন নির্বাহী ক্ষমতা যথার্থই স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছে, যখন জাতীয় সভার স্বার্থটা জাতীয় স্বার্থ হয়ে উঠতে পারে, অমনি সংঘাত চালাবার সাহস তাদের আর থাকছে না। তা করলে জাতিকে কদম বাড়াবার নির্দেশ দিতে তারা বাধ্য হত; কিন্তু জাতি এগুবে, এটাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভীতিজনক। এইসব ক্ষেত্রে তারা 'পর্বতের' প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আলোচ্য সূচিতে চলে যেত। বৃহত্তর পরিসরে বিচার্য বিষয়টা এইভাবে

পরিত্যক্ত হওয়াতে নির্বাহী ক্ষমতা শান্তভাবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকে যখন আবার সামান্য এবং অর্থহীন কোন ঘটনাপ্রসঙ্গে সেই একই প্রশ্ন তোলা সম্ভব হবে, যখন বলতে গেলে সেটার শুধু একটা গণ্ডিবদ্ধ পার্লামেণ্টীয় তাৎপর্যই বাকি থাকে। তখন কিন্তু শৃংখলা পার্টির রুদ্ধ আক্রোশ ফেটে পড়ে, তখন তারা মঞ্চের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে, তখন তারা রাষ্ট্রপতির তীব্র নিন্দা করে, ঘোষণা করে প্রজাতন্ত্র বিপন্ন; অবশ্য তখনই আবার তাদের এই উত্তেজনা হাস্যকর মনে হয়, সংগ্রামের উপলক্ষটিকে মনে হয় কপট অছিলামাত্র, অথবা একেবারেই সংগ্রামের অযোগ্য ব্যাপার। পার্লামেণ্টীয় ঝড় চায়ের পেয়ালায় তুফানে পরিণত হয়, সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় ঘোঁট পাকাতে, সংঘাত পর্যবসিত হয় কেলেঙ্কারিতে। জাতীয় সভার পার্লামেণ্টীয় অধিকার সম্পর্কে বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলির উৎসাহ যেহেতু সর্বসাধারণের অধিকার সম্পর্কে সভার উৎসাহেরই সমান, তাই বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলি সভার অপমানে ক্রুর আনন্দ উপভোগ করে, অন্যদিকে পার্লামেণ্টের বাইরের বুর্জোয়ারা বুঝতেই পারে না পার্লামেণ্টের ভিতরের বুর্জোয়ারা কেমন করে এইসব তুচ্ছ কলহে সময় নষ্ট করতে এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এমন জঘন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। সারা জগৎ যখন সংঘর্ষের প্রত্যাশা করে সেই মুহূর্তে শান্তিস্থাপন, এবং যখন শান্তি এসেছে মনে করছে সেই মুহূর্তে আক্রমণের এই রণনীতিতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

২০ ডিসেম্বর পাস্কাল দ্যুপ্রা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্বর্ণখণ্ডের লটারি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। এই লটারি ছিল 'ইলিশিয়ামের দুহিতা' (৫৪)। বোনাপার্ট তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের সাহায্যে একে ধরাধামে এনেছিলেন, আর পুলিসের বড়কর্তা কার্লিয়ে একে সরকারীভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যদিও ফরাসী আইনে পরহিতার্থে লটারি ছাড়া সমস্ত রকমের লটারি নিষিদ্ধ। এক ফ্র্যাঙ্ক দামের সত্তর লক্ষ লটারির টিকিট, তার মুনাফা থেকে নাকি প্যারিসের ভবঘুরেদের কালিফোর্নিয়ায় পাঠানোর খরচা তোলা হবে। একদিকে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নকে স্থানচ্যুত করবে সোনালী স্বপ্ন; কাজ করার শুধু তত্ত্বগত অধিকারের স্থান নেবে প্রথম পুরস্কারের লোভনীয় সম্ভাবনা। স্বভাবতই কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখণ্ডের ঝলমলানির মধ্যে প্যারিসের

শ্রমিকরা তাদেরই পকেট থেকে ভুলিয়ে বার-করা সাধারণ ফ্র্যাঙ্কগুলিকে চিনতে পারল না। মোটের ওপর ব্যাপারটা কিন্তু ডাহা জুয়াচুরি ছাড়া কিছু নয়: যে ভবঘুরের দল প্যারিস ত্যাগের কষ্টস্বীকার না করেই কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনি খুলে বসতে চেয়েছিল তারা হল স্বয়ং বোনাপার্ট এবং তাঁর ঋণগ্রস্ত গোল-টেবিল চক্র। জাতীয় সভা যে ত্রিশ লক্ষ মঞ্জুর করেছিল তা উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে উড়ে গিয়েছিল; যে কোন উপায়ে ধনভান্ডার আবার পূর্ণ করা প্রয়োজন ছিল। বৃথাই বোনাপার্ট তথাকথিত cités ouvrières* নির্মাণের নামে একটা জাতীয় তহবিল খুলে একটা মোটা অঙ্ক দিয়ে তালিকায় নিজের নামটি বসালেন সবার উপরে। কঠিনহৃদয় বুর্জোয়ারা অবিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুত চাঁদা শোধের প্রতীক্ষায় রইল, আর যেহেতু স্বভাবতই তা এল না, তাই শূন্যে সমাজতান্ত্রিক সৌধের ফটকাটা একেবারে মাটিতে এসে পড়ল। স্বর্ণখন্ডটায় বেশি কাজ দিল। পুরস্কাররূপে প্রদেয় স্বর্ণখন্ডগুলির উপরে যে সত্তর লক্ষের উদ্বৃত্ত রইল, বোনাপার্ট অ্যান্ড কোম্পানি সেটার একাংশ পকেটে পুরেই সন্তুষ্ট হল না, তারা জাল লটারি টিকিট ছাপাল, একই নম্বরের দশ, পনের, এমনকি বিশখানা করেও টিকিট ছাড়ল —১০ ডিসেম্বর সমিতিরই উপযুক্ত আর্থিক কারবার বটে! প্রজাতন্ত্রের ঝুটা রাষ্ট্রপতি নয়, রক্তমাংসের মানুষ বোনাপার্টের সম্মুখীন হল জাতীয় সভা এক্ষেত্রে। এবার তাঁকে হাতে-নাতে ধরা সম্ভব ছিল — সংবিধানের সঙ্গে নয়, ফৌজদারী দন্ডবিধির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে। দুপ্রা-র প্রশ্নের পরেও সভা যে দিনগত আলোচ্য সূচিতে চলে গেল তা শুধু এই কারণে নয় যে, নিজেদের 'সন্তোষ' ঘোষণার জিরারদাঁ আনীত প্রস্তাব শৃংখলা পার্টিকে নিজেদের ধারাবাহিক দুর্নীতির কথা স্মরণ করিয়েছিল। বুর্জোয়া মাত্রেই, এবং বিশেষত যে বুর্জোয়া ফেঁপে উঠে রাজপুরুষে পরিণত হয়েছে সেই বুর্জোয়া তার ব্যবহারিক নীচতার বাবত হাজির করে তাত্ত্বিক আতিশয্য। রাজপুরুষ হিসেবে সে তার সম্মুখস্থ রাষ্ট্রশক্তির মতোই হয়ে দাঁড়ায় এমন একটি উচ্চাঙ্গের সত্তা যার বিরুদ্ধে কেবল উচ্চমার্গে, পবিত্র পদ্ধতিতেই সংগ্রাম সম্ভব।

---

* শ্রমিক বসতি। — সম্পঃ

বোনাপার্ট বোহেমিয়ান [ছন্নছাড়া] ছিলেন, **লুম্পেনপ্রলেতারিয়ান** নবাব ছিলেন বলেই কোন পাজি বুর্জোয়ার চেয়ে তাঁর এই সুবিধেটা ছিল যে, তিনি লড়াইটা চালাতে পারতেন জঘন্য রীতিতে, তাই সভা তাঁকে সামরিক ভোজসভা, সৈন্যপরিদর্শন, ১০ ডিসেম্বর সমিতি এবং পরিশেষে ফৌজদারী দণ্ডবিধির পিচ্ছল জমি হাতে ধরে পার করার পরে তিনি দেখলেন আপাত-আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণে চলে যাবার সময় এসেছে। ইতোমধ্যে বিচারমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী, নৌবাহিনীর মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর যে খুদে হারগুলো দিয়ে জাতীয় সভা খুঁকুরে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল সেজন্যে তাঁর বিশেষ দুশ্চিন্তা হয় নি। পদত্যাগ করা থেকে এবং তাতে করে নির্বাহী ক্ষমতার তুলনায় পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া থেকে তিনি মন্ত্রীদের নিবৃত্ত করলেন শুধু তাই নয়, জাতীয় সভার বিরতিকালে তিনি যেটার সূচনা করেছিলেন সেটাকে এখন সম্পূর্ণ করতেও সমর্থ হলেন — সেটা হল পার্লামেণ্ট থেকে সামরিক শক্তির বিচ্ছেদ, **শাঙ্গার্নিয়ের অপসারণ।**

প্রথম সামরিক ডিভিশনের উদ্দেশে মে মাসে পাঠান বলে কথিত, কাজেই যেন শাঙ্গার্নিয়ের পাঠান একখানা আদেশপত্র প্রকাশিত হয়েছিল একটা ইলিজে পত্রিকায়, এতে অফিসারদের প্রতি উপদেশ ছিল যে, অভ্যুত্থান ঘটলে তারা যেন নিজেদের কাতারে বিশ্বাসঘাতকদের সহ্য না ক'রে তাদের অবিলম্বে গুলি করে মারে এবং জাতীয় সভা সৈন্য তলব করলে সেটা যেন অগ্রাহ্য করে। ১৮৫১ সালের ৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভাকে এই আদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ব্যাপারটা সম্বন্ধে তদন্তের জন্যে তারা দম ফেলার ফুরসত চেয়েছিল প্রথমে তিন মাস, পরে একসপ্তাহ এবং শেষ পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র। অবিলম্বে কৈফিয়তের জন্যে জাতীয় সভা জিদ ধরল। শাঙ্গার্নিয়ে উঠে বললেন এমন নির্দেশপত্র কখনও দেওয়া হয় নি। তিনি আরও বললেন, জাতীয় সভার নির্দেশ পালনে তিনি সর্বদাই তৎপর থাকবেন এবং সংঘর্ষ ঘটলে জাতীয় সভা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারে। অনির্বচনীয় করতালি সহকারে তাঁর ঘোষণাটি জাতীয় সভা গ্রহণ করে এবং তাঁর সম্বন্ধে একটা আস্থা-প্রস্তাব গ্রহণ করে। একজন জেনারেলের ব্যক্তিগত রক্ষণাধীনে নিজেকে সঁপে দিয়ে সভা অধিকার ত্যাগ করল, নিজ ক্লীবতা এবং সৈন্যবাহিনীর সর্বশক্তিমত্তা ঘোষণা করল; কিন্তু বোনাপার্টেরই কাছ থেকে 'চাকরান' হিসেবে পাওয়া একটা

ক্ষমতা তাঁরই বিরুদ্ধে সভার হাতে তুলে দিয়ে এবং নিজের পালা এলে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টই, তাঁর নিজেরই আশ্রিত সংস্থাটা তাঁকে রক্ষা করবে বলে প্রত্যাশা করে জেনারেলটি আত্মপ্রতারণা করলেন। ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁকে যা যৌতুক দিয়েছিল সেটার রহস্যময় ক্ষমতায় শাঙ্গার্নিয়ে কিন্তু বিশ্বাস করলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল অন্য দুই রাষ্ট্রীয় শক্তির পাশাপাশি তিনি এক তৃতীয় শক্তি। তাঁর ভাগ্য এই যুগের অন্যান্য সেইসব নায়ক অথবা বলা ভাল সাধুসন্তদের মতোই, যাদের বিরাটত্ব শুধু তাদের সম্পর্কে তাদের নিজেদের তরফের স্বার্থে গড়া সংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট ধারণাটুকুতে; পরিস্থিতি যেইমাত্র এদের কাছে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের দাবি করে অমনি এরা চুপসে তাদের মামুলি মূর্তিতে পরিণত হয়। ঐসব তথাকথিত নায়ক এবং খাঁটি সাধুসন্তদের মারাত্মক শত্রু হল সাধারণভাবে অবিশ্বাস। রসিকজন এবং বিদ্রূপকারীদের দিক থেকে উৎসাহের অভাব দেখে এইজন্যেই এদের রাজোচিত নৈতিক ক্রোধ।

সেই সন্ধ্যাতেই মন্ত্রীদের ইলিজে-তে ডাকা হল; বোনাপার্ট শাঙ্গার্নিয়েকে বরখাস্ত করার জিদ ধরলেন; পাঁচজন মন্ত্রী তাতে স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হলেন; *Moniteur* ঘোষণা করল মন্ত্রিসভায় সংকট উপস্থিত, আর শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি শাঙ্গার্নিয়েরে পরিচালনায় একটা পার্লামেন্টীয় ফৌজ গঠনের হুমকি দিল। এই কাজ করার সাংবিধানিক অধিকার শৃঙ্খলা পার্টির ছিল। জাতীয় সভার সভাপতিপদে শাঙ্গার্নিয়েকে নিযুক্ত করে নিরাপত্তার জন্যে যত খুশি সৈন্য তলব করলেই হত। বেশ নিরাপদেই তা করা যেত আরও এই কারণে যে, শাঙ্গার্নিয়ে তখনও বাস্তবিকই সৈন্যবাহিনীর এবং প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদলের পরিচালক, তিনি সৈন্যসমেত তলবের অপেক্ষা করছিলেন মাত্র। জাতীয় সভার সরাসর সৈন্য তলব করার অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপনেরও সাহস তখনও বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলির হয় নি; সেই অবস্থায় এই বৈধ আপত্তিতে কোন ফললাভের সম্ভাবনা ছিল না। সৈন্যবাহিনী জাতীয় সভার আদেশ পালন করত, তা সম্ভবপর বলে বোধ হয় যদি এই কথাটা মনে রাখা হয় যে, বোনাপার্ট আটদিন ধরে সারা প্যারিসে খুঁজে খুঁজে শেষে দু'জন জেনারেলকে পেয়েছিলেন যারা শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির আদেশে স্বাক্ষর দিতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন — বারাগে দ'ইলিয়ে

এবং সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি। তবে, শৃঙ্খলা পার্টি সেটার সদস্যদের মধ্যে এবং পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোট পেত কিনা তাতে যথেষ্টই সন্দেহ হয় যদি এটা বিবেচনায় থাকে যে, আটদিন পরে দু'-শ' ছিয়াশিটি ভোট তাদের ছেড়ে যায়, আর ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শেষ মুহূর্তেও 'পর্বত' অনুরূপ এক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। তৎসত্ত্বেও শৃঙ্খলার বারগ্রেভরা সম্ভবত তখনও তাদের সাধারণ সদস্যদের এমন এক সাহসে অনুপ্রাণিত করতে পারত যেটার মূলকথা ছিল সঙ্গীনের অরণ্যের অন্তরালে নিরাপত্তা-বোধ এবং পালিয়ে তাদের শিবিরে শামিল ফৌজের সাহায্যগ্রহণ। এর পরিবর্তে ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বারগ্রেভ মহোদয়গণ ইলিজে-তে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রনায়কসুলভ বাণী শুনিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় বিবেচনার উপরে জোর দিয়ে শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির আদেশ দানে বোনাপার্টকে বিরত করার চেষ্টাই করলেন। কাউকে বুঝিয়ে রাজী করাতে হলে তাকেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক বলে স্বীকার করা হয়। তাদের এই কাজে আশ্বস্ত হয়ে বোনাপার্ট ১২ জানুয়ারি তারিখে একটা নতুন মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করেন, তাতে থেকে গেলেন পুরনো মন্ত্রিসভার নেতৃদ্বয় — ফুল্দ্ এবং বারোশ। সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি হলেন যুদ্ধমন্ত্রী; *Moniteur* শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির ডিক্রি প্রকাশ করল, তাঁর অধিনায়কত্বের ক্ষমতা ভাগ করে প্রথম সামরিক ডিভিশনের নেতৃত্ব দেওয়া হল বারাগে দ'ইলিয়ে-কে, আর জাতীয় রক্ষিদলের নেতৃত্ব পেলেন পেরো। সমাজের রক্ষাপ্রাচীর বরখাস্ত হল, ফলে ছাদের একটি টালিও খসে পড়ল না, পক্ষান্তরে ফটকাবাজারে শেয়ারের দাম চড়তে থাকল।

শাঙ্গার্নিয়ের মাধ্যমে যে সৈন্যদল তাদের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে প্রস্তুত ছিল সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার ফলে গোটা সৈন্যবাহিনীকেই রাষ্ট্রপতির হাতে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করে শৃঙ্খলা পার্টি জানিয়ে দিল বুর্জোয়া শ্রেণী রাজ্যশাসনের যোগ্যতা হারিয়েছে। পার্লামেন্টীয় মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব আর রইল না। সৈন্যবাহিনী এবং জাতীয় রক্ষিদলের উপর কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে খোয়াবার পরে পার্লামেন্টের হাতে বলপ্রয়োগের আর কোন্ উপায় অবশিষ্ট রইল যেটার সাহায্যে জনগণের উপরে পার্লামেন্টের জবরদখলী কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধানিক কর্তৃত্ব যুগপৎ বজায় রাখা যায়? কিছুই রইল না। শুধু বলহীন নীতির শরণ নেওয়ার পথই সেটার কাছে খোলা রইল,

এমনসব নীতি যেগুলোর ব্যাখ্যা তারা বরাবর করেছে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বলে, যা নিজের স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্যে অন্যের ওপর চাপানো হয়। শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতি এবং বোনাপার্টের হাতে সামরিক শক্তি এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আলোচ্য কালপর্যায়ের, অর্থাৎ শৃঙ্খলা পার্টি এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে সংগ্রামের কালপর্যায়ের প্রথম পর্ব শেষ হল। এই দুই শক্তির মধ্যে এবার প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণা হল, প্রকাশ্য যুদ্ধ চলল, কিন্তু অস্ত্র এবং সৈন্য উভয়ই শৃঙ্খলা পার্টির হস্তচ্যুত হবার পরেই। মন্ত্রিসভাহীন, সৈন্যবাহিনীহীন, জনগণবর্জিত, জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন, ৩১ মে-র নির্বাচনী আইনের পরে সার্বভৌম জাতির প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত, চক্ষুহীন কর্ণহীন দন্তহীন, সমস্ত কিছু বিহীন হয়ে পড়ে জাতীয় সভা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল সাবেকী ফরাসী পার্লামেণ্টে (৫৫), যেটাকে সরকারের হাতে কার্যভার ছেড়ে দিয়ে post festum* ঘোঁৎঘোঁৎ করে আপত্তি জানিয়ে তুষ্ট থাকতে হয়।

শৃঙ্খলা পার্টি ক্রোধের তুফান তুলে নতুন মন্ত্রিসভাকে অভ্যর্থনা করল। জেনারেল বেদো স্মরণ করিয়ে দিলেন বিরতির সময়ে স্থায়ী কমিশনের নম্র ভাবের কথা, -- বৈঠকের বিবরণী প্রকাশ থেকে বিরত হয়ে যে অত্যধিক সৌজন্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল সেই কথা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং তখন সেই বিবরণী প্রকাশের দাবি তুললেন, অবশ্য ততদিনে বিবরণীটা স্বভাবতই নালার জলের মতো নীরস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কোন নতুন তথ্য তাতে প্রকাশ পেত না, বীতস্পৃহ জন-মানসে সেটার কোন দাগ পড়ত না। রেমুজো-র প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সভা বিভিন্ন ব্যুরোতে গুটিয়ে গেল এবং একটা 'জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ কমিটি' নিয়োগ করল। প্যারিস প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধা গৎ থেকে সরে গেল আরও কম, কারণ সেই সময়ে বাণিজ্যে বাড়-বাড়ন্ত, কারখানাগুলি কর্মব্যস্ত, শস্যের দর কম, অঢেল খাদ্য, আর সঞ্চয়-ব্যাঙ্কে প্রতিদিন নতুন টাকা জমা পড়ে। পার্লামেণ্টের উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত 'জরুরী ব্যবস্থা' ভেস্তে গেল ১৮ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাবে, জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েরে নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হল না। প্রজাতন্ত্রীদের ভোটগুলি পাবার জন্যে শৃঙ্খলা পার্টি এইভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করতে বাধ্য

---

* ভোজের পর, অর্থাৎ সব কিছু হয়ে যাবার পর। — সম্পাঃ

হয়েছিল, কারণ মন্ত্রিসভার সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র শাঙ্গার্নিয়েরের পদচ্যুতিই প্রজাতন্ত্রীদের মনোমত হয়েছিল, অথচ মন্ত্রিসভার অন্যান্য কাজের নিন্দা করার অবস্থায় শৃঙ্খলা পার্টি বস্তুত ছিল না, কারণ সেসব কাজ হয়েছিল তাদেরই নির্দেশে।

১৮ জানুয়ারি তারিখের অনাস্থা প্রস্তাব দু'-শ' ছিয়াশি ভোটের বিপক্ষে চার-শ' পনের ভোটে পাস হল। অর্থাৎ চরম লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী এবং 'পর্বতের' মৈত্রীর ফলেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এতে প্রমাণ হল যে, বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘর্ষে শৃঙ্খলা পার্টি খুইয়েছে কেবল মন্ত্রিসভা নয়, কেবল সৈন্যবাহিনী নয়, পার্লামেণ্টে তাদের স্বতন্ত্র সংখ্যাধিক্য পর্যন্ত খোয়া গেছে, একদল প্রতিনিধি তাদের শিবির ত্যাগ করে গেছে আপসের ক্ষেপামিতে, লড়াইয়ের ভয়ে, অবসাদের দরুন, অতিপ্রিয় সরকারী মাহিনার প্রতি আত্মীয়সুলভ মমতায়, মন্ত্রিপদ শূন্য হওয়ার জল্পনায় (অদিলোঁ বারো), অথবা সেই নিছক স্বার্থপরতাবশে, যার ফলে সাধারণ বুর্জোয়াদের মধ্যে সর্বদাই কোন ব্যক্তিগত কারণে স্বশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ বিসর্জনের প্রবণতা থাকে। বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা প্রথম থেকেই একমাত্র বিপ্লব-বিরোধী সংগ্রামেই শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে লেগে ছিল। ক্যাথলিক পার্টির নেতা মঁতালাঁবের তখনই তাঁর প্রভাব দিয়ে বোনাপার্টের পাল্লা ভারি করেছিলেন, কেননা পার্লামেণ্টীয় দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশা ছিল না। শেষে, এই পার্টির নেতৃদ্বয়, — তিয়ের আর বেরিয়ে, একজন অর্লিয়ান্সী, অপর জন লেজিটিমিস্ট — প্রকাশ্যেই নিজেদের প্রজাতন্ত্রী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে তাঁদের প্রাণ চায় রাজতন্ত্র অথচ বুদ্ধি বলে প্রজাতন্ত্র, সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে দেশ শাসনের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ হল পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র। রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের যে পরিকল্পনা তাঁরা পার্লামেণ্টের পিছনে অক্লান্তভাবে অনুসরণ করেছেন সেটাকে এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীরই চোখের সামনে এমন একটা চক্রান্ত বলে নিন্দা করতে তাঁরা বাধ্য হলেন যা যেমন নির্বোধ, তেমনি বিপজ্জনক।

১৮ জানুয়ারির অনাস্থা প্রস্তাব আঘাত করল মন্ত্রীদের, রাষ্ট্রপতিকে নয়। অথচ শাঙ্গার্নিয়েকে বরখাস্ত করেছিলেন মন্ত্রিসভা নয়, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই।

শৃঙ্খলা পার্টি কি বোনাপার্টেরই অভিশংসন দাবি করবে? তাঁর পুনঃস্থাপনার অভিলাষ আছে এইজন্যে? কিন্তু সে কামনা তো কেবল তাদেরই কামনার পরিপূরক। তবে কি সৈনাদল পরিদর্শন এবং ১০ ডিসেম্বর সমিতি সংক্রান্ত তাঁর ষড়যন্ত্রের জন্যে? কিন্তু অনেক আগেই তো তারা দিনগত আলোচ্য সূচির নিচে এইসব প্রশ্ন সমাধিস্থ করেছিল। তবে কি ২৯ জানুয়ারি আর ১৩ জুনের নায়ক, যে ১৮৫০ সালের মে মাসে ভয় দেখিয়েছিল বিদ্রোহ হলে প্যারিসের চতুর্দিকে অগ্নিসংযোগ করা হবে, তার পদচ্যুতির প্রতিবাদে? সমাজের ভূলুণ্ঠিত রক্ষাপ্রাচীরটিকে তুলে ধরার জন্যে সরকারীভাবে সমবেদনা জ্ঞাপনের অনুমতিও মিলল না তাদের মিত্র 'পর্বত' এবং কাভেনিয়াকের কাছ থেকে। একজন জেনারেলকে বরখাস্ত করতে রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক অধিকার তারা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারল না। রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক অধিকারের পার্লামেণ্টীয় নীতিবিরুদ্ধ প্রয়োগেই তারা ক্রোধ প্রকাশ করেছিল। তারাই কি ক্রমাগত নিজেদের পার্লামেণ্টীয় অধিকারের নিয়মতন্ত্রবিরুদ্ধ প্রয়োগ করে আসে নি বিশেষত সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের প্রশ্নে? অতএব শৃঙ্খলা পার্টি বাধ্য হল সুনির্দিষ্ট পার্লামেণ্টীয় চৌহদ্দির ভিতরেই বিচরণ করতে। আর ১৮৪৮ সাল থেকে **পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধিতারূপী** (parliamentary cretinism) যে বিশেষ ব্যাধি মহাদেশ জুড়ে আসর জমিয়েছে, যে ব্যাধির ছোঁয়াচে মানুষ একটি কাল্পনিক জগতে আটক পড়ে এবং রূঢ় বহির্জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত বোধ তার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় — এই পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধির ফলেই যারা একদা পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার সমস্ত শর্তগুলি স্বহস্তে নষ্ট করছে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের পক্ষে পার্লামেণ্টীয় জয়টাকে জয় মনে করা, অথবা মন্ত্রীদের আঘাত করা মারফত রাষ্ট্রপতিকেই আঘাত করা হল বলে বিশ্বাস করা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত তাতে জাতির সমক্ষে জাতীয় সভাকে নতুন করে অপদস্থ করার সুযোগই তারা দিল রাষ্ট্রপতিকে। ২০ জানুয়ারি *Moniteur* ঘোষণা করল সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রাহ্য হয়েছে। ১৮ জানুয়ারির ভোট থেকে, 'পর্বত' আর রাজতন্ত্রীদের মৈত্রীর ঐ ফল থেকে প্রমাণ হল যে পার্লামেণ্টে কোন দলেরই সংখ্যাধিক্য আর নেই, এই অছিলায়, এবং নতুন সংখ্যাগুরু দল গড়ে না ওঠা পর্যন্ত, বোনাপার্ট

একটি তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা নিয়োগ করলেন এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের একজনও পার্লামেণ্টের সদস্য নয়, সবাই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং নগণ্য লোক, অর্থাৎ নিতান্ত করণিক আর নকলনবিসদের মন্ত্রিসভা। শৃঙ্খলা পার্টি এবার এই নাচের পুতুলদের নিয়ে খেলায় নিজেদের কর্মক্লান্ত করে তুলবার অবকাশ পেল; নির্বাহী ক্ষমতা আর জাতীয় সভায় প্রতিনিধিত্ব থাকার কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করল না। মন্ত্রীরা যে অনুপাতে পুতুলমাত্র ছিল, বোনাপার্ট ঠিক সেই অনুপাতে প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করলেন, এবং নিজ স্বার্থে সেটা ব্যবহারের সুযোগও তাঁর সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।

১০ ডিসেম্বর সমিতির পাণ্ডা রাষ্ট্রপতি নিজের জন্যে যে আঠার লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপনে তাঁর মন্ত্রীবেশী করণিকদের বাধ্য করেছিলেন, 'পর্বত' দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে শৃঙ্খলা পার্টি সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে প্রতিশোধ নিল। এবার মাত্র এক-শ' দুই ভোটের সংখ্যাধিক্যে প্রশ্নটির মীমাংসা হয়, অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারির পরে আরও সাতাশটি ভোট খসে পড়েছিল; শৃঙ্খলা পার্টি ভাঙ্গনের মুখে এগিয়ে চলছিল। সেইসঙ্গে, যাতে 'পর্বতের' সঙ্গে তাদের মৈত্রীর তাৎপর্য সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যেও ভুল ধারণা না হয়, তাই 'পর্বতের' একশত ঊননব্বই জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধীদের ব্যাপক মার্জনার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করতে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কোন এক ভেসের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটুকুতেই কাজ হল যে, পরিস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে শান্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রচণ্ড আলোড়ন গোপনে চলছে, সর্বত্র গুপ্ত সমিতি সংগঠিত হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পত্রিকাগুলির পুনঃপ্রকাশের আয়োজন চলছে, বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিকূল সংবাদ আসছে, জেনেভায় শরণার্থীরা লিয়োঁ থেকে ফ্রান্সের সমগ্র দক্ষিণাংশ জুড়ে একটা ষড়যন্ত্র পরিচালনা করছে, ফ্রান্স এসে পড়েছে শিল্প এবং বাণিজ্যিক সঙ্কটের মুখে, রুবে-র শিল্পপতিরা শ্রম সময় কমিয়ে দিচ্ছে, বেল্ ইলের (৫৬) বন্দীরা বিদ্রোহ করেছে --- সামান্য একজন ভেস-এর কথাই লাল জুজুর আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট হল, এবং যে প্রস্তাব নিঃসন্দেহে জাতীয় সভার জন্যে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে

বোনাপার্টকে আবার সেটর দ্বারস্থ করতে পারত, সেই প্রস্তাব শৃঙ্খলা পার্টি বিনা আলোচনায় অগ্রাহ্য করল। নতুন গোলযোগের সম্ভাবনা দিয়ে নির্বাহী ক্ষমতা যে ভয় দেখাল তাতে আতঙ্কিত না হয়ে তাদের বরং শ্রেণী-সংগ্রামের জন্যে কিছুটা সুবিধে করে দিয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে নিজেদের উপর নির্ভরশীল করে রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু আগুন নিয়ে খেলার সাহস বোধ করল না তারা।

ইতোমধ্যে এই তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত অত্যন্ত জড়ক্রিয় হয়েই রইল। বোনাপার্ট মন্ত্রিসভায় ক্রমাগত নতুন অদলবদল করে জাতীয় সভাকে ক্লান্ত করে তুললেন এবং বোকা বানাতে থাকলেন। কখনও তিনি ভাব করলেন যেন লমার্তিন আর বিয়োকে নিয়ে গঠন করতে চান একটা প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা; কখনও যেন-বা পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা—অপরিহার্য সেই অদিলোঁ বারোকে নিয়ে, বোকা বানাবার মতো লোকের প্রয়োজন হলে যাঁর নাম বাদ পড়তেই পারে না; তারপর ভাতিমেনিল এবং বেনুয়া দ'আজিকে নিয়ে লেজিটিমিস্ট মন্ত্রিসভা; এবং তারপর আবার মালভিলকে নিয়ে অর্লিয়ান্সী মন্ত্রিসভা। এইভাবে যেমন তিনি শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন উপদলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে রাখলেন, এবং সামগ্রিকভাবে তাদের শঙ্কিত করে তুললেন প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রিসভার সম্ভাবনা এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সর্বজনীন ভোটাধিকার ফিরে আসার ভয় দেখিয়ে, সেইসঙ্গে তেমনি তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে দিলেন যে, রাজতান্ত্রিক উপদলগুলির আপসহীনতার জন্যেই তাঁর পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত সৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বুর্জোয়ারা কিন্তু ততই আরও জোরে চিৎকার করে 'শক্তিশালী সরকার' দাবি করতে লাগল; ফ্রান্সকে 'শাসন-ব্যবস্থাহীন' অবস্থায় ফেলে রাখা তারা ততই বেশি অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতে লাগল, যতই একটা সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যিক সংকট আসন্ন বলে বোধ হল, আর তার ফলে শহরাঞ্চলে সমাজতন্ত্র নতুন নতুন সমর্থক লাভ করতে লাগল, যেমন গ্রামাঞ্চলে সমর্থক জুটছিল খাদ্যশস্যের সর্বনেশে মূল্যহ্রাসের ফলে। বাণিজ্যে প্রতিদিন আরও মন্দা দেখা দিতে থাকল; বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি হল লক্ষণীয়, প্যারিসে অন্তত দশ হাজার শ্রমিকের রুটির সংস্থান রইল না; রুয়েঁ, মুলহাউজেন, লিয়োঁ, রুবে, তুর্কুয়েঁ, সাঁ এতে', এলবোফ

প্রভৃতিতে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে রইল। এই অবস্থায় ১১ এপ্রিল তারিখে বোনাপার্ট পুনর্বহাল করতে সাহস পেলেন ১৮ জানুয়ারির মন্ত্রিসভাকে: শ্রীযুক্ত রুয়ের, ফুল্দ, বারোশ প্রভৃতির সেই মন্ত্রিসভা, আর তাঁদের জোর বাড়ান হল সেই শ্রীযুক্ত লেওঁ ফশেকে যোগ করে, যাঁকে জাল টেলিগ্রাম পাঠাবার অপরাধে সংবিধান-সভা সেটার অন্তিমদশায় পাঁচ জন মন্ত্রীর ভোট বাদে সর্বসম্মতিক্রমে এক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে নিন্দা করেছিল। অতএব মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৮ জানুয়ারি জাতীয় সভার জয় এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে তিন মাসের সংগ্রামের একমাত্র ফল দাঁড়াল এই যে, ১১ এপ্রিল ফুল্দ এবং বারোশ তৃতীয় শক্তিরূপে তাঁদের মন্ত্রিত্বের মিতালিতে নিলেন পিউরিটান ফশেকে।

১৮৪৯ সালের নভেম্বরে বোনাপার্টকে একটি **পার্লামেণ্টীয় রীতিবিরুদ্ধ** মন্ত্রিসভা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, ১৮৫১ সালের জানুয়ারিতে **পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত** মন্ত্রিসভা নিয়ে, আর ১১ এপ্রিল তিনি একটি **পার্লামেণ্ট-বিরোধী** মন্ত্রিসভা গঠনের মতো জোর পেলেন, যেটার মধ্যে বেশ মিলেমিশে রইল উভয় সভারই অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট, — সংবিধান-সভা এবং বিধান-সভা, একটি প্রজাতান্ত্রিক, অপরটি রাজতান্ত্রিক। বিভিন্ন মন্ত্রিসভার এই পর্যায়ক্রমটা হল একটা তাপমানযন্ত্র যেটা দিয়ে পার্লামেণ্ট নিজ প্রাণের উত্তাপ হ্রাসের-পরিমাপ করতে পারত। এপ্রিলের শেষভাগে সেই উত্তাপ এতই কমে এল যে, এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পেসির্নি রাষ্ট্রপতির দলে আসার জন্যে শাঙ্গার্নিয়েকে উপরোধ জানাতে পারলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, বোনাপার্টের মতে জাতীয় সভার প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, আর কুদেতার যে সম্ভাবনা অবিরত সামনে রাখা হয়েছে কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার স্থগিত রাখতে হল, তা ঘটার পর যে ঘোষণা প্রকাশ করার কথা তা পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। শাঙ্গার্নিয়ে শৃঙ্খলা পার্টির নেতাদের এই মৃত্যুসংবাদ জানালেন, কিন্তু ছারপোকার কামড়ে প্রাণ হারাবার কথা কে বিশ্বাস করবে? পীড়িত, জীর্ণ, মৃত্যুর কালিমালিপ্ত হলেও এই পার্লামেণ্ট ১০ ডিসেম্বর সমিতির কিম্ভূত দলপতির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধটাকে ছারপোকার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বেশি কিছু

বলে ভাবতে পারল না। কিন্তু বোনাপার্ট শৃঙ্খলা পার্টিকে সেই জবাব দিলেন যা এজেসিলেস বলেছিলেন রাজা এজিসকে:

'আমাকে ভাবছ পিপীলিকা, কিন্তু একদিন আমি হয়ে উঠব সিংহ।' (৫৭)

৬

সামরিক শক্তি হাতে রাখার এবং নির্বাহী ক্ষমতার উপর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ পুনরধিকার করবার নিষ্ফল চেষ্টায় শৃঙ্খলা পার্টিকে 'পর্বত' এবং বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে জোট বাঁধতে হয়েছিল, সেটা থেকে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে **পার্লামেণ্টে** তাদের স্বতন্ত্র **সংখ্যাধিক্য** খোয়া গেছে। ২৮ মে কেবল পঞ্জিকার পাতার জোরেই, কেবল ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার বলই সেটার পরিপূর্ণ ভাঙনের সঙ্কেত দিল। ২৮ মে শুরু হল জাতীয় সভার জীবনের শেষ বছর। এবার সেটার স্থির করার কথা সংবিধান অপরিবর্তিত থেকে যাবে, না সংশোধিত হবে। কিন্তু সংবিধান সংশোধন বলতে বোঝায় বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন নাকি পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শাসন শুধু নয়, গণতন্ত্র নাকি প্রলেতারীয় নৈরাজ্য শুধু নয়, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র নাকি বোনাপার্ট শুধু নয়, সেইসঙ্গে আরও বোঝায় অর্লিয়ান্স নাকি বুরবোঁ! তাই পার্লামেণ্টের মাঝখানে এমন একটা বিরোধের কারণ এসে পড়ল, যার ফলে শৃঙ্খলা পার্টি যেসব বিরুদ্ধ উপদলে বিভক্ত সেগুলোর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত প্রকাশ্যে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠা অনিবার্য ছিল। শৃঙ্খলা পার্টি ছিল নানাধর্মী বিভিন্ন সামাজিক পদার্থের সমবায়। সংশোধনের প্রশ্নে এমন রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হল যাতে বস্তুটা বিয়োজিত হয়ে মূল অঙ্গ-উপাদানসমূহে বিভক্ত হয়ে গেল।

সংশোধনের প্রশ্নে বোনাপার্টপন্থীদের আগ্রহটা সোজা। তাদের পক্ষে এটি ছিল সর্বোপরি ৪৫ ধারাটা বাতিলের প্রশ্ন; বোনাপার্টের পুনঃনির্বাচন এবং তাঁর কর্তৃত্বের মেয়াদবৃদ্ধি নিষিদ্ধ ছিল এই ধারায়। প্রজাতন্ত্রীদের মনোভাবও ছিল তেমনিই সহজ-সরল। যে কোন সংশোধনেরই তারা ছিল ঘোর বিরোধী, তার মধ্যে তারা দেখত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র। যেহেতু জাতীয় সভায় **এক-চতুর্থাংশেরও অধিক ভোট** তাদের হাতে ছিল, এবং

যেহেতু সংবিধান অনুসারে সংশোধনী প্রস্তাব আইনত সিদ্ধ হতে হলে এবং সংশোধনকারী পরিষদ আহ্বান করতে হলে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন, অতএব নিজেদের ভোটটুকু হাতে থাকলেই তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত মনে করার কথা। তাই তারা জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল।

এইসব সুস্পষ্ট মতাবস্থানের তুলনায় শৃঙ্খলা পার্টি কিন্তু সমাধানের অসাধ্য নানা বৈপরীত্যে জড়িয়ে পড়েছিল। সংশোধনের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে স্থিতাবস্থা বিপন্ন হবে, যেহেতু বোনাপার্টের পক্ষে তখন খোলা থাকবে একমাত্র বলপ্রয়োগেরই পথ, এবং যেহেতু ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে চরম মুহূর্তটিতে ফ্রান্সকে বৈপ্লবিক অরাজকতার হাতে সমর্পণ করতে হবে এমন পরিস্থিতিতে যখন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা হারিয়েছে, বহুকাল যাবত সে ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ছিল না, আর জনগণ সে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অথচ জানা কথা যে, সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট বৃথাই যাবে, কারণ প্রজাতন্ত্রীদের ভিটোর ফলে নিয়মতান্ত্রিক কারণে তাদের ব্যর্থতা অবধারিত। সংবিধানবিরুদ্ধ উপায়ে সাধারণ সংখ্যাধিক্যকেই অবশ্যপালনীয় বলে ঘোষণা করলে তারা বিপ্লবের উপরে আধিপত্যের আশা করতে পারে একমাত্র যদি নির্বাহী ক্ষমতার সার্বভৌম শক্তির কাছে শর্তহীন বশ্যতা স্বীকার করে, সেক্ষেত্রে বোনাপার্টকেই করে দেওয়া হবে সংবিধানের, সেটা সংশোধনের এবং তাদের নিজেদেরও হর্তাকর্তা। শুধু আংশিক সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে সম্রাটরূপে তাঁর ক্ষমতা জবরদখলের পথই পরিষ্কার হবে। সামগ্রিক সংশোধনে প্রজাতন্ত্রের জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং রাজবংশদুটোর দাবির অনিবার্য সংঘাত দেখা দেবে, কারণ বুরবোঁ আর অর্লিয়ান্সের পুনঃস্থাপনার শর্তগুলি কেবল ভিন্ন নয়, একটিকে একেবারে বর্জন না করলে অন্যটি অসম্ভব।

যে নিরপেক্ষ এলাকাতে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর দুটি উপদল — লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী দল, বৃহৎ ভূমিসম্পত্তি আর শিল্পের দল — সমান অধিকার সহকারে পাশাপাশি বসবাস করতে পারে, তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র।** এটা হল তাদের মিলিত শাসনের অপরিহার্য শর্ত, একমাত্র রাষ্ট্ররূপ যেখানে তাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের বশে আনা গিয়েছিল তাদের বিশিষ্ট উপদলীয় দাবিসমূহ এবং অন্যান্য সমস্ত

শ্রেণীর দাবিও। রাজতন্ত্রী হিসেবে তারা ফিরে গেল তাদের অতীত বিরোধে, ভূমিসম্পত্তি বনাম অর্থবলের প্রভুত্বের জন্যে সংগ্রামে, আর এই বিরোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ, সেটার মূর্তরূপ হল তাদের রাজারা, তাদের দুই রাজবংশ। এইজন্যেই বুরবোঁদের ফিরিয়ে আনার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিরোধ।

অর্লিয়ান্সী জন-প্রতিনিধি ক্রেতোঁ নিয়মিতভাবে ১৮৪৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫১ সালে রাজপরিবারগুলির নির্বাসনের অনুশাসন প্রত্যাহারের প্রস্তাব এনেছিলেন। পার্লামেণ্টেও সমানই নিয়মিতভাবে এই দৃশ্য দেখা গেল যে, একটি রাজতান্ত্রিক সভা তাদের নির্বাসিত রাজাদের প্রত্যাবর্তনের দ্বার নাছোড় হয়ে রুদ্ধ করে রাখছে। তৃতীয় রিচার্ড ষষ্ঠ হেনরিকে এই বলে হত্যা করেছিলেন যে, তিনি এই পৃথিবীর পক্ষে বড় বেশি সৎ লোক, একমাত্র স্বর্গেই তাঁর স্থান। এঁরা ঘোষণা করলেন রাজাদের ফিরে পাবার পক্ষে ফ্রান্স বড়ই নিকৃষ্ট দেশ। অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে তারা হয়ে উঠেছিল প্রজাতন্ত্রী এবং যে জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত রাজাদের ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করেছিল সেটাকে বারবার এরা অনুমোদন করল।

সংবিধানের যে সংশোধন ঘটনাচক্রে অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল তাতে প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুই বুর্জোয়া উপদলের যুগ্ম শাসন সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছিল, আর রাজতন্ত্রের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার দেখা দিল, প্রধানত যেগুলির প্রতিনিধিত্ব রাজতন্ত্র করেছিল পালা করে — আবার দেখা দিল একটা উপদলের উপরে অন্যটার প্রাধান্যের লড়াই। শৃঙ্খলা পার্টির কূটনীতিবিদরা বিশ্বাস করেছিল রাজবংশ দুটোর সম্মিলনী ঘটিয়ে, রাজতান্ত্রিক দল দুটির এবং তাদের রাজপরিবারদ্বয়ের তথাকথিত মিলন ঘটিয়ে তারা এই সংগ্রামের মীমাংসা করতে পারবে। পুনঃস্থাপনা এবং জুলাই রাজতন্ত্রের প্রকৃত মিলন কিন্তু পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র, যেখানে অর্লিয়ান্স এবং লেজিটিমিস্ট রঙ মুছে যায়, আর বুর্জোয়াদের বিভিন্ন প্রজাতি মিলিয়ে যায় সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের মধ্যে, বুর্জোয়া গণ-এর মধ্যে। এবার কিন্তু অর্লিয়ান্সীকে হতে হবে লেজিটিমিস্ট, আর লেজিটিমিস্টকে অর্লিয়ান্সী; যে রাজছত্রে তাদের বিরোধ মূর্তিমান, তাতেই মূর্ত হওয়া চাই তাদের ঐক্য; তাদের একান্ত নিজস্ব উপদলীয় স্বার্থের অভিব্যক্তিটাই হওয়া চাই তাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের

প্রকাশ; রাজতন্ত্রকে সেই কাজ করতে হবে যে কাজ কেবল দুই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করেই প্রজাতন্ত্রের দ্বারা করা সম্ভব ছিল এবং করা হয়েছিলও। এই পরশপাথর পয়দা করার জন্যেই শৃঙ্খলা পার্টির পন্ডিতেরা মাথা ঘামাতে লাগলেন। লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র যেন কোনদিন শিল্পপতি বুর্জোয়াদের রাজতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে, অথবা বুর্জোয়া রাজতন্ত্র যেন কখনও হয়ে উঠতে পারে ভূমিসম্পত্তির বংশানুক্রমিক মালিক অভিজাতবর্গের রাজতন্ত্র। ভূমিসম্পত্তি এবং শিল্প যেন কখনও **একটি** রাজমুকুটের অধীনে ভাই-ভাই হয়ে যেতে পারে, যখন সেই মুকুটে জ্যেষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ কেবল একটি ভ্রাতার মস্তকই ভূষিত করা যায়। যতদিন না ভূমিসম্পত্তি আপনিই শিল্পচরিত্র ধারণ করতে চাইছে, তখন শিল্পের পক্ষে যেন ভূমিসম্পত্তির সঙ্গে আদৌ কোন মিটমাট করা সম্ভব। কাল যদি পঞ্চম হেনরির মৃত্যু হয়, তার ফলে প্যারিসের কাউন্ট তো লেজিটিমিস্টদের রাজা হতে পারবেন না, যদি না তিনি অর্লিয়ান্সী রাজপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু সম্মিলনীর যে দার্শনিকেরা সংশোধনের প্রশ্নটা যতই সামনে এসে যাচ্ছিল ততই সরব হয়ে উঠেছিলেন, *Assemblée Nationale* (৫৮) পত্রিকাটিকে নিজেদের দৈনিক সরকারী মুখপত্র করে নিয়েছিলেন, এবং এমনকি এই মুহূর্তেও (ফেব্রুয়ারি ১৮৫২) আবার তৎপর হয়ে উঠেছেন, তাঁদের ধারণা হল সমস্ত মুশকিলের কারণ শুধু রাজবংশ দুটির মধ্যে বিরোধ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লুই ফিলিপের মৃত্যুর পরে পঞ্চম হেনরি এবং অর্লিয়ান্স পরিবারের পুনর্মিলনের যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত রাজবংশীয় কূটচক্রান্তের মতোই যার খেলা চলত কেবল জাতীয় সভার বিরতিকালে, দুই অঙ্কের অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে (entr'actes) যবনিকার অন্তরালে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের বদলে যা বরং সাবেকী কুসংস্কার নিয়ে ভাবাকুল ছেনালিপনা মাত্র, সেই চেষ্টা এখন পূর্বতন শৌখিন নাটুকেপনা ছেড়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সাড়ম্বর রাষ্ট্রীয় নাট্যরূপে শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হতে থাকল। দূতেরা ছুটল প্যারিস থেকে ভেনিস (৫৯), ভেনিস থেকে ক্ল্যারমন্ট এবং ক্ল্যারমন্ট থেকে প্যারিসে। শাঁবরের কাউন্ট একটি ইস্তাহার জারি করে 'তাঁর সমস্ত পরিজনবর্গের সাহায্যে' তাঁর নিজের নয়, 'জাতীয়' পুনঃস্থাপনার ঘোষণা করলেন। অর্লিয়ান্সী সালভাঁদী পঞ্চম হেনরির পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। লেজিটিমিস্ট কর্তা

বেরিয়ে, বেনুয়া দ'আজি, সাঁ-প্রিস্ত ক্ল্যারমণ্ট যাত্রা করে অর্লিয়ান্সচক্রকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথাই। মিলনবাদীরা অতিরিক্ত বিলম্বে উপলব্ধি করল যে দুটি বুর্জোয়া উপদলের স্বার্থ যখন পারিবারিক স্বার্থ, দুই রাজবংশের স্বার্থের আকারে তীক্ষ্ণতর হয়, তখন ঐসব স্বার্থের অনন্যতা কিছুমাত্র নষ্ট হয় না, এবং নমনীয়তা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। পঞ্চম হেনরি যদি প্যারিসের কাউণ্টকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করতেন — সম্মিলনের ফলে বড়জোর যে একমাত্র সাফল্য হাসিল হতে পারত — তাতে অর্লিয়ান্সবংশ এমন কোন অধিকার পেত না যা পঞ্চম হেনরি নিঃসন্তান হওয়ার দরুন ইতোমধ্যেই তারা পেয়ে যায় নি, অথচ জুলাই বিপ্লবে অর্জিত সমস্ত অধিকার তাদের খোয়া যেত। তাদের আদি দাবিগুলো, বুরবোঁ রাজবংশের জ্যেষ্ঠ শাখার বিরুদ্ধে প্রায় শতবর্ষব্যাপী সংগ্রামে ছিনিয়ে নেওয়া সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করতে হত; নিজেদের ইতিহাসলব্ধ অধিকার, আধুনিক রাজত্বের অধিকার বিকিয়ে দিতে হত কুলাধিকারের জন্যে। এই মিলন তাই হতে পারত আর কিছুই নয়, শুধু অর্লিয়ান্সবংশের স্বেচ্ছায় অধিকার ত্যাগ, লেজিটিমিস্ট নীতির কাছে আত্মসমর্পণ, প্রটেস্টান্ট রাষ্ট্রীয় চার্চ থেকে অপসরণ করে অনুতপ্তচিত্তে ক্যাথলিক চার্চে প্রবেশ। উপরন্তু, এই অপসরণের ফলে তারা তাদের হারানো সিংহাসনেও উঠতে পারত না, পৌঁছত শুধু সিংহাসনে ওঠার ধাপে, যেখানে তাদের জন্ম। গিজো, দ্যুশাতেল প্রভৃতি প্রাক্তন অর্লিয়ান্সী মন্ত্রী যাঁরা এইভাবে সম্মিলনের ওকালতি করতে ক্ল্যারমণ্টে ছুটেছিলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করছিলেন জুলাই বিপ্লব নিয়ে Katzenjammer,* বুর্জোয়াদের রাজত্ব এবং বুর্জোয়া রাজকীয়তা সম্পর্কে হতাশার অনুভূতি, অরাজকতার বিরুদ্ধে শেষ মন্ত্রশক্তি হিসেবে লেজিটিমিস্ট নীতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। অর্লিয়ান্স এবং বুরবোঁদের মধ্যস্থ হিসেবে নিজেদের কল্পনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন স্রেফ অর্লিয়ান্সদলত্যাগী, এবং জুয়াঁভিলের রাজকুমার সেইভাবেই তাঁদের গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, অর্লিয়ান্সীদের তাগড়াই জঙ্গী অংশটা — তিয়ের, বাজ, ইত্যাদি — লুই ফিলিপের পরিজনবর্গকে আরও অনায়াসে বোঝাতে পারলেন

---

* 'পরদিন-সকাল'-বোধ। — সম্পাঃ

যে, প্রত্যক্ষভাবে রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপনার পূর্বশর্ত যদি হয় দুই রাজবংশের একীকরণ এবং এমন যে কোন একীকরণের পূর্বশর্ত যদি হয় অর্লিয়ান্সবংশের অধিকার ত্যাগ, সেক্ষেত্রে, উলটে, আপাতত প্রজাতন্ত্রকে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির আসনকে সিংহাসনে রূপান্তরের উপযোগী অবস্থার প্রতীক্ষায় থাকাই সর্বতোভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের অনুযায়ী। জুয়াঁভিল প্রার্থী বলে গুজব রটনে হল, কৌতূহলী জনসাধারণকে অনিশ্চিত অবস্থায় রাখা হল, এবং কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে, সংশোধনের ব্যাপারটা অগ্রাহ্য হবার পর প্রকাশ্যে তাঁকে প্রার্থী বলে ঘোষণা করা হল।

অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টদের রাজতান্ত্রিক সম্মিলনের চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হল শুধু তাই নয়; এতে তাদের **পার্লামেণ্টীয় সম্মিলন,** তাদের সাধারণ প্রজাতান্ত্রিক রূপটিকে নষ্ট করা হল, আর শৃঙ্খলা পার্টিকে ভেঙে সেটার আদি অঙ্গ-উপাদানগুলিতে বিভক্ত করা হল; কিন্তু ক্ল্যারমন্ট আর ভেনিসের মধ্যে মনোমালিন্য যতই বেড়ে চলল, যতই তাদের ফয়সালা ভেঙে গিয়ে জুয়াঁভিলের জন্যে আন্দোলন অগ্রসর হল, বোনাপার্টের মন্ত্রী ফশে এবং লেজিটিমিস্টদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ততই বেশি আগ্রহ আর ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেতে থাকল।

শৃঙ্খলা পার্টির ভাঙন সেটার আদি উপাদানগুলিতে গিয়েই থামল না। সেটার মস্ত দুটো উপদলের প্রত্যেকটির মধ্যেই আবার নতুন করে বিয়োজন চলল। যেসব পুরনো সূক্ষ্ম পার্থক্য আগে লেজিটিমিস্ট বা অর্লিয়ান্সী এক-একটা চক্রের ভিতরে থেকে পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি মারামারি করত সেগুলো সবই যেন শুকিয়ে-যাওয়া ইনফিউসরিয়া প্রোটোজোয়ার মতো জলস্পর্শে আবার তাজা হয়ে উঠল, সেগুলো যেন নিজ-নিজ গোষ্ঠী আর স্বতন্ত্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট নতুন প্রাণশক্তি আহরণ করেছে। লেজিটিমিস্টরা স্বপ্ন দেখল তারা টুইলেরিস আর মার্সাঁ-র প্যাভিলিয়ন, ভিলেল আর পলিনিয়াকের (৬০) মধ্যকার তর্কবিতর্কের মধ্যে আবার ফিরে গেছে। অর্লিয়ান্সীরা যেন আবার বিচরণ করতে লাগল গিজো, মলে, ব্রলি, তিয়ের এবং অদিলোঁ বারো-র দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্বর্ণযুগে।

শৃঙ্খলা পার্টির যে অংশটা সংশোধনের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, অথচ সংশোধনের চৌহদ্দির প্রশ্নে আবার যাদের মধ্যে মিল ছিল না —

একদিকে বেরিয়ে আর ফাল্লু-র নেতৃত্বে, অন্যদিকে লা রশজাকলাঁ-র নেতৃত্বে লেজিটিমিস্টরা, এবং মলে, ব্রলি, মঁতালাঁবের এবং অদিলোঁ বারো-র নেতৃত্বে রণক্লান্ত অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে অংশটা — এরা বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনির্দিষ্ট এবং ব্যাপক ভিত্তিতে রচিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সম্বন্ধে একমত হল:

'জাতির সার্বভৌমত্ব ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা তাকে প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতিনিধিগণ প্রস্তাব করিতেছে যে সংবিধানের সংশোধন হউক।'

কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের পক্ষের তথ্য-পরিবেশক তকভিলের মারফত তারা সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করল যে, **প্রজাতন্ত্র বিলোপের** প্রস্তাব তোলার অধিকার জাতীয় সভার নেই, সে অধিকার একমাত্র সংশোধক পরিষদেই ন্যস্ত। তাছাড়া, সংবিধানের সংশোধন হতে পারে কেবল **'বৈধ' প্রণালীতেই,** অর্থাৎ একমাত্র যদি সংশোধনের সপক্ষে থাকে সমগ্র ভোটের সংবিধানে যা নির্ধারিত সেই তিন-চতুর্থাংশ ভোট। ছয় দিনের তুমুল বিতর্কের পরে ১৯ জুলাই সংশোধনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল, যা প্রত্যাশিতই ছিল। সেটার পক্ষে ছিল চার-শ' ছেচল্লিশ ভোট, কিন্তু বিপক্ষে ভোট ছিল দু'-শ' আটাত্তর। তিয়ের, শাঙ্গার্নিয়ে প্রমুখ চরম অর্লিয়ান্সীরা প্রজাতন্ত্রী এবং 'পর্বতের' সঙ্গে ভোট দিলেন।

এইভাবে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য সংবিধানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল, কিন্তু সংবিধান আপনিই সংখ্যালঘুদের পক্ষে, এবং এদের ভোটই পালনীয় বলে মত প্রকাশ করে। কিন্তু শৃঙ্খলা পার্টি কি ১৮৫০ সালের ৩১ মে এবং ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন সংবিধানকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাধিক ভোটের অধীন করায় নি? এতদিন পর্যন্ত তাদের সমস্ত নীতির ভিত্তিমূলেই কি পার্লামেণ্টের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের কাছে সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলির বশ্যতাই তদবধি ছিল না কি তাদের সমগ্র কর্মনীতির ভিত্তি? আইনের আক্ষরিক অর্থের উপর প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস তারা কি গণতন্ত্রীদের কাছে ছেড়ে দেয় নি এবং সেজন্যে তাদের তীব্র নিন্দা করে নি? কিন্তু এই মুহূর্তে সংবিধান সংশোধনের একমাত্র অর্থ ছিল রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব চলতে দেওয়া, ঠিক যেমন সংবিধান অক্ষুণ্ণ রাখার অর্থ

ছিল বোনাপার্টের পদচ্যুতি ছাড়া আর কিছু নয়। পার্লামেণ্ট তাঁর পক্ষে মত দিল, কিন্তু সংবিধান মত দিল পার্লামেণ্টের বিপক্ষে। সুতরাং সংবিধান ছিঁড়ে ফেলে তিনি কাজ করলেন পার্লামেণ্টের মনোভাব অনুসারে, আর সংবিধান অনুসারে তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন।

পার্লামেণ্ট ঘোষণা করেছিল সংবিধান এবং সেটার সঙ্গে পার্লামেণ্টের নিজস্ব শাসন 'সংখ্যাগুরুর ঊর্ধ্বে'; ভোট মারফত পার্লামেণ্ট সংবিধানকে বাতিল করল এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, সেটার জীবদ্দশায় একটির অবলুপ্তি কিংবা অন্যটির অস্তিত্ব কোনটাই চলতে পারে না। যারা সেটাকে কবর দেবে তারা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সংশোধন নিয়ে যখন বিতর্ক চলছিল তখন বোনাপার্ট প্রথম সামরিক ডিভিশনের অধিনায়কত্ব থেকে বারাগে দ'ইলিয়ে-কে অপসারিত করেন, কারণ তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত বলে প্রতিপন্ন হন, এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্ত করেন লিয়োঁ-বিজয়ী, ডিসেম্বরের দিনগুলোর বীরনায়ক, নিজের এক অনুচর জেনারেল মানিয়াঁ-কে, যিনি লুই ফিলিপের আমলে বুলোন অভিযানের ব্যাপারে বোনাপার্টের প্রতি পক্ষপাতিত্বের দায়ে মোটের উপরে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

সংবিধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে শৃঙ্খলা পার্টি প্রমাণ করে দিল যে, শাসন করতে কিংবা খিদমত করতে, বাঁচতে অথবা মরতে, প্রজাতন্ত্রকে সহ্য করতে কিংবা সেটাকে উচ্ছেদ ঘটাতে, সংবিধানকে তুলে ধরতে বা সেটাকে বিসর্জন দিতে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযোগিতা চালাতে কিংবা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এর কোনটারই উপায় তারা জানে না। তাহলে তারা সমস্ত দ্বন্দ্ব-অসংগতির সমাধানের জন্যে কার মুখাপেক্ষী ছিল? তারা মুখাপেক্ষী ছিল পঞ্জিকার, ঘটনাচক্রের। ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করার স্পর্ধা তারা ত্যাগ করেছিল। এইভাবে তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনাবলিকেই তারা আহবান জানাল; আর এইভাবে আহবান জানাল সেই শক্তির উদ্দেশে, জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেটার হাতে একটির পর একটি ক্ষমতা তুলে দিয়ে শেষে সেটার সম্মুখে ক্লীবের মতো দাঁড়িয়েছিল। নির্বাহী ক্ষমতার কর্ণধার যাতে আরও নিরুপদ্রবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন, আক্রমণের উপায়গুলি দৃঢ়তর করতে পারেন, অস্ত্রনির্বাচন

করে নিজ অবস্থানগুলিকে সুরক্ষিত করতে পারেন, যেন সেইজন্যেই ঠিক সেই সঙ্কটমুহূর্তে তারা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে ১০ অগস্ট থেকে ৪ নভেম্বর এই তিন মাস বৈঠক স্থগিত রাখা স্থির করল।

পার্লামেন্টের পার্টিটা সেটার দুই বৃহৎ উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল শুধু তাই নয়, এই দুই উপদলেরই ভিতরেও ভাগ-বিভাগ ঘটল শুধু তাই নয়, তদুপরি পার্লামেন্টের ভেতরকার শৃঙ্খলা পার্টি পার্লামেন্টের **বাইরের** শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হল। বুর্জোয়াদের মুখপাত্র এবং কলমচিরা, তাদের বক্তৃতামঞ্চ আর পত্র-পত্রিকা, এক কথায় বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শবিদেরা এবং বুর্জোয়া শ্রেণী আপনিই — প্রতিনিধিরা এবং যাদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হল, তারা পরস্পরকে আর বুঝতে পারছিল না।

বিভিন্ন প্রদেশের লেজিটিমিস্টরা তাদের সীমায়িত দিগন্ত এবং অসীম উৎসাহ নিয়ে তাদের পার্লামেন্টীয় নেতা বেরিয়ে এবং ফলুর বিরুদ্ধে পালিয়ে গিয়ে বোনাপার্টপন্থী শিবিরে যোগ দেবার এবং পঞ্চম হেনরির পক্ষত্যাগের অভিযোগ আনল। তাদের লিলিফুলের মন মানুষের পতনে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু কূটনীতিতে নয়।

বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের রাজনীতিকদের সঙ্গে এই বুর্জোয়াদের বিচ্ছেদটা ছিল অনেক বেশি সাংঘাতিক এবং চূড়ান্ত। লেজিটিমিস্টদের মতো নেতাদের বিরুদ্ধে নীতি বর্জনের অনুযোগ করল না এই বুর্জোয়ারা, বরং উল্টে এরা আনল অকেজো নীতি আঁকড়ে থাকার অভিযোগ।

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, লুই ফিলিপের আমলে বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের যে অংশটি ক্ষমতার বেশির ভাগটা দখল করেছিল তারা অর্থাৎ **ফিনান্স অভিজাতবর্গ** ফুল্দের যোগদানের পরে বোনাপার্টপন্থী হয়ে পড়েছিল। ফুল্দ ছিলেন ফটকাবাজারে বোনাপার্টের স্বার্থের প্রতিনিধিই শুধু নয়, তিনি আবার বোনাপার্টের কাছে ফটকাবাজারের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করতেন। ফিনান্স অভিজাতবর্গের মনোভাব তাদের ইউরোপীয় মুখপত্র লন্ডনের *Economist* (৬১) পত্রিকার একটি রচনাংশে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। ১৮৫১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই পত্রিকার প্যারিসের সংবাদদাতা লেখেন:

'এখন আমরা শুনছি বহু মহল থেকে বলা হচ্ছে ফ্রান্স সর্বোপরি চায় শান্তি। বিধান সভার প্রতি বাণীতে রাষ্ট্রপতি এই ঘোষণা করেছেন; সভামঞ্চ থেকে এর প্রতিধ্বনি উঠছে; পত্র-পত্রিকাগুলিতে এই বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে; গির্জার প্রচার-বেদি থেকে এটা ঘোষিত হচ্ছে; গোলযোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনায় সরকারী ফাণ্ডের চঞ্চলতায় এবং নির্বাহী ক্ষমতার জয় প্রকটিত হওয়া মাত্র সরকারী ফাণ্ডের স্থির ভাবের মধ্যে সেটা প্রদর্শিত হয়।'

১৮৫১ সালের ২৯ নভেম্বরের সংখ্যায় *Economist* নিজের নামে ঘোষণা করে:

'রাষ্ট্রপতিই শৃঙ্খলার রক্ষক, আর ইউরোপের প্রতিটি ফটকাবাজার তাঁকে এখন সেইভাবেই দেখছে।'

অতএব ফিনান্স অভিজাতবর্গ নির্বাহী ক্ষমতার বিপক্ষে শৃঙ্খলা পার্টির পার্লামেন্টীয় সংগ্রামটিকে **শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত** বলে ধিক্কৃত করল এবং তাদের প্রকাশ্যে ঘোষিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির প্রতিটি জয়কে **শৃঙ্খলার জয়** বলে অভিনন্দিত করল। ফিনান্স অভিজাতবর্গ বলতে এক্ষেত্রে কেবল তাদের বোঝাচ্ছে না যারা বৃহৎ ঋণ-ব্যবসায়ী এবং সরকারী ফাণ্ডে যারা ফটকা খেলে, যাদের সম্বন্ধে অবিলম্বেই বোঝা যায় যে তাদের স্বার্থ রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ থেকে অভিন্ন। সমগ্র আধুনিক ফিনান্স, গোটা ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সম্পূর্ণত সরকারী ক্রেডিটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। এদের কারবারী পুঁজির একাংশ বিনিয়োগ ক'রে সুদে খাটান হয় অনতিবিলম্বে বিনিমেয় সরকারী সিকিউরিটিতে। তাদের আমানত, তাদের আয়ত্ত পুঁজি, যেটাকে তারা ছড়িয়ে দেয় ব্যাপারী আর শিল্পপতিদের মধ্যে, সেটার একাংশ আসে সরকারী সিকিউরিটির মালিকদের লভ্যাংশ থেকে। প্রতিযুগেই যদি রাষ্ট্রশক্তির স্থিতিশীলতা সমগ্র টাকার বাজার এবং সেটার পূজারীদের দৃষ্টিতে মোজেস এবং পয়গম্বরদের মর্যাদা পেয়ে থাকে, তবে এই যুগে সে মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাবে না কেন, যখন প্রতিটি মহাপ্লাবন পুরনো রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর পুরনো রাষ্ট্রীয় ঋণও ভাসিয়ে নিয়ে যাবার বিপদ সৃষ্টি করে?

শিল্প বুর্জোয়ারাও শৃঙ্খলার প্রতি অন্ধ অত্যাসক্তির দরুন নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে পার্লামেন্টীয় শৃঙ্খলা পার্টির কলহে রুষ্ট হয়েছিল।

শাঙ্গার্নিয়ের অপসারণ উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি ভোটদানের পরে তিয়ের, আঙ্গলা, সাঁ-ব্যেভ, প্রভৃতিকে ঠিক শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতেই তাঁদের নির্বাচকেরা প্রকাশ্যে তিরস্কার করেছিল, তাতে বিশেষ করে 'পর্বতের' সঙ্গে তাঁদের মৈত্রীটাই শৃঙ্খলার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে চাবকানি খেয়েছিল। আমরা যা দেখেছি, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টির সংগ্রামের যা বিশেষত্ব সেইসব সদম্ভ শ্লেষোক্তি আর হীন চক্রান্ত যখন তার চেয়ে উত্তম সংবর্ধনা লাভের যোগ্য ছিল না, তাহলে, অপর পক্ষে, এই যে-বুর্জোয়া পার্টি সেটার প্রতিনিধিদের আদেশ করেছিল সামরিক ক্ষমতা সেটার নিজস্ব পার্লামেন্টের হাত থেকে একজন ভাগ্যান্বেষী সিংহাসনের দাবিদারের হাতে নির্বিরোধে চলে যেতে দিতে, সেটার স্বার্থে অপচয়-করা অজস্র ষড়যন্ত্রেরও উপযুক্ত ছিল না সেটা। এটা প্রমাণ করল যে, এর **সামাজিক** স্বার্থ, এর নিজস্ব **শ্রেণী-স্বার্থ**, এর **রাজনৈতিক ক্ষমতা** রক্ষার সংগ্রাম একে কেবল বিব্রত এবং বিচলিতই করেছে, কারণ সংগ্রামটা ছিল ব্যক্তিগত কারবারের ক্ষেত্রে গোলযোগ।

প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে জেলা শহরগুলিতে গণামান্য বুর্জোয়ারা, পৌর কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য আদালতের বিচারক, ইত্যাদিরা বোনাপার্টের সফরকালে সর্বত্র অত্যন্ত দাসোচিত ভঙ্গিতে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল, এমনকি যখন তিনি জাতীয় সভা এবং বিশেষত শৃঙ্খলা পার্টিকে অসংযত আক্রমণ করেছিলেন তখনও, দৃষ্টান্তস্বরূপ দিজোঁ-তে।

ব্যবসা-বাণিজ্য যতদিন ভালভাবে চলেছিল, এবং ১৮৫১ সালের গোড়ায়ও সে অবস্থা ছিল, তখন, পাছে বাণিজ্যের মতিগতি বিগড়ে যায় তাই বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টীয় সংগ্রামের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন করত। বাণিজ্যে যখন মন্দা এল, ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগ থেকে অবস্থাটা সমানে যা ছিল, তখন বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টীয় সংগ্রামকে বদ্ধতার কারণ বলে অভিযোগ করে, এবং বাণিজ্য যাতে আবার শুরু হয় সেজন্যে সংগ্রাম বন্ধ করার হাঁক পাড়তে থাকল। সংশোধন-সংক্রান্ত বিতর্ক চলল ঠিক এই দুঃসময়ে। প্রশ্নটি যেহেতু ছিল বিদ্যমান রাষ্ট্ররূপ থাকবে কি থাকবে না, তাই বুর্জোয়ারা মনে করল এই যন্ত্রণাকর অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য তাদের প্রতিনিধিদের কাছে দাবি করাই আরও বেশি সঙ্গত। এর মধ্যে কোন অসংগতি ছিল না।

অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান বলতে সেই ব্যবস্থা চলতে দেওয়াই তারা বুঝেছিল— অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তটিকে সুদূর ভবিষ্যৎ কালের জন্যে স্থগিত রাখা। স্থিতাবস্থা রক্ষার দুটিমাত্র উপায় ছিল: বোনাপার্টের কর্তৃত্ব চলতে দেওয়া, অথবা তাঁর নিয়মতান্ত্রিক অবসরগ্রহণ এবং কাভেনিয়াকের নির্বাচন। বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের কাছে শেষোক্ত সমাধানটিই বাঞ্ছনীয় ছিল; তারা তাদের প্রতিনিধিদের নীরব থেকে এই জরুরী সমস্যাটির স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার চেয়ে বেশি সদুপদেশ দিতে পারল না। তাদের ধারণা ছিল তাদের প্রতিনিধিরা কোন কথা না বললে বোনাপার্টও কোন কাজ করবেন না। তারা চেয়েছিল একটি উটপাখি গোছের পার্লামেণ্ট, যেটা অদৃশ্য থাকার জন্যে শুধু মাথাটি ঢাকবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্য একটি অংশ চেয়েছিল, বোনাপার্ট যেহেতু রাষ্ট্রপতির আসনে রয়েছেন, তিনি সেখানেই থাকুন, যাতে সব কিছু পড়ে থাকে একই পুরনো খাতে। তাদের পার্লামেণ্ট প্রকাশ্যে সংবিধান লঙ্ঘন করে অনাড়ম্বরে অধিকার ত্যাগ করে নি বলে তারা রুষ্ট ছিল।

জেলাগুলির সাধারণ কাউন্সিলগুলি, বৃহৎ বুর্জোয়াদের এই প্রাদেশিক প্রতিনিধি সংস্থাগুলি, জাতীয় সভার বিরতিকালে ২৫ অগস্ট তারিখ থেকে বৈঠক আরম্ভ করে, সেগুলি প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই সংশোধনের পক্ষে, তাই পার্লামেণ্টের বিপক্ষে এবং বোনাপার্টের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল।

নিজেদের **পার্লামেণ্টীয় প্রতিনিধিদের** সঙ্গে বিবাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার চেয়েও দ্বিধাহীনভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রোধ প্রকাশ করে তাদের সাহিত্য জগতের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে, নিজেদের পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে। বোনাপার্টের জবরদখলী ক্ষমতালিপ্সার প্রতিবাদে বুর্জোয়া সাংবাদিকদের প্রতিটি আক্রমণ, নির্বাহী ক্ষমতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার্থে পত্রিকাগুলির প্রতিটি প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তরে বুর্জোয়া জুরিদের রায়ে সর্বনাশা জরিমানা এবং জঘন্য মেয়াদের কারাদণ্ডাদেশ দেখে কেবল ফ্রান্স নয়, সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে আমি দেখিয়েছি, **পার্লামেণ্টীয় শৃঙ্খলা পার্টি** শান্তির জন্যে সোরগোল তুলে নিষ্ক্রিয়তার ব্রত নিয়েছিল; সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয় **শাসন**-ব্যবস্থার সমস্ত পরিবেশ নিজ হাতে ধ্বংস ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর

নিরাপত্তা আর অস্তিত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা খাপ খায় না; তখন অন্যদিকে **পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়া জনরাশি** রাষ্ট্রপতির প্রতি দাস্য প্রদর্শন ক'রে, পার্লামেণ্টের দুর্নাম ক'রে, নিজস্ব পত্র-পত্রিকার প্রতি বর্বর দুর্ব্যবহার ক'রে বোনাপার্টকে ডাক দিয়েছিল তাদের বলিয়ে আর লিখিয়ে অংশটাকে, তাদের রাজনীতিক আর সাহিত্যসেবীদের, তাদের বক্তৃতামঞ্চ আর পত্র-পত্রিকাগুলিকে দমন এবং লোপ করতে, যাতে তখন তারা একটি শক্তিশালী এবং নিরঙ্কুশ সরকারের রক্ষণাধীনে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে চালিয়ে যেতে পারে। শাসন করার ঝঞ্ঝাট আর বিপদ থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিজেদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষাই এরা জানিয়ে দিল স্পষ্ট করে।

এই পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়ারা ইতিপূর্বে নিজস্ব শ্রেণী-শাসনের জন্যে নিছক পার্লামেণ্টীয় এবং সাহিত্য মাধ্যমে সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে সংগ্রামের নেতাদের প্রতি, অথচ এরাই এখন, ঘটনা ঘটে যাবার পর, বুর্জোয়াদের সপক্ষে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে, জীবনমরণ সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত অবতীর্ণ হয় নি বলে তাদের উপর দোষারোপ করতে সাহস পেল! এই বুর্জোয়ারা প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণতম এবং জঘন্যতম ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে নিজেদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থ, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থ বলি দিয়েছে এবং নিজেদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে একই প্রকার বলিদান দাবি করেছে, আর এরাই এখন বিলাপ করতে থাকল যে,

> প্রলেতারিয়েত এদের আদর্শ রাজনৈতিক স্বার্থ বলি দিয়েছে তাদের [প্রলেতারিয়েতের] বৈষয়িক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে। এরা ভাব করল লক্ষ্মীমণির মতো, যাদের নাকি সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা বিভ্রান্ত প্রলেতারিয়েত চরম মুহূর্তে ভুল বুঝে পরিত্যাগ করল। আর সারা বুর্জোয়া জগতেও সেটার ব্যাপক প্রতিধ্বনি শোনা গেল। আমি অবশ্য এখানে ছেঁদো জার্মান রাজনীতিক কিংবা সেই ধরনের আজেবাজে লোকদের কথা বলছি না। আমি বলছি দৃষ্টান্তস্বরূপ আগে উদ্ধৃত *Economist* পত্রিকার কথা। ১৮৫১ সালের ২৯ নভেম্বর তারিখে পর্যন্ত, অর্থাৎ কুদেতার মাত্র চার দিন আগেও এই পত্রিকা বোনাপার্টকে 'শৃঙ্খলারক্ষক' এবং তিয়ের আর বেরিয়েদের 'নৈরাজ্যবাদী' আখ্যা দিয়েছিল, আর বোনাপার্ট নৈরাজ্যবাদীদের শায়েস্তা করার পর ১৮৫১

সালের ২৭ ডিসেম্বরই পত্রিকাটা 'মধ্য আর উচ্চ পর্যায়ের মান্বষের দক্ষতা, জ্ঞান, শ্ংখলাবোধ, মানসিক প্রভাব, বিদ্যাবুদ্ধি এবং নৈতিক ম্ল্যের' প্রতি 'অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নির্বোধ প্রলেতাইরে-দের' বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মুখর হয়ে উঠল। নির্বোধ, অজ্ঞ এবং ইতর জনরাশি হল ব্র্জোয়া জনরাশিই, আর কেউ নয়।

১৮৫১ সালে ফ্রান্সে অবশ্য একটা ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যিক সংকট গোছের ঘটেছিল। ১৮৫০ সালের তুলনায় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে রপ্তানি কমে গিয়েছিল; মার্চ মাসে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কল-কারখানা বন্ধ হতে থাকে; এপ্রিলে শিল্পপ্রধান জেলাগ্বলির অবস্থা প্রায় ফেব্রুয়ারির দিনগ্বলির পরেকার মতো শোচনীয় হয়ে ওঠে; মে মাসেও কাজ-কারবার চাঙ্গা হল না; ২৮ জ্বন পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অভ্ ফ্রান্সের হিসাবপত্রে আমানতের অঙ্কে বিরাট বৃদ্ধি এবং হ্বণ্ডির উপরে আগামের পরিমাণে তেমনিই হ্রাস দেখে বোঝা গেল উৎপাদন অচল অবস্থায় রয়েছে, অক্টোবরের মধ্যভাগের আগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি শ্বর্ হল না। ফরাসী ব্র্জোয়া শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যে এই অচলাবস্থার কারণ হিসেবে নির্দেশ করল বিভিন্ন নিছক রাজনৈতিক অবস্থা, পার্লামেণ্ট এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে বিরোধ, রাষ্ট্রের নিছক অস্থায়ী রূপের অনিশ্চয়তা এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারের ভয়াবহ সম্ভাবনা। প্যারিসে এবং জেলাগ্বলিতে শিল্পের কয়েকটা শাখায় এই সমস্ত পরিস্থিতির একটা মন্দার ক্রিয়া ঘটেছিল, তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু যা-ই হোক, রাজনৈতিক অবস্থার এই প্রভাব ছিল শ্বধ্ব স্থানীয় এবং নগণ্য। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, রাজনৈতিক দিগন্ত অন্ধকার হয়ে এল এবং প্যালে দ্য ইলিজে থেকে যে কোন মুহূর্তে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ছিল, ঠিক তখনই ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির স্বত্রপাত হল, এর পরেও কি অন্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে? উপরন্তু, যে ফরাসী ব্র্জোয়াদের 'দক্ষতা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং বিদ্যাবুদ্ধি' নাকের ডগা ছাড়িয়ে যায় না, তারা লণ্ডনে শিল্প-প্রদর্শনীর (৬২) সমগ্র পর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের দ্বরবস্থার কারণটা একেবারে নাকের নিচেই খ্ৰুজে পেতে পারত। ফ্রান্সে যখন কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, ইংলণ্ডে তখন কারবারগ্বলোতে দেউলিয়াপনা দেখা দিয়েছিল। এপ্রিল আর মে মাসে

ফ্রান্সে শিল্পক্ষেত্রে আতঙ্ক চরমে উঠেছিল, সেই এপ্রিল আর মে মাসে ইংলন্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যজগতে আতঙ্ক উঠেছিল চরমে। ফ্রান্সের পশম শিল্পের মতো ইংলন্ডের পশম শিল্প এবং ফ্রান্সের রেশম শিল্পের মতো ইংলন্ডের রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ইংলন্ডের সুতোকলগুলি কাজ চালিয়ে যায় তা ঠিক, কিন্তু তাতে ১৮৪৯ আর ১৮৫০ সালের মতো লাভ আর ছিল না। একমাত্র পার্থক্য এই যে, ফ্রান্সের সংকটটা ছিল শিল্পগত, ইংলন্ডে — ব্যবসা-বাণিজ্যে; ফ্রান্সে কল-কারখানাগুলি অচল হয়ে রইল, আর ইংলন্ডে কল-কারখানার কাজ বেড়ে চলল, কিন্তু আগেকার কয়েক বছরের তুলনায় তত অনুকূল অবস্থায় নয়; বাজারে সবচেয়ে বেশি মার খেল ফ্রান্সের রপ্তানি, আর ইংলন্ডের আমদানি। অভিন্ন কারণটা ছিল স্পষ্টপ্রতীয়মান — স্বভাবতই ফ্রান্সের রাজনৈতিক দিগন্তের চৌহদ্দির মধ্যে সেটার হদিস মেলে না। ১৮৪৯ আর ১৮৫০ সাল ছিল সবচেয়ে বেশি বৈষয়িক বাড়-বাড়ন্তের দুটো বছর এবং অতি-উৎপাদনের কাল, সেটা তাই-ই বলে টের পাওয়া গেল মাত্র ১৮৫১ সালে। সে বছরের গোড়ায় শিল্প-প্রদর্শনীর প্রত্যাশায় সেটাতে আরও বিশেষ রকমের উৎসাহন জোটে। উপরন্তু, ছিল নিম্নলিখিত বিশেষ অবস্থাগুলি: প্রথমে, ১৮৫০ আর ১৮৫১ সালে তুলোর আংশিক ফসলহানি, পরে প্রত্যাশা ছাপিয়ে তুলো উৎপাদনের নিশ্চয়তা; তুলোর দামের প্রথমে বৃদ্ধি, পরে আকস্মিক হ্রাস, সংক্ষেপে দামের ওঠা-নামা। কাঁচা রেশমের উৎপাদন অন্ততপক্ষে ফ্রান্সে হল গড়পড়তা উৎপাদের চেয়ে কম। শেষে ১৮৪৮ সালের পর থেকে পশম শিল্পের এত সম্প্রসারণ ঘটেছিল যাতে পশমের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি, আর পশমী দ্রব্যের চেয়ে কাঁচা পশমের দাম এত বেড়েছিল যার মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। এইভাবে তাহলে বিশ্ব-বাজারের তিনটে শিল্পের জন্যে কাঁচামালের ক্ষেত্রে পাওয়া গেল ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার তিনদফা মালমসলা। এই বিশেষ অবস্থাগুলির কথা ছেড়ে দিলে, অতি-উৎপাদন এবং অতিরিক্ত ফটকাবাজি শিল্পচক্রের আবর্তনে অনিবার্যভাবে যে সাময়িক বিরতি ঘটায়, যার পরে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে এই চক্রগতির শেষ পর্ব উন্মত্তের মতো পার হয়ে আবার যাত্রারম্ভস্থলে, **সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য সংকটে** আবার পেঁছে যায়, সেই বিরতি ছাড়া আর কিছুই নয় ১৮৫১ সালের প্রতীয়মান সংকটটা। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এই

ধরনের বিরামকালে ইংলণ্ডে কারবারী দেউলিয়াপনা দেখা যায়, আর ফ্রান্সে শিল্পই অচলাবস্থায় আসে, তার কারণ অংশত সমস্ত বাজারেই ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা সেই মুহূর্তে অসহনীয় হয়ে উঠে সেটাকে পশ্চাদাপসারণে বাধ্য করে, এবং অংশত, বিলাস দ্রব্যের উৎপাদক হিসেবে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোন মন্দার অবস্থাতেই আক্রমণটা বেছে বেছে তারই ওপর পড়ে। এইভাবে, সাধারণ সংকট বাদেও ফ্রান্সকে বিভিন্ন নিজস্ব জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তবে সেগুলো ফ্রান্সের কোন দেশজ প্রভাবের চেয়ে বিশ্ব-বাজারের সাধারণ অবস্থা দিয়েই অনেক বেশি পরিমাণে নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ফরাসী বুর্জোয়াদের সংস্কারের সঙ্গে ইংরেজ বুর্জোয়াদের বিবেচনার একটা প্রতিতুলনা অনাকর্ষণীয় হবে না। ১৮৫১ সালের বাৎসরিক বাণিজ্যবিবরণীতে লিভারপুলের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লিখছে:

'বছরের গোড়ায় যেসব প্রত্যাশা করা হয় সেগুলো সবে সমাপ্ত বছরটায় যেমনটা একেবারেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হল এমনটা হয়েছে খুবই কম বছরেই; যে মস্ত বাড়-বাড়ন্তের প্রত্যাশা প্রায় সর্বসম্মত ছিল, তার পরিবর্তে এই বছরটি হয়ে দাঁড়াল গত পঁচিশ বছরের সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক বছরগুলির একটা — অবশ্য শিল্পক্ষেত্রের নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রের শ্রেণীগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা হচ্ছে। অথচ বছরটার গোড়ায় এর ঠিক বিপরীত অবস্থা আশা করার কারণ নিশ্চয়ই ছিল — উৎপন্ন মালের পরিমাণ ছিল মাঝামাঝি রকমের, টাকার পরিমাণ ছিল প্রচুর, খাদ্য সস্তা ছিল, ফসলের প্রাচুর্য ছিল সুনিশ্চিত, মহাদেশের মূলভূমিতে অটুট শান্তি বিরাজ করছিল এবং দেশে কোনরকম রাজনৈতিক অথবা আর্থিক গোলযোগ ছিল না; বাস্তবিকপক্ষে, বাণিজ্য এমন মুক্তপক্ষ ছিল না আর কখনও... তাহলে এই সর্বনাশা ফলাফলের মূল কারণ কী? আমাদের ধারণা, কারণটা হল আমদানি আর রপ্তানি উভয়ক্ষেত্রেই **অতিরিক্ত বাণিজ্য**। আমাদের বণিকরা তাদের কর্মের স্বাধীনতা আরও কঠোরভাবে সীমায়িত না করলে ত্রিবার্ষিক আতংক ছাড়া আর কিছুই আমাদের সংযত রাখতে পারবে না।'

এবার ফরাসী বুর্জোয়াদের অবস্থাটা কল্পনা করে দেখুন, ব্যবসায় জগতের এই আতঙ্কে যন্ত্রণাকাতর তাদের বাণিজ্য-পাগল মস্তিষ্ককে কীভাবে পীড়িত, আলোড়িত, হতবুদ্ধি করছে বিভিন্ন কুদেতা আর সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের গুজব, পার্লামেণ্ট এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত, অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টদের মধ্যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক

লড়াই, দক্ষিণ ফ্রান্সে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র, নিয়েভ্র আর শের জেলায় তথাকথিত জাক্‌রি (৬৩), রাষ্ট্রপতি-পদের জন্যে বিভিন্ন প্রার্থীদের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকাগুলির ফেরিওয়ালামার্কা হাঁক, প্রজাতন্ত্রীদের অস্ত্রবলে সংবিধান আর সর্বজনীন ভোটাধিকার রক্ষার হুমকি, বাণীপ্রচারক দেশত্যাগী প্রবাসী বীরপুরুষগণ, যারা ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে পৃথিবীর অবসান ঘটবে বলে ঘোষণা করেছে -- এই সমস্ত ভেবে দেখলেই উপলব্ধি করবেন সম্মিলন, সংশোধন, স্থগিতকরণ, সংবিধান, ষড়যন্ত্রকরণ, মৈত্রী প্রবসন, জবরদখল এবং বিপ্লবের এই অবর্ণনীয় কর্ণবিদারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বুর্জোয়ারা কেন তাদের পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসছে: **'শেষহীন ত্রাসের চেয়ে বরং ত্রাসে শেষই ভাল!'**

বোনাপার্ট এই জিগিরটার মর্ম বুঝলেন। তাঁর উপলব্ধি-ক্ষমতাটাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল মহাজনদের ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্য প্রতিদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যতই নিকটবর্তী হতে থাকল হিসাব-নিকাশের দিন ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার, ততই তারা আকাশের গ্রহ সমাবেশে দেখতে লাগল তাদের পার্থিব হুণ্ডিগুলো অনাদায়ী থেকে যাবার সংকেত। খাঁটি জ্যোতিষী হয়ে উঠেছিল তারা। জাতীয় সভা বোনাপার্টের ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক মেয়াদবৃদ্ধির আশা বিফল করে দিয়েছিল; জুয়াঁভিলের রাজকুমারের প্রার্থিত্বের ফলে আর দ্বিধার অবকাশ ছিল না।

কখনও কোন ঘটনা আসার অনেক আগেই যদি সেটার ছায়া ফেলে থাকে সেটা হল বোনাপার্টের কুদেতা। সেই কবে, ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে, তাঁর নির্বাচনের সবেমাত্র একমাস পরেই তিনি শাঙ্গার্নিয়ের কাছে এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব তুলেছিলেন। ১৮৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর নিজের প্রধানমন্ত্রী অদিলোঁ বারো কুদেতার কর্মনীতিতে প্রচ্ছন্ন ধিক্কার দেন, আর ১৮৫০ সালের শীতকালে তিয়ের সেটা করেন প্রকাশ্যে। ১৮৫১ সালের মে মাসে পেরসিনি শাঙ্গার্নিয়েকে কুদেতার পক্ষে টানতে চেষ্টা করেন আবার; *Messager de l'Assemblée* (৬৪) পত্রিকায় এই আলাপ-আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পার্লামেণ্টের প্রতিটি ঝটিকার সময়ে বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলি জবরদখলের ভয় দেখিয়েছে এবং সংকট যত কাছিয়ে এসেছে ততই বেড়েছে তাদের গলার জোর। 'কেষ্টবিষ্টু' মহলের

নারী-পুরুষদের নিয়ে বোনাপার্ট প্রতিরাত্রে যে পানোৎসব চালাতেন তাতে মধ্যরাত্রি আসন্ন হলেই পানপ্রাচুর্যে রসনা বন্ধনমুক্ত আর কল্পনাশক্তি প্রজ্বলিত হয়ে উঠত, তখন কুদেতার তারিখ ধার্য হত পরদিন প্রাতঃকালেই। তরবারি কোষমুক্ত হত, পানপাত্র ঠোকাঠুকির আওয়াজ উঠত, 'প্রতিনিধিদের' জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলা হত, বোনাপার্টকে ভূষিত করা হত সম্রাটের বেশে, যতক্ষণ না সকালে প্রেতটা আর একবার বিতাড়িত হত, আর প্যারিসের লোকে মুখ-আলগা সতী এবং অবিবেচক 'নাইটদের' উক্তিতে চমৎকৃত হয়ে জানতে পারত কী ঘোর বিপদ থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে আর-একবার। সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসে একটার পর একটা কুদেতার গুজব রটল ঘন ঘন। তার সঙ্গে সঙ্গে কর্বুরিত ডেগেরেটাইপের (daguerreotype) মতো ছায়াতে রঙ ধরত। ইউরোপের দৈনিকগুলির সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসের সংখ্যাগুলোর পাতা ওলটালে দেখা যায় অক্ষরে-অক্ষরে এই ধরনের সংবাদ: 'প্যারিস কুদেতার গুজবে ঠাসা। বলা হচ্ছে রাজধানী রাত্রে সৈন্যে ভরে যাবে, পরদিন সকালে নির্দেশ জারি করে জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হবে, সেন্ জেলায় অবরোধের অবস্থা ঘোষিত হবে, সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তিত হবে এবং জনগণের শরণ নেওয়া হবে। প্রকাশ, বোনাপার্ট নাকি এইসব অবৈধ ডিক্রি বলবৎ করবার জন্যে মন্ত্রীদের সন্ধানে আছেন।' এই সংবাদবাহী পত্রগুলি সর্বদাই শেষ হত একটি চূড়ান্ত শব্দে — '**স্থগিত রইল**'। কুদেতা বরাবরই ছিল বোনাপার্টের বদ্ধভাব। এই ধারণা নিয়েই তিনি আবার ফ্রান্সে হাজির হয়েছিলেন। এই ধারণাটা এমনভাবে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যাতে তিনি ক্রমাগত তা ফাঁস করে বসতেন, বলে ফেলতেন। আবার তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যাতে বারবার চিন্তাটা ছেড়েও দিতেন। কুদেতার ছায়াটা প্যারিসীয়দের কাছে ভূত হিসেবে এতই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল যে অবশেষে সেটা সশরীরে হাজির হলে তারা সেটাকে বিশ্বাস করতেই চায় নি। কুদেতাটাকে যা ফতে হতে দিল সেটা তাই ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারের সতর্ক বাক্‌সংযমও নয়, জাতীয় সভার উপর সেটা অতর্কিতে এসে পড়েছিল তাও নয়। কুদেতা যে কৃতকার্য হল সেটা তাঁর অবিমৃষ্যকারিতা সত্ত্বেও এবং জাতীয় সভার পূর্বজ্ঞান থাকা অবস্থায়ই, এটা হল পূর্বতন ঘটনাপরম্পরার অপরিহার্য অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

১০ অক্টোবর বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের কাছে সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন; ১৬ অক্টোবর তারা পদত্যাগপত্র দাখিল করল; ২৬-এ প্যারিস তরিনি মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ পেল। একই সময়ে পুলিসের বড়কর্তা কার্লিয়ে-র জায়গায় মপা এলেন; প্রথম সামরিক ডিভিশনের কর্তা মানিয়াঁ রাজধানীতে জড় করলেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত রেজিমেণ্টগুলিকে। ৪ নভেম্বর জাতীয় সভার অধিবেশন আবার আরম্ভ হল। অধীত পাঠ্যধারাটিকে সংক্ষেপে চুম্বকে পুনরাবৃত্তি করা, এবং মৃত্যুর পরেই সেটাকে গোর দেওয়া হল বলে প্রমাণ করা ছাড়া জাতীয় সভার আর কিছুই করার ছিল না।

নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে সংগ্রামে সভা প্রথমেই যে ঘাঁটি হারাল সেটা হল মন্ত্রিসভা। তরিনির মন্ত্রিসভার মতো একটি স্রেফ ছায়া মন্ত্রিসভাকে পূর্ণমর্যাদায় গ্রহণ করে তারা বিধিসম্মতভাবে এই ক্ষতি কবুল করতে বাধ্য হল। শ্রীযুক্ত জিরো নবগঠিত মন্ত্রিসভার নামে আত্মপরিচয় দিলে স্থায়ী কমিশনে হাস্যরোল উঠেছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের মতো বিভিন্ন প্রবল ব্যবস্থার জন্যে এমন দুর্বল মন্ত্রিসভা! অথচ পার্লামেণ্টের মধ্যে কিছুই নয়, সবই সেটার বিরুদ্ধে হাসিল করাই ছিল ঠিক লক্ষ্যটা।

জাতীয় সভার কাজ আবার আরম্ভ হবার প্রথম দিনে এল বোনাপার্টের একটি বাণী, তাতে তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ১৮৫০ সালের ৩১ মে তারিখের আইন রদের দাবি করেন। সেইদিনেই তাঁর মন্ত্রীরা এই মর্মে একটা ডিক্রি উত্থাপন করে। জাতীয় সভা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিসভার জরুরী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং ১৩ নভেম্বর ৩৫৫-৩৪৮ ভোটে বাতিল করে আইনটাকেই। এইভাবে, তারা আর একবার নিজেদের ম্যাণ্ডেট ছিঁড়ে ফেলল; আর একবার তারা প্রমাণ করল যে, স্বাধীনভাবে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি সভাটা শ্রেণীবিশেষের জবরদখলী পার্লামেণ্টে পরিণত হয়েছে; আর একবার তারা স্বীকার করল যে, জাতিদেহের সঙ্গে পার্লামেণ্টীয় মুণ্ডের সংযোগকারী পেশীগুলিকে তারা নিজেদের হাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়ে নির্বাহী ক্ষমতা যেমন জাতীয় সভার থেকে মুখ ফিরিয়ে জনগণের প্রতি আবেদন জানাল, আর বিধানিক কর্তৃপক্ষ খসড়া কোয়েস্টর বিল্ দিয়ে জনগণের দরবার থেকে আবেদন

করল সৈন্যবাহিনীর প্রতি। তাদের সরাসরি সৈন্যতলবের, পার্লামেণ্টীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল এই কোয়েস্টর আইনের উদ্দেশ্য। এইভাবে তারা নিজেদের আর জনগণের মধ্যে এবং নিজেদের আর বোনাপার্টের মধ্যে সালিস হিসেবে দাঁড় করাল সৈন্যবাহিনীকে, আর সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতা বলে মেনে নিল, কিন্তু অন্যদিকে তাদের স্বীকার করতে হল যে, এই ক্ষমতাটার উপরে আধিপত্যের দাবি তারা ছেড়েছিল অনেক আগেই। অবিলম্বে সৈন্যতলব করার বদলে তাদের সৈন্যতলব করার অধিকার নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তারা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেদের সংশয়টাই ফাঁস করে দিল। কোয়েস্টর বিল্ প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজেদের ক্লীবতাই প্রকাশ্যে স্বীকার করল। প্রস্তাবটা পরাজিত হয়, এটার উপস্থাপকেরা ১০৮ ভোটের কমতিতে সংখ্যাধিক্য পেল না। এইভাবে প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করল 'পর্বত'। এরা পড়েছিল বুরিদানের গাধাটার অবস্থায়, অবশ্য দুই আঁটি খড়ের মধ্যে পড়ে কোন্‌টা বেশি লোভনীয় সেটা স্থির করার সমস্যা নয়, এটা হল দুটো প্রহারবৃষ্টির মধ্যে পড়ে কোন্‌টা বেশি কঠোর তাই স্থির করার সমস্যা। তাদের ভয় ছিল একদিকে শাঙ্গার্নিয়েকে, অন্যদিকে বোনাপার্টকে। স্বীকার করতেই হবে অবস্থাটা কিছু বীরোচিত ছিল না।

১৮ নভেম্বর শৃঙ্খলা পার্টি পৌর নির্বাচনী আইনে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনে এই মর্মে যে, পৌরসভা নির্বাচকদের পক্ষে তিন বছরের জায়গায় এক বছর এক এলাকাতে বসবাসই যথেষ্ট। এই সংশোধনী প্রস্তাব একটামাত্র ভোটে পরাজিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, ঐ ভোটটা ছিল ভুল। পরস্পরবিরোধী উপদলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলা পার্টি অনেক আগেই পার্লামেণ্টে তাদের স্বতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুইয়েছিল। এবার দেখা গেল পার্লামেণ্টে কোন সংখ্যাগুরু পক্ষই আর নেই। জাতীয় সভা কার্যপরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সেটার অঙ্গ-পরমাণুগুলিকে একত্রে ধরে রাখার কোন বাঁধনি শক্তি আর ছিল না; সেটা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল; সেটা তখন মৃত।

শেষে, দুর্বিপাকের অল্প কয়েক দিন আগে পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়া সম্প্রদায় পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদটাকে আর একবার যথাবিধি প্রতিপন্ন করেছিল। পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধিতার রোগে

আর সবার চেয়ে বেশি আক্রান্ত পার্লামেণ্টীয় নায়ক হিসেবে তিয়ের পার্লামেণ্টের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় পরিষদের সঙ্গে মিলে একটি নতুন পার্লামেণ্টীয় চক্রান্ত ফেঁদেছিলেন — একটা 'দায়িত্ব আইন', তাতে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের গণ্ডির ভিতরে শক্ত করে বাঁধা থাকতে হত। ১৫ সেপ্টেম্বর প্যারিসে নতুন বাজারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বোনাপার্ট যেমন এক দ্বিতীয় মাজানিয়েলো-র মতো বাজারের মহিলাদের অর্থাৎ মেছুনীদের মনোহরণ করেছিলেন -- অবশ্য একজন মেছুনীর প্রকৃত ক্ষমতা সতের জন পার্লামেণ্টীয় বরগ্রেভের চেয়ে বেশি; ঠিক যেমন তিনি কোয়েস্টর-বিল্ উত্থাপন করে আহ্লাদিত করেছিলেন ইলিজে-তে যাদের আপ্যায়ন করতেন সেই সহচরদের, ঠিক তেমনি এবার ২৫ নভেম্বর তিনি জয় করে নিলেন শিল্পপতি বুর্জোয়াদের হৃদয়, যারা লণ্ডনের শিল্প-প্রদর্শনীর জন্যে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার পদক নিতে সার্কাসমণ্ডপে জড় হয়েছিল। *Journal des Débats* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতার অর্থপূর্ণ অংশটি আমি উদ্ধৃত করছি:

'এমনসব অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরে আমি সঙ্গতভাবেই পুনরাবৃত্তি করতে পারি যে, একদিকে বাক্যবীরের দল এবং অন্যদিকে রাজতান্ত্রিক মরীচিকা দিয়ে অবিরত উপদ্রুত হবার বদলে যদি ফরাসী প্রজাতন্ত্র সেটার প্রকৃত স্বার্থ অনুসারে চলত এবং প্রতিষ্ঠানাদি সংস্কারের সুযোগ পেত, তবে সেটা হয়ে উঠতে পারত কত মহান। (মণ্ডপের প্রতি কোণ থেকে সরব, তুমুল এবং মুহুর্মুহু করতালি।) রাজতান্ত্রিক মরীচিকা সমস্ত প্রগতি এবং শিল্পের সমস্ত প্রধান শাখাগুলির পথে অন্তরায়। অগ্রগতির বদলে কেবলই সংগ্রাম। দেখা যাচ্ছে, যারা আগে রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং বিশেষ অধিকারের সবচেয়ে সোৎসাহ সমর্থক ছিল তারাই আজ কনভেনশনের পক্ষসমর্থক হয়ে উঠেছে শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকার থেকে উদ্ভূত শক্তিটাকে খর্ব করার জন্যে। (প্রবল ও মুহুর্মুহু করতালি।) দেখছি, যারা বিপ্লবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বিপ্লবের দরুন সবচেয়ে বেশি খেদ করেছে তারাই আজ নতুন বিপ্লবের প্ররোচনা দিচ্ছে — কেবল জাতির সংকল্পকে শৃঙ্খলিত করার জন্যেই... আমি আপনাদের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। (শাবাশ, শাবাশ, তুমুল শাবাশধ্বনি)।'

এইভাবে দাসসুলভ শাবাশধ্বনি তুলে শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা ২ ডিসেম্বরের কুদেতা, পার্লামেণ্টের বিনাশ, নিজেদেরই শাসনের পতন,

বোনাপার্টের একনায়কত্বকে ধন্য ধন্য করে গ্রহণ করল। ২৫ নভেম্বরের করতালির বজ্রনাদের জবাবে এল ৪ ডিসেম্বর কামানানির্ঘোষ এবং সর্বাধিক করতালিতে যিনি ফেটে পড়েছিলেন সেই শ্রীযুক্ত সালাঁদ্রুজের বাড়ির উপরেই বোমা ফাটল সর্বাধিক।

দীর্ঘ পার্লামেন্ট (৬৫) ভেঙে দেবার সময়ে ক্রমওয়েল সেটার মাঝে গিয়েছিলেন একা, ঘড়িটা বের করেছিলেন যাতে তাঁর নির্ধারিত সময়ের পরে এক মুহূর্তও সেটার অস্তিত্ব না থাকে, আর পার্লামেণ্টের প্রতিটি সদস্যকে পরম উল্লসিত সকৌতুক শ্লেষোক্তি করে বিতাড়িত করেছিলেন। নিজের ঐ আদিরূপের চেয়ে ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন আঠারোই ব্রুমেয়ার তারিখে বিধানিক সংস্থাটিতে অন্ততপক্ষে হাজির হয়েছিলেন এবং সেটার উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ সেটার কাছে পড়ে দিয়েছিলেন, যদিও স্খলিতকণ্ঠে। দ্বিতীয় বোনাপার্ট ক্রমওয়েল কিংবা নেপোলিয়নের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মডেলের সন্ধান করলেন বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনা-বিবরণীতে নয়, ১০ ডিসেম্বর সমিতির ঘটনা-বিবরণীতে, ফৌজদারী আদালতের ঘটনা-বিবরণীতে। তিনি ব্যাঙ্ক অভ্ ফ্রান্স থেকে লুটে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জোগাড় করলেন, দশ লক্ষ দিয়ে জেনারেল মানিয়াঁকে কিনে নিলেন, সৈন্যদের কিনলেন জনপিছু পনের ফ্র্যাঙ্ক আর মদ দিয়ে, দুষ্কর্মে সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হলেন গোপনে নিশাচর তস্করের মতো, সবচেয়ে বিপজ্জনক পার্লামেণ্টীয় নেতাদের বাড়ি চড়াও করানো হল, বিছানা থেকে টেনে তুলে নেওয়ান হল কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়ের, ল্য ফ্লো, শাঙ্গার্নিয়ে, শারাস্, তিয়ের, বাজ্, প্রভৃতিকে; প্যারিসের প্রধান প্রধান চক এবং পার্লামেন্ট গৃহ সৈন্য দিয়ে দখল করান হল; ভোরে সমস্ত দেয়ালে লটকান ফেরিওয়ালামার্কা হাঁকের প্ল্যাকার্ডে ঘোষণা করা হল জাতীয় সভা আর রাষ্ট্রীয় পরিষদের অবসান, সর্বজনীন ভোটাধিকারের পুনঃপ্রবর্ত এবং সেন্ জেলায় অবরোধের অবস্থা। একইভাবে অল্পদিন পরে তিনি *Moniteur* পত্রিকায় একখানা জাল দলিল গুঁজে দিলেন, তাতে বলে দেওয়া হল, পার্লামেণ্টের প্রভাবশালী সদস্যরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে একটি রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেছেন।

দশম ওয়ার্ডের পৌরসভা গৃহে সমবেত এবং প্রধানত লেজিটিমিস্ট

আর অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে পার্লামেণ্টের বাকি টুকরোটা মুহুর্মুহু 'প্রজাতন্ত্রের জয়!' ধ্বনি তুলে বোনাপার্টের পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, বাড়িটার বাইরে হাঁ করে চেয়ে থাকা জনতার উদ্দেশে বৃথাই গলাবাজি করল, শেষে আফ্রিকার নিশানিদের হেফাজতে তাদের প্রথমে দ্য'অর্সে (d'Orsay) শিবিরে এবং পরে কয়েদী গাড়িতে ভরতি করে মাজাস, হাম্ আর ভাঁসেনের জেলখানায় চালান দেওয়া হল। শৃঙ্খলা পার্টি, বিধান-সভা এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অবসান ঘটল এইভাবে। ঝটিতি ইতি করার আগে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করা যাক:

এক ॥ **প্রথম কালপর্যায়**। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মে, ১৮৪৮। ফেব্রুয়ারি কালপর্যায়। প্রস্তাবনা। সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধাপ্পা।

দুই ॥ **দ্বিতীয় কালপর্যায়**। প্রজাতন্ত্র গঠন এবং জাতীয় সংবিধান-সভার কালপর্যায়।

১। ৪ মে থেকে ২৫ জুন, ১৮৪৮। প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীর সংগ্রাম। জুনের দিনগুলিতে প্রলেতারিয়েতের পরাজয়।

২। ২৫ জুন থেকে ১০ ডিসেম্বর, ১৮৪৮। বিশুদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একনায়কত্ব। সংবিধানের খসড়া রচনা। প্যারিসে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা। ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি বোনাপার্ট নির্বাচিত হবার ফলে বুর্জোয়া একনায়কত্ব নাকচ।

৩। ২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৮ থেকে ২৮ মে, ১৮৪৯। বোনাপার্টের বিরুদ্ধে এবং তাঁর সঙ্গে জোট বেঁধে শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে সংবিধান-সভার সংগ্রাম। সংবিধান-সভার তিরোভাব। প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের পতন।

তিন ॥ **তৃতীয় কালপর্যায়। নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** এবং **জাতীয় বিধান-সভার** কালপর্যায়।

১। ২৮ মে, ১৮৪৯ থেকে ১৩ জুন, ১৮৪৯। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়াদের সংগ্রাম। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরাজয়।

২। ১৩ জুন, ১৮৪৯ থেকে ৩১ মে ১৮৫০। শৃঙ্খলা পার্টির পার্লামেণ্টীয় একনায়কত্ব। সর্বজনীন ভোটাধিকার লোপ করে এরা নিজেদের শাসন সম্পূর্ণ করল, কিন্তু খোয়াল পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা।

৩। ৩১ মে, ১৮৫০ থেকে ২ ডিসেম্বর, ১৮৫১। পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়াদের এবং বোনাপার্টের মধ্যে সংগ্রাম।

(ক) ৩১ মে, ১৮৫০ থেকে ১২ জানুয়ারি, ১৮৫১। সৈন্যবাহিনীর উপর সর্বাধিনায়কত্ব হারাল পার্লামেণ্ট।

(খ) ১২ জানুয়ারি থেকে ১১ এপ্রিল, ১৮৫১। প্রশাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হল। পার্লামেণ্টে শৃঙ্খলা পার্টি স্বতন্ত্র সংখ্যাগুরুত্ব হারাল। প্রজাতন্ত্রীদের এবং 'পর্বতের' সঙ্গে তাদের মিত্রতাস্থাপন।

(গ) ১১ এপ্রিল থেকে ৯ অক্টোবর, ১৮৫১। সংশোধন, সম্মিলন এবং মেয়াদ বাড়াবার চেষ্টা। বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানে বিয়োজিত হয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি। বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট আর পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সাধারণ বুর্জোয়াদের বিচ্ছেদ সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল।

(ঘ) ৯ অক্টোবর থেকে ২ ডিসেম্বর, ১৮৫১। পার্লামেণ্ট এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে প্রকাশ্য কাটান-ছিঁড়েন। নিজ শ্রেণী, সৈন্যবাহিনী এবং বাদবাকি সমস্ত শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে পার্লামেণ্ট সেটার অন্তিম কৃত্য করে প্রাণত্যাগ করল। পার্লামেণ্টীয় আমল এবং বুর্জোয়া শাসনের তিরোভাব। বোনাপার্টের জয়। সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের প্যারোডি।

৭

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সূত্রপাতে **সামাজিক প্রজাতন্ত্র** কথাটা উঠেছিল একটি বচন হিসেবে, একটা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলিতে **প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের** রক্তে ডুবে গেলেও নাটকের পরবর্তী অঙ্কগুলিতে সেটা প্রেতের মতো অধিষ্ঠান করতে থাকে। **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** নিজ পোঁছি ঘোষণা করল। ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন সেটা ছত্রভঙ্গ হল সেটার **পেটি বুর্জোয়ারাসুদ্ধ,** তারা পিট্টান দিল, কিন্তু পালাতে পালাতেই দ্বিগুণ বড়াই করে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে গেল। গোটা রঙ্গমঞ্চ দখল করে বসল বুর্জোয়ারা সমেত **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র;** এটা নিজ অস্তিত্ব ব্যবহার করল পূর্ণ মাত্রায়; কিন্তু ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সেটাকে কবর দিল, তার

সঙ্গে সঙ্গে উঠল সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের সকাতর ধ্বনি: 'প্রজাতন্ত্রের জয়!'

ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের প্রাধান্য প্রতিহত করে; তারা নিয়ে এল ১০ ডিসেম্বর সমিতির দলপতির নেতৃত্বাধীন লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রাধান্য। লাল নৈরাজ্যের ভবিষ্য বিভীষিকা দেখিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সকে শ্বাসরোধী আতঙ্কের অবস্থায় রেখে দিল; সেই ভবিষ্যতের সঙ্গে বোনাপার্ট আগেভাগে হিসাবনিকাশ করে নিলেন: ৪ ডিসেম্বর বুলভার মমার্ত্র এবং বুলভার ডেস ইতালিয়েন-এর বিশিষ্ট বুর্জোয়াদের তাদের জানালায় শৃঙ্খলা বাহিনীর পানোন্মত্ত সৈন্যদের দিয়ে গুলি করালেন। তারা তরবারিকে মহিমান্বিত করেছিল, তরবারিই তাদের উপর কর্তৃত্ব করল। তারা বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকা ধ্বংস করেছিল; তাদের নিজস্ব পত্র-পত্রিকা ধ্বংস হয়ে গেল। তারা জনসভার ওপরে চাপিয়েছিল পুলিসী তত্ত্বাবধান; তাদের বৈঠকখানাগুলো পুলিসের তত্ত্বাবধানে। তারা গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিদল ভেঙে দিয়েছিল, তাদের নিজস্ব জাতীয় রক্ষিদল ভেঙে দেওয়া হল। তারা অবরোধের অবস্থা চাপিয়েছিল; তাদের উপর চাপান হল অবরোধের অবস্থা। তারা জুরিপ্রথা হঠিয়ে সামরিক কমিশন চালু করেছিল; তাদের জুরিকে স্থানচ্যুত করে এল সামরিক কমিশনগুলো। তারা জনশিক্ষা ব্যবস্থাকে পাদরিদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল; পাদরিরা তাদেরকে নিল নিজেদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অধীনে। তারা বিনা বিচারে লোককে নির্বাসন দিয়েছিল; তারা বিনা বিচারে নির্বাসিত হচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে তারা সমাজে প্রতিটি আলোড়ন দমন করেছিল; তাদের সমাজে প্রতিটি আলোড়ন রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে স্তব্ধ করা হচ্ছে। টাকার থলি সম্পর্কে উৎসাহবশত নিজেদের রাজনীতিক আর বিদ্বানের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল; তাদের রাজনীতিক আর বিদ্বানেরা দূর হয়েছে, কিন্তু মুখ বন্ধ হয়ে এবং কলম ভেঙে যাওয়াতে তাদের টাকার থলিই লুঠ হচ্ছে। খ্রীষ্টানদের প্রতি সন্ত আর্সেনিয়স যা হাঁকতেন সেটা বুর্জোয়া শ্রেণী অক্লান্তভাবে হেঁকেছে বিপ্লবের প্রতি: 'Fuge, tace, quiesce! পালাও, চুপ করো, স্থির হয়ে থাকো!' বোনাপার্ট বুর্জোয়াদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ছেন: 'Fuge, tace, quiesce! পালাও, চুপ করো, স্থির হয়ে থাকো!'

'Dans cinquante ans l'Europe sera républicaine ou cosaque.'* নেপোলিয়নের এই উভয়সংকটের সমাধান ফরাসী বুর্জোয়ারা বহু আগেই পেয়ে গিয়েছিল। তারা সমাধানটা পেয়েছে république cosaque-এ। কোন সার্সি ডাইনী বিদ্যা দিয়ে কিন্তু বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্ররূপী শিল্পকর্মটিকে বিকৃত করে বিকটাকৃতি করে তোলে নি। এই প্রজাতন্ত্রের খোয়া গেছে শুধু বাহ্য সম্ভ্রান্ত ভাবটা। আজকের ফ্রান্স** পরিসমাপ্ত রূপেই বিদ্যমান ছিল পার্লামেন্টীয় প্রজাতন্ত্রের ভিতরে। সঙ্গীনের একটা খোঁচাতেই বুদ্বুদ ফেটে সর্বসমক্ষে বেরিয়ে পড়ল বিকট জানোয়ারটা।

২ ডিসেম্বরের পরে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত বিদ্রোহ করল না কেন?

তখন অবধি বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের কেবল রায় জারি করা হয়েছিল: রায়টাকে বলবৎ করা হয় নি। প্রলেতারিয়েতের যে কোন গুরুতর অভ্যুত্থান তৎক্ষণাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করত, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের মিলমিশ ঘটিয়ে শ্রমিকদের দ্বিতীয় জুনের পরাজয় সুনিশ্চিত করে তুলত।

৪ ডিসেম্বর বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা (épicier) প্রলেতারিয়েতকে লড়তে প্ররোচিত করেছিল। সেই সন্ধ্যায় জাতীয় রক্ষিদলের কয়েকটা বাহিনী সশস্ত্র এবং সজ্জিত হয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কারণ বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা খবর পেয়ে যায় যে, ২ ডিসেম্বর তারিখের একটা ডিক্রিতে বোনাপার্ট গোপন ব্যালট বাতিল করে সরকারী তালিকায় নামের পাশে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' লিখবার হুকুম দেন। ৪ ডিসেম্বরের প্রতিরোধে বোনাপার্ট ভয় পান। সেই রাত্রে তিনি প্যারিসের সমস্ত রাস্তার মোড়ে গোপন ব্যালট আবার চালু হবার ঘোষণা লটকানোর ব্যবস্থা করেন। বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা মনে করল তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হল। পরদিন সকালে যাদের দেখা গেল না, তারা হল বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা।

১-২ ডিসেম্বর রাত্রিতে বোনাপার্ট একটা আচমকা হামলায়

---

* 'পঞ্চাশ বছরে ইউরোপ হয় প্রজাতান্ত্রিক না হয় কসাক হয়ে যাবে।' — সম্পাঃ

** অর্থাৎ ১৮৫১ সালের বুদেরোর সরকার। — সম্পাঃ

প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের নেতাদের, ব্যারিকেডের অধিনায়কদের কেড়ে নেন। অফিসারবিহীন এক বাহিনী, ১৮৪৮ সালের জুন আর ১৮৪৯ সাল এবং ১৮৫০ সালের মে মাসের স্মৃতির কারণে 'পর্বতের' লোকদের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে লড়তে বিমুখ এই প্রলেতারিয়েত তাদের সেনামুখ, অর্থাৎ গুপ্ত সমিতিগুলির হাতে ছেড়ে দিল প্যারিসের অভ্যুত্থানিক সম্মান রক্ষার দায়িত্ব, যে সম্মান বুর্জোয়া শ্রেণী সৈন্যদলের হাতে এতই নির্বিবাদে সমর্পণ করেছিল যাতে পরে জাতীয় রক্ষিদলকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্য হিসেবে বোনাপার্ট মুখ সিটকে বলতে পেরেছিলেন যে, জাতীয় রক্ষিদলের অস্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীরা ঘুরিয়ে ধরবে এই আশঙ্কা তাঁর ছিল!

'C'est le triomphe complet et définitif du socialisme!'* গিজো ২ ডিসেম্বরের চরিত্র নির্দেশ করেছিলেন এইভাবে। কিন্তু পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের জয়ের বীজ নিহিত যদি থাকেও, সাক্ষাৎ এবং স্পষ্টপ্রতীয়মান ফল হল **পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে বোনাপার্টের জয়, বিধানিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে নির্বাহী ক্ষমতার জয়, বাক্যবলের বিরুদ্ধে বিনাবাক্য বলের জয়**। পার্লামেণ্টে জাতি সেটার সাধারণ অভিপ্রায়কে আইনে পরিণত করত, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর আইনকে করে তুলত জাতির সাধারণ অভিপ্রায়। নির্বাহী ক্ষমতার কাছে সেটা নিজস্ব সমস্ত অভিপ্রায় পরিত্যাগ করে বশ্যতাস্বীকার করল একটা অভিপ্রায়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্বের কাছে, কর্তৃপক্ষের কাছে। বিধানিক ক্ষমতা থেকে বিসদৃশভাবে নির্বাহী ক্ষমতায় প্রকাশিত হয় জাতির স্বায়ত্তশাসন থেকে যা বিসদৃশ সেই পরকীয় শাসন (heteronomy) । কাজেই, ফ্রান্স যেন শ্রেণীবিশেষের স্বৈরতন্ত্র এড়িয়ে গেল শুধু ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরতন্ত্রের অধীনে, উপরন্তু কর্তৃত্বহীন এক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে পড়ার জন্যে। সংগ্রামের মীমাংসা যেন এমনভাবে হল যাতে সমানই অক্ষম এবং সমানই মূক সমস্ত শ্রেণী বন্দুকের কুঁদোর সামনে নতজানু হল।

কিন্তু বিপ্লব চলে শেষ অবধি। এখনও সেটার চলছে আত্মশুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত। বিপ্লব কাজ করে যায় প্রণালীবদ্ধভাবে। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর

---

* 'এটা হল সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিজয়!' — সম্পাঃ

অবধি সেটার প্রস্তুতির কাজ সারা হয়েছিল শুধু অর্ধেকটা; এখন বাকি অর্ধেকটা সমাধা করছে। প্রথমে বিপ্লব পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতা উচ্ছেদ করতে সমর্থ হবার জন্যে সেটাকে সুসম্পূর্ণ করে তোলে। এই কার্যসিদ্ধির পর এখন **নির্বাহী ক্ষমতাকে** নিখুঁত করার কাজ চলেছে, তাকে একেবারে তার বিশুদ্ধতম রূপে নিয়ে এসে, বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, একমাত্র লক্ষ্যস্থল হিসেবে নিজের বিরুদ্ধেই তাকে দাঁড় করাচ্ছে, যাতে তার বিরুদ্ধেই সংহত করা যায় তার সমগ্র বিধ্বংসী শক্তি। এই প্রাথমিক কাজের দ্বিতীয়ার্ধ সমাধা হলে ইউরোপ আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে চিৎকার করবে: খেড়ে ছুঁচো, বেশ খুঁড়েছ!*

বিশাল আমলাতান্ত্রিক এবং সামরিক সংগঠন, বিভিন্ন বিস্তৃত স্তরব্যাপী সুনিপুণ রাষ্ট্রযন্ত্র, পাঁচ লক্ষ কর্মচারীর বাহিনী এবং আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য, এইসব নিয়ে এই নির্বাহী ক্ষমতা, এই যে-ভয়াবহ পরগাছা সংস্থাটা ফরাসী সমাজদেহে জালের মতো জড়িয়ে সমস্ত রন্ধ্রমুখ রুদ্ধ করে রেখেছে, এর উদ্ভব হয়েছিল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার যে অবক্ষয় এটা ত্বরান্বিত করেছিল সেই অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ভূস্বামীদের এবং নগরগুলির সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকারগুলো রাষ্ট্রক্ষমতার বিশেষক উপাদানে পরিণত হল; হোমরা-চোমরা সামন্তরা বেতনভোগী কর্মচারীতে পর্যবসিত হল, আর মধ্যযুগের পরস্পরবিরোধী পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার বিচিত্র বিন্যাসটা রূপান্তরিত হয়ে গড়ে উঠল রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের নিয়মিত পরিকল্পনা, তাতে কাজ কারখানার মতো বিভক্ত এবং কেন্দ্রীকৃত। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের কাজটা ছিল সমস্ত পৃথক পৃথক স্থানীয়, আঞ্চলিক, নগরভিত্তিক এবং প্রাদেশিক ক্ষমতা চূর্ণ করে জাতির নাগরিক ঐক্য গড়া, কাজেই সেটা চলল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আরব্ধ কাজ আরও সম্প্রসারিত করার দিকে, সেটা হল কেন্দ্রীকরণ, কিন্তু সেইসঙ্গে সরকারী ক্ষমতার পরিধি, বিভিন্ন বিশেষক লক্ষণ এবং সহায়ক বৃদ্ধির দিকে। নেপোলিয়ন এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিখুঁত করে তুলেছিলেন। লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র আর জুলাই রাজতন্ত্র এতে যোগ করল শুধু অধিকতর শ্রম-বিভাগ,

---

* শেক্সপীয়র, 'হ্যামলেট', প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য। -- সম্পাঃ

সেটা বেড়ে চলল বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে শ্রম-বিভাগ থেকে নতুন নতুন স্বার্থগোষ্ঠী এবং তার ফলে নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক উপাদান উদ্ভবের সমান পরিমাণে। প্রতিটি সাধারণী স্বার্থকে তৎক্ষণাৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিপরীতে উচ্চতর সার্ব স্বার্থ হিসেবে দাঁড় করান হল, সমাজের সদস্যদের ক্রিয়াকলাপের আওতা থেকে কেড়ে নিয়ে সেটাকে করে তোলা হল সরকারী কর্মপরিধির বিষয়ীভূত — একটা সাঁকো, স্কুলবাড়ি এবং গ্রাম-গোষ্ঠীর সাধারণী সম্পত্তি থেকে রেলপথ, জাতীয় সম্পদ আর ফ্রান্সের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র দমন-পীড়ন ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতার সামর্থ্য এবং কেন্দ্রীকরণ দৃঢ়তর করতে বাধ্য হয়। প্রতিটি বিপ্লবই এই যন্ত্রটিকে চূর্ণ না করে আরও নিখুঁতই করেছে। যেসব পার্টি পালা করে আধিপত্যের জন্যে লড়েছে সেগুলো সবই এই বিরাট রাষ্ট্রসৌধটাকে বিজয়ীর প্রধান লাভ বলে গণ্য করেছে।

কিন্তু নিরংকুশ রাজতন্ত্রের আমলে, প্রথম বিপ্লবের সময়ে, নেপোলিয়নের আমলে আমলাতন্ত্র ছিল বুর্জোয়াদের শ্রেণী-শাসন প্রস্তুতির উপায় মাত্র। পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের অবস্থায়, লুই ফিলিপের আমলে, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতিতে সেটা ছিল শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার — সেটা নিজস্ব ক্ষমতার জন্যে যতই চেষ্টা করুক না কেন।

একমাত্র দ্বিতীয় বোনাপার্টের অধীনেই মনে হতে পারে রাষ্ট্র নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে নিল। নাগরিক সমাজের বিপক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থিতি এতই পুরোপুরি সংহত হল যাতে সেটার নেতৃত্ব চলে ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারকে দিয়েই, বিদেশ থেকে ভেসে-আসা এই ভাগ্যান্বেষীকে দিয়ে, যাকে ঢালের উপরে তুলে ধরেছে মাতাল সৈন্যের দল, যাদের সে মদ আর সসেজ দিয়ে কিনেছে, আর যাদের সে ক্রমাগতই সসেজ-ভোগ দিতে বাধ্য। তাই একটা গুরুভার হতাশা, একটা নিদারুণ অপমান আর গ্লানিবোধ বুক চেপে ধরেছে ফ্রান্সের। লাঞ্ছিত বোধ করছে দেশটি।

তবু রাষ্ট্র-ক্ষমতা তো শূন্যে ঝুলে থাকে না। বোনাপার্ট একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি, তায় আবার ফরাসী সমাজে যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি সেই **খুদে জোত-জমার (Parzellen)** কৃষিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি।

বুরবোঁরা যেমন ছিল বৃহৎ ভূমিসম্পত্তির রাজবংশ, অর্লিয়ান্স যেমন ছিল অর্থজগতের রাজবংশ, তেমনি বোনাপার্টরা হল কৃষকদের, অর্থাৎ ফরাসীদের প্রধান অংশের রাজবংশ। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের কাছে আত্মসমর্পণকারী বোনাপার্ট নয়, বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে যিনি ছত্রভঙ্গ করেন সেই বোনাপার্টই কৃষককুলের বৃত মানুষ। তিন বছর ধরে শহরগুলি ১০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের অর্থের মিথ্যাকরণে এবং সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনা সম্বন্ধে কৃষকদের ঠকাতে কৃতকার্য হয়েছিল। ১৮৪৮-এর ১০ ডিসেম্বরের নির্বাচনকে চূড়ান্ত রূপ দিল কেবল ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা।

খুদে জোত-জমার কৃষক সম্প্রদায় একটি বিশাল জনসমষ্টি, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ অনুরূপ, কিন্তু তাদের মধ্যে বহুধা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। তাদের উৎপাদন-প্রণালী পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বদলে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ফ্রান্সের নিকৃষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষকদের দারিদ্র্যের জন্যে এই বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে। এদের উৎপাদন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ খুদে জোত-জমায় চাষ-বাসে শ্রমবিভাগ, বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব নয়, তাই বিকাশের বিভিন্নতা, গুণাবলীর বৈচিত্র্য, সামাজিক সম্পর্কের প্রাচুর্য কিছুই সম্ভব হয় না। প্রত্যেকটি কৃষক পরিবার প্রায় স্বয়ম্ভর; সেটা ভোগাবস্তুর প্রধান অংশটা সরাসরি নিজেই উৎপাদন করে, এইভাবে জীবনোপায় সংগ্রহ করে সামাজিক সংসর্গের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে বিনিময়ের সাহায্যেই বেশি। একটি খুদে জোত-জমা, একজন কৃষক, আর তার পরিবার; এদের পাশে আর-একটা খুদে জোত-জমা, আর-একজন কৃষক, আর তার পরিবার। এইরকম কয়েক কুড়ি পরিবার নিয়ে এক-একটি গ্রাম, এবং কয়েক কুড়ি গ্রাম নিয়ে এক-একটি জেলা। এইভাবে, ফরাসী জাতির সবচেয়ে বড় অংশটা হল সদৃশ রাশিগুলির নিছক যোগফল, যেভাবে বস্তার আলুগুলো নিয়ে একবস্তা আলু, অনেকটা সেই রকমের। লক্ষ লক্ষ পরিবার জীবনের এমন অর্থনৈতিক পরিবেশে থাকে যাতে তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী, তাদের স্বার্থ এবং তাদের সংস্কৃতি অন্যান্য শ্রেণীর ঐসব উপাদান থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং তারা পড়ে শেষোক্তদের প্রতি বৈর-বিরুদ্ধ অবস্থানে — এই দিক থেকে তারা একটি শ্রেণী বটে। এই খুদে জোত-জমার কৃষকদের

মধ্যে পরস্পর-সংযুক্তি যে-পরিমাণে স্থানীয় মাত্র, এবং স্বার্থের অভিন্নতা তাদের মধ্যে পয়দা করে না কোন যৌথসত্তা, জাতীয় পরিসরের বন্ধন, রাজনৈতিক সংগঠন, সেই পরিমাণে তারা শ্রেণী নয়। কাজেই তারা নিজেদের নামে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ পার্লামেণ্টে অথবা কনভেনশনে জোর দিয়ে তুলে ধরতে অপারক। তারা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তাদের হয়ে কাউকে প্রতিনিধিত্ব করা চাই। তাদের প্রতিনিধিকে আবার সেইসঙ্গে আসা চাই তাদের কর্তা হিসেবে, তাদের উপর একটা কর্তৃত্ব হিসেবে, একটা নিরঙ্কুশ শাসন-ক্ষমতা হিসেবে, যা অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করে, উপর থেকে তাদের জন্যে পাঠায় রোদ, পাঠায় বর্ষা। কাজেই যে নির্বাহী ক্ষমতা সমাজকে অধীন করে রাখে তারই মধ্যে প্রকাশ পায় খুদে জোত-জমায় কৃষকদের রাজনৈতিক প্রভাবের চরম অভিব্যক্তি।

নেপোলিয়ন নামধারী এক ব্যক্তি তাদের সমস্ত পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবে, এই মর্মে একটা অলৌকিক কান্ডে ফরাসী কৃষকদের বিশ্বাস জন্মেছিল কিংবদন্তি থেকে। একজন দেখা দিলও বটে, সে নিজেকে সেই ব্যক্তি বলে জাহির করল, কারণ তার নাম নেপোলিয়ন, আর যেহেতু 'নেপোলিয়ন-সংহিতায়' লেখা আছে la recherche de la paternité est interdite*। বিশ বছরের ভবঘুরের জীবন এবং একের পর এক উৎকট অ্যাডভেঞ্চারের পরে জনশ্রুতিটা বাস্তব হয়ে উঠল, লোকটা হয়ে দাঁড়াল ফরাসীদের সম্রাট। ভ্রাতুষ্পুত্রের বদ্ধভাব বাস্তবে পরিণত হল, কারণ সেটা মিলে গিয়েছিল ফরাসীদের সবচেয়ে সংখ্যাবহুল শ্রেণীর বদ্ধভাবের সঙ্গে।

আপত্তি উঠতে পারে, ফ্রান্সের অর্ধেক অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ, কৃষকদের উপর সৈন্যবাহিনীর হামলা, ব্যাপকভাবে কৃষকদের জেলে দেওয়া আর নির্বাসন তবে কেন?

চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে ফ্রান্সে 'বক্তৃতাবাজির জন্যে' কৃষকদের উপর এইরকম উৎপীড়নের দৃষ্টান্ত আর নেই।

কিন্তু কথাটার যেন ভুল অর্থ না হয়। বোনাপার্টবংশ যাদের প্রতিনিধি তারা বিপ্লবী কৃষক নয়, রক্ষণশীল কৃষক; যে কৃষক তাদের সামাজিক জীবনের

---

* পিতৃবংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ। — সম্পাঃ

পরিবেশ, অর্থাৎ খুদে জোত-জমা ছাড়িয়ে বেরতে চেষ্টা করে তারা নয়, সেই জোত-জমা যারা মজবুত করতে চায় সেই কৃষক; যে গ্রামীণ জনতা শহরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে নিজেদের উদ্যমে পুরনো ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে চায় তারা নয়, বরং উলটে সেইসব লোক যারা সেই সাবেক ব্যবস্থার ভিতরে হতবুদ্ধিকর বিচ্ছিন্নতার মাঝে থেকে সাম্রাজ্যের ভূতের কাছ থেকে নিজেদের এবং নিজেদের ছোটো জোত-জমাগুলোর জন্যে নিরাপত্তা আর আনুকূল্য পেতে চায়। বোনাপার্ট রাজবংশ প্রতিফলিত করছে কৃষকের জ্ঞানালোক নয়, তার কুসংস্কার; তার বিচারশক্তি নয়, তার অন্ধ বিশ্বাস; তার ভবিষ্যৎ নয়, তার অতীত; তার আধুনিক সেভেন্ (৬৬) নয়, তার আধুনিক ভাঁদে (৬৭)।

পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের তিন বছরের কঠোর শাসনে ফরাসী কৃষকদের একাংশের নেপোলিয়নীয় মোহ কেটেছিল, শুধু ভাসাভাসা হলেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের মধ্যে; কিন্তু যতবারই তারা সচল হয়ে উঠেছে বুর্জোয়ারা হিংস্র উপায়ে তাদের দমন করেছে। পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফরাসী কৃষকদের নবচেতনা এবং সাবেকী মানসের মধ্যে প্রাধান্যের জন্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল। স্কুল শিক্ষক এবং যাজকদের মধ্যে অবিরাম সংঘাতের আকার ধারণ করেছিল এই অগ্রগতি। বুর্জোয়ারা স্কুল শিক্ষকদের ঘায়েল করল। সরকারী কার্যকলাপের স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা কৃষকরা করেছিল এই প্রথম বার। গ্রাম-প্রধান (maires) এবং জেলাশাসকদের (prefects) মধ্যে ধারাবাহিক দ্বন্দ্বে সেটা প্রকাশ পায়। বুর্জোয়ারা গ্রাম-প্রধানদের বরখাস্ত করে। শেষে, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা তাদের আপন সন্তান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবরোধের অবস্থা এবং পিটুনি অভিযান দিয়ে বুর্জোয়ারা তাদের শাস্তি দেয়। সেই একই বুর্জোয়া শ্রেণী আজ জনগণের, ইতর জনতার নির্বুদ্ধিতার কথা বলে চেঁচাচ্ছে, তারা নাকি বেইমানি করে বোনাপার্টের হাতে তুলে দিয়েছে বুর্জোয়াদের। বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেই জোর করে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্য-ভাবালুতা [Imperialis-mus] সুদৃঢ় করেছে, এই কৃষক ধর্মটি পয়দা হবার পরিবেশটাকে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। অবশ্য জনগণ যতদিন রক্ষণশীল থাকে ততদিন তাদের নির্বুদ্ধিতাকে বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেতে বাধ্য, এবং জনগণ বিপ্লবী হয়ে উঠলেই ভয় পেতে বাধ্য তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে।

কৃদেতার পরবর্তী বিদ্রোহগুলিতে ফরাসী কৃষকদের একাংশ ১৮৪৮-এর ১০ ডিসেম্বরে দেওয়া তাদের নিজেদের ভোটের বিপক্ষেই অস্ত্রহাতে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের পরে তারা যে শিক্ষার ভিতর দিয়ে গিয়েছিল সেটাই তাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করে। কিন্তু তারা যে নিজেদের তুলে দিয়েছিল ইতিহাসের দুর্বৃত্ত জগতের হাতে; ইতিহাস তাদের প্রতিশ্রুতির মূল্যদানে বাধ্য করল; তখনও তাদের অধিকাংশের অন্ধসংস্কার ছিল এতই প্রবল যে, সবচেয়ে লাল জেলাগুলিতেই কৃষক জনতা প্রকাশ্যে বোনাপার্টের পক্ষে ভোট দেয়। এদের মতে জাতীয় সভা তাঁর অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল। গ্রামাঞ্চলের অভিপ্রায়ের উপর শহর যে বেড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল সেটাকে তিনি ভেঙে দিলেন মাত্র। কয়েকটি এলাকায় কৃষকরা নেপোলিয়নের পাশাপাশি কনভেনশনের একটা কিম্ভূত ধারণা পর্যন্ত পোষণ করত।

প্রথম বিপ্লব কৃষকদের অর্ধ-ভূমিদাস থেকে ভূমিতে স্থায়িস্বত্বভোগীতে রূপান্তরিত করবার পরে নেপোলিয়ন অনুমোদন এবং নিয়মিত করেছিলেন সেইসব শর্ত যেগুলোর ভিত্তিতে তারা সদ্যপ্রাপ্ত ফরাসী জমি নিরুপদ্রবে কাজে লাগাতে এবং সম্পত্তির জন্যে তাদের প্রবল আসক্তি পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে ফরাসী কৃষকের সর্বনাশ করছে ঠিক এই খুদে জোত-জমাই, জমি-বিভাগ, মালিকানার যে-রূপটাকে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে পাকাপোক্ত করেছিলেন। বৈষয়িক পরিবেশটাই সামন্ততান্ত্রিক আমলের কৃষককে করল খুদে জোত-জমার মালিক, আর নেপোলিয়নকে করল সম্রাট। দুই পুরুষেই তার অনিবার্য ফলটা পয়দা হল: কৃষির ক্রমাবনতি, কৃষিজীবীর ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা। মালিকানার 'নেপোলিয়নীয়' রূপটা উনিশ শতকের গোড়ায় ছিল ফরাসী গ্রামাঞ্চলের মানুষের মুক্তি এবং সমৃদ্ধির জন্যে অপরিহার্য, সেটা এই শতাব্দীর মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের দাসত্ববন্ধন আর নিঃস্বতার অনুশাসন। আর দ্বিতীয় বোনাপার্টকে যেসব 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' তুলে ধরতে হবে, এই অনুশাসনটাই সেগুলোর মধ্যে প্রথম। এখনও যদি কৃষকদের মতো তাঁর এই মোহ থেকে থাকে যে তাদের সর্বনাশের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এই খুদে জোত-জমিরই মাঝে নয়, তার বাইরে, কোন গৌণ পরিস্থিতির প্রভাবের মধ্যে, তাহলে উৎপাদন-সম্পর্কের সংস্পর্শে এলে তাঁর পরীক্ষাগুলো সাবানের বুদ্বুদের মতোই ফেঁসে যাবে।

খুদে জোত-জমার অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। নেপোলিয়নের আমলে গ্রামাঞ্চলে ভূমির খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থাটা ছিল শহরে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং বৃহৎ শিল্পের সূচনার সম্পূরক। সদ্য-উৎখাত ভূস্বামী অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণী ছিল সর্বব্যাপী প্রতিবাদ। ফ্রান্সের মাটিতে খুদে জোত-জমা যে শিকড় গাড়ে তার ফলে সামন্ততন্ত্র পোষক-বঞ্চিত হয়েছিল। খুদে জোত-জমার সীমানাগুলো ছিল পূর্বতন অধিস্বামীদের যে কোন অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের প্রাকৃতিক আত্মরক্ষা-প্রাকারের মতো। কিন্তু উনিশ শতকের গতিপথে সামন্ত মনিবদের স্থান নিল শহরে মহাজনের দল; জমির সঙ্গে জড়িত সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার জায়গায় এল মর্টগেজ প্রথা; অভিজাতদের ভূমিসম্পত্তির জায়গা নিল বুর্জোয়া পুঁজি। কৃষকদের খুদে জোত-জমা তখন হল জমি থেকে পুঁজিপতিদের লাভ সুদ আর খাজনা আদায়ের অছিলা মাত্র, আর জমির চাষী কী করে মজুরি তুলবে সেটা ছেড়ে দেওয়া রইল তারই ওপর। ফ্রান্সের জমিতে মর্টগেজ ঋণের বোঝা ফরাসী কৃষক শ্রেণীর উপরে যে সুদের ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটার পরিমাণ সমগ্র ব্রিটিশ জাতীয় ঋণের বাৎসরিক সুদের সমান। খুদে জোত-জমার বিকাশ অনিবার্যভাবেই সেটাকে ঠেলে দেয় পুঁজির কাছে দাসত্ব-বন্ধনের মাঝে, তার ফলে ফরাসী জাতির অধিকাংশ মানুষ গুহাবাসীতে পরিণত হয়েছে। নারী আর শিশু সমেত এক কোটি ষাট লক্ষ কৃষক থাকে জঘন্য কুঁড়ে ঘরে, তার অনেকগুলোয়েই ফাঁক একটিমাত্র, কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র দুটি, আর সবচেয়ে সুবিধাযুক্ত বাড়িগুলিতে তিনটি মাত্র। অথচ বাড়ির জানালাগুলো হল মস্তিষ্কের পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয় যেমনটা। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থা নবোদ্ভূত খুদে জোত-জমার রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান কায়েম করে তাতে সম্মানের সার দিয়েছিল, সেই ব্যবস্থাটা একটা রক্তচোষা হয়ে সেই জোত-জমার রক্ত আর মস্তিষ্ক চুষে-চুষে পুঁজির অপরাসায়নিক কটাহে নিক্ষেপ করছে। 'নেপোলিয়নীয় সংহিতা' এখন মালক্রোক, দেনার দায়ে সম্পত্তি নিলাম এবং বাধ্যতামূলক নিলামের 'সংহিতা' ছাড়া কিছু নয়। ফ্রান্সে সরকারীভাবে স্বীকৃত ভিক্ষুক, ভবঘুরে, অপরাধী আর গণিকা আছে (শিশু ইত্যাদি সমেত) চল্লিশ লক্ষ, তাদের সঙ্গে ধরতে হবে আরও পঞ্চাশ লক্ষ

লোক, যারা কোনমতে ঝুলে রয়েছে প্রাণান্তের কিনারে, তারা হয় গ্রামাঞ্চলেই ডেরা বেঁধে আছে, নয়তো লোটা-কাঁথা আর কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এবং শহর ছেড়ে গ্রামে ঘোরাঘুরি করছে সমানে। কাজেই কৃষকদের স্বার্থ নেপোলিয়নের আমলের মতো বুর্জোয়াদের স্বার্থের, পুঁজির অনুযায়ী আর নয়, বরং তার বিরুদ্ধ। তাই কৃষকরা দেখতে পায়, তাদের স্বাভাবিক মিত্র এবং নেতা হল **শহরের প্রলেতারিয়েত,** যাদের নির্দিষ্ট কাজটা হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন। কিন্তু **শক্ত আর নিরঙ্কুশ সরকার,** এই যে দ্বিতীয় 'নেপোলিয়নীয় ধারণাটিকে' দ্বিতীয় নেপোলিয়নের কাজে পরিণত করা চাই, সেটার উপর ভার পড়ল বলপ্রয়োগে এই 'বৈষয়িক' ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করার। এই 'বৈষয়িক ব্যবস্থাই' আবার বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সমস্ত ঘোষণাপত্রের প্রধান ধরতাই বুলি।

পুঁজি যে মর্টগেজ চাপাচ্ছে সেটা ছাড়াও খুদে জোত-জমা নানা করের ভারাক্রান্ত। আমলাতন্ত্র, সৈন্যদল, যাজকেরা, দরবার, এককথায় নির্বাহী ক্ষমতার সমগ্র যন্ত্রটার জীবনের উৎসাহ হল কর। শক্তিশালী সরকার এবং গুরুভার কর অভিন্ন। খুদে জোত-জমা স্বভাবগুণেই সর্বশক্তিমান এবং সংখ্যাবহু আমলাতন্ত্রের উপযুক্ত ভিত্তি। সারা দেশে সম্পর্কতন্ত্র আর ব্যক্তিবর্গের একটা সমরূপ মাত্রা সৃষ্টি করে এই জোত-জমা। তাই একটা সর্বোচ্চ কেন্দ্র থেকে এই সমরূপ পুঞ্জের প্রত্যেকটা বিন্দুতে একরূপ ক্ষমতাপ্রয়োগও এর ফলে সম্ভব হয়। জনগণ এবং রাষ্ট্রশক্তির মধ্যবর্তী অভিজাত স্তরগুলি এতে নির্মূল হয়ে যায়। তাই সর্বদিকেই এই রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতা এবং সেটার সরাসর সংস্থাগুলোর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। শেষে, খুদে জোত-জমা পয়দা করে একটা বাড়তি বেকার জনসমষ্টি, গ্রামাঞ্চলে বা শহরে তাদের স্থান নেই, কাজেই ভদ্রজনোচিত মুষ্টিভিক্ষা গোছের সরকারী পদের জন্যে তারা হাত বাড়ায়, সরকারী পদসৃষ্টির প্রয়োজন জাগায়। সঙিনের মুখে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ ক'রে, ইউরোপের মূলভূমিতে লুণ্ঠন চালিয়ে নেপোলিয়ন বাধ্যতামূলক কর সুদসমেত পরিশোধ করেছিলেন। তখন ঐসব কর কৃষকের শ্রমশীলতা জাগিয়ে তুলেছিল, কিন্তু এখন ঐসব কর তার শ্রমশীলতার অবশিষ্ট শক্তি কেড়ে নিচ্ছে, তার নিঃস্বতা রোধের অক্ষমতাটাকে সম্পূর্ণ করে তুলছে। আর সুসজ্জিত এবং ভোজন-পরিতৃপ্ত একটা বিশাল

আমলাতন্ত্র হল একটা 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' যা দ্বিতীয় বোনাপার্টের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর। কী করে তা না হয়ে পারে, যখন সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলির পাশে একটা কৃত্রিম সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে তিনি বাধ্য, যাদের কাছে তাঁর শাসন রক্ষাই অন্নবস্ত্রের সমস্যা? তাই সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে আগেকার মাত্রায় তোলা এবং নতুন নতুন বিনাকাজের সৃষ্টি করাই হল তাঁর একটা প্রথম আর্থিক ব্যবস্থা।

শাসনের হাতিয়ার হিসেবে **যাজকদের** কর্তৃত্ব হল আর-একটা 'নেপোলিয়নীয় ধারণা'। সমাজের সঙ্গে সঙ্গতির দিক থেকে, প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করার ব্যাপারে, এবং উপর থেকে রক্ষক কর্তৃপক্ষের কাছে নতিস্বীকার করাতে সদ্য-উদ্ভূত খুদে জোত-জমা স্বভাবতই ছিল ধর্মপরায়ণ; কিন্তু যে খুদে জোত-জমা দেনায় জেরবার, সমাজ আর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত এবং নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যাবার তাগিদ বোধ করে, সেটা স্বভাবতই অধার্মিক হয়ে ওঠে। সবে-পাওয়া জমির ফালিটুকুর সঙ্গে আসমান সংযোজন বেশ প্রীতিকরই ছিল, বিশেষত সেটা আবহাওয়া পয়দা করে বলে; কিন্তু খুদে জোত-জমার বদলি হিসেবে সেটাকে সামনে ঠেলে দেওয়া মাত্রই তা অপমান হয়ে ওঠে। পুরোহিত তখন হয়ে দাঁড়ায় পার্থিব পুলিসবাহিনীর চন্দনচর্চিত হিংস্র সন্ধানী কুকুর — আর-একটা 'নেপোলিয়নীয় ধারণা'। পরের বার রোমের বিরুদ্ধে অভিযানটা হবে ফ্রান্সের ভিতরেই, কিন্তু শ্রীযুক্ত মঁতালাঁবের যেমনটা ভেবেছেন তার বিপরীত অর্থে।

শেষে, সমস্ত 'নেপোলিয়নীয় ধারণার' শীর্ষস্থানে রয়েছে **সৈন্যবাহিনীর** প্রাধান্য। সৈন্যবাহিনী ছিল মালিক কৃষকদের point d'honneur*; সৈন্যবাহিনীতে তো বীরমূর্তিতে রূপান্তরিত তারা নিজেরাই, বহির্বিশ্বের বিরুদ্ধে যারা তাদের নবলব্ধ সম্পত্তি রক্ষা করে, নবার্জিত জাতীয় সত্তাকে গৌরবমণ্ডিত করে, ভূভাগে লুণ্ঠন চালিয়ে সেখানে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সৈনিকের উর্দি তো ছিল তাদের সরকারী পোশাক, যুদ্ধ তাদের কাব্য, খুদে জোত-জমা কল্পনায় পরিবর্ধিত এবং নিটোল রূপ নিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের পিতৃভূমি; দেশপ্রেম ছিল মালিকানা চেতনার আদর্শরূপ। কিন্তু আজ

* সম্মানের বিষয়, বিশেষ গর্বের বস্তু। — সম্পাঃ

যে শত্রুদের হাত থেকে ফরাসী কৃষকদের সম্পত্তি রক্ষা করতে হয় তারা আর কসাক নয়, তারা হল huissiers* এবং কর আদায়কারী। খুদে জোত-জমার অবস্থিতি আর তথাকথিত পিতৃভূমিতে নয়, সেটার স্থান মর্টগেজের রেজিস্ট্রি খাতায়। সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত আর কৃষক নওজোয়ানের কুসুমদাম নয়, সেটা এখন কৃষক লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের এঁদো কচুরিপানা। এই ফৌজ এখন বহুলাংশে বদলি সৈনিক নিয়ে গড়া, ঠিক যেমন বোনাপার্ট নিজেই হলেন নেপোলিয়নের বদলি মাত্র। বর্তমানে তারা হরিণের পালের মতো কৃষকদের তাড়া ক'রে এবং সশস্ত্র পুলিসের কাজ ক'রে বীরকীর্তি জাহির করে, আর যদি কোনক্রমে ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারকে তাঁর নিজ ব্যবস্থার অন্তর্বিরোধের দরুন তাড়িত হয়ে ফরাসী সীমানা পার হতে হয়, তাহলে কিছুটা লুটপাটের পর তাঁর এই ফৌজের কপালে জুটবে জয়মাল্যের বদলে প্রহার।

দেখা যাচ্ছে: **সমস্ত** 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' হল অপরিণত **খুদে জোত-জমার তাজা তারুণ্যের ধারণা;** যে খুদে জোত-জমার দিন ফুরিয়ে গেছে সেটার বেলায় ধারণাগুলো উদ্ভট। এইসব ধারণা শুধু সেটার মৃত্যুযন্ত্রণার বিভ্রম, বুলিতে পরিণত কতকগুলো শব্দ মাত্র, এমন প্রেরণা যা রূপান্তরিত হয়েছে প্রেতাত্মায়। কিন্তু ফরাসী জাতির অধিকাংশকে সনাতন ঐতিহ্যের ভারমুক্ত করার জন্যে এবং রাষ্ট্রশক্তি আর সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধতাটাকে বিশুদ্ধ রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্যে সাম্রাজ্যের [des Imperialismus] এই প্যারডি প্রয়োজন ছিল। খুদে জোত-জমা ক্রমাগত ক্ষয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেটার উপরে স্থাপিত রাষ্ট্রসৌধটা ভেঙে পড়ছে। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রের যে কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন সেটা দেখা দিতে পারে শুধু সামন্ততন্ত্রের প্রতি বিপক্ষতা করে গড়া সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপরেই।**

---

* নাজিররা। — সম্পাঃ

** ১৮৫২ সালের সংস্করণে এই অনুচ্ছেদের শেষে নিচের পঙক্তিগুলি ছিল, ১৮৬৯ সালের সংস্করণে মার্কস সেগুলিকে বাদ দিয়েছিলেন: 'রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসের ফলে কেন্দ্রীকরণ বিপন্ন হবে না। যে কেন্দ্রীকরণ অদ্যাবধি সেটার বিপরীতটা দিয়ে, সামন্ততন্ত্র দিয়ে ক্লিষ্ট, আমলাতন্ত্র হল সেটারই হীন এবং বর্বর রূপমাত্র। 'নেপোলিয়নীয়

২০ আর ২১ ডিসেম্বরের যে সাধারণ নির্বাচন দ্বিতীয় বোনাপার্টকে সাইনাই পর্বতে* তুলে দিল বিধান পাবার জন্যে নয়, তা দিতে, সেটার ধাঁধার উত্তর যুগিয়ে দিচ্ছে ফরাসী কৃষকদের অবস্থা।

বোনাপার্টকে নির্বাচিত না করে বুর্জোয়া শ্রেণীর উপায় ছিল না সেটা স্পষ্টই। কনস্ট্যান্সের কাউন্সিলে (৬৮) পিউরিটানরা পোপদের বিরুদ্ধে লম্পট জীবনযাপনের অভিযোগ এনে নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কান্না জুড়ে দিলে কার্ডিনাল পিয়ের দ'আইয়ি বজ্রকণ্ঠে তাঁদের বলেছিলেন: 'ক্যাথলিক চার্চকে এখনও রক্ষা করতে পারে একমাত্র সশরীর শয়তান, আর আপনারা চাইছেন দেবদূত!' তেমনি, কুদেতার পরে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী বলে উঠল: একমাত্র ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারই এখনও বুর্জোয়া সমাজকে রক্ষা করতে পারে! একমাত্র চৌর্যই এখনও পারে সম্পত্তি রক্ষা করতে; একমাত্র ভণ্ডামিই — ধর্মকে; জারজবৃত্তি — পরিবারকে; বিশৃঙ্খলা — শৃঙ্খলাকে।

যেটা হয়ে উঠল একটা স্বতন্ত্র ক্ষমতা এমন নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বোনাপার্ট মনে করেন 'বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে' নিরাপদ করাই তাঁর কর্মব্রত। কিন্তু এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার শক্তি মধ্যশ্রেণীতে নিহিত। কাজেই তিনি নিজেকে মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিয়ে সেই মর্মে ডিক্রি জারি করতে থাকেন। তবে, তিনি একজন কেষ্টবিষ্টু সেটা সর্বত এই কারণে যে, তিনি এই মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন এবং নিয়ত চূর্ণ করছেন। কাজেই তিনি নিজেকে দেখেন মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক আর সাহিত্যিক শক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে। অথচ তাদের বৈষয়িক ক্ষমতা রক্ষা করে তিনি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার নবজন্ম দিচ্ছেন। তদনুসারে কারণকে জিইয়ে রাখতে

পুনঃস্থাপনায়' আশাভঙ্গ হলে ফরাসী কৃষক খুদে জোত-জমায় আস্থা হারাবে, এই খুদে জোত-জমার ভিত্তিতে গড়া সমগ্র রাষ্ট্রসৌধ ধূলিসাৎ হবে, আর **যে ঐকতান ছাড়া প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের একক সঙ্গীত কৃষিপ্রধান সমস্ত দেশে অন্তিম সঙ্গীতে পরিণত হয় সেই ঐকতান লাভ করবে ঐ বিপ্লব।**'

* সাইনাই পর্বত — বাইবেলের কথা অনুসারে পয়গম্বর মোসেস সাইনাই পর্বতে (সম্ভবত মিশরে সাইনাই উপদ্বীপে, কিন্তু শনাক্ত নয়) ঈশ্বরের কাছ থেকে বিধান পেয়েছিলেন। — সম্পাঃ

হবে, অথচ ক্রিয়াফল যেখানেই প্রকটিত হবে সেখানে সেটাকে খতম করতে হবে। কিন্তু কারণ আর ক্রিয়ার কিছুটা তালগোল না পাকিয়ে সেটাকে চালিয়ে দেওয়া যায় না, কেননা পারস্পরিক ক্রিয়ায় উভয়ের বিশেষত্ব লোপ পায়। সীমারেখাটা নিশ্চিহ্ন করার মতো নতুন ডিক্রি। যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে বোনাপার্ট নিজেকে মনে করেন কৃষকদের এবং সাধারণভাবে জনগণের প্রতিনিধি বলে, যিনি জনসমষ্টির নিম্নতন শ্রেণীগুলিকে সুখী করতে চান বুর্জোয়া সমাজের কাঠামের ভিতরেই। তাই নতুন নতুন ডিক্রি যাতে 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রীরা' (৬৯) আগেভাগেই তাদের রাষ্ট্রবিদ্যা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বোনাপার্ট নিজেকে দেখেন সর্বোপরি ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার হিসেবে, সেই লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি হিসেবে, যেটার অন্তর্ভুক্ত হলেন তিনি নিজে, তাঁর পার্শ্বচরগণ, সরকার এবং সৈন্যদল, যেটার প্রধান চিন্তা হল নিজ সুযোগ-সুবিধা এবং রাজকোষ থেকে কালিফোর্নিয়া লটারির পুরস্কার আহরণ। তাই তিনি ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার হিসেবে নিজ অবস্থিতি প্রতিষ্ঠিত করেন ডিক্রি মারফত, বিনা ডিক্রিতে এবং ডিক্রি সত্ত্বেও।

লোকটার করণীয় কাজগুলোর পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি থেকে আসছে তাঁর শাসনের মধ্যে অসংগতি, একটা বিহ্বল পথ হাতড়ানি, তাতে কখনও একটা শ্রেণীকে কখনও অন্য একটা শ্রেণীকে দলে টানা অথবা অবমাননা করা হয়, আর সমস্ত শ্রেণী একইভাবে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়; কর্মক্ষেত্রের এই অনিশ্চিত ভাবটা তাঁর সরকারী ডিক্রিগুলির উদ্ধত এবং চরম ধরনধারনের সঙ্গে খুবই হাস্যকর বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে —এই ধরনধারনটা হল তাঁর খুড়োমহাশয়ের অতি বিশ্বস্ত অনুকরণ।

শক্তিশালী সরকারের অধীনে তো শিল্প-বাণিজ্যের এবং তার থেকে মধ্যশ্রেণীর কাজ-কারবারের উন্নতি ঘটার কথা উষ্ণগৃহের ধাঁচে। রেলপথ নির্মাণের অসংখ্য পারমিট দান ঘটে। কিন্তু বোনাপার্টপন্থী লুম্পেন-প্রলেতারিয়েতের বাড়-বাড়ন্ত হওয়া চাই। যারা সন্ধান জানে তারা রেলপথের পারমিট নিয়ে ফটকবাজারে লুকন-ছাপান খেল চালিয়েছে। কিন্তু রেলপথের জন্যে পুঁজি আসছে না। রেলপথের শেয়ারের জন্যে অগ্রিম যোগানের বাধ্যবাধকতা চাপান হল ব্যাঙ্কের উপর। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংককেও

ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে, তাই সেটাকে মিষ্টি কথায় ভোলান চাই। সাপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশের দায় থেকে ব্যাঙ্ককে দেওয়া হল অব্যাহতি। সরকারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের একটা শ্বাপদ চুক্তি। লোকের কর্মসংস্থান করতে হবে। আরম্ভ হল পূর্তকার্য। কিন্তু পূর্তকার্যের ফলে জনগণের কর-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব বাড়ে। তাই করভার লাঘবের জন্যে লভ্যাংশজীবীদের উপর হামলা চালিয়ে, পাঁচ শতাংশ সুদের বন্ডকে সাড়ে-চার শতাংশ সুদের কাগজে পরিণত করে কর-হ্রাস। কিন্তু আর একবার শান্ত করার জন্যে বুর্জোয়াকে কিছু দেওয়া চাই। সুতরাং যারা খুচরা কেনে সেই জনগণের উপর মদ্য-কর দ্বিগুণ, আর যারা খায় পাইকারী হারে সেই মধ্যশ্রেণীর জন্যে সেই কর অর্ধেক করা হল। বাস্তবের শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি ভেঙে দেওয়া হল, কিন্তু ভবিষ্য তাজ্জব-তাজ্জব সঙ্ঘের প্রতিশ্রুতি তার সঙ্গে। কৃষকদের সাহায্য করতে হবে। তাই মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, যাতে তাদের ঋণগ্রহণ সহজ হয় এবং সম্পত্তির সমাহার ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু অর্লিয়ান্স পরিবারের বাজেয়াপ্ত ভূমিসম্পত্তি থেকে টাকা করার জন্যে এইসব ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করা চাই। কোন পুঁজিপতি এই শর্তে রাজী নয়, সরকারী ডিক্রিতেও তেমন কথা নেই, অতএব মর্টগেজ ব্যাঙ্ক নিছক ডিক্রিমাত্র থেকে যায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বোনাপার্ট সমস্ত শ্রেণীর পিতৃপ্রতিম হিতকারী রূপে প্রতীয়মান হবার ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু একটি শ্রেণীকে বঞ্চিত না করে অন্য কোন শ্রেণীকে কিছু দেওয়া তাঁর অসাধ্য। ফ্রোন্দের আমলে যেমন ডিউক অভ্ গিজ্ সম্বন্ধে বলা হত তিনি ফ্রান্সে সবচেয়ে দায়বান ব্যক্তি (obligeart), কারণ নিজের সমস্ত ভূমিসম্পত্তিকে তিনি তাঁর প্রতি নিজ পক্ষাবলম্বীদের দায়ে পরিণত করেন, ঠিক তেমন বোনাপার্টও ফ্রান্সে সবচেয়ে দায়বান ব্যক্তি হিসেবে ফ্রান্সের সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত শ্রমকে নিজের প্রতি ব্যক্তিগত দায়ে পরিণত করতে ব্যগ্র। তিনি গোটা ফ্রান্স চুরি করতে চান তা ফ্রান্সকেই উপহার দিতে পারার জন্যে, অথবা বলা ভাল, ফরাসী মুদ্রা দিয়ে ফ্রান্সকে নতুন করে কিনে নিতে পারার জন্যে, কারণ ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সামগ্রী তাঁকে কিনতেই হবে। যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সেনেট, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, বিধানিক সংস্থা, 'লিজিয়ন অভ্ অনার', সৈনিকদের পদক,

ঘোড়দৌড়খানা, পূর্তকর্ম, রেলপথ, সাধারণ সভ্যদের বাদ দিয়ে জাতীয় রক্ষিদলের জেনারেল স্টাফ এবং অর্লিয়ান্স রাজবংশের বাজেয়াপ্ত ভূমিসম্পত্তি — সবকিছুই হয়ে পড়েছে ক্রয়ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। সৈন্যবাহিনীর এবং সরকারী যন্ত্রের প্রতিটি পদ কেনাবেচার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সকেই তা দান করার জন্যে ফ্রান্স কেড়ে নেবার এই প্রক্রিয়ার সর্বপ্রধান দিকটা হল এই কারবারের সময়ে যে শতাংশটা পড়ে ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার এবং সভ্যদের পকেটে। শ্রীযুক্ত দ্য মর্নির রক্ষিতা কাউন্টেস ল. যে সরস মন্তব্যে অর্লিয়ান্সী ভূমিসম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বর্ণনা দিয়েছিলেন, **'C'est le premier vol* de l'aigle'** [এ হল ঈগলপাখির প্রথম ওড়া] সেই কথা এই ঈগলটির প্রতিটি উড্ডয়ন সম্পর্কে প্রযোজ্য, যদিও **দাঁড়কাকের** সঙ্গেই এ **ঈগলের** বেশি মিল। জনৈক কৃপণ ব্যক্তি যখন বড়াই করে তার দীর্ঘকাল জীবনযাপনের উপযোগী ধনের হিসাব করছিল তখন এক ইতালীয় কার্থুজেন সন্ন্যাসী তাকে যে ভাষায় তিরস্কার-উপদেশ দিয়েছিল সেইভাবেই বোনাপার্ট এবং তাঁর অনুগামীরা রোজ পরস্পরকে ডেকে বলছেন: 'Tu fai conto sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli anni'।** পাছে বছরের হিসাবে ভুল হয়, তাই তাঁরা হিসাব করেন মিনিটের। একদল হোঁজিপেঁজি ঢুকে পড়েছে রাজসভায়, মন্ত্রিদপ্তরগুলোয়, প্রশাসনিক সংস্থা আর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে, যে-দঙ্গলের সেরা লোকটি সম্পর্কে বলতে হবে, তার উৎপত্তি সবার অজানা। — সুলুকের হোমরা-চোমরাদের মতোই কিন্তুত সম্ভ্রান্তপনার চালে জরিদার কোর্তার মধ্যে কোনরকমে ঢুকে পড়েছে এই হুল্লোড়ে অশ্রদ্ধেয় লুঠেরা বোহেমা। এদের নীতি-প্রচারক হলেন ভেরোঁ-ক্রেভেল, আর গ্রানিয়ে দা কসানিয়াক এদের চিন্তাবীর, এটা বিবেচনা করলে ১০ ডিসেম্বর সমিতির উপরকার স্তরটার চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। গিজো তাঁর মন্ত্রিসভার আমলে যখন রাজবংশানুগামী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটা ওঁছা পত্রিকায় গ্রানিয়েকে ব্যবহার করতেন তখন তিনি তাকে নিয়ে বড়াই

---

* **Vol** অর্থে ওড়া এবং চুরি বোঝায়। [মার্কসের টীকা।]

** 'তুমি জিনিসপত্রের হিসাব করছ, আগে তোমার বাকি বছরগুলির হিসাব করা উচিত।' [মার্কসের টীকা।]

করতেন এই রসিকতা দিয়ে — 'C'est le roi des drôles', 'ও হল ভাঁড়দের রাজা'। লুই বোনাপার্টের দরবার এবং ঘোঁট প্রসঙ্গে রিজেন্সি (৭০) অথবা পঞ্চদশ লুই-কে স্মরণ করা ভুল হবে। কারণ 'ইতিপূর্বে বহুবার রক্ষিতাদের শাসনের অভিজ্ঞতা ফ্রান্সের হয়েছে, কিন্তু hommes intretenus*-দের শাসন আগে কখনও দেখা যায় নি।'**

নিজ অবস্থার পরস্পরবিরোধী চাহিদাগুলোর তাড়নায়, এবং তার সঙ্গে ভেলকিবাজের মতো ক্রমাগত চমক লাগিয়ে নেপোলিয়নের বদলি হিসেবে নিজের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার প্রয়োজনের তাগিদে, অর্থাৎ প্রতিদিন এক-একটা ছোটখাট কুদেতার কান্ড ঘটাবার প্রয়োজনের তাগিদে বোনাপার্ট সমগ্র বুর্জোয়া অর্থনীতিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পক্ষে যা অলঙ্ঘ্য মনে হয়েছিল তা সবই লঙ্ঘন করছেন, কিছু লোককে করছেন বিপ্লব সম্পর্কে সহিষ্ণু, আর কিছু লোককে বিপ্লবকামী করে তুলছেন, শৃঙ্খলার নামে বাস্তব অরাজকতা সৃষ্টি করছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের জ্যোতি ঘুচিয়ে সেটাকে কলুষিত করছেন, সেটাকে একাধারে ঘৃণা আর উপহাসের পাত্রে পরিণত করছেন। ট্রিভস-এর পবিত্র পরিচ্ছদ (৭১) পূজার অনুকরণে তিনি প্যারিসে নেপোলিয়নের সম্রাটবেশ পূজার আয়োজন করেছেন। কিন্তু অবশেষে যেদিন সম্রাটের রাজবেশে লুই বোনাপার্ট সজ্জিত হবেন সেদিন ভাঁদোম স্তম্ভের উপর থেকে নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা মাটিতে আছড়ে পড়বে।

ডিসেম্বর ১৮৫১ থেকে
মার্চ ১৮৫২-এর মধ্যে
মার্কসের লেখা
Die Revolution
পত্রিকায়
প্রকাশিত, নিউ ইয়র্ক,
১৮৫২

স্বাক্ষর: কার্ল মার্কস

১৮৬৯ সালের সংস্করণ
অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

* রক্ষিত পুরুষ। — সম্পাঃ

** উদ্ধৃত মন্তব্যটি শ্রীমতী দা জিরার্দাঁ-র। [মার্কসের টীকা।]

কার্ল মার্কস

'জনগণের সংবাদপত্রের' (৭২) বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা

১৮৪৮-এর তথাকথিত বিপ্লবগুলি হচ্ছে নগণ্য ঘটনামাত্র — এগুলি ছিল ইউরোপীয় সমাজের শক্ত আবরণে ছোটো ছোটো ভাঙ্গন ও ফাটল। অবশ্য তা পাতালের আভাস দিয়েছিল। সমাজের এই আপাত-কঠিন উপরিভাগের নিচে তরল বস্তু-সমুদ্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে তাতে, যা স্ফীত হয়ে উঠলেই উপরের প্রস্তর কঠিন মহাদেশগুলি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। বিভ্রান্তভাবে এবং হৈচৈ করে এই বিপ্লবগুলি ঘোষণা করল প্রলেতারিয়েতের মুক্তিবার্তা, যা হল উনিশ শতকের এবং সে শতকের বিপ্লবের গূঢ় কথা। অবশ্য, এই সামাজিক বিপ্লবটি ১৮৪৮ সালে উদ্ভাবিত কোন অভিনব সামগ্রী নয়। স্টীম, বিদ্যুৎ ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নাগরিক বার্বে, রাস্পাই এবং ব্লাঙ্কির চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক চরিত্রের বিপ্লবী। কিন্তু, যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা আছি তা যে প্রত্যেকের উপর ২০,০০০ পাউন্ড ওজনের চাপ দিচ্ছে, তা কি আপনারা অনুভব করেন? ১৮৪৮-এর পূর্বেকার ইউরোপীয় সমাজও অনুভব করে নি যে বৈপ্লবিক বায়ুমণ্ডল তাকে পরিবেষ্টিত করে চতুর্দিক থেকে তাকে চাপ দিচ্ছিল। আমাদের এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব হিসেবে একটি বিরাট সত্য রয়েছে, যাকে কোন পার্টিই অস্বীকার করতে সাহস পায় না। একদিকে শুরু হয়েছে এমন শিল্প ও বৈজ্ঞানিক শক্তি যা মানুষের পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোনো যুগেই কোনদিন কল্পনাও করা যায় নি। অপরদিকে দেখা দিল ক্ষয়ের লক্ষণ, যা রোম সাম্রাজ্যের শেষাংশে অনুষ্ঠিত লিপিবদ্ধ বিভীষিকাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের এ যুগে যেন সবকিছুর গর্ভেই তার বিপরীতের অস্তিত্ব। মানব-শ্রম লাঘবের ও তাকে

ফলবান করার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে যন্ত্র, সে যন্ত্রকে আমরা দেখছি মানুষকেই উপবাসী রাখছে, তাকে অতিরিক্ত খাটাচ্ছে। সম্পদের নতুন উদ্ভাবিত উৎসগুলি যেন কোন অদ্ভুত অপ্রাকৃত মায়ায় অভাবের কারণে পরিণত হচ্ছে। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের জয়যাত্রার মূল্য দিতে হচ্ছে যেন চরিত্রহীনতা দিয়ে। যে গতিতে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে, সেই গতিতেই যেন মানুষ অন্য মানুষের বা তার নিজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে। এমনকি, বিজ্ঞানের পবিত্র আলোকও যেন অজ্ঞতার কৃষ্ণ পটভূমিতে ছাড়া দীপ্তি পায় না। আমাদের সমস্ত আবিষ্কার ও প্রগতির ফল যেন দাঁড়াচ্ছে বৈষয়িক শক্তিসমূহকে মানসক্রিয়ায় ভূষিত করা এবং মানবজীবনকে বৈষয়িক শক্তির স্তরে নামিয়ে আনা। একদিকে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান এবং অপরদিকে বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা ও অবক্ষয়ের এই যে বিরোধ, আমাদের যুগে উৎপাদন-শক্তি ও সমাজ-সম্পর্কের মধ্যকার এই বিরোধ এমন এক সত্য যা জাজ্বল্যমান, সর্বগ্রাসী, অবিসংবাদী। কোন কোন পার্টি এর জন্যে বিলাপ করতে পারে; অন্যেরা হয়ত বর্তমান বিরোধের হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিল্পের হাত থেকেই মুক্তি চায়। অথবা তারা এমন কল্পনাও করতে পারে যে, শিল্পক্ষেত্রের এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাজনীতি ক্ষেত্রের একইরকম উল্লেখযোগ্য পশ্চাদগতি দিয়েই সম্পূর্ণ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে গেলে, এই সমস্ত বিরোধের মধ্যে যে সুচতুর চেতনার প্রকাশ বরাবর দেখা যাচ্ছে, তার রূপনির্ধারণে আমরা ভুল করি না। আমরা জানি, সমাজের এই নবোদিত শক্তিসমূহ যথোচিতভাবে কার্যকরী হবার জন্যে দরকার শুধু নবোদিত মানুষের কর্তৃত্ব, আর তেমন মানুষ হল শ্রমিক মানুষ। যন্ত্র যেমন আধুনিক যুগের আবিষ্কার, এরাও ঠিক তেমনই। বুর্জোয়া, অভিজাতবর্গ এবং পশ্চাদগতির শোচনীয় পয়গম্বরেরা যে সংকেত দেখে বিভ্রান্ত বোধ করে তারই মধ্যে আমরা চিনে নিই আমাদের সেই বীর বন্ধু রবিন গুডফেলো-কে, সেই বুড়ো ছুঁচোকে যে অতি দ্রুত মাটির মধ্যে কাজ করে, সেই যোগ্য পথিকৃৎ বিপ্লবকে। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের অগ্রজ সন্তান হচ্ছে ইংরেজ শ্রমিকেরা। তাই তারা নিশ্চয়ই সামাজিক বিপ্লবকে সাহায্য করতে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকবে না, যে সেই বিপ্লব জন্ম লাভ করছে এই শিল্প থেকেই; যে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাদেরই নিজস্ব শ্রেণীর মুক্তি; যে

বিপ্লব পর্ঁজির শাসন ও মজর্রি-শ্রমের দাসত্বের মতোই সর্বজনীন। আমি জানি, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কী বীরত্বপর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী চলেছে, যদিও বর্জোয়া ঐতিহাসিকের দ্বারা বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ও উপেক্ষিত হওয়ার দরুন সে সংগ্রামগর্লি অপেক্ষাকৃত কম গৌরব অর্জন করে নি। শাসক শ্রেণীর দর্ষ্কৃতির প্রতিশোধ নেবার জন্যে মধ্যযর্গে জার্মানিতে 'ভেমগেরিখট' (Vehmgericht) নামে একটি গর্প্ত বিচারমণ্ড ছিল। যদি কোন বাড়িতে লাল ক্রর্সচিহ্ন দেখা যেত তবে লোকে বর্ঝত যে, এই 'ভেম' (Vehm) সে বাড়ির মালিককে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আজ ইউরোপের প্রতিটি সৌধই রহস্যজনক সেই লাল-ক্রসে চিহ্নিত। ইতিহাস এখানে বিচারক, আর দণ্ডদাতা হল প্রলেতারিয়েত।

১৮৫৬ সালের ১৪
এপ্রিলে ইংরেজী ভাষায়
প্রদত্ত মার্কসের বক্তৃতা
The People's Paper
পত্রিকায়
১৯ এপ্রিল, ১৮৫৬
সালে প্রকাশিত

সংবাদপত্রটির মর্ল
পাঠ অনর্সারে মর্দ্রিত
ইংরেজী থেকে অনর্বাদ

কার্ল মার্কস

'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (৭৩) গ্রন্থের ভূমিকা

বুর্জোয়া অর্থনীতির মতবাদকে আমি বিচার করেছি নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে: **পুঁজি, ভূমিসম্পত্তি, মজুরি-শ্রম, রাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশ্ব-বাজার।** যে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ বিভক্ত, প্রথম তিনটি শিরোনামায় আমি সেই শ্রেণী-তিনটির জীবনের অর্থনৈতিক শর্ত সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি; বাকি তিনটি শিরোনামার মধ্যে যে একটা পারম্পরিক যোগাযোগ আছে সেটা একনজরেই প্রত্যক্ষ। প্রথম বইয়ের প্রথম অংশে, যাতে পুঁজি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলি আছে: ১। পণ্য, ২। মুদ্রা অথবা সরল সঞ্চালন, ৩। সাধারণ পুঁজি। প্রথম পরিচ্ছেদ দুটি হল বর্তমান অংশের বিষয়বস্তু। গোটা বিষয়টি আমার কাছে রয়েছে খণ্ড খণ্ড রচনা হিসেবে, এগুলি লেখা হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, দীর্ঘ ব্যবধানে, নিজের ধারণা স্পষ্ট করার জন্যে, প্রকাশনার জন্যে নয়। উপরিলিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলির সুসংবদ্ধ পরিব্যাখ্যান নির্ভর করবে বাইরেকার অবস্থার উপরে।

যে সাধারণ ভূমিকাটি (৭৪) আমি খসড়া করে রেখেছিলাম সেটি আমি বাদ দিচ্ছি; কেননা, আরও ভাল করে ভেবে দেখার পর আমার মনে হচ্ছে যে এখনও যেসব ফলাফল সপ্রমাণ হয় নি সেগুলি আগে থেকে অনুমান করে নেওয়া অস্বস্তিকর, আর তাছাড়া যে পাঠক মোটামুটিভাবে আমাকে অনুসরণ করতে চান তাঁকে বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে আরোহণের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। অন্যদিকে, অর্থশাস্ত্রের বিষয়ে আমার অধ্যয়নের ধারা সম্বন্ধে এখানে কিছু বললে হয়ত তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে।

আমি আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলাম, অবশ্য দর্শন ও ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে একটি গৌণ বিষয় হিসেবেই আমি তার চর্চা করতাম। ১৮৪২-১৮৪৩ সালে *Rheinische Zeitung* (৭৫) পত্রিকার সম্পাদকরূপে তথাকথিত বৈষয়িক স্বার্থের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার বিড়ম্বনা আমার এই প্রথম হল। কাঠচুরি ও ভূমিসম্পত্তির বিখণ্ডীকরণ সম্বন্ধে রাইন প্রাদেশিক সভায় *(Rheinisch Landtag)* কার্যবিবরণী; মোসেল অঞ্চলে কৃষকদের অবস্থা নিয়ে *Rheinische Zeitung*-এর বিরুদ্ধে রাইন প্রদেশের তদানীন্তন সর্বাধ্যক্ষ হের ফন শাপার কর্তৃক আরব্ধ সরকারী তর্কযুদ্ধ; এবং সর্বশেষে অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ শুল্ক বিষয়ক বিতর্কাবলী থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ে আমার মনোনিবেশ করার প্রথম সুযোগ আসে। অন্যদিকে, যে-সময় বিষয়ের জ্ঞানের চেয়ে 'এগিয়ে যাবার' সদিচ্ছা ছিল অনেক বেশি, সেই সময়ে *Rheinische Zeitung*-এ শোনা যেত ফরাসী সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দার্শনিকভাবে সামান্য ছোপলাগা প্রতিধ্বনি। এই অপেশাদারিপনার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়ালাম, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে *Allgemeine Augsburger Zeitung*-এর (৭৬) সঙ্গে এক বিতর্কে একথাও আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করেছিলাম যে, আমার পূর্বকার পড়াশুনা এমন নয় যাতে ফরাসী ঝোঁকগুলির অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে আমি সাহসী হতে পারি। বরঞ্চ, *Rheinische Zeitung*-এর পরিচালকরা যে মোহের বশবর্তী হয়ে ভাবছিলেন যে কাগজটিতে দুর্বলতর মনোভাব প্রকাশ করলে তার প্রতি প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের হাত এড়ানো যাবে, সাগ্রহে সেই মোহের সুযোগ নিয়ে আমি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে পাঠাগারে আশ্রয় নিলাম।

যে সন্দেহে আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম, তার সমাধানের জন্যে প্রথম যে কাজটি আমি হাতে নিলাম তা হল অধিকার সম্বন্ধে হেগেলীয় দর্শনের* সমালোচনামূলক পর্যালোচনা। এই লেখার ভূমিকাটি** মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৪৪-এ প্যারিসে প্রকাশিত *Deutsch-Französische Jahrbücher*

---

* ক. মার্কস, 'আইন সংক্রান্ত হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনায় অবদান'। — সম্পাঃ

** ঐ। 'ভূমিকা'। — সম্পাঃ

(৭৭) পত্রিকায়। আমার অনুসন্ধান থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে বিভিন্ন আইনগত সম্পর্কের তথা বিভিন্ন রাষ্ট্র রূপের অনুধাবন করতে হলে, সেই সম্পর্ক ও রূপ দেখেই বা মানব-মনের তথাকথিত সাধারণ বিকাশ দেখেই তা করা সম্ভব হয় না; এদের মূল রয়েছে বরং মানব-জীবনের বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে, যার সমস্তটাকে একত্র করে হেগেল আঠারো শতকের ইংরেজ ও ফরাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে নাম দিয়েছেন 'পৌরসমাজ' ('Civil Society'). কিন্তু এই পৌরসমাজের শারীর-সংস্থান খুঁজে বার করতে হবে আবার অর্থশাস্ত্রে। শেষোক্ত ব্যাপারে অধ্যয়ন আমি শুরু করি প্যারিসে, ও তারপর অনুসন্ধান চালিয়ে যাই ব্রাসেল্‌স্‌-এ; মসিয়ে গিজোর বহিষ্কার আদেশের ফলে সেখানেই আমাকে দেশান্তরিত হতে হয়। অনুসন্ধানের ফলে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছলাম, এবং ধরতে পারার পর থেকে যাকে আমি আমার অধ্যয়নের পথ-নির্দেশিকা সূত্র হিসেবে কাজে লাগিয়েছি, সংক্ষেপে তাকে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে: মানব-জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতগুলি অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন-সম্পর্কে, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার উপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি হয় তারই অনুরূপ। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের, অর্থাৎ, আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতদিন যে মালিকানা-সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে। তারপর শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরিকাঠামোও কম-বেশি দ্রুত

রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরগুলি বিচার করতে গেলে, উৎপাদনের অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির বৈষয়িক রূপান্তর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসুলভ সূক্ষ্মতার সঙ্গেই নিরূপণ করা যায় তা থেকে পৃথক করে দেখতে হবে আইনগত, রাজনীতিগত, ধর্মগত, নন্দনতত্ত্বগত বা দর্শনগত, সংক্ষেপে বলতে গেলে ভাবাদর্শগত রূপগুলিকে, যার মাধ্যমে মানুষ এ সংঘাত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও লড়াই করে তার নিষ্পত্তি করে। যেমন ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নির্ভর করে না সে ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে তার উপর, তেমনি কোনো রূপান্তরের সময়কালকে সে যুগের স্বকীয় চেতনা দিয়ে আমরা বিচার করতে পারি না; বিপরীতপক্ষে, সেই চেতনাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের বিরোধিতা দিয়ে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যকার সংঘর্ষ দিয়ে। কোন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যতটা উৎপাদন-শক্তির স্থান হতে পারে তার সমস্ত কিছুর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে সামাজিক ব্যবস্থার কখনও বিলুপ্তি ঘটে না; আর নতুন উন্নততর উৎপাদন-সম্পর্কের আবির্ভাবও আসতে পারে না যতক্ষণ না পুরনো সমাজের গর্ভের মধ্যেই তেমন সম্পর্কের অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত পরিপক্ক হয়ে উঠছে। সুতরাং মানবজাতি সর্বদা সেই কর্তব্যেই প্রবৃত্ত হয় যার সমাধান সম্ভব; কেননা, বিষয়টির প্রতি আরও গভীর দৃষ্টি দিলে সর্বদাই দেখা যাবে যে, কর্তব্যটাই দেখা দেয় শুধু তখন যখন তা সমাধানের বৈষয়িক শর্তগুলো ইতিমধ্যেই বর্তমান কিংবা অন্তত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ রূপরেখা হিসেবে এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক রূপগঠনের ক্রমাগ্রসর পর্যায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, ব্যক্তিমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের বৈষয়িক অবস্থাও সৃষ্টি করে। সুতরাং, এই সমাজ-গঠন তাই মানব-সমাজের প্রাক-ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটাচ্ছে।

অর্থনীতিক সংজ্ঞা-বিভাগের* (economic categories) সমালোচনা প্রসঙ্গে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের চমৎকার স্কেচটি (*Deutsch-Französische Jahrbücher* পত্রিকায়) প্রকাশের পর থেকে পত্রালাপের মাধ্যমে আমি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ভাব-বিনিময় রক্ষা করেছি, তিনিও অন্য পথ দিয়ে (তাঁর 'The Condition of the Working Class in England' মিলিয়ে দেখুন) আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলেন। তাই ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে যখন তিনিও ব্রাসেল্‌স্‌-এ এসে বসবাস করতে লাগলেন, তখন আমরা স্থির করলাম যে, জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেব। আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনারূপে।** অকটাভো-আকারের দুই বৃহৎ খণ্ডে এই পাণ্ডুলিপিটি ওয়েস্টফালিয়ায় প্রকাশকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার অনেকদিন পরে আমরা খবর পেলাম যে, পরিবর্তিত অবস্থার দরুন লেখাটির মুদ্রণ সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিটিকে মূষিকের দন্তুর সমালোচনার কবলেই ছেড়ে দেওয়া গেল সাগ্রহেই কারণ আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য, নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করা, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সে সময়ে যেসব বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্য দিয়ে, কখনও একদিক থেকে, কখনও-বা আর একদিক থেকে, আমাদের মতামত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছিলাম, তার মধ্যে আমি শুধু উল্লেখ করব এঙ্গেলস ও আমার মিলিত লেখা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'*** ও মৎ-প্রকাশিত 'অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা' ('Discours sur le libr échange')। শুধুমাত্র তর্কযুদ্ধ হলেও সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের মতামতের চূড়ান্ত বিষয়গুলির ইঙ্গিত দেওয়া হল ১৮৪৭-এ প্রকাশিত এবং প্রুধোঁর বিরুদ্ধে লিখিত আমার 'দর্শনের দারিদ্র্য' ('Misère de la Philosophie') গ্রন্থে। 'মজুরি-শ্রমের'****

* **F. Engels, 'Outlines of a Critique of Political Economy'.** — সম্পাঃ

** ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলস, 'জার্মান ভাবাদর্শ'। — সম্পাঃ

*** ১ম খণ্ডের পৃঃ ১৪১-১৮১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

**** ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৭-৪৮ দ্রঃ। — সম্পাঃ

বিষয়ে জার্মান ভাষায় লিখিত যে নিবন্ধটিতে আমি ব্রুসেল্‌স্‌ জার্মান শ্রমিক সমিতিতে (৭৮) প্রদত্ত উক্ত বিষয়ে আমার বক্তৃতাবলি সন্নিবিষ্ট করেছি, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও তৎকারণে বেলজিয়ম থেকে আমার জবরদস্তি অপসারণের ফলে তার মুদ্রণ ব্যাহত হয়েছিল।

১৮৪৮-এ ও ১৮৪৯-এ *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকার (৭৯) সম্পাদনা ও পরবর্তী ঘটনাসমূহের ফলে আমার অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক গবেষণায় বাধা হয়। আবার আমি তা শুরু করতে পারি কেবল ১৮৫০-এ লন্ডনে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত যে বিপুল মালমসলা পুঞ্জীভূত রয়েছে, বুর্জোয়া সমাজ পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে লন্ডনে যে সুবিধা আছে, এবং সর্বশেষে কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের যে নব পর্যায়ে বুর্জোয়া সমাজের যেন প্রবেশ ঘটল তাতে করে স্থির করতে হল যে একেবারে গোড়া থেকে আবার শুরু করব, নতুন মালমসলা নিয়ে কাজ চালাব বিচার করে। অংশত এই চর্চাই আমাকে এমন সমস্ত বিষয়ে নিয়ে ফেলল, যেগুলি বাহ্যত বহুদূরবর্তী বিষয় আর তার জন্যে আমাকে কম বেশি সময় ব্যয় করতে হয়েছে। অবশ্য, আমার হাতে যে সময় ছিল তা বিশেষ করে কমে গিয়েছিল রুজি উপার্জনের অনিবার্য প্রয়োজনের চাপে। আজ আট বৎসর ধরে প্রথম ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্র *New York Tribune*-এ (৮০) আমি যেসব প্রবন্ধ লিখে আসছি তার জন্যে আমার অধ্যয়ন অসম্ভব রকম বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়; কারণ ঠিক কাগুজে সাংবাদিকতা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকি খুব ব্যতিরেকী ক্ষেত্রেই। যাই হোক, ইংলন্ড ও ইউরোপ মহাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ঘটনাবলি বিষয়ে প্রবন্ধগুলি ছিল আমার প্রেরিত লেখার এত বেশি অংশ যে, প্রকৃত অর্থশাস্ত্রের পরিধির বাইরেও অনেক ব্যবহারিক খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত হতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।

অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমার গবেষণা ধারার এই রূপরেখাটি উপস্থিত করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই দেখানো যে আমার মতামত সম্পর্কে যাই ভাবা হোক ও শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থবদ্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে তার যত কম মিলই থাকুক না কেন, তা বহুবর্ষব্যাপী সবিবেকী অনুসন্ধানের ফল। কিন্তু, বিজ্ঞানের

প্রবেশ-দ্বারে নরকের প্রবেশ-দ্বারের মতোই এই দাবি নিশ্চয়ই লিখিত থাকা দরকার:

> 'Qui si convien lasciare ogni sospetto;
> Ogni viltà convien che qui sia morta.'*

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, জানুয়ারি, ১৮৫৯

'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' মার্কসের এই গ্রন্থে মুদ্রিত, বার্লিন, ১৮৫৯

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

* এখানে ছাড়তে হবে সকল অবিশ্বাস;
এখানে ধ্বংস হবে সমস্ত ভীরু ভাবনার।'
(দান্তে, 'ডিভাইন কমেডি')। — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'

প্রথম সংস্করণ, বার্লিন, ফ্রানট্স ডুঙ্কের, ১৮৫৯ (৮১)

১

বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে জার্মানরা যে অন্যান্য সভ্য জাতিগুলির সমপর্যায়ে, এমনকি অধিকাংশ বিষয়ে উন্নততর পর্যায়ে উঠেছে, বহুদিন আগেই তার পরিচয় তারা দিয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞানের অগ্রবর্তীদের মধ্যে কোন জার্মানকে পাওয়া যেত না, সে বিজ্ঞান হল অর্থশাস্ত্র। এর কারণ সুস্পষ্ট। অর্থশাস্ত্র হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ, সুতরাং, তার পূর্ব শর্ত হল বিকশিত বুর্জোয়া ব্যবস্থার অস্তিত্ব। কিন্তু জার্মানিতে, ধর্ম-সংস্কার (৮২) যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কৃষক সমরগুলির পরে, বিশেষত ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পর (৮৩), কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও তেমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে নি। জার্মান সাম্রাজ্য থেকে হল্যান্ড বেরিয়ে যাবার ফলে (৮৪) জার্মানি বাধ্য হয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের আওতার বাইরে পড়ে যায় ও গোড়া থেকেই তার শিল্প বিকাশ ন্যূনতম আকারে নেমে আসে। আর জার্মানরা যখন অতি ধীরে ও অতি পরিশ্রমে গৃহযুদ্ধের ধ্বংস থেকে নিজেদের পুনরুদ্ধার করছিল, প্রতিটি ক্ষুদে রাজা ও সাম্রাজ্যের ব্যারনরা তাদের প্রজাদের শিল্পের উপর যে শুল্ক বেষ্টনী ও নির্বোধ বাণিজ্যবিধি আরোপ করত তার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামে যখন জার্মানদের যে নাগরিক শক্তি কোনদিনই খুব বেশি ছিল না তার সমস্তটুকুকেই তারা ক্ষয় করে ফেলছিল, যখন সরাসরি সম্রাটের অধীন শহরগুলি তাদের গিল্ডসুলভ গোঁড়ামি ও প্যাট্রিশিয়ানসুলভ বিধিব্যবস্থা সমেত ক্ষয় পাচ্ছিল, সেই সময় বিশ্ব বাণিজ্যের নেতৃস্থানীয় অবস্থানগুলি অধিকার করে বসল হল্যান্ড, ইংলন্ড ও ফ্রান্স; উপনিবেশের পর উপনিবেশ স্থাপন করতে লাগল তারা, হস্তশিল্প-

কারখানাকে উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে বিকশিত করল, এবং শেষ পর্যন্ত যে স্টীমশক্তি সবেমাত্র ইংলন্ডের কয়লা ও লৌহ আকরকে মূল্যবান করে তুলতে শুরু করেছিল তার কল্যাণে ইংলন্ড আধুনিক বুর্জোয়া বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে ফেলল। মধ্যযুগের যেসব হাস্যকর প্রাচীন জের ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জার্মানির বৈষয়িক বুর্জোয়া বিকাশকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে যতদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে ততদিন অবশ্য কোন জার্মান অর্থশাস্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র শুল্ক-ইউনিয়ন (৮৫) প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানেরা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছল যাতে তারা অর্থশাস্ত্রের বিষয়টা অন্তত বুঝতে পারল। বস্তুত এই সময় থেকেই জার্মান বুর্জোয়াদের উপকারার্থে বৃটিশ ও ফরাসী অর্থশাস্ত্রের আমদানি শুরু হয়। অনতিবিলম্বে বিদগ্ধমন্ডলী ও আমলাতন্ত্রীরা এসে এই আমদানী বস্তুটি দখল করে নিয়ে এমন কায়দায় তাকে গড়ে তুলল যা 'জার্মান ভাবধারার' দিক থেকে মোটেই গৌরবজনক নয়। রচনাকার্যের অনধিকার চর্চায় যেসব উচ্চ শ্রেণীর প্রতারক, বণিক, শিক্ষক ও আমলা এসে জড়ো হল তাদের পাঁচমিশালী দঙ্গল থেকে উদ্ভব হয় এক জার্মান অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্য, নীরসতা, অগভীরতা, চিন্তাশূন্যতা, বাগবাহুল্য এবং চুরি বিদ্যার দিক দিয়ে যার সঙ্গে শুধু জার্মান উপন্যাসেরই তুলনা চলে। ব্যবহারিক বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রথমে শিল্পপতিদের সংরক্ষণ-নীতিবাদী গোষ্ঠীটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের প্রামাণিক মুখপাত্র লিস্ট, এখনও পর্যন্ত জার্মান বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, -- যদিও তাঁর গৌরবমণ্ডিত রচনা সমস্তটাই হচ্ছে মহাদেশীয় পদ্ধতির (৮৬) তত্ত্বগত প্রবর্তক ফরাসী ফেরিয়ে থেকে নকল করা। এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে পঞ্চম দশকে বল্টিক প্রদেশসমূহের বণিকদের অবাধ-বাণিজ্যমতবাদী দলের উদ্ভব হয়; এরা শিশুসুলভ অথচ স্বার্থপ্রণোদিত বিশ্বাস নিয়ে ইংরেজ অবাধ-বাণিজ্যবাদীদেরই (৮৭) যুক্তিগুলি প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। সর্বশেষে, বিষয়টির তত্ত্বগত দিক নিয়ে যাদের কাজ করতে হয়েছিল সেই শিক্ষক ও আমলাদের মধ্যে দেখা গেল হের রাউ-এর মতো শুষ্ক, দোষগুণ বিচার-অক্ষম ওষধি-সংগ্রাহকদের, অনায়ত্ত হেগেলীয় ভাষায় বিদেশী প্রকল্পসমূহের তর্জমাকারী হের স্টাইনের মতো জল্পনাবাজ পণ্ডিতমূর্খদের, অথবা হের রিল-এর মতো 'সাংস্কৃতিক-

ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের সাহিত্যিক উঞ্ছজীবীদের। এসবের শেষ পরিণতি হল ক্যামেরালিস্টিকস্ (Cameralistics) (৮৮) বিদ্যা। এটি হল নানা রকম অবান্তর পদার্থে পূর্ণ খিচুড়ি বিশেষ, তার সঙ্গে যেন একলেকটিক অর্থশাস্ত্রের একটু চাটনি ছিটানো। সে জ্ঞানটা রাষ্ট্র-নিযুক্ত একজন আইন স্কুল স্নাতকের পক্ষে রাষ্ট্র পর্ষদের শেষ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হবার দিক দিয়ে কাজে লাগবে।

এইভাবে যখন জার্মানির বুর্জোয়া শ্রেণী, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং আমলাতন্ত্র বৃটিশ-ফরাসী অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক কথাগুলিকে অখন্ডনীয় আপ্তবাক্য হিসেবে কণ্ঠস্থ ও সে বিষয়ে কিছু পরিমাণ স্পষ্ট ধারণা করার জন্যে পরিশ্রম করে চলেছে, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হল জার্মান প্রলেতারীয় পার্টি। এই পার্টির সামগ্রিক তত্ত্বগত ভিত্তিটাই এসেছে অর্থশাস্ত্রের বিচার থেকে; এবং ঠিক এই পার্টির আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকেই বিজ্ঞানসম্মত স্বাধীন **জার্মান অর্থশাস্ত্রের** উদয় হয়। এই জার্মান অর্থশাস্ত্র মূলত প্রতিষ্ঠিত **ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার** ভিত্তির উপর, যার মূল দিকগুলি উপরোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে।* এই ভূমিকার প্রধান প্রধান কথাগুলি *Das Volk* পত্রিকায় (৮৯) ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হয়েছে এবং সেইজন্যেই ভূমিকাটির কথা উল্লেখ করলাম। শুধু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ইতিহাসগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই (প্রকৃতি-বিজ্ঞান বাদ দিলে সব বিজ্ঞানই হল ইতিহাসগত বিজ্ঞান) এক বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার হল এই প্রতিজ্ঞা যে, 'বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে'; ইতিহাসে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের, যেসব ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থার, যেসব তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হয়, তা সমস্ত কিছু অনুধাবন করতে হলে আগে সেই যুগের মানুষের বৈষয়িক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সেই বৈষয়িক অবস্থা থেকেই এদের উৎপত্তি। 'মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে।' সূত্রটি এত সহজ-সরল যে, ভাববাদী মোহে আচ্ছন্ন নয়

* এই খন্ডের পৃঃ ১৩৭-১৪৩ দ্রঃ। — সম্পাঃ

এরকম যে কোন ব্যক্তির কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে। কিন্তু বিরাট বৈপ্লবিক পরিণাম এর মধ্যে নিহিত, শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়েও: 'সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে, অর্থাৎ আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতদিন যে মালিকানা-সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃংখলে। তারপর শুরু হয় **সামাজিক বিপ্লবের** এক যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরিকাঠামোও কম বেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়... বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, ব্যক্তিমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের বৈষয়িক শর্তাবলীও সৃষ্টি করে।'* আমাদের এই বস্তুবাদী থিসিস যদি আরও এগিয়ে নিই ও বর্তমানের অবস্থায় এর প্রয়োগ করি, তাহলে এক বিরাট বিপ্লবের, বস্তুত সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতটাই আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

আরও গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখলে কিন্তু অবিলম্বে উপলব্ধি হবে যে, মানুষের চেতনা তার সত্তার উপর নির্ভরশীল, তার উল্টোটা নয়, এই আপাত সরল সূত্রটি অবিলম্বেই এবং তার প্রথম পরিণতিতেই সমস্ত ভাববাদের, এমনকি সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন ভাববাদেরও প্রত্যক্ষ বিরোধী। সকল ঐতিহাসিক ব্যাপারে সমস্ত রকম ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি নাকচ হয়ে পড়ে তাতে। রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের সমস্ত চিরাচরিত পদ্ধতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়; এহেন নীতিবিগর্হিত ধারণার বিরুদ্ধে সক্রোধ সংগ্রামে নামে দেশপ্রেমিক মহাত্মাপনা। সুতরাং, দৃষ্টিভঙ্গির এই নতুন পদ্ধতির সঙ্গে শুধু যে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদেরই অনিবার্য সংঘাত লাগল তা নয়; মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব এই যাদুমন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে চায় যে গোটা ফরাসী

* এই খণ্ডের পৃঃ ১০৯-১৪১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

সমাজতন্ত্রী মহল, সংঘাত লাগে তাদেরও সঙ্গে। তবে জার্মানির ইতর-গণতন্ত্রবাদী হৈচৈকারীদের মধ্যেই তা সবচেয়ে প্রবল ক্রোধের উদ্রেক করল। তাহলেও তারা সাগ্রহেই এই নতুন চিন্তাকে চুরি করে নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, যদিও অসাধারণ ভুল বুঝে।

ঐতিহাসিক একটিমাত্র দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী ধারণার বিকাশ ঘটানো এমন এক বৈজ্ঞানিক কীর্তি যার জন্যে বছরের পর বছর নির্বিঘ্ন অনুশীলন দরকার; কেননা, এ কথা তো সহজবোধ্য যে, এক্ষেত্রে কেবল বুলি দিয়ে কাজ হবে না। এ কাজ সম্পন্ন করা যায় শুধু রাশীকৃত ঐতিহাসিক মালমসলাকে সবিচারে বাছাই করে, পরিপূর্ণ আয়ত্ত করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আমাদের পার্টিকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিল এবং ফলে তার পক্ষে নিছক বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য অনুসরণ করে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তাসত্ত্বেও মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি পার্টি-রচিত সমস্ত সাহিত্যের মধ্যেই একটি অন্তর্লীন সূত্রের মতোই গ্রথিত আছে। এই সমস্ত লেখাতেই প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বিষয়কে উপলক্ষ্য করে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিক্ষেত্রেই কর্মোদ্যমের উদ্ভব হয়েছে সরাসরি বৈষয়িক প্রণোদনা থেকেই, সংশ্লিষ্ট বাক্যাবলী থেকে নয়; দেখানো হয়েছে যেমন রাজনৈতিক কর্মোদ্যম ও তার ফলাফল তেমনই রাজনৈতিক ও আইনগত বাক্যাবলীও বরং বৈষয়িক প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত।

১৮৪৮-১৮৪৯-এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর এমন একটা সময় এল যখন বাহির থেকে জার্মানিকে প্রভাবিত করা ক্রমশই বেশি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের পার্টি তখন প্রবাসী কোন্দলের ক্ষেত্রটা — কেননা, সেটাই তখন একমাত্র সম্ভাব্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল -- ছেড়ে দেয় ইতর-গণতন্ত্রবাদীদের হাতে। শেষোক্তরা যখন প্রাণভরে ঘোঁট পাকিয়ে চলল, একদিন ঝগড়া-বিবাদ করে পরের দিন মিটমাট করতে লাগল, এবং তার পরের দিন আবার নিজেদের ভেতরকার কেলেঙ্কারির প্রকাশ্য প্রচার চালাচ্ছিল; যখন সমগ্র আমেরিকা জুড়ে ইতর-গণতন্ত্রবাদীরা ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াচ্ছিল শুধু জুটানো পয়সাকটি নিয়ে পরের মুহূর্তেই গণ্ডগোল পাকাতে, সেই সময়টা আমাদের পার্টি ফের খানিকটা অধ্যয়নের অবসর পেয়ে খুশিই হয়। তার খুব বড় একটা সুবিধা এই যে, তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

পার্টির আয়ত্তে ছিল; তাকে সংরচিত করে তোলার কাজেই পার্টিকে পুরোপুরি ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্তত এই এক কারণেই দেশান্তরীদের মধ্যকার 'মহৎ ব্যক্তিদের' মতো অধঃপতন আমাদের পার্টির পক্ষে কখনও সম্ভব হয় নি।

সেই অধ্যয়নের প্রথম ফল হল আলোচ্য গ্রন্থখানি।

২

আমাদের সামনে যে গ্রন্থটি রয়েছে তার ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র থেকে নেওয়া স্বতন্ত্র কতগুলি পরিচ্ছেদের শুধুমাত্র একটা অসংবদ্ধ সমালোচনার অথবা কোন কোন বিতর্কমূলক অর্থতত্ত্বগত প্রশ্নের বিচ্ছিন্ন আলোচনার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বরং শুরু থেকেই গ্রন্থটির রচনা-বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে অর্থশাস্ত্রের সমগ্র বিষয়টিকে একটা প্রণালীবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায়, যাতে বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া বিনিময়ের নিয়মগুলির একটা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিকাশ দেখানো যায়। যেহেতু অর্থতত্ত্ববিদরা এইসব নিয়মের ব্যাখ্যাকার বা পক্ষসমর্থনকারী ছাড়া আর কিছুই নন, সেইজন্যে বিকাশের চিত্রটি একইসঙ্গে সমগ্র অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায়।

কোন বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ পরস্পর-সংযোগের ভিত্তিতে বিকশিত করার চেষ্টা হেগেলের মৃত্যুর পর থেকে আর হয় নি বললেই হয়। হেগেলের সরকারী শিষ্যসম্প্রদায় গুরুর দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি থেকে সবচেয়ে সহজ কৌশলটির কায়দা শুধু আয়ত্ত করে নেয়; সে কায়দা যে কোন বিষয়ের উপর, এবং প্রায়ই হাস্যকর অপটুভাবে তারা প্রয়োগ করতে থাকে। এই গোষ্ঠীর কাছে হেগেলের সমগ্র উত্তরাধিকারটি সীমিত হয়ে পড়ল শুধুমাত্র একটি ছকে, যার সাহায্যে যে কোন প্রশ্ন তারা উদ্ভাবন করতে লাগল, সীমিত হয়ে পড়ল কতগুলি শব্দ ও বাক্য-রীতির সংকলনে, — চিন্তা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবের ক্ষেত্রে সময় মত হাতের কাছে পাওয়া ছাড়া যার আর কোন উদ্দেশ্য রইল না। এর ফলে, বন্‌-এর জনৈক অধ্যাপকের কথায় বলতে গেলে, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, এই সমস্ত হেগেলপন্থীরা কোন বিষয় কিছুই বুঝত না, অথচ সব বিষয়ে লিখতে পারত। বাস্তবিকই তাদের কাজের প্রকৃতি এইরকমই হয়ে

উঠেছিল। এদিকে তাদের দম্ভ সত্ত্বেও এই ভদ্রলোকেরা নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে, বড় সমস্যা থেকে তাঁরা যতদূর সম্ভব তফাৎ থাকতেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচীন পণ্ডিতী বিজ্ঞানের প্রাধান্যটাই বজায় রইল; যখন ফয়েরবাখ অনুমানভিত্তিক প্রত্যয়কে অচল বলে ঘোষণা করলেন, তখনই মাত্র হেগেলবাদ ধীরে ধীরে হল নিদ্রামগ্ন; মনে হতে লাগল যেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার নতুন করে প্রাচীন অধিবিদ্যার ও তার অনড় সংজ্ঞাগুলির রাজত্ব শুরু হয়েছে।

ব্যাপারটির একটা স্বাভাবিক কারণ ছিল। নিছক বাক্য-বিন্যাসে হেগেলবাদী দিয়াদোচির (৯০) (Diadochi) রাজত্বের পরিসমাপ্তি হবার পর স্বভাবতই যে-যুগটি এল, তাতে বিজ্ঞানের ইতিবাচক অন্তর্বস্তুটি তার বাহ্যরূপের চেয়ে আবার বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে এক অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে জার্মানি ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রকৃতিবিজ্ঞানসমূহের মধ্যে, যা ছিল ১৮৪৮-এর পরেকার শক্তিশালী বুর্জোয়া বিকাশের সহগামী। এবং এই যেসব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে জল্পনা-প্রবণতা কখনই বিশেষ গুরুত্বলাভ করতে পারে নি, সেগুলি ফ্যাশন হয়ে পড়ার ফলে প্রাচীন অধিবিদ্যক কায়দায় চিন্তাপ্রণালীর, এমনকি ভল্‌ফ-এর চূড়ান্ত রকমের অসার মামুলিয়ানারও পুনরাবির্ভাব দেখা দেয়। হেগেল বিস্মৃতির অতলে গেলেন, এবং গড়ে উঠল নতুন প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, তত্ত্বগত দিক দিয়ে এই বস্তুবাদের সঙ্গে আঠারো শতকের বস্তুবাদের কোন প্রভেদ নেই; এর সুবিধাটা প্রধানত ছিল এই যে এর হাতে ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞানের, বিশেষত রসায়ন ও শারীরবৃত্তের সমৃদ্ধতর মালমসলা। বুখনার ও ফগ্‌ট-এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই কাণ্ট-পূর্বযুগের সংকীর্ণ-চিত্ত অর্বাচীন চিন্তাপ্রণালীর পুনঃপ্রকাশ, যার মধ্যে অতি-তুচ্ছ অসারতাও বাদ পড়ে না। এমনকি, যে মলেশট ফয়েরবাখের নামে শপথ নেন তিনি পর্যন্ত অতি হাস্যকর ভাবে বারবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন সরলতম সংজ্ঞার মধ্যে। অন্তর্বস্তু ও বাহ্যরূপের নধ্যকার, কারণ ও ফলাফলের মধ্যকার খাদের সামনে এসে বুর্জোয়া সাংসারিক বোধের গেঁতো ছ্যাকরা ঘোড়া স্বভাবতই থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু অমূর্ত চিন্তার জংলী জমির উপর দিয়ে ফুর্তি করে শিকার-যাত্রা করতে হলে ছ্যাকরা ঘোড়ায় না চাপাই উচিত।

সুতরাং এখানে এমন আর একটি সমস্যার সমাধান দরকার যার সঙ্গে নিছক অর্থশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানকে কীভাবে বিকশিত করতে হবে? একদিকে ছিল হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, যাকে হেগেল এক সম্পূর্ণ অমূর্ত ও 'জল্পনামূলক' রূপে রেখে গিয়েছিলেন; অপরদিকে রইল সাধারণ এবং মূলত ভল্‌ফ-নির্দিষ্ট আধিবিদ্যক পদ্ধতি, যা পুনরায় একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং যে-পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদেরও বৃহদায়তন অসংলগ্ন গ্রন্থখণ্ডসমূহ। শেষোক্ত পদ্ধতিটিকে কাণ্ট এবং বিশেষ করে হেগেল তত্ত্বগতভাবে এমন করে বিধ্বস্ত করেছিলেন যে, শুধুমাত্র আলস্যবশে এবং অন্য একটা সহজ বিকল্প পদ্ধতির অভাবের দরুন এই পদ্ধতিটির ব্যবহার অব্যাহত থাকাটা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে, হেগেলীয় পদ্ধতিটি তার লব্ধ রূপে একেবারেই অব্যবহার্য। সে পদ্ধতি ছিল মূলত ভাববাদী, অথচ আগেকার সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশি বস্তুবাদী এক বিশ্ব-দৃষ্টি বিকাশের সমস্যাটাই তখন প্রশ্ন। সে পদ্ধতি শুরু হত বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে, অথচ এক্ষেত্রে শুরু করা চাই কঠোর বাস্তব তথ্য থেকে। নিজস্ব স্বীকৃতি অনুযায়ীই যে পদ্ধতি 'শূন্য থেকে শূন্যের মাধ্যমে শূন্যেতে পৌঁছিয়ে এসেছে' (৯১), সে পদ্ধতি সেই আকারে এক্ষেত্রে কোনক্রমেই উপযোগী নয়। তবুও যুক্তিবিদ্যার সমস্ত মালমসলার মধ্যে শুধুমাত্র একেই অন্তত আরম্ভ-বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এর সমালোচনাও হয় নি, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াও হয় নি। এই মহান দ্বান্দ্বিকতত্ত্ববিদের যারা বিরোধী তাদের কোন একজন ব্যক্তিও তাঁর চিন্তার গৌরবজনক কাঠামোর মধ্যে কোন ভাঙ্গন ধরাতে পারে নি; সে চিন্তা শুধু বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গিয়েছিল, কারণ তাকে নিয়ে কী করতে হবে তার সামান্যতম ধারণাও হেগেলপন্থী গোষ্ঠীর ছিল না। সুতরাং, সর্বোপরি দরকার হয়েছিল হেগেলীয় পদ্ধতিকেই একটা আমূল সমালোচনার লক্ষ্যীভূত করা।

অন্যান্য সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তাপদ্ধতি থেকে হেগেলের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য তার প্রচণ্ড ইতিহাস বোধে, এর ওপরেই তার ভিত্তি। গঠনরূপের দিক থেকে এ পদ্ধতি যদিও অমূর্ত ও ভাববাদী, তবু তার চিন্তাবিকাশ ধারাটি সর্বদাই চলেছে বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশধারার সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং এই শেষোক্তকে ধরা হত আসলে কেবল প্রথমের কষ্ঠিপাথর হিসেবে।

তাতে করে যদিও আসল সম্পর্কটি উল্টে দিয়ে মাথার ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল, তাহলেও দর্শনের মধ্যে আসল সারবস্তু প্রতি পদেই প্রবেশলাভ করেছে, আরও বেশি করেছে কারণ হেগেল তাঁর শিষ্যদের মতো অজ্ঞতা জাহির করেন নি, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অন্যতম। ইতিহাসের মধ্যে যে একটা ক্রমবিকাশ, একটা অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আছে তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাবার চেষ্টা করেন; এবং তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত দর্শনের অনেক কিছুই আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গির মহিমা আজও শ্রদ্ধেয়, সেটা তাঁর পূর্বগামীদের সঙ্গে, অথবা বিশেষ করে তাঁর সময়কালের পর থেকে ইতিহাস নিয়ে সাধারণ ভাবনা করেছেন এরকম যে-কারুর সঙ্গেই তাঁর তুলনা করি না কেন। তাঁর 'চেতনাবাদ', 'নন্দনতত্ত্ব', 'ইতিহাসের দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই তাঁর এই অপূর্ব ইতিহাসবোধের প্রাধান্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুকে তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসগতভাবে, ইতিহাসের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট, যদিও বিমূর্ত বিকৃত অন্তঃসম্পর্কে।

ইতিহাস সম্বন্ধে এই যুগান্তকারী ধারণাই হল নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ তত্ত্বগত ভিত্তি এবং যুক্তি পদ্ধতির জন্যেও একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল এই থেকেই। যেহেতু, এমনকি 'বিশুদ্ধ চিন্তার' দিক দিয়ে দেখলেও, এই বিস্মৃতপ্রায় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব থেকে যে এমন ফল পাওয়া গিয়েছে, এবং অধিকন্তু, এত সহজে যে পূর্বগামী সমস্ত যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার নিকাশ করেছে, তাতে এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, আর যাই হোক, এর মধ্যে কূটতর্ক (Sophistry) ও চুলচেরা ব্যাপার-স্যাপারের চেয়ে বড় জিনিস ছিল। কিন্তু পদ্ধতির সমালোচনা সহজ ব্যাপার ছিল না, সমস্ত সরকারী দর্শন তা এড়িয়ে গিয়েছে এবং এখনও এড়িয়ে যাচ্ছে।

যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে হেগেলের যা আসল আবিষ্কার হেগেলীয় যুক্তিবিদ্যা থেকে সেই অন্তর্বস্তুটিকে উদ্ধার করে, ভাববাদী আবরণ থেকে মুক্ত করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে সেই সহজ আকারে পুনর্গঠিত করা যাতে তা চিন্তা বিকাশের একমাত্র যথার্থ রূপ হয়ে দাঁড়ায় — এ কর্তব্য যে একটি মাত্র লোক গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন মার্কস এবং আজও তিনিই একক। যে-পদ্ধতিটি অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে মার্কসের সমালোচনার ভিত্তিভূমিস্বরূপ,

তার সংরচনের কাজটাকে আমরা খোদ মূল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটার চেয়ে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ফল বলে মনে করি না।

এই যে-পদ্ধতি আমরা পেলুম সেই পদ্ধতি অনুসারেও, অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা করা যেত দুভাবে: ইতিহাসগতভাবে অথবা যুক্তিগতভাবে। যেহেতু ইতিহাসে এবং তার সাহিত্যিক প্রতিফলনেও, সমগ্রভাবে বিকাশের ধারাটি অত্যন্ত সহজ সম্পর্ক থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল সম্পর্কের দিকে এগিয়ে চলে, সেইহেতু অর্থশাস্ত্রের সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেও এমন একটি স্বাভাবিক নির্দেশক সূত্র পাওয়া গেল যার সঙ্গে সমালোচনাকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক সংজ্ঞা বিভাগগুলিও সামগ্রিকভাবে ঠিক যুক্তিগত বিকাশের মতোই একই অনুক্রমে প্রতিভাত হয়। এই ধরনটির বাহ্যিক সুবিধা হচ্ছে এই যে, এটা অধিকতর স্বচ্ছ, কেননা, প্রকৃতই এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে **বাস্তব** বিকাশটাকেই, কিন্তু আসলে এর ফলে সেটা দাঁড়াত বড়জোর একটা জনবোধ্য প্রণালী। অনেক সময় ইতিহাস এগিয়ে চলে লাফ দিয়ে ও আঁকাবাঁকা পথে; এবং এতে প্রত্যেক স্থলেই ইতিহাসকেই অনুসরণ করে যেতে হত। তার ফলে শুধু যে অনেক গৌণ গুরুত্বের মালমসলা অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হত তাই নয়, ভাবনাধারাও অনেক ব্যাহত হত। অধিকন্তু, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাস না লিখে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস লেখা যায় না এবং তার ফলে কর্তব্যটা অপরিসীম হয়ে দাঁড়ায়, কেননা এর জন্যে যে প্রাথমিক কাজ দরকার তার কিছুই করা হয় নি। সুতরাং, আলোচনায় যুক্তিগত বিশ্লেষণই দাঁড়ায় একমাত্র উপযোগী পদ্ধতি। কিন্তু বস্তুত এই পদ্ধতি ইতিহাসগত বিচার ছাড়া আর কিছু নয়, শুধু তার ঐতিহাসিক আকার ও আপতিক বিক্ষেপগুলিকে বর্জন করা হয়েছে। যা দিয়ে এ ইতিহাসের শুরু, চিন্তা-শৃঙ্খলের শুরুও হবে সেই একই জিনিস থেকে, আর চিন্তার পরবর্তী ধারাটিও হবে আর কিছুই নয়, ইতিহাসের ধারারই অমূর্ত এবং তত্ত্বের দিক থেকে সুসঙ্গত আকারের একটি প্রতিফলন; সংশোধিত প্রতিফলন, কিন্তু সেই নিয়মেই সংশোধিত, যে নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে ইতিহাসেরই প্রকৃত ধারা থেকে, যাতে প্রত্যেক উপাদানকে তার পরিপূর্ণ পরিপক্কতার বিকাশ মুহূর্তে, তার চিরায়তরূপে বিবেচনা করতে পারা যায়।

এই পদ্ধতিতে আমরা শুরু করি সেই সর্বপ্রথম ও সহজতম সম্পর্কটি

থেকে, যা ইতিহাসগতভাবে ও কার্যক্ষেত্রে আমাদের সামনে দেখা দেয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তা হল সর্বপ্রথম পাওয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি। কিন্তু এটি যেহেতু একটা **সম্পর্ক**, সেইহেতু এর দুটি দিক আছে যা **পরস্পর সংশ্লিষ্ট।** প্রত্যেকটি দিককে আলাদাভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়, তা থেকে তাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় গিয়ে পেশছাই। বিরোধ দেখা যাবে যার সমাধান দরকার। কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে শুধুমাত্র আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত কোন অমূর্ত চিন্তাপ্রণালীকে বিচার করছি না, বিচার করছি বিশেষ সময়ে সংঘটিত অথবা এখনও সংঘটমান এক প্রকৃত ঘটনা-প্রবাহকে, সেইহেতু এই বিরোধগুলোও নিশ্চয় বাস্তবরূপে দেখা দিয়ে থাকবে এবং সেগুলির সম্ভবত সমাধানও মিলে থাকবে৷ সে সমাধানের প্রকৃতি অনুসরণ করে গিয়ে আমরা দেখতে পাব যে তা সম্পন্ন হয়েছে একটি নতুন সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার মধ্যে; সে সম্পর্কের দুই বিপরীত দিককে আবার আমাদের বিকশিত করে তুলতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্রের শুরু হচ্ছে **পণ্য দিয়ে**, এর শুরু উৎপন্ন দ্রব্যের পরস্পরের বিনিময় আরম্ভের মুহূর্ত থেকে, তা সে বিনিময় ব্যক্তিবিশেষ অথবা আদিম গোষ্ঠী যারাই করুক না কেন। বিনিময়ের মধ্যে যে-দ্রব্যটি এসে পড়ছে সেটাই হল পণ্য। পণ্য হল অবশ্য একমাত্র এই কারণেই যে, **বস্তুতে,** উৎপন্ন দ্রব্যে এসে যুক্ত হচ্ছে দুটি মানুষের বা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যকার **সম্পর্ক**, উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যেকার সম্পর্ক, যারা এক্ষেত্রে আর একই ব্যক্তিতে মিলিত নয়। এ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত পাই, যা সমগ্র অর্থশাস্ত্রের মধ্যে প্রবাহিত এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মনে যা প্রচন্ড বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে: অর্থশাস্ত্রের বিচার্য বস্তু নয় মানুষে মানুষে সম্পর্ক, এবং শেষ পর্যন্ত শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক; অথচ এই সম্পর্ক সর্বদাই **বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বস্তুরূপেই প্রতিভাত হয়।** বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন অর্থনীতিবিদের কাছে এই অন্তঃসম্পর্কের আভাস ধরা পড়েছে সত্য, কিন্তু এটা যে সমগ্র অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন মার্কস; এর ফলে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নগুলিকেও তিনি এত সহজ ও

স্বচ্ছ করে দিলেন যে, এখন এমনকি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও তা আয়ত্ত করতে পারবে।

এখন যদি আমরা পণ্যের বিভিন্ন দিকের বিচার করি, দুই আদিম গোষ্ঠীর মধ্যকার আদিম দ্রব্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম অতি কষ্টে যে-পণ্য গড়ে উঠেছিল সে-হিসেবে নয়, পণ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তাকে যদি বিচার করি, তাহলে ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা আমাদের কাছে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসে পড়ি অর্থতত্ত্বগত বিতর্কের ক্ষেত্রে। মধ্যযুগীয় যানবাহনের তুলনায় রেলওয়ে যতটা উন্নত, বর্তমান রূপে সংরচিত জার্মান দ্বান্দ্বিক তত্ত্বও যে প্রাচীন অগভীর অতিভাষী আধিবিদ্যক পদ্ধতির তুলনায় অন্তত ততটা উন্নত, তার উজ্জ্বল উদাহরণ পেতে চাইলে অ্যাডাম স্মিথ বা খ্যাতনামা অন্য কোন সরকারী অর্থতাত্ত্বিকের লেখা পড়ে দেখুন, বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য এই ভদ্রলোকদের কাছে কী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল, এদুটি জিনিসকে যথাযুক্ত পৃথক করে রাখা ও স্বকীয় নির্দিষ্টতায় আলাদা আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেকটিকে অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষে হয়েছিল কত কঠিন; তারপর এর সঙ্গে মার্কসের লেখার স্বচ্ছ ও সহজ ব্যাখ্যার তুলনা করে দেখুন।

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের ব্যাখ্যা করার পর পণ্যকে উপস্থিত করা হয়েছে এই দুই মূল্যের আশু ঐক্যের রূপ হিসাবে, **বিনিময়-প্রণালীতে** এইরূপেই পণ্যের আবির্ভাব হয়। এর ফলে কী কী বিরোধ দেখা দেয় তা পরে জানতে পারা যাবে ২০ ও ২১ পৃষ্ঠা* পড়লে। আমরা শুধু এটুকু উল্লেখ করি যে এই বিরোধগুলির তাৎপর্য শুধু তত্ত্বগত ও অমূর্ত ক্ষেত্রেই নয়; সেইসঙ্গে এগুলি সাক্ষাৎ বিনিময়-সম্পর্কের, সরল দ্রব্য-বিনিময়-সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্য থেকে উদ্ভূত অসুবিধাও প্রতিফলিত করছে; যে-অসম্ভাব্যতার মধ্যে বিনিময়ের এই প্রথম স্থূল রূপটির অবসান হতে বাধ্য, তাকে প্রতিফলিত করছে। সেই অসম্ভাব্যতাগুলির সমাধান হচ্ছে এই ঘটনায় যে, সমস্ত পণ্যেরই বিনিময়-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করার ধর্মটি স্থানান্তরিত হল একটি বিশেষ পণ্যের মধ্যে — **মুদ্রায়**। মুদ্রা, অথবা সরল সঞ্চলন সম্বন্ধে তারপর ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, যথা: ১। **মূল্যের পরিমাপ** হিসেবে মুদ্রা,

* ক. মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'। — সম্পাঃ

এই প্রসঙ্গে মুদ্রায় মাপা মূল্য, অর্থাৎ **দামের** সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; ২। **সঞ্চলনের মাধ্যম** হিসেবে ও ৩। এই দুই সংজ্ঞার ঐক্য **আসল মুদ্রা** হিসেবে, বৈষয়িক বুর্জোয়া সম্পদের প্রতীক স্বরূপ মুদ্রা। এতেই প্রথম খণ্ডের শেষ হয়েছে। মুদ্রা কী করে পুঁজিতে পরিণত হল, তা রাখা হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে।

দেখা গেল যে, এই পদ্ধতিতে যুক্তিবিদ্যাসম্মত ধারা কোনক্রমেই নিছক অমূর্ত ক্ষেত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়। বিপরীতপক্ষে, এই পদ্ধতির জন্যে প্রয়োজন হয় ইতিহাস থেকে উদাহরণ এবং বাস্তবের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ। তাই তেমন প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে বিপুল বৈচিত্র্যে, যথা সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাসের প্রকৃত ধারাটির এবং অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের উভয়েরই নজির দেওয়া হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিষ্কার সংজ্ঞা-নির্ধারণ গোড়া থেকেই অনুসৃত হয়েছে। তাই এক-একটা নির্দিষ্ট, কম-বেশি একতরফা বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাগুলির সমালোচনা যুক্তিগত বিকাশ ধারার মধ্যেই মূলত দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, ও তাদের সংক্ষেপে সূত্রাকারে উপস্থিত করাও সম্ভব।

তৃতীয় প্রবন্ধে খাস গ্রন্থটির অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব।

১৮৫৯-এর অগস্টের
প্রথমার্ধে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

৬ ও ২০ অগস্ট, ১৮৫৯
তারিখের *Das Volk*
সংবাদপত্রে ১৪ ও ১৬ নং
সংখ্যায় প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জর্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

পত্রাবলি

ইয়ো. ভেইডেমেয়ার সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ৫ মার্চ, ১৮৫২

...এখন আমার প্রসঙ্গ ধরলে, বর্তমান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আবিষ্কারের, বা তাদের মধ্যে সংগ্রাম আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার নয়। আমার বহুপূর্বে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক শারীরস্থান বর্ণনা করেছেন। আমি নতুন যা করেছি তা হচ্ছে এইটে প্রমাণ করা যে, ১) **উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের** সঙ্গেই শুধু **শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব** জড়িত; ২) শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপেই **প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে** পৌঁছয়; ৩) এই একনায়কত্বটাও হল **সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি** ও একটি **শ্রেণীহীন সমাজে** উত্তরণ মাত্র...

১৯৩৩ সালে *Jungsozialistische Blätter* পত্রিকায় পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

পাণ্ডুলিপির পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

এঙ্গেলস সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১৬ এপ্রিল, ১৮৫৬

... *People's Paper* পত্রিকাখানির বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত পরশু একটি ছোটোখাটো ভোজসভা হয়েছিল। এবার আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করি, কেননা মনে হয়েছিল এটা সময়োপযোগী হবে, গ্রহণ করি আরও এইজন্যে যে, দেশান্তরীদের মধ্যে **একমাত্র** আমিই ছিলাম আমন্ত্রিত (পত্রিকায় তাই ঘোষণা করা হয়), প্রথম স্বাস্থ্যপান প্রস্তাবও জোটে আমার ভাগ্যেই; ঠিক হয়েছিল সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সার্বভৌমতা নিয়ে আমাকে বলতে হবে। অতএব, ইংরেজীতে ছোটো একটি বক্তৃতা করেছিলাম, যা ছাপাতে আমি চাই না।* আমার মনে মনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা সিদ্ধ হয়েছিল। যাকে আড়াই শিলিং দিয়ে টিকিট কিনতে হয়েছিল সেই শ্রী তলাঁদিয়ে এবং ফরাসী ও অন্যান্য দেশান্তরী দঙ্গলের বাকী সকলেই সুনিশ্চিত হয়েছে যে, আমরাই হচ্ছি চার্টিস্টদের একমাত্র 'অন্তরঙ্গ' মিত্র এবং যদিও আমরা প্রকাশ্যে জাহির করি না এবং চার্টিজমের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে দহরমমহরমটা ফরাসীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি, তবু যে স্থানটি ঐতিহাসিকভাবে আমাদের প্রাপ্য সে স্থানটি যে কোন সময় আবার আমরা দখল করতে পারি। এবং সেটা আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এইজন্যে যে, পিয়া-র সভাপতিত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারীর সভায় **শেরটসার** নামক সেই বুড়ো জার্মান গর্দভটা এগিয়ে এসে মারাত্মক গিল্ড সংকীর্ণতায় জার্মান 'পণ্ডিতদের' ও 'বুদ্ধিজীবী কর্মীদের' চুটিয়ে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে, যারা তাদের (গর্দভদের) গাছে তুলে দিয়ে সরে পড়েছে এবং অন্যান্য জাতির সামনে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করতে তাদের

---

* এই খণ্ডের পৃঃ ১৩৪-১৩৬ দ্রঃ। — সম্পাঃ

বাধ্য করেছে। প্যারিসে থাকার সময় থেকেই তো এই শেরটসারকে তুমি জানো। বন্ধু শাপারের সঙ্গে আরও কয়েকবার আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, দেখেছি সে অত্যন্ত অনুতপ্ত পাপী। গত দুই বছর ধরে সে যে অবসর গ্রহণ করে আছে তাতে মনে হয় যেন তার মানসিক শক্তির বাহার বেড়েছে। বুঝতেই পারছ, যে কোন বিপদ আপদে এই লোকটিকে হাতে রাখা এবং বিশেষ করে ভিলিখের কবল থেকে বাইরে রাখা সব সময়ই ভাল। শাপার এখন উইন্ডমিল্ স্ট্রীটের (৯২) গর্দভদের প্রতি রেগে লাল হয়ে আছে।

স্টেফেনের কাছে লেখা তোমার চিঠিখানি আমি পেঁছিয়ে দেব। লেভির চিঠিখানা ওখানে নিজের কাছে রেখে দেওয়া তোমার উচিত ছিল। যেগুলি আমার কাছে ফেরত পাঠাতে বলব না, সেই চিঠিগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কাজটি করবে। চিঠিগুলি যত কম ডাকে দেওয়া হয় ততই ভাল। রাইন প্রদেশ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, ভবিষ্যতে এমন কিছু দেখছি যা থেকে 'পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার' গন্ধ পাওয়া যায়। পুরাতন বিপ্লবে মাইন্‌ট্‌স ক্লাবিস্টদের (৯৩) যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থায় পড়তে আমরা বাধ্য হই কিনা তা বহুলাংশ নির্ভর করছে বার্লিনের ঘটনাবলি কী রূপ নেবে তার উপর। ব্যাপার তাহলে আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। রাইনের অপর পারের আমাদের সুযোগ্য বন্ধুদের সম্পর্কে তো আমরা কম ওয়াকিবহাল নই! কৃষকযুদ্ধের এক ধরনের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সহায়তা করার উপর জার্মানিতে সবকিছু নির্ভর করবে। তাহলে চমৎকার ব্যাপার হবে...

১৯২৯ সালে
ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলসের
রচনাবলির ২২ খণ্ডের
প্রথম সংস্করণে রুশ ভাষায়
সম্পূর্ণ প্রকাশিত

শ্রুতলিপি পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

এঙ্গেলস সমীপে মার্কস

[লণ্ডন,] ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭

...তোমার 'ফৌজ' চমৎকার হয়েছে। শুধু এর আয়তন দেখে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কারণ, এতখানি পরিশ্রম করা তোমার পক্ষে খুব ক্ষতিকর। যদি জানতাম যে রাত্রি জেগে কাজ করতে শুরু করবে, তাহলে বরং ব্যাপারটা ঝুলোয় দিতেই রাজী হতাম।

উৎপাদন-শক্তি ও সমাজ-সম্পর্কের সংযোগ সম্পর্কিত আমাদের ধারণার নির্ভুলতা ফৌজের ইতিহাস থেকে যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর কিছু থেকে তত নয়। সাধারণভাবে, অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে ফৌজ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ফৌজের মধ্যেই প্রাচীনেরা সর্বপ্রথম একটি পুরাপুরি মজুরি-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অনুরূপভাবে, রোমকদের মধ্যে peculium castrense* ছিল প্রথম আইনী রূপ, যাতে অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিবারের পিতা ছাড়া অন্যদের অধিকারও স্বীকৃত হয়। Fabri** কর্পোরেশানের মধ্যে গিল্ড ব্যবস্থাও প্রথম দেখা দেয়। এখানেও দেখি যন্ত্রপাতির প্রথম ব্যাপক ব্যবহার। এমনকি ধাতুর বিশেষ মূল্য এবং মুদ্রারূপে তাদের ব্যবহারের ভিত্তিটার গুরুত্ব গোড়াতে সম্ভবত ছিল সামরিক — গ্রিমের প্রস্তরযুগ শেষ হবামাত্রই। একটি শাখার মধ্যে শ্রমবিভাগও সর্বপ্রথম ফৌজেই ঘটে। বুর্জোয়া সমাজের রূপগুলির সমগ্র ইতিহাসটি এখানে আশ্চর্য স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। যদি কোনদিন সময় পাও, তবে এই দিক থেকে সমস্যাটা নিয়ে কাজ করো।

---

* ফৌজী শিবিরের সম্পত্তি। — সম্পাঃ

** ফৌজের সঙ্গে সংযুক্ত কারুশিল্পীরা। — সম্পাঃ

আমার মতে তোমার বিবরণীতে মাত্র এই কয়টি বিষয় বাদ পড়েছে: ১) প্রথম আসল ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বৃহদাকারে ও তৎক্ষণাৎ আবির্ভাব কার্থিজীয়দের মধ্যে (আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে কার্থিজীয় ফৌজ সম্পর্কে বার্লিনের এক ভদ্রলোকের লেখা (৯৪) একখানি বই পড়ে দেখব। বইখানির কথা আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি)। ২) পঞ্চদশ শতকে এবং ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম দিকে ইতালিতে ফৌজ ব্যবস্থার বিকাশ। রণকৌশলগত ধূর্ততা সেখানেই বেরিয়েছিল। কনডোটিয়েরেরা (৯৫) পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করত মেকিয়াভেলি তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাসে তার যে বর্ণনা দিয়েছেন (জিনিসটা তোমার জন্যে নকল করে পাঠাব) তা অত্যন্ত কৌতুককর। (না, যখন ব্রাইটনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব — কবে? — তখন মেকিয়াভেলির বইখানি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাস এক অপূর্ব সৃষ্টি।) এবং সর্বশেষে ৩) এশীয় সামরিক ব্যবস্থা, যা প্রথমে পারসিকদের মধ্যে এবং পরে নানাভাবে পরিবর্তিত আকারে মোগল, তুর্কী ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে...

১৯১৩ সালে, স্টুটগার্টে
'Der Briefwechsel
zwischen F. Engels
und K. Marx'
বইয়ের ২ খণ্ডে প্রকাশিত

হস্তলিপির পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

টীকা

(১) ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালে ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ঘটনাবলির বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেখা এই **'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'** হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্কসীয় রচনাগুলিরই একটি। শ্রেণী-সংগ্রাম এবং প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের তত্ত্ব, রাষ্ট্র এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব — ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই সমস্ত বুনিয়াদী নীতির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যান মার্কস দিয়েছেন এই রচনায়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতি প্রলেতারিয়েতের মনোভাব সম্বন্ধে মার্কসের সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। তিনি বলেছেন, 'প্রতিটি বিপ্লবই এই যন্ত্রটিকে চূর্ণ না করে আরও নিখুঁতই করেছে' (এই বইয়ে ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। লেনিন বলেছেন, এটা হল রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপস্থাপনা।

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস আগামী বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে কৃষককুল সংক্রান্ত প্রশ্নের বিশ্লেষণ চালিয়ে গেছেন, সমাজ-জীবনে বিভিন্ন রাজনীতিক পার্টির ভূমিকা তুলে ধরেছেন, আর খুলে ধরেছেন বোনাপার্টবাদের বিশেষত্বগুলোর স্বরূপ। পৃঃ ৭

(২) **ভাঁদোম স্তম্ভ** প্যারিসে স্থাপিত হয় ১৮০৬ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে — নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের বিজয়গুলির উদ্দেশে শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে; শত্রুর যেসব কামান হস্তগত হয়েছিল সেগুলো থেকে নেওয়া ব্রঞ্জ দিয়ে নির্মিত এই স্তম্ভের মাথায় ছিল নেপোলিয়নের প্রতিমূর্তি। ১৮৭১ সালে ১৬ মে প্যারিস কমিউনের নির্দেশে স্তম্ভটাকে ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সেটাকে পুনঃস্থাপন করে ১৮৭৫ সালে। পৃঃ ৮

(৩) J.C.L. Simonde de Sismondi. 'Etudes sur l'economie politique'. T. I. Paris, 1837, p. 35. পৃঃ ৯

(৪) **১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর** — ফ্রান্সে লুই বোনাপার্ট এবং তাঁর সমর্থকদের প্রতিবৈপ্লবিক কুদেতার দিন। পৃঃ ১০

(৫) **রেনেসাঁস** — পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উদ্ভবের ফলে পশ্চিম আর মধ্য ইউরোপের কিছু দেশে সাংস্কৃতিক এবং ভাবাদর্শগত বিকাশ ঘটে। এই সময়ে শিল্প এবং বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ঘটে; প্রাচীন জগতের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগে (এ থেকেই এই কালের নাম)। পৃঃ ১০

(৬) দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র ছিল ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ১১

(৭) **১৭৯৩-১৭৯৫ সালের 'পর্বত'** — অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে কনভেনশনের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক উপদল।

১৮৪৮-১৮৫১ সালের মধ্যে ফ্রান্সের সংবিধান আর বিধান-সভায় একটি পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক উপদলের আখ্যা হল **'পর্বত'**। পৃঃ ১২

(৮) **ব্রুমেয়ার** — ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক পঞ্জিকায় একটা মাসের নাম। আঠারোই ব্রুমেয়ার (৯ নভেম্বর), ১৭৯৯ — এই দিনে সংঘটিত কুদেতার ফলে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক একনায়কত্ব কায়েম হয়। 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের দ্বিতীয় সংস্করণ' বলতে মার্কস বোঝাচ্ছেন ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা।

পৃঃ ১২

(৯) **বেড্‌লাম্‌** — ইংলণ্ডে একটা পাগলাগারদ। পৃঃ ১৪

(১০) ১৮৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর গণভোটে লুই বোনাপার্ট ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পৃঃ ১৫

(১১) **'মিশরের মাংসের হাঁড়ির জন্যে আপসোস'** কথাটা নেওয়া হয়েছে বাইবেলের একটা কাহিনী থেকে; তাতে আছে, মিশর থেকে ইহুদীদের ব্যাপক প্রস্থানের সময়ে তাদের মধ্যে কিছুটা ভীরু লোকেরা আপসোস করে বলত, পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে তখনকার ক্লেশস্বীকার করার চেয়ে মিশরে মাংসের ভেগের ধারে বসে মরাই ছিল ভাল। পৃঃ ১৫

(১২) **ফেব্রুয়ারি বিপ্লব** — ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারির দিনের বিপ্লব, তাতে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের ঘোষণা হয়। পৃঃ ১৫

(১৩) Hic Rhodus, hic salta! (এই তো রোড্‌স্‌, এখানে লাফ দাও!) — কথাটা নেওয়া হয়েছে একজন চালিয়াত সম্বন্ধে ঈশপের একটা উপাখ্যান থেকে, সে বলেছিল একবার সে রোড্‌স্‌-এ একটা অসাধারণ লাফ দিয়েছিল, তার জন্যে সে সাক্ষী-সাবুদ হাজির করতে পারে, তার জবাবে বলা হয়েছিল, 'কথাটা সত্যি হলে

সাক্ষী-সাবুদের কথা কেন? এই তো রোড্স্, এখানে লাফ দাও!' অর্থাৎ কিনা, 'কী করতে পারো তা দেখিয়ে দাও এই এখানেই!'

এই তো গোলাপফুল, এখানে নৃত্য করো! — আগেকার উক্তিটির শব্দান্তরিত বয়ান (রোড্স্ একটা দ্বীপের নাম, গ্রীক ভাষায় শব্দটার আর একটা অর্থ 'গোলাপফুল')। কথাটাকে হেগেল ব্যবহার করেন তাঁর 'Grundlinied der Philosophie des Rechts' ('অধিকার সংক্রান্ত দর্শনের মূলনীতিসমূহ')-এর ভূমিকায়। পৃঃ ১৬

(১৪) ১৮৪৮ সালের ফরাসী সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হত চার বছর অন্তর-অন্তর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে লুই বোনাপার্টের মেয়াদ ফুরিয়েছিল ১৮৫২ সালের মে মাসে। পৃঃ ১৭

(১৫) **চিলিয়াস্টরা** (গ্রীক শব্দ 'চিলিয়াস' থেকে, শব্দটার অর্থ — হাজার) — খ্রীষ্ট দ্বিতীয় বার আবির্ভূত হবেন, প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর 'সহস্র বছরের রাজত্বের স্বর্ণযুগ', তখন হবে ন্যায়, বিশ্বজনীন সমতা আর সমৃদ্ধির চূড়ান্ত বিজয়, এই মর্মে একটা অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মমতের প্রচারকেরা। পৃঃ ১৭

(১৬) In partibus infidelium (চলিত অর্থে — 'অধর্মীদের দেশে') — অখ্রীষ্টীয় দেশে নিছক নামে-মাত্র ডায়োসিস-এ নিযুক্ত ক্যাথলিক বিশপের উপাধিতে একটা অতিরিক্ত সংযোজন। কোনো দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করে বিদেশে গঠিত প্রবাসী সরকারের আখ্যা হিসেবে মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের বিভিন্ন রচনায় কথাটা বারবার ব্যবহার করেছেন। পৃঃ ১৭

(১৭) **ক্যাপিটোল** — রোম্-এ একটা টিলার নাম, একটা সুরক্ষিত নগরদুর্গ — সেখানে গড়া হয়েছিল জুপিটার, জুনো এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দির। একটা উপাখ্যানে আছে, ৩৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গলদের একটা আক্রমণ থেকে রোম্ রক্ষা পেয়েছিল শুধু জুনোর মন্দির থেকে হাঁসগুলোর প্যাঁকপ্যাঁকানির কল্যাণে, — ক্যাপিটোলে ঘুমন্ত রক্ষীরা জেগে উঠেছিল সেই আওয়াজের দরুন। পৃঃ ১৭

(১৮) তথাকথিত 'আফ্রিকানেরা' বা 'আলজেরীয়দের' সম্বন্ধে উল্লেখ। স্বাধীনতার সংগ্রামরত উপজাতির বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে যে ফরাসী জেনারেল এবং অফিসাররা নিজেদের কর্মজীবন গড়ে তোলে তাদের নাম। সংবিধান-সভায় আফ্রিকার জেনারেলরা কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়েরে আর বেদো প্রজাতন্ত্রীদের উপদলের নেতৃত্বে দাঁড়িয়েছিলেন। পৃঃ ১৭

(১৯) **রাজবংশবিরোধী তরফ** — জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে ফরাসী প্রতিনিধিদের কক্ষে অদিলোঁ বারোর নেতৃত্বে একটি দল। শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের উদারনৈতিক

বুর্জোয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে নরমপন্থী নির্বাচন সংস্কারের জন্যে তারা দাঁড়িয়েছিল, কেননা সেই সংস্কারে তারা দেখেছিল বিপ্লবের বিরোধিতা করা এবং অর্লিয়ান্সবংশ বজায় রাখার উপকরণ। পৃঃ ১৯

(২০) **জুলাই রাজতন্ত্র** — লুই ফিলিপের একটা রাজত্বকাল (১৮৩০-১৮৪৮) — নামটা আসে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব থেকে। পৃঃ ২০

(২১) **১৮৪৮ সালে ১৫ মে** একটা জন-বিক্ষোভপ্রদর্শনের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক আর হস্তশিল্পীরা সংবিধান-সভার অধিবেশন চলাকালে সেই হল-ঘরে ঢুকে পড়ে 'সভা' ভেঙে দেওয়া হল বলে ঘোষণা করে গড়েছিল একটি বৈপ্লবিক সরকার। কিন্তু জাতীয় রক্ষিদল এবং সৈন্যদলগুলি বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করেছিল অচিরেই। ব্লাঙ্কি, বার্বে, আলবের, সোব্রিয়ে এবং শ্রমিকদের অন্যান্য নেতা গ্রেপ্তার হন। পৃঃ ২০

(২২) রোমক ইতিহাসবিদ এ. কেসারিইস্কি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ৩১২ সালে সম্রাট ১ম কনস্তান্তিন মাক্সেন্তিয়স-এর নিধনের প্রাক্কালে নাকি আকাশে একটি ক্রুসচিহ্ন দেখেছিলেন, যার উপর লেখা ছিল: 'জয়ী হইবে'। পৃঃ ২৩

(২৩) দেলফায় আপোলোর মন্দিরের পূজারিকা আর ভবিষ্যদ্বক্তা পিথিয়া বিশেষ এক তেপায়া থেকে নিজ ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন। পৃঃ ২৩

(২৪) *Le National* ('জাতীয় পত্রিকা') — ১৮৩০ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী দৈনিক; নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র। অস্থায়ী সরকারে তাদের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিরা ছিলেন মারাস্ত, বাস্তিদ এবং গার্নিয়ে-পাজেস্।

Journal des Débats politiques et littéraires ('রাজনীতিক-সাহিত্যিক আলোচনা পত্রিকা') — ১৭৮৯ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী বুর্জোয়া দৈনিক। জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে সরকারী পত্রিকা, অর্লিয়ান্সী বুর্জোয়াদের মুখপত্র। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে পত্রিকাটি প্রতিবৈপ্লবিক বুর্জোয়াদের তথাকথিত শৃঙ্খলা পার্টির অভিমত প্রকাশ করে। পৃঃ ২৪

(২৫) ১৭৯২ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র। পৃঃ ২৪

(২৬) **ভিয়েনা সন্ধিচুক্তি** — নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রাহী দেশগুলির ১৮১৫ সালে মে-জুন মাসে ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি। পৃঃ ২৪

(২৭) **নিয়মতান্ত্রিক সনদ** — ফ্রান্সে ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পরে এটা গৃহীত হয়; এটা ছিল জুলাই রাজতন্ত্রের বুনিয়াদী বিধান। পৃঃ ২৬

(২৮) **ক্লিশি** — ১৮২৬-১৮৬৭ সালে ফ্রান্সে দেনদারদের জেলখানা। পৃঃ ২৯

(২৯) **প্রিটোরীয় বাহিনী** — প্রাচীন রোম-এ জেনারেল কিংবা সম্রাটের দেহরক্ষিদল, তাদের ভরণপোষণ করত সংশ্লিষ্ট জেনারেল কিংবা সম্রাট, তারা নানা রকম বিশেষ সুবিধা পেত। তারা সবসময়ে অভ্যন্তরীণ গোলযোগে শামিল হত এবং কখনও কখনও নিজেদের দৃঢ় সমর্থকদের সিংহাসনে বসাত। এখানে ১০ ডিসেম্বর সমিতির পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে (এজন্যে এই বইয়ের পৃঃ ৭১-৭৫ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩২

(৩০) ১৮৪৯ সালের মে-জুলাই মাসে রোম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণে নেপ্‌ল্‌স্ আর অস্ট্রিয়া রাজ্যের যুক্ত অংশগ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩২

(৩১) লুই বোনাপার্টের জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা বলছেন মার্কস: ১৮৩২ সালে লুই বোনাপার্ট থুর্গাউ ক্যান্টনে সুইস্ নাগরিক হন; ১৮৪৮ সালে ব্রিটেনে থাকবার সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলেন স্পেশ্যাল কনস্টেব্‌ল বাহিনীতে (সিভিলিয়ানদের নিয়ে গড়া রিজার্ভ পুলিস)। পৃঃ ৩২

(৩২) ১৮১৪-১৮৩০ সালের পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের আমল — ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের দ্বিতীয় রাজত্বের কালপর্যায়। অভিজাতকুল এবং যাজকমণ্ডলীর স্বার্থসমর্থক বুরবোঁদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজ উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে। পৃঃ ৩৩

(৩৩) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফরাসী বুর্জোয়াদের রাজতান্ত্রিক পার্টি-দুটোর কথা বলা হচ্ছে: লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সী।

লেজিটিমিস্টরা — ১৮৩০ সালে উৎখাত 'বৈধ' বুরবোঁ রাজবংশের অনুগামীরা, এরা ছিল বৃহৎ ভূমিসম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের স্বার্থের প্রতিনিধি। অর্লিয়ান্স রাজবংশ নির্ভর করত ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর; এই বংশের রাজত্বকালে (১৮৩০-১৮৪৮) এটার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টরা সোশ্যাল-বক্তৃতাবাগীশি চালাত এবং বুর্জোয়াদের শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের স্বার্থরক্ষী বলে নিজেদের জাহির করত।

অর্লিয়ান্সী — বুরবোঁ রাজবংশের কোনো কনিষ্ঠ পুত্রের শাখা-বংশ অর্লিয়ান্স কুলের সমর্থকেরা; অর্লিয়ান্স বংশ ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের সময়ে, সেটা উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। অর্লিয়ান্সীরা ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে (১৮৪৮-১৮৫১) লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সী হয়েছিল সম্মিলিত রক্ষণপন্থী শৃংখলা পার্টির কোষকেন্দ্র। পৃঃ ৩৩

(৩৪) কালিগ্যুলো — একজন রোমক সম্রাট (৩৭-৪১) — তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল প্রীটোরীয় বাহিনী। পৃঃ ৩৬

(৩৫) *Le Moniteur universel* ('সর্বজনীন অগ্রদূত') — ফরাসী দৈনিক, সরকারী মুখপত্র, ১৭৮৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়। সরকারী ডিক্রি, পার্লামেণ্টের বিবরণী এবং অন্যান্য সরকারী দলিলপত্রের প্রকাশনা তাতে আবশ্যিক ছিল। ১৮৪৮ সালে পত্রিকাটি ল্যুক্সেমবুর্গ কমিশনের বৈঠকগুলির রিপোর্টও প্রকাশ করেছিল। পৃঃ ৩৭

(৩৬) বিধান-সভার কোয়েস্টররা ছিল অর্থনৈতিক আর আর্থিক বিষয়াবলি এবং নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটিদের আখ্যা (রোমক কোয়েস্টরদের অনুরূপ)। জাতীয় সভার অধ্যক্ষের সরাসর সৈন্য তলব করার অধিকার মঞ্জুর করার বিল্-এর কথা এখানে বলা হচ্ছে; লা ফ্লো বাজ্র এবং পানা, এই রাজতন্ত্রী কোয়েস্টররা ঐ বিল্ পেশ করেন ১৮৫১ সালের ৬ নভেম্বরে; গরম-গরম বিতর্কের পরে বিল্টা বাতিল হয় ১৭ নভেম্বরে। পৃঃ ৩৮

(৩৭) নিয়মতন্ত্রীরা — নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতীরা, বৃহৎ বুর্জোয়া আর উদারনৈতিক অভিজাতবর্গের প্রতিনিধি যারা রাজ্যশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

জিরণ্ডিন — ১৮ শতাব্দীর শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে একটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক উপদল। জিরণ্ডিনরা নরমপন্থী বুর্জোয়াদের স্বার্থ সমর্থন করে, তারা বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল, রাজতন্ত্রের সঙ্গে চুক্তি-রফা করার পথে চলেছিল। নামাঙ্কিত হল জিরণ্ড জেলা থেকে, সংবিধান-সভায় এবং কনভেন্শনে যার প্রতিনিধি হিসেবে ছিল এই উপদলের নেতৃবৃন্দ।

জ্যাকোবিন — ১৮ শতাব্দীর শেষের দিককার বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে একটি রাজনৈতিক উপদল। ফরাসী বুর্জোয়াদের বামপন্থী পক্ষের প্রতিনিধিরা, সামন্ততন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে এবং অবিচলিতভাবে সমর্থন করে। পৃঃ ৩৮

(৩৮) ১৮৪৮ সালের ১৬ এপ্রিলে প্যারিসে শ্রমিকদের একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল 'শ্রমের সংগঠন' এবং 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ লোপ করার' দাবির একখানা আরজি পেশ করতে যাচ্ছিল সাময়িক সরকারের কাছে; মিছিলটাকে থামিয়ে দিয়েছিল

বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদল — তাদের বিশেষভাবে জড় করা হয়েছিল এইজন্যেই। পৃঃ ৩৯

(৩৯) ফ্রোন্দ্ — ১৬৪৮-১৬৫৩ সালে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসী অভিজাতবর্গ এবং বুর্জোয়াদের একটা আন্দোলন। অভিজাতদের মধ্য থেকে এই আন্দোলনের নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নির্ভর করেছিল তাদের সামন্ত আর বৈদেশিক সৈন্যদের উপর, তাছাড়া কাজে লাগিয়েছিল বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ এবং শহরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। পৃঃ ৪০

(৪০) ফ্রিজীয় উষ্ণীষ — লাল টুপি — প্রাচীন ফ্রিজীয়দের শিরোভূষণ। অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় তা জ্যাকবিনদের মাথার টুপি হিসেবে গৃহীত হয় এবং সেই থেকে তা হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতার প্রতীক। পৃঃ ৪০

(৪১) পদ্মফুল — বুরবোঁ রাজবংশের একটা কুল-প্রতীকচিহ্ন। পৃঃ ৪৩

(৪২) এম্‌স্ — পশ্চিম জার্মানির নগর। আগে এখানে কাউন্ট শাঁবরের একটা স্থায়ী আবাস ছিল। কাউন্ট শাঁবর বুরবোঁ জ্যেষ্ঠ বংশ থেকে ফরাসী সিংহাসনে প্রার্থী হিসেবে ছিলেন।

ক্ল্যারমণ্ট — লণ্ডনের নিকটবর্তী একটি কেল্লা, ফ্রান্স থেকে পলায়নের পর লুই ফিলিপ এখানে বাস করতেন। পৃঃ ৪৪

(৪৩) বুর্জে-তে ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ১৮৪৮ সালের ১৫ মে-র ঘটনাবলিতে যোগদানকারীদের মোকদ্দমা চলছিল (টীকা নং ২১ দ্রঃ)। ব্লাকি সারা জীবনের জন্যে, ব্লাঙ্কি দশ বছরের জন্যে কারাবাসে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আলবের, দ্য ফ্লত, সোব্রিয়ে, রাস্পাই আর অন্যান্যেরা বিভিন্ন মেয়াদের জন্যে দণ্ডিত হয়েছিলেন। পৃঃ ৪৮

(৪৪) জেরিকো — বাইবেলের কথা অনুসারে প্যালেস্টাইন বিজয়কালে ইহুদিরা প্রথম এই নগরটি অধিকার করে, নগরের দেয়াল নাকি অবরোধকারীদের শিঙার আওয়াজে ভেঙে পড়ে। পৃঃ ৪৯

(৪৫) লুই বোনাপার্ট আশা করেছিলেন পোপ ৯ম পায়ুস তাঁকে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবেন — সেই পরিকল্পনার পরোক্ষ উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। বাইবেলের কিংবদন্তিতে আছে, ইস্রায়েলের রাজা ডেভিডকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন পয়গম্বর স্যামুয়েল। পৃঃ ৫৪

(৪৬) মোরাভিয়ায় অস্টারলিজ-এর যুদ্ধ হয়েছিল ১৮০৫ সালে ২ ডিসেম্বর (২০

নভেম্বর) — এই যুদ্ধে রুশ-অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ১ম নেপোলিয়ন বিজয়ী হন। পৃঃ ৫৪

(৪৭) ১৮৩৯ সালে প্যারিসে প্রকাশিত লুই বোনাপার্টের বই 'Des idées napoleoniennes' ('নেপোলিয়নীয় ধারণাসমূহ')-এর পরোক্ষ উল্লেখ। পৃঃ ৬০

(৪৮) **বারগ্রেভ-রা** (Burgraves) — নতুন নির্বাচনী আইনের মুসাবিদা করার জন্যে বিধান-সভার কমিশনের ১৭ জন নেতৃস্থানীয় অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টের ক্ষমতার জন্যে অসমর্থনীয় দাবি এবং প্রতিক্রিয়াশীল দূরাকাঙ্ক্ষার দরুন তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল। নামটা নেওয়া হয় ভিক্টর হুগোর ঐ একই নামের ঐতিহাসিক নাটক থেকে। এই নাটকের ঘটনাস্থল হল মধ্যযুগীয় জার্মানি, সেখানে এক-একটা 'বার্গ' (সুরক্ষিত শহর কিংবা দুর্গ)-এর শাসকের উপাধি ছিল বার্গ-গ্রাফ্, তাকে নিযুক্ত করতেন সম্রাট। পৃঃ ৬৫

(৪৯) ১৮৫০ সালের জুলাই মাসে বিধান-সভায় পাস করা মুদ্রণ আইনে সংবাদপত্র প্রকাশকদের দেয় জামানতের পরিমাণ বেশ কিছুটা বাড়ান হয়, আর পুস্তিকার উপরও একটা মুদ্রাঙ্কন শুল্ক ধার্য করা হয়। পৃঃ ৬৭

(৫০) ***National*** পত্রিকা সম্বন্ধে ২৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

La Presse ('সংবাদপত্র') — ১৮৩৬ সাল থেকে থেকে প্যারিসে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা; জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে পত্রিকাটি ছিল প্রতিপক্ষীয়; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের এবং পরে বোনাপার্টপন্থীদের মুখপত্র। পৃঃ ৬৭

(৫১) **লাজারোনি** (Lazzaroni) — ইতালিতে স্বশ্রেণীচ্যুত লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের আখ্যা; উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লাজারোনিদের বারবার ব্যবহার করেছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজতন্ত্রীরা। পৃঃ ৭২

(৫২) লুই বোনাপার্টের জীবনের নিম্নলিখিত দুটো ঘটনার কথা বলা হচ্ছে: ১৮৩৬ সালে ৩০ অক্টোবর তিনি দুটো গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সাহায্যে স্ট্রাসবুর্গে একটা বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের নিরস্ত্র করা হয়, আর লুই বোনাপার্টকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করা হয় আমেরিকায়। ১৮৪০ সালে ৬ অগস্ট আবার তিনি বুলোন্-এ স্থানীয় গ্যারিসনের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ উসকাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তাঁর উপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়, কিন্তু তিনি পালিয়ে ইংলণ্ডে চলে যান ১৮৪৬ সালে। পৃঃ ৭২

(৫৩) **ইলিজে কাগজগুলি** — বোনাপার্টপন্থী মতধারার পত্র-পত্রিকা; রাষ্ট্রপতি হিসেবে লুই বোনাপার্টের প্যারিসের বসতস্থল ইলিজে প্রাসাদের নামানুসারে। পৃঃ ৭৬

(৫৪) 'Lied an die Freude' ('Ode to Joy', 'আনন্দ-গাথা') কবিতার একটা চরণে শিলার আনন্দকে 'ইলিশিয়ামের দুহিতা' বলে কীর্তিত করেছেন, সেটাকে মার্কস উল্লেখ করছেন শব্দের খেলায়। ক্লাসিকাল পুরাণে ইলিশিয়াম বা ইলিশিয়ান প্রান্তর হল স্বর্গের সমতুল। প্যারিসে যে বীথিকায় লুই বোনাপার্টের বসস্থান ছিল সেটারও নাম সাঁজ ইলিজে (ইলিশিয়ান প্রান্তর)। পৃঃ ৮১

(৫৫) ১৮ শতকের শেষভাগের বুর্জোয়া বিপ্লবের আগে **পার্লামেণ্ট** ছিল ফ্রান্সে সর্বোচ্চ বিধানতান্ত্রিক সংস্থা। এইসব সংস্থায় রাজকীয় ফরমান নিবন্ধভুক্ত হত, আর সেগুলির ছিল তথাকথিত বিধিমত আপত্তির অধিকার, অর্থাৎ কোন ফরমানে দেশের প্রথা এবং বিধান লঙ্ঘিত হলে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার। পৃঃ ৮৬

(৫৬) **বেল্ ইল্** (Belle Isle) — বিস্কে উপসাগরে একটা দ্বীপ; রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখার জায়গা। পৃঃ ৮৯

(৫৭) গ্রীক লেখক আথেনাউস-এর (২-৩ শতাব্দী) 'Deipnosophistae' ('খানা-মেজের দার্শনিকেরা'। বইয়ে বিবৃত একটা কাহিনীকে মার্কস এখানে শব্দান্তরিত করেছেন। প্রাচীন স্পার্টার রাজা এজেসিলেস সৈন্যদল নিয়ে গিয়েছিলেন মিশরের ফেয়ারো তাকোস-কে সাহায্য করতে, তাঁর দৈহিক খর্বতার উল্লেখ করে ফেয়ারো বলেছিলেন: 'পর্বতের তখন প্রসববেদনা। জিউস ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু পর্বত প্রসব করল একটা মূষিক।' এজেসিলেস তাঁর জবাবে বলেছিলেন: 'এখন আমাকে তোমার মনে হচ্ছে মূষিক মাত্র, কিন্তু সময় আসবে যখন তোমার মনে হবে আমি একটা সিংহ।' পৃঃ ৯২

(৫৮) *L'Assemblée nationale* ('জাতীয় সভা') — রাজতান্ত্রিক লেজিটিমিস্ট মতধারার ফরাসী দৈনিক পত্রিকা; ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়। লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী, এই দুই রাজবংশীয় পার্টির সম্মিলনী সমর্থন করেছিল ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সাল অবধি। পৃঃ ৯৫

(৫৯) ফরাসী সিংহাসনে লেজিটিমিস্ট দাবিদার শাঁবর-এর কাউণ্ট উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বাস করতেন ভেনিস-এ। পৃঃ ৯৫

(৬০) ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল অবধি পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের কালপর্যায়ে

লেজিটিমিস্টদের শিবিরে কর্মকৌশলগত মতবিরোধের কথা বলা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাবলি একটু সাবধান হয়ে চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন ১৮শ লুই-র সমর্থক ভিলেল, আর ১৮২৪ সাল থেকে রাজা ১০ম চার্লস — কাউন্ট দ্য'আর্তুয়া-এর অনুগামী পলিনিয়াক প্রাক্‌বৈপ্লবিক শাসনের নিরংকুশ পুনঃপ্রবর্তনের ওকালতি করেছিলেন।

প্যারিসে **টুইলেরিস প্রাসাদ** ছিল ১৮শ লুই-র বাসস্থান; পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের আমলে কাউন্ট দ্য'আর্তুয়া থাকতেন ঐ প্রাসাদের **মার্সাঁ-র প্যাভিলিয়ন (Pavilion Marsan)** পার্শ্বভাগে। পৃঃ ৯৭

(৬১) *The Economist* – একটা ইংরেজী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা, বৃহৎ শিল্প বুর্জোয়াদের মুখপত্র; ১৮৪৩ সাল থেকে লন্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। পৃঃ ১০০

(৬২) প্রথম আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে মে-অক্টোবর মাসে। পৃঃ ১০৫

(৬৩) **জাক্‌রি** — 'জাক্' শব্দ থেকে ফরাসী কৃষকদের কুনাম; ভিন্ন অর্থে — কৃষকদের অভ্যুত্থান। পৃঃ ১০৮

(৬৪) *Le Messager de l'Assemblée* – ('সভার দূত') ১৮৫১ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত বোনাপার্টবিরোধী ফরাসী দৈনিক। পৃঃ ১০৮

(৬৫) **দীর্ঘ পার্লামেন্ট** (Long Parliament) (১৬৪০-১৬৫৩) — বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হবার সময়ে রাজা ১ম চার্লসের আহূত ইংলন্ডের পার্লামেন্ট; এটা হয়েছিল বিধান সংস্থা। ১৬৪৯ সালে এই পার্লামেন্ট ১ম চার্লসের উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয় এবং ইংলন্ডকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। ১৬৫৩ সালে ক্রমওয়েল এই পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। পৃঃ ১১৩

(৬৬) **সেভেন্‌** — ফ্রান্সে লাঙেদোক প্রদেশের একটা পার্বত্য অঞ্চল, এখানে একটা কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৭০২-১৭০৫ সালে। প্রটেস্টান্টদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ হিসেবে শুরু হয়ে এই বিদ্রোহ হয়ে উঠেছিল খোলাখুলি সামন্ততন্ত্রবিরোধী। পৃঃ ১২৩

(৬৭) **ভাঁদে** — আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে ফ্রান্সের এই অঞ্চলটি প্রতিবিপ্লবের একটি কেন্দ্র ছিল। বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবিপ্লবীরা ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং পশ্চাৎপদ ভাঁদে-র কৃষকদের কাজে লাগায়। পৃঃ ১২৩

(৬৮) **কনস্ট্যান্সের কাউন্সিল** (১৪১৪-১৪১৮) বসান হয়েছিল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হবার সময়ে ক্যাথলিক চার্চের দুর্বল হয়ে পড়া অবস্থা থেকে সেটাকে সবল করে তোলার জন্যে। পৃঃ ১২৯

(৬৯) **'সাচ্চা সমাজতন্ত্রীরা'** — ১৯ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে জার্মানিব্যাপী বিশেষত পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার প্রতিনিধিরা। তারা সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ নয়, প্রেম আর ভ্রাতৃত্বের ভাবপ্রবণতার প্রচলন বেশি পছন্দ করত এবং জার্মানিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন অস্বীকার করত। পৃঃ ১৩০

(৭০) ফ্রান্সে ১৫শ লুই-র নাবালক অবস্থায় ১৭১৫ থেকে ১৭২৩ সাল অবধি সময়ে ফিলিপ দ্য অর্লিয়ান্সের রাজ-প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩৩

(৭১) **ট্রিভস-এর পবিত্র পরিচ্ছদ** — ট্রিভস-এ ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালে প্রদর্শিত একটা 'পবিত্র' স্মৃতিচিহ্ন। বলা হয় এটা খ্রীষ্টের একটা পোশাক, যা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময়ে খুলে ফেলা হয়েছিল। পৃঃ ১৩৩

(৭২) ১৮৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল চার্টিস্ট *People's Paper* ('জনগণের সংবাদপত্র')-এর চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় মার্কস প্রথম বক্তা হবার সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে প্রলেতারিয়েতের পৃথিবীজোড়া ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। চার্টিস্টদের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের সংসর্গ, ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের উপর ভাবাদর্শগত প্রভাব খাটাবার জন্যে এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন পুনঃপ্রবর্তন করতে চার্টিস্ট নেতাদের সাহায্য করার জন্যে তাঁদের প্রবল ইচ্ছার একটি লক্ষণীয় নিদর্শন হল ঐ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মার্কসের অংশগ্রহণ।

The People's Paper – ১৮৫২ সালের মে থেকে ১৮৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত লন্ডনে প্রকাশিত চার্টিস্ট সাপ্তাহিক। ১৮৫২ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মার্কস এবং এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে লেখা দেন এবং সম্পাদকীয় কাজকর্মেও সাহায্য করেন। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে পত্রিকাটি বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়। পৃঃ ১৩৪

(৭৩) মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র সৃষ্টির কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হল মার্কসের **'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'** বইখানি। বইখানা লেখা শুরু করার আগে মার্কস গবেষণা করেছিলেন পনর বছর ধরে, ঐ সময়ে তিনি বিপুল পরিমাণ সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং রচনা করেন নিজ অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তি। মার্কস তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলিকে অর্থবিদ্যা বিষয়ে একটা মুখ্য রচনায় তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন। মালমশলা সুসংবদ্ধ করা এবং রচনার প্রথম কাঁচা

খসড়া লেখার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন ১৮৫৭ সালের অগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে। তার পরের মাসগুলিতে মার্কস বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করেন এবং ভবিষ্য রচনাটিকে ভাগে-ভাগে পৃথক পৃথক সংখ্যায় প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। বার্লিনের জনৈক প্রকাশক ফ. ডুঙ্কের-এর সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি করে মার্কস প্রথম ভাগটা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন, সেটা ছাপা হয়েছিল ১৮৫৯ সালের জুন মাসে।

প্রথম ভাগের একটু পরেই মার্কস দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করতে মনস্থ করেন, তাতে আলোচনা থাকত পুঁজি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়ে। কিন্তু পরবর্তী গবেষণার ফলে মার্কস মূল পরিকল্পনা বদলে ফেলেন। পরিকল্পিত প্রবন্ধগুলির বদলে তিনি লিখলেন 'পুঁজি', সেটার মধ্যে তিনি সংশোধিত আকারে অন্তর্ভুক্ত করলেন 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' বইয়ের মূল ভাবগুলিকে। পৃঃ ১৩৭

(৭৪) মার্কস অর্থবিদ্যা সম্পর্কে নিজ মুখ্য রচনার যে ভূমিকা লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন সেই অসমাপ্ত ভূমিকার কথা এখানে বলা হয়েছে (৭৩ নং টীকা দ্রঃ)। পৃঃ ১৩৭

(৭৫) *Rheinische Zeitung* (পূর্ণ নাম হল *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe)* ('রাজনীতি, বাণিজ্য আর শিল্প সম্বন্ধে রাইনীয় সংবাদপত্র') —১৮৪২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের ৩১ মার্চ অবধি কলোনে প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাস থেকে মার্কস এই সংবাদপত্রে সহযোগ করেন; ঐ বছরের অক্টোবর মাস থেকে এর অন্যতম সম্পাদক হন। পৃঃ ১৩৮

(৭৬) *Allgemeine Zeitung* ('সর্বজনীন পত্রিকা') — প্রতিক্রিয়াপন্থী জার্মান দৈনিক; এটার প্রকাশনা শুরু হয়েছিল ১৭৯৮ সালে। ১৮১০ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এটা প্রকাশিত হয় অগস্‌বুর্গে। ১৮৪২ সালে এতে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে ইউটোপীয় কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্রের ভাব-ধারণাকে বিকৃত করা হয়। ঐ অপচেষ্টাটাকে মার্কস ধরিয়ে দিয়েছিলেন 'Der Kommunismus und die Augsburger *Allgemeine Zeitung*' ('কমিউনিজম এবং অগস্‌বুর্গের 'সর্বজনীন পত্রিকা'') প্রবন্ধে। পৃঃ ১৩৮

(৭৭) *Deutsch-Französische Jahrbücher* ('জার্মান-ফরাসী ঘটনা-বিবরণী') — কার্ল মার্কস এবং আর্নল্ড রুগে-র সম্পাদিত এবং জর্মান ভাষায় প্যারিসে প্রকাশিত পত্রিকা। শুধু প্রথম ডবল সংখ্যা বেরিয়েছিল (১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে)। তাতে ছিল কার্ল মার্কসের দুটো প্রবন্ধ — 'Zur Judenfrage ('ইহুদি সংক্রান্ত প্রশ্নে') এবং 'Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung' ('আইন সংক্রান্ত হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনায় অবদান'), আর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের দুটো প্রবন্ধ — 'Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie' ('অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনার রূপরেখা') এবং 'Die Lage Englands. 'Past and Present' by Thomas Carlyle, London, 1843' ('ইংলণ্ডের অবস্থিতি। টমাস কার্লাইলের 'অতীত এবং বর্তমান', লণ্ডন, ১৮৪৩')। বস্তুবাদে এবং কমিউনিজমে মার্কস এবং এঙ্গেলসের চূড়ান্ত উত্তরণ সূচিত হয় এইসব রচনায়। পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রধানত মার্কস এবং রুগে-র মধ্যে বুনিয়াদী মতবিরোধের ফলে; রুগে ছিলেন বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল। পৃঃ ১৩৯

(৭৮) **জার্মান শ্রমিক সমিতি** — তার প্রতিষ্ঠা করেন মার্কস আর এঙ্গেলস ১৮৪৭ সালের অগস্টের শেষে, লক্ষ্য ছিল বেলজিয়মবাসী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ ঘটান, আর তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রচার। মার্কস, এঙ্গেলস আর তাঁদের সহকর্মীদের নেতৃত্বে এই সমিতি বেলজিয়মবাসী জার্মান বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানদের সঙ্ঘবদ্ধ করার একটি আইনসঙ্গত কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমিতির সেরা লোকগুলি ব্রাসেল্‌স্ কমিউনিস্ট সঙ্ঘে যোগ দেন। ব্রাসেল্‌সের জার্মান শ্রমিক সমিতির সভ্যদের গ্রেপ্তার ও বেলজিয়ম থেকে নির্বাসনের ফলে এ সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কিছু পরে। পৃঃ ১৪২

(৭৯) *Neue Rheinische Zeitung.* Organ der Demokratie —১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে অবধি কলোন-এ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; এর মুখ্য সম্পাদক ছিলেন মার্কস, আর এঙ্গেলস ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য। পৃঃ ১৪২

(৮০) *New York Daily Tribune* – ১৮৪১-১৯২৪ সালে প্রকাশিত প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র। ১৮৫১ সালের অগস্ট থেকে ১৮৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মার্কস এবং এঙ্গেলস এই পত্রিকায় লেখা দিতেন। পৃঃ ১৪২

(৮১) প্রবন্ধটা হল মার্কসের **'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'** বইয়ের একটা পর্যালোচনা। এঙ্গেলস বলেন, এটা হল প্রলেতারিয়ান পার্টির একটা অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্য এবং প্রলেতারিয়েতের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। প্রকাশিত হয়েছিল শুধু প্রথম দুটো ভাগ। তৃতীয় ভাগে এঙ্গেলস বইখানার অর্থনৈতিক মর্মবস্তু নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় বলে সেটা ছেপে বেরয় নি; তৃতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। পৃঃ ১৪৪

(৮২) **ধর্ম-সংস্কার** (Reformation) — ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সামাজিক গণ-আন্দোলন; ১৬ শতকে এতে জড়িত হয়েছিল ইউরোপের অনেক দেশ। সেগুলির বেশির ভাগ দেশে পাশাপাশি ঘটেছিল তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম। জার্মানিতে ১৫২৪-১৫২৫ সালের কৃষকসমর চালান হয়েছিল ধর্ম-সংস্কারের ভাবাদর্শগত পতাকাতলে। পৃঃ ১৪৪

(৮৩) **তিশ বছরের যুদ্ধ** (১৬১৮-১৬৪৮) — প্রটেস্টান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে চিরপ্রতিকূলতার দরুন সংঘটিত সর্বাত্মক ইউরোপীয় যুদ্ধ। জার্মানি ছিল লড়াইয়ের মুখ্য কেন্দ্র; বিস্তর সামরিক লুণ্ঠন এবং যুধ্যমান শক্তিগুলির সম্প্রসারণ-কামনার লক্ষ্যস্থল হয়েছিল জার্মানি। পৃঃ ১৪৪

(৮৪) ১৪৭৭ থেকে ১৫৫৫ সাল পর্যন্ত হল্যান্ড ছিল 'পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের' একটা অংশ। সাম্রাজ্যটা ভেঙে পড়লে দেশটিকে স্পেনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। ষোল শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের শেষের দিক হল্যান্ড স্পেনীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে একটা স্বতন্ত্র বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। পৃঃ ১৪৪

(৮৫) **শুল্ক-ইউনিয়ন** — ১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাশিয়ার কর্তৃত্বে প্রায় সমস্ত জার্মান রাজ্য একত্রিত হয়। সাধারণ শুল্কে — পরিসীমা স্থাপন করে সেটা ভবিষ্যতে জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্যের সহায়ক ছিল। পৃঃ ১৪৫

(৮৬) **মহাদেশীয় পদ্ধতি** বা ইউরোপের মূলভূমির অবরোধ ঘোষণা করেছিলেন ১ম নেপোলিয়ন ১৮০৬ সালে; তাতে ইউরোপের মূলভূমির দেশগুলি এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৮১২ সালে রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরে সেটাকে বাতিল করা হয়েছিল। পৃঃ ১৪৫

(৮৭) **অবাধ-বাণিজ্যবাদীরা** — অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার পক্ষপাতীরা। ইংলন্ডে উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে তারা একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল হিসেবে ছিল। পৃঃ ১৪৫

(৮৮) **ক্যামেরালিস্‌টিকস্‌ বা সরকারী, বারোয়ারি কাজকর্ম সংক্রান্ত বিদ্যা (Cameralistics or cameral sciences)** — কোন কোন ইউরোপীয় দেশের মধ্যযুগীয় এবং পরে বুর্জোয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও প্রশাসনিক, আর্থ, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের পাঠ্যধারা। পৃঃ ১৪৬

(৮৯) *Das Volk* ('জনগণ') — মার্কসের ঘনিষ্ঠ সহযোগে ১৮৫৯ সালের ৭ মে থেকে ২০ অগস্ট অবধি লন্ডনে জার্মান ভষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক; জুলাই মাসের গোড়ার দিকে মার্কস কার্যত হন পত্রিকাটির সম্পাদক। পৃঃ ১৪৬

(৯০) ঊনিশ শতকের চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে যেসব দক্ষিণপন্থী হেগেলবাদী জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু 'চেয়ার'-এ অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং নিজেদের অবস্থিতিটাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিকাল মতধরের প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ চালাতেন, তাঁদের সম্বন্ধে পরোক্ষ বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে।

দিয়াদোচি -- মহান আলেকজান্ডারের যেসব সেনাপতি তিনি মরা যবার পরে ক্ষমতার জন্যে কাড়াকাড়িতে পরস্পরের মধ্যে হিংস্র লড়াই চালিয়েছিলেন। পৃঃ ১৫০

(৯১) গ. ভ. ফ. হেগেল, 'যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান', ১ম ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫১

(৯২) লণ্ডন **জার্মান শ্রমিক শিক্ষা সমিতির** কথা বলা হচ্ছে; ঊনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে সেটার কার্যালয় ছিল গ্রেট উইণ্ডমিল্ স্ট্রীটে। কার্ল শাপার, ইওসেফ মোল্ এবং 'সমদর্শীদের লীগ'-এর অন্যান্য সদস্য ঐ সমিতি স্থাপন করেছিলেন ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস এই সমিতির ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মার্কস, এঙ্গেলস এবং তাঁদের কয়েক জন সমর্থক সমিতি ছেড়ে যান, কেননা সেটার বহু সদস্য সংকীর্ণতাবাদী-হঠকারী ভিলিখ-শাপার উপদলের পক্ষে চলে গিয়েছিল। ১৮৬৪ সালে 'আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ সমিতি হয়েছিল লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের একটি জার্মান শাখা। ঐ লণ্ডন শিক্ষামূলক সমিতি টিকে ছিল ১৯১৮ সাল অবধি, তখন সরকার সেটাকে বন্ধ করে দেয়। পৃঃ ১৫৯

(৯৩) বৈপ্লবিক ফরাসী ফৌজ মাইনট্স দখল করার পরে জার্মান প্রজাতন্ত্রী-গণতন্ত্রীরা ১৭৯২ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠা করেছিল তথাকথিত 'সমতা আর ভ্রাতৃত্ব বান্ধব ক্লাব'। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা লোপ, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং রাইন্-এর পশ্চিম পারের অঞ্চলকে বৈপ্লবিক ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলেছিল মাইনট্স-এর ক্লাবিস্টরা। শহরের জনসমষ্টি কিংবা কৃষকেরা, কেউই তাদের অভিমত সমর্থন করে নি। ১৭৯৩ সালে জুলাই মাসে প্রুশিয়রা মাইনট্স দখল করার পরে ক্লাবিস্টরা ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। পৃঃ ১৫৯

(৯৪) হতে পারে উল্লেখ করা হচ্ছে W. Bötticher. 'Geschichte der Carthager', Berlin, 1827. (ভবলিউ বেটিখের, 'কার্থেজ-এর ইতিহাস' বার্লিন, ১৮২৭)। বইখানা মূলত কার্থেজ-এর যুদ্ধ-ইতিহাস প্রসঙ্গে। পৃঃ ১৬১

(৯৫) **কনডোটিয়েররা** (Condottiere) -- চোদ্দ এবং পনর শতকে ইতালিতে ভাড়াটে সৈন্যদের সর্দাররা। পৃঃ ১৬১

নামের সূচি

এ

ক

ব

বাজ (Baze), **জাঁ দিদিয়ে** (১৮০০-১৮৮১) — ফরাসী আইনজীবী এবং রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী। —৯৬, ১১৩

বায়ি (Bailly), **জাঁ-সিলভাঁ** (১৭৩৬-১৭৯৩) — অষ্টাদশ শতকের শেষের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্মী, উদারনৈতিক সাংবিধানিক বুর্জোয়ার অন্যতম পরিচালক। —১৪

বারাগে দ'ইলিয়ে (Baraguay d'Hilliers), **আশিল** (১৭৯৫-১৮৭৮) — ফরাসী জেনারেল; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময় সংবিধান এবং বিধান সভার ডেপুটি; ১৮৫১ সালে প্যারিস গ্যারিসনের অধিনায়কত্ব করেন, বোনাপার্টপন্থী। —৮৪, ৮৫, ৯৯

বারো (Barrot), **অদিলোঁ** (১৭৯১-১৮৭৩) — ফরাসী বুর্জোয়া রাজনীতিক, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উদারনৈতিক রাজবংশীয় বিরোধী পার্টির নেতা; ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত শৃঙ্খলা পার্টির উপর নির্ভরশীল মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন। —৩৪-৩৭, ৪১, ৫৬, ৫৭-৫৯, ৬৯, ৭০, ৮৭, ৯০, ৯৭, ৯৮, ১০৮

বারোশ (Baroche), **পিয়ের জুল** (১৮০২-১৮৭০) — ফরাসী রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মী, শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিনিধি, পরে বোনাপার্টপন্থী; ১৮৪৯ সালে আপীল আদালতের প্রধান অভিশংসক। — ৬৬, ৭৯, ৮৫, ৯১

বার্নার্ড (Bernard), — ফরাসী সেনাপতি, প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের অংশগ্রাহীদের উৎপীড়নকারী সামরিক কমিশনগুলির নেতা, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় কুদেতার পর প্রজাতন্ত্রী-বোনাপার্টবিরোধীপন্থীদের বিচারসম্পর্কিত তদন্তের অন্যতম সংগঠক। —৩২

বার্বে (Barbès), **আর্মাঁ** (১৮০৯-১৮৭০) — ফরাসী বিপ্লবী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সক্রিয় কর্মী, ১৮৪৮ সালের ১৫ মে'র ঘটনাগুলিতে অংশগ্রহণের জন্যে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, ১৮৫৪ সালে মার্জনা লাভ করেন। —১৩৪

বিয়ো (Billault), **অগ্যুস্ত আদোল্ফ মারি** (১৮০৫-১৮৬৩) — ফরাসী রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী, ১৮৪৯ সাল থেকে বোনাপার্টপন্থী, সংবিধান-সভার সদস্য (১৮৪৮-১৮৪৯); স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৫৪-১৮৫৮)। —৯০

বুরবোঁ — ফ্রান্সের রাজবংশ (১৫৮৯-১৭৯২, ১৮১৪-১৮১৫ এবং ১৮১৫-১৮৩০)। —৩৩, ৪৩, ৯২-৯৪, ৯৬, ১২১

বেদো (Bedeau), **মারি আলফোঁস** (১৮০৪-১৮৬৩) — ফরাসী জেনারেল এবং রাজনীতিক, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়

ভ

ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার সক্রিয় কর্মী। —৫৩

ভিলিখ (Willich), **আগস্ট** (১৮১০-১৮৭৮) — প্রুশীয় অফিসার, কমিউনিস্ট লীগের সদস্য, ১৮৪৯ সালের বাডেন-পেলাটিনেট বিদ্রোহে অংশগ্রহী; ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগ থেকে ভেঙে আলাদা হয়ে যাওয়া সম্প্রদায়িক ও হঠকারী অংশের অন্যতম নেতা; ১৮৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশান্তরী হন, সেখানে গৃহযুদ্ধে উত্তরের তরফে অংশগ্রহণ করেন। —১৫৯

ভিলেল (Villèle), **জাঁ বাতিস্ত সেরাফেং জোসেফ** (১৭৭৩-১৮৫৪) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, লেজিটিমিস্ট, প্রধানমন্ত্রী (১৮২২-১৮২৮)। —৯৭

ভেইডেমেয়ার (Weydemeyer), **ইয়োজেফ** (১৮১৮-১৮৬৬) — জার্মান ও মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, কমিউনিস্ট লীগের সদস্য, জর্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশগ্রাহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে উত্তরের তরফে যোগ দেন; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কসবাদ প্রচারের সূত্রপাত ঘটান; মার্কস ও এঙ্গেলসের মিত্র ও সুহৃদ। —৭, ১৫৭

ভেরোঁ (Véron), **লুই দোজিরে** (১৭৯৮-১৮৬৭) — ফরাসী সাংবাদিক ও রাজনীতিক, বোনাপার্টপন্থী; *Constitutionnel* পত্রিকার মালিক। —১৩২

ভেস (Vaïsse), **ক্লদ মারিয়াস** (১৭৯৯-১৮৬৪) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, বোনাপার্টপন্থী; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৫১ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল)। —৮৯

ম

মঁতালাঁবের (Montalembert), **শার্ল** (১৮১০-১৮৭০) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি, অর্লিয়ানিস্ট, ক্যাথলিক পার্টির প্রধান। —৮৭, ৯৮, ১২৭

মগাঁ (Mauguin), **ফ্রাঁসোয়া** (১৭৮৫-১৮৫৪) — ফরাসী আইনবিদ, ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক রাজবংশীয় বিরোধী পক্ষের অন্যতম নেতা; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি। —৭৮-৮০

মংক (Monk), **জর্জ** (১৬০৮-১৬৭০) — বৃটিশ জেনারেল; ১৬৬০ সালে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। —৭৫

মপা (Maupas), **শার্লেমান এমিল** (১৮১৮-১৮৮৮) — ফরাসী আইনজীবী, বোনাপার্টপন্থী, প্যারিস পুলিসের প্রিফেক্ট (১৮৫১), ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অন্যতম সংগঠক, পুলিস মন্ত্রী (১৮৫২-১৮৫৩)। —১১০

র

ল

শ

ফরাসী জেনারেল ও বুর্জোয়া রাজনীতিক, রাজতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালের জুনের পর প্যারিসের গ্যারিসন এবং জাতীয় রক্ষিদলের অধিনায়ক, প্যারিসে ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের মিছিল ছত্রভঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। — ৩৬, ৩৮, ৪১, ৫৪, ৫৫, ৭৪-৭৬, ৭৯, ৮৩-৮৭, ৯১, ৯৮, ১০২, ১০৮, ১১১, ১১৩

শাপার (Schaper), **ফন** — প্রুশীয় প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রতিনিধি; রাইন প্রদেশের ওবের-প্রেসিডেন্ট (১৮৪২-১৮৪৫)। — ১৩৮

শাপার (Schapper), **কার্ল** (১৮১২-১৮৭০) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী, ন্যায়পরায়ণ লীগের অন্যতম পরিচালক, কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জার্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশগ্রাহী; ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগের ভাঙনের সময় সাম্প্রদায়িক-হঠকারী অংশের অন্যতম নেতা; ১৮৫৬ সালে আবার মার্কসের ঘনিষ্ঠ হন; প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য। —১৫৯

শারাস (Charras), **জাঁ বাতিস্ত আদোল্ফ** (১৮১০-১৮৬৫) — ফরাসী সামরিক কর্মী এবং রাজনীতিক, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালে প্যারিস শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থান দমনে অংশগ্রহণ করেন; লুই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন; ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হন। —৮, ১১৩

শেক্সপীয়র (Shakespeare), **উইলিয়ম** (১৫৬৪-১৬১৬) — মহান ইংরেজ লেখক। —১১৯

শেরটসার (Scherzer), **আন্দ্রেয়াস** (১৮০৭-১৮৭৯) — জার্মান দর্জি, ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগের ভাঙনের পর ভিলিখ-শাপারের সাম্প্রদায়িক-হঠকারী অংশের অন্তর্ভুক্ত প্যারিসের একটি গ্রুপের সদস্য, ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্যারিসের তথাকথিত জার্মান-ফরাসী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত; পরে ইংলন্ডে দেশান্তরী হন। —১৫৮, ১৫৯

শ্রাম (Schramm), **জাঁ পল আদাঁ** (১৭৮৯-১৮৮৪) — ফরাসী জেনারেল ও রাজনীতিক, বোনাপার্টপন্থী, যুদ্ধমন্ত্রী (১৮৫০-১৮৫১)। —৭৬

স

সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি — রেনিও দে সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি, অগুস্ত মিশেল এতিয়েন দ্রষ্টব্য।

সাঁ-জুস্ত (Saint-Yust), **লুই আঁতুয়া** (১৭৬৭-১৭৯৪) — অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের বিখ্যাত কর্মী, জ্যাকোবিনদের অন্যতম নেতা। —১৩

সাঁ-প্রিস্ত (Saint-Priest), **এমানুয়েল**

হ

সাহিত্যের এবং পৌরাণিক চরিত্র

একিলিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় ট্রয় অবরোধকারী গ্রীক বীরদের মধ্যে সাহসীতম, হোমরের 'ইলিয়াডের' অন্যতম প্রধান নায়ক। —২৮, ৩০

ক্রাপ্যুলিনস্কি — হাইনের 'দুই নাইট' কবিতার নায়ক যিনি নিজের জমিদারি উড়িয়ে দেন; ক্রাপ্যুলিনস্কি পদবীটি রচিত হয়েছে ফরাসী crapule শব্দ থেকে যার অর্থ অতিভোজন, মদ্যপান করে মাতলামি করা, এবং — নিষ্কর্মা, সমাজের তলানি। ক্রাপ্যুলিনস্কি নাম মার্কস এখানে দিয়েছেন লুই বোনাপার্টকে। —২৩

ক্রেভেল — বালজাকের 'কাজিন বেট' উপন্যাসের একটি চরিত্র, ভুঁইফোড়, আত্মসাৎকারী ও ব্যভিচারী। —১৩২

ডামোক্লিস — প্রাচীন গ্রীক উপকথা অনুসারে, সিরাকুজের স্বৈরাচারী ডায়োনিসিয়াসের (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) অনুচর। একদা ডামোক্লিস ডায়োনিসিয়াসের কাছে ভোজনে আমন্ত্রিত হন। ভোজনের সময় তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ডামোক্লিসকে মানব সম্বলের অস্থায়িতা সম্পর্কে বিশ্বাস করাবার জন্যে ডায়োনিসিয়াস তাঁকে নিজের সিংহাসনে বসান এবং তাঁর মাথার উপর ঘোড়ার চুলে বাঁধা একটি ধারালো তরোয়াল ঝুলিয়ে দেন। ডামোক্লিসের তরোয়াল — নিরন্তর, নিকট এবং ভয়ঙ্কর বিপদের প্রতিশব্দ। —৬৪

থেটিস্ — গ্রীক পুরাকথা অনুসারে সমুদ্রের দেবী, একিলিসের মা, যিনি ছেলেকে ট্রয়ের তীরে প্রথম নৌকো ভিড়োতে বারণ করেন (প্রথম যে নৌকো ভিড়োবে তার জন্যে অপেক্ষা করেছিল মৃত্যু)। —৩০

নিক বটম — শেক্সপিয়রের 'মিডসামার নাইট্স ড্রিম' কমেডির একটি চরিত্র। —৭২

পল — বাইবেলের কথা অনুসারে খ্রীষ্টের অন্যতম অ্যাপস্টল। —১২

ব্যাকেস্ — প্রাচীন রোমানদের মদ ও ফুর্তির দেবতা। —৭৫

রবিন গুডফেলো — ইংরেজ লোককথা অনুসারে কাল্পনিক লোক যে মানুষের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করে; শেক্সপিয়রের 'মিডসামার নাইটস ড্রিম' কমেডির অন্যতম প্রধান চরিত্র। —১৩৫

শুফ্‌টার্লে এবং স্পিগেলবের্গ — শিলারের 'দস্যু' নাটকের চরিত্র, কোনরকম নৈতিক মান বর্জিত লুটেরা আর হত্যাকারী। —৭৩

শ্লেমিল, পিটার — শামিসোর 'পিটার শ্লেমিলের অত্যাশ্চর্য ঘটনা' গল্পের নায়ক, যিনি নিজের ছায়া বদল করেছিলেন যাদুর থলির সঙ্গে। —৪০

সার্সি — গ্রীক পুরাকথা অনুসারে এইয়া দ্বীপের মায়াবিনী; ইউলিসেসের সাথীদের শুয়োরে রূপান্তরিত করেন এবং তাকে এক বছর ধরে নিজের দ্বীপে আটকে রাখেন; আলঙ্কারিক অর্থে — মনোমুগ্ধকারিনী। —১১৭

স্যামুয়েল — বাইবেলের কথা অনুসারে প্রাচীন ইহুদী পয়গম্বর। —৯, ৫৪

হ্যাবেকুক — বাইবেলের পয়গম্বর। —১৪

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন,
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

৩

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том V

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101-608}{014(01)-80}$ 633-80 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্বোধনী ভাষণ

১৮৬৪, ২৮শে সেপ্টেম্বরে লন্ডনের লং-একরস্থ সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিষ্ঠিত (১)

শ্রমজীবী মানুষেরা,

একটি বিরাট সত্য হল এই যে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে শ্রমজীবী জনসমষ্টির দুর্দশার কোনো লাঘব হয় নি, তবু এই সময়টাই শিল্প-বিকাশ ও বাণিজ্যবৃদ্ধির দিক দিয়ে অতুলনীয়। ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ বুর্জোয়ার একটি নরমপন্থী ওয়াকিবহাল মুখপত্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইংলণ্ডের রপ্তানি ও আমদানি যদি শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহলে ইংরেজদের দারিদ্র্য একেবারে শূন্যের স্তরে নেমে যাবে। কিন্তু হায়! ১৮৬৪ সালে ৭ই এপ্রিল ইংলণ্ডের অর্থসচিব* পার্লামেণ্টে তাঁর শ্রোতাদের এই বিবৃতি দিয়ে আনন্দ দান করলেন যে, ইংলণ্ডের মোট আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ১৮৬৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে '৪৪, ৩৯, ৫৫, ০০০ পাউণ্ডে উঠেছে। এই আশ্চর্য সংখ্যাটা ১৮৪৩-এর অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক যুগের বাণিজ্যের প্রায় তিনগুণ!' এই সব বলেও তিনি 'দারিদ্র্য' সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলে ওঠেন, 'সেইসব লোকের কথা ভাবুন, যারা এই এলাকার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবুন সেই মজুরির কথা যা বৃদ্ধি পায় নি', 'সেই মানবজীবন যা প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনের ক্ষেত্রেই শুধু বেঁচে থাকার জন্য একটি সংগ্রাম মাত্র!' তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের লোকদের কথা বলেন নি, সেখানে উত্তরে ধীরে ধীরে মানুষের জায়গা দখল করছে যন্ত্র আর দক্ষিণে মেষ-চারণ যদিও ভাগ্যহত সেই দেশটিতে এমন কি মেষের সংখ্যাও কমে আসছে, অবশ্য মানুষের মতো অত দ্রুত নয়। এর ঠিক আগেই একটা আকস্মিক আতঙ্কের ঝোঁকে

---

* উ. গ্ল্যাডস্টোন। — সম্পাঃ

অভিজাতদের ঊর্ধ্বতন দশ হাজারের উচ্চতমে প্রতিনিধিরা যা ফাঁস করে বসেছিল তার পুনরাবৃত্তি তিনি করেন নি। যখন লন্ডনে টুঁটিচেপারা (২) [garrotters] আতঙ্ক খানিকটা জোরালো হয়ে ওঠে, তখন লর্ড-সভা নির্বাসন দন্ড ও কয়েদ খাটুনি সম্বন্ধে একটা তদন্ত ও রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করে। ১৮৬৩ সালের বিরাট আকারের ব্লু বুকে (৩) এক ভয়াবহ সত্য ফাঁস হয়ে গেল, সরকারী তথ্য ও সংখ্যা দিয়ে প্রমাণিত হল যে দন্ডপ্রাপ্ত সবচেয়ে খারাপ অপরাধীরা, ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের কয়েদী গোলামেরাও ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের কৃষি-মজুরদের চেয়ে কম খাটে, বেশি খায়দায়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে (৪) ল্যাঙ্কাশায়ার ও চেশায়ারের শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পথে দাঁড়াল, তখন সেই একই লর্ড-সভা থেকে শিল্পাঞ্চলে একজন চিকিৎসককে পাঠান হল এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তিনি অনুসন্ধান করবেন, গড়পড়তা হিসাবে স্বল্পতম ব্যয়ে ও সহজতম রূপে কত কম পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন ব্যবহার করেই 'অনাহারজনিত রোগ এড়ান যায়।' মেডিকাল ডেপুটি ডাঃ স্মিথ নির্ধারণ করলেন যে, অনাহারজনিত রোগের ঠিক উপরের স্তরে থাকতে হলে... একজন সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সাপ্তাহিক প্রয়োজন হল ২৮,০০০ গ্রেন কার্বন ও ১,৩৩০ গ্রেন নাইট্রোজেন। তিনি এটাও নির্ধারণ করলেন যে, প্রচন্ড দারিদ্র্যের চাপে সুতো কলের কর্মীদের পথ্য কমে গিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছে, এ পরিমাণটা প্রায় তার সমান।* কিন্তু তারপর দেখুন! সেই একই বিজ্ঞ চিকিৎসককে প্রিভি কাউন্সিলের (৫) মেডিকাল অফিসার পরে আর একবার পাঠিয়েছিলেন দরিদ্রতর শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অংশের পুষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে। সেই অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ আছে 'জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ষষ্ঠ রিপোর্টে', যা এই বছরে পার্লামেন্টের আদেশানুসারে প্রকাশিত হয়েছে। কী আবিষ্কার

* পাঠককে একথা মনে করিয়ে দেওয়া রইলো যে, জল এবং কিছু অজৈব উপাদান ছাড়া, মানুষের খাদ্যের কাঁচামাল হল কার্বন ও নাইট্রোজেন। অবশ্য, মানব-দেহকে পরিপুষ্ট করতে হলে এই সহজ রাসায়নিক উপাদানগুলিকে শাকসব্জি ও প্রাণীজাত খাদ্যবস্তু রূপেই সরবরাহ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আলুতে প্রধানত থাকে শুধু কার্বন, আর গমের রুটিতে যথাযথ অনুপাতে থাকে কার্বনজাত ও নাইট্রোজেনজাত বস্তু। [মার্কসের টীকা।]

করলেন ডাক্তার? যারা রেশম বোনে, যেসব মেয়েরা সুচের কাজ করে, যারা চামড়ার দস্তানা বানায়, মোজা তৈরি করে ইত্যাদি, তারা গড়পড়তা যা পায় তা সুতাকল কর্মীদের দুর্দশাকালীন খোরাকের চেয়েও খারাপ, 'অনাহারজনিত রোগ এড়ানর জন্য ঠিক যতটুকু' কার্বন ও নাইট্রোজেনও 'দরকার' সেটুকুও নয়।

এই রিপোর্ট থেকেই উদ্ধৃত করছি: 'তাছাড়া, কৃষক-জনসাধারণের মধ্য থেকে যে-সমস্ত পরিবারকে পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এটাই দেখা গেল যে, তাদের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশীর ক্ষেত্রে কার্বনঘটিত খাদ্য জুটছে প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম; নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম জুটছে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী ক্ষেত্রে এবং তিনটি জেলাতে (বার্কশায়ার, অক্সফোর্ডশায়ার এবং সামারসেটশায়ার) লোকের গড়পড়তা দৈনন্দিন আহার্যেই নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য প্রয়োজনের চেয়ে কম।' সরকারী রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'এ কথা মনে রাখা উচিত যে, নিতান্ত নিরুপায় হলেই তবে লোকেরা খাদ্যের অনটন স্বীকার করে এবং তাই সাধারণত অন্যান্য ব্যাপারে চরম কৃচ্ছ্রতার পরই তবে খাদ্যের কৃচ্ছ্রতা আসে... এমন কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটাও এদের কাছে ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য, এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আত্মসম্মানী প্রচেষ্টা এখনও চোখে পড়লেও প্রতি ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা মানে অধিকতর ক্ষুধার জ্বালা।' 'এ ভাবনা বেদনাদায়ক, বিশেষ করে যদি এ কথা মনে রাখি যে উপরোক্ত দারিদ্র্য অলসতার সঙ্গত দারিদ্র্য নয়, সে দারিদ্র্য সবক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষেরই দারিদ্র্য। বস্তুতপক্ষে যে কাজ করে এই সামান্য ভিক্ষান্ন মিলছে, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যধিক দীর্ঘ।'

রিপোর্টে এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত সত্যও উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, ইংলন্ড, ওয়েলস্, স্কট্ল্যান্ড ও আয়র্ল্যান্ড — 'ইউনাইটেড কিংডমের এই বিভাগগুলির মধ্যে' যে বিভাগ সবচেয়ে অবস্থাপন্ন সেই 'ইংলন্ডের কৃষিজীবী জনসাধারণই সবচেয়ে কম খাদ্য খেয়ে থাকছে'; কিন্তু, এমন কি বার্কশায়ার, অক্সফোর্ডশায়ার ও সামারসেটশায়ারের কৃষি-মজুরেরাও পূর্ব-লন্ডনের দক্ষ কারখানার-কারিগরদের অনেকের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকে।

এই হচ্ছে সরকারী বিবৃতি, যা ১৮৬৪ সালে পার্লামেন্টের আদেশেই প্রকাশিত হয়েছে অবাধ-বাণিজ্যের স্বর্ণ যুগে, যখন অর্থসচিব কমন্স-সভার কাছে এই কথা জানান যে,

'গড় হিসাবে ব্রিটিশ শ্রমিকের অবস্থার যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তা যে কোনো দেশের বা যে কোনো যুগের ইতিহাসে অসাধারণ ও অতুলনীয় বলে আমাদের বিশ্বাস।'

এই সরকারী অভিনন্দনের তাল কাটছে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী রিপোর্টের এই শুষ্ক মন্তব্যে:

'কোনো দেশের জনস্বাস্থ্য বলতে বোঝায় জনগণের স্বাস্থ্য, এবং জনগণও ততক্ষণ স্বাস্থ্যবান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একেবারে তলার দিকে তারা অন্তত কিছুটা সমৃদ্ধ হয়।'

জাতির প্রগতিসূচক পরিসংখ্যানগুলির নৃত্যে অর্থসচিবের চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে, তিনি উন্দাম আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন,

'১৮৪২ থেকে ১৮৫২-এর মধ্যে দেশের ট্যাক্স-যোগ্য আয় শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল... আর ১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ — গত ৮ বৎসরে এই আয় ১৮৫৩-এর তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে! ব্যাপারটি এত আশ্চর্য যে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়...' মিঃ গ্ল্যাডস্টোন যোগ করেন, 'সম্পদ ও শক্তির এই চাঞ্চল্যকর বৃদ্ধি পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ!'

আপনারা যদি জানতে চান, স্বাস্থ্যহানি নৈতিক অধঃপাত ও মানসিক ধ্বংসের কোন অবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি 'পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শক্তির এই চাঞ্চল্যকর বৃদ্ধি' ঘটিয়েছে এবং এখনও ঘটাচ্ছে, তাহলে ছাপাখানা ও দরজিদের কর্মশালার উপর বিগত 'জনস্বাস্থ্য রিপোর্টে' প্রদত্ত ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ১৮৬৩ সালের 'শিশু নিয়োগ কমিশনের রিপোর্ট'এর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। সেখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে:

'শ্রেণী হিসাবে কুম্ভকাররা সকলেই, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই হল এক অতি অধঃপতিত জনসংখ্যা'; বলা হয়েছে যে, 'স্বাস্থ্যহীন শিশুরাই আবার স্বাস্থ্যহীন পিতা-মাতা হয়ে দাঁড়ায়'; 'ক্রমান্বয়ে জাতির অবনতি এগিয়েই চলবে'; আবার, 'পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনবরত লোক সংগ্রহ করা যদি না হত এবং যদি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান বংশে বিবাহাদি না চলত, তাহলে স্টাফোর্ডশায়ারের জনসংখ্যার অবনতি হত আরও অনেক বেশী।'

'ঠিকা রুটি-কারিগরদের অভাব-অভিযোগ' নিয়ে মিঃ ট্রেমেনহিরের ব্লু বুকের দিকে নজর দিন! তাছাড়া, কারখানাসমূহের ইন্সপেক্টররা যে আপাত-

বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিল এবং যা রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে, সে বিবৃতি পড়ে কে না শিউরে উঠেছে? সে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, তুলার দুর্ভিক্ষে সাময়িকভাবে সুতাকল থেকে ছাড়া পাওয়ার ফলে বরাদ্দ দুঃস্থ খাদ্য মাত্রায় ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নতিই হচ্ছিল, আর তাদের শিশুসন্তানদের মৃত্যুহার কমছিল কারণ শিশুদের মায়েরা এতদিনে গডফ্রের আরকের [Godfrey's cordial] বদলে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াবার অবকাশ পাচ্ছিল।

আরেকবার উল্টো দিকটা দেখুন! ১৮৬৪-র ২০শে জুলাই কমন্স-সভার সামনে যে আয় ও সম্পত্তিগত ট্যাক্সের বিবরণ দাখিল করা হয় তা থেকে আমরা এই কথাই জানতে পারি যে, তহসিলদারদের হিসাব অনুযায়ী যেসব লোকের বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ পাউন্ড ও তদূর্ধ্ব, তাদের দলে ১৮৬২-র ৫ই এপ্রিল থেকে ১৮৬৩-র ৫ই এপ্রিলের মধ্যে আরও তেরজন যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ এই এক বছরে তাদের সংখ্যা ৬৭ থেকে ৮০-তে পৌঁছেছে। সেই একই বিবরণ থেকে এ কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, প্রায় ২,৫০,০০,০০০ পাউন্ড পরিমাণ বাৎসরিক আয় ভাগাভাগি হয়ে যায় ৩,০০০ লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইংলন্ড ও ওয়েলস্-এর সমগ্র কৃষি-মজুরেরা আয় হিসাবে যে মুষ্টি ভিক্ষা লাভ করে তার মোট পরিমাণ থেকেও এ আয় কিছুটা বেশী। ১৮৬১ সালের লোকগণনার হিসাবটি খুলে দেখলে জানতে পারবেন যে, ইংলন্ড ও ওয়েলস্-এর ভূমিসম্পত্তির পুরুষ মালিকের সংখ্যা ১৮৫১-তে যেখানে ছিল ১৬,৯৩৪, সেখানে তা ১৮৬১-তে কমে দাঁড়িয়েছে ১৫,০৬৬। অর্থাৎ, ১০ বছরে ভূমিসম্পত্তির কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১ ভাগ। এই হারে যদি অল্প কয়েকজনের হাতে দেশের জমির কেন্দ্রীভবন এগিয়ে যায়, তাহলে ভূমি সমস্যাটি অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যে, যখন অর্ধেক আফ্রিকা প্রদেশটির মালিক হয়েছে ছয়জন ভদ্রলোক এ কথা শুনে হেসেছিলেন নেরো।

'এত আশ্চর্য যে প্রায় অবিশ্বাস্য এইসব তথ্য নিয়ে' আমরা যে এত বেশী আলোচনা করলাম তার কারণ এই যে, শিল্প বাণিজ্যে ইউরোপের শীর্ষে রয়েছে ইংলন্ড। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, কয়েকমাস পূর্বে লুই-ফিলিপের এক উদ্বাস্তু পুত্র প্রকাশ্যে ইংরেজ কৃষি-মজুরদের এই বলে

অভিনন্দিত করেন যে চ্যানেলের অপর পারে এদের অল্পতর সঙ্গতিসম্পন্ন সাথীদের তুলনায় এদের ভাগ্য ভাল। বাস্তবিকই, স্থানীয় রং বদলে ও কিছুটা সংকুচিত আকারে ইংলন্ডের তথ্যগুলি ইউরোপের সমস্ত শিল্পোন্নত ও প্রগতিশীল দেশেই পুনরুদিত। এই সমস্ত দেশেই ১৮৪৮ সাল থেকে এক অশ্রুতপূর্ব শিল্প বিকাশ ও আমদানি রপ্তানির অকল্পনীয় প্রসার ঘটেছে। এই সমস্ত দেশেই 'পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শক্তির বৃদ্ধি' সত্যই 'চাঞ্চল্যকর'। ইংলন্ডের মতো এইসব দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর অল্প এক অংশের আসল মজুরির কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আর্থিক মজুরির সামান্য বৃদ্ধি সুখসুবিধার যেটুকু আসল লাভ বোঝায় তা দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির খরচ ১৮৫২ সালে ৭ পাউন্ড ৭ শিলিং ৪ পেন্সের জায়গায় ১৮৬১-তে ৯ পাউন্ড ১৫ শিলিং ৮ পেন্সে উঠে যাওয়াতে শহরের দুঃস্থ আবাস বা অনাথালয়ের বাসিন্দাদের যেটুকু উপকার সম্ভব তার বেশী কিছু নয়। প্রত্যেক জায়গাতেই শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশ নিচে নেমে যাচ্ছে, অন্তত সেই হারেই যে হারে তাদের উপরতলার লোকেদের সামাজিক জীবনে উন্নতি হচ্ছে। যন্ত্রের উন্নতি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নতুন উপনিবেশ সৃষ্টি, দেশান্তর গমন, নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা, অবাধ-বাণিজ্য — এসব কোনো কিছুই, এমন কি সবকটি একত্র করেও মেহনতী জনগণের দুর্দশা যে দূর হবে না, বরং বর্তমানের মিথ্যা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শ্রমের উৎপাদন-শক্তির প্রতিটি নতুন বিকাশের প্রবণতাই যে সামাজিক বৈষম্য গভীরতর করার ও সামাজিক বৈরভাব তীক্ষ্ণতর করার দিকেই — এই সত্য আজ ইউরোপের সকল দেশের প্রত্যেকটি সংস্কারমুক্ত লোকের কাছেই প্রমাণিত হয়ে উঠেছে, এই সত্যকে অস্বীকার করে শুধু তারাই যারা অপরকে মূর্খের স্বর্গে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আর্থিক প্রগতির এই 'চাঞ্চল্যকর' যুগে অনাহারজনিত মৃত্যু প্রায় একটা প্রথার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুগ শিল্প ও বাণিজ্যের সংকটরূপে সামাজিক মহামারীর আরো ঘন ঘন পুনরাগমন, অধিকতর বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান মারাত্মক ফলাফলের দ্বারা চিহ্নিত।

১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলো ব্যর্থ হবার পর, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে শ্রমিক

শ্রেণীর যত পার্টি সংগঠন ও পার্টি পত্রিকা ছিল সবকিছুই শক্তির লৌহ হস্তে নিষ্পেষিত করা হল, শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী সন্তানরা হতাশ হয়ে আশ্রয় নিলেন আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারের প্রজাতন্ত্রে, আর শিল্পোন্মাদনা, নৈতিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এক যুগের সামনে মিলিয়ে গেল মুক্তির স্বল্পস্থায়ী স্বপ্ন। ইউরোপখণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর পরাজয়ের জন্য অংশত দায়ী ছিল ইংরেজ সরকারের কূটনীতি; এখনকার মতোই তখনও ইংরেজ সরকার সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মন্ত্রিসভার সঙ্গে (৬) ভ্রাতৃত্বসুলভ সৌহার্দ্য রেখে কাজ করছিল। এই পরাজয়ের সংক্রামক ফলাফল শীঘ্রই চ্যানেলের এপারেও এসে পৌঁছল। ইউরোপখণ্ডের ভাইদের বিপর্যয়ে একদিকে যেমন ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল কমে গেল ও নিজ আদর্শের সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ভেঙে পড়ল, তেমনি অপরদিকে এর ফলে ভূমিপতি ও ধনপতিদের কিছুটা বিচলিত আত্মপ্রত্যয় আবার ফিরে এল। যে সব সুবিধা দেবার কথা তারা আগেই বিজ্ঞাপিত করেছিল, ঔদ্ধত্যভরে সে সব তারা প্রত্যাহার করে নিল। নতুন নতুন স্বর্ণ-অঞ্চল আবিষ্কৃত হওয়ায় দলে দলে লোক দেশত্যাগ করতে লাগল এবং তার ফলে ব্রিটিশ প্রলেতারীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় ফাঁক। তাদের আগেকার দিনের সক্রিয় অন্য কর্মীরা বেশী কাজ ও বেশী মজুরির সাময়িক ঘুষের মায়ায় 'রাজনৈতিক দালালে' পরিণত হল। চার্টিস্ট আন্দোলনকে (৭) জীবিত রাখার বা পুনর্গঠিত করার সমস্ত প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হল, শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র কাগজগুলি জনসাধারণের উদাসীনতায় একে একে বিলুপ্ত হয়ে গেল; এবং সত্য কথা বলতে গেলে এমন এক রাজনৈতিক অবলুপ্তির অবস্থার সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী পরিপূর্ণ মাত্রায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বলে মনে হল যা পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। সুতরাং, ব্রিটেন ও ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের সাযুজ্য না থাকলেও অন্তত পরাজয়ের সাযুজ্য ঘটল।

তা সত্ত্বেও, ১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলির পরবর্তী যুগটা ক্ষতিপূরণের চিহ্ন বর্জিত নয়। এখানে আমরা শুধু দুটি বিরাট ঘটনার উল্লেখ করব।

ত্রিশ বৎসর ধরে প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করার পর ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী ভূমিপতি ও ধনপতিদের মধ্যে এক সাময়িক ভাঙন কাজে লাগিয়ে

দশ ঘণ্টার আইনটি (৮) পাশ করাতে সক্ষম হল। এর ফলে কারখানার শ্রমিকদের প্রভূত শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক যে উপকারের কথা কারখানা পরিদর্শকদের অর্ধ বাৎসরিক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয় তা এখন সর্বত্রই স্বীকৃত। ইউরোপে অধিকাংশ সরকারকেই ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি আইন কম বেশী সংশোধিত রূপে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকেও প্রতিবৎসর এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারিক সুবিধাটুকু ছাড়াও, শ্রমজীবী মানুষের এই বিধানটির বিস্ময়কর সাফল্যকে গৌরবজনক মনে করার অন্য কারণও ছিল। ডাঃ উর, অধ্যাপক সিনিয়র ও এই জাতের অন্যান্য মহাপণ্ডিতদের মতো তাদের বিজ্ঞানের অতি কুখ্যাত মুখপাত্রদের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং প্রাণভরে প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমের ঘণ্টা যদি আইনগত ভাবে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তাতে ব্রিটিশ শিল্পের মৃত্যু পরোয়ানাই জারী করা হবে; এ শিল্প বাঁচতে পারে কেবল পিশাচের মতো রক্ত চুষে, তদুপরি শিশুর রক্ত চুষেই। পুরাকালে শিশুহত্যা ছিল মোলখ [Moloch] পূজার্চনার এক রহস্যময় অনুষ্ঠান কিন্তু সে অনুষ্ঠান পালন করা হত শুধু অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ উপলক্ষে, বৎসরে হয়ত বা একবার, এবং তা ছাড়া, শুধুমাত্র গরিব শিশুদের ওপরেই একমাত্র পক্ষপাত মোলখের ছিল না। শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা আইনত সীমাবদ্ধ রাখার এই সংগ্রাম আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এই কারণে যে আতংকিত লোলুপদের কথা ছাড়াও এর প্রভাব পড়েছিল এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর, একদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রের যা ভিত্তি, সেই চাহিদা ও যোগানের নিয়মের অন্ধ প্রভুত্বের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর যা অর্থশাস্ত্র সেই সামাজিক দূরদৃষ্টি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্ব। সুতরাং, দশ ঘণ্টার আইনটি শুধু যে এক বৃহৎ ব্যবহারিক সাফল্য তাই নয়; এ হল একটা নীতিরও জয়; এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রের কাছে বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থশাস্ত্র পরাজিত হল।

কিন্তু সম্পত্তির অর্থশাস্ত্রের উপর শ্রমের অর্থশাস্ত্রের আরো বড় একটি বিজয় বাকি ছিল। আমরা সমবায় আন্দোলনের কথা বলছি, বিশেষত কোনোরকম সহায়তা না পেয়েও কিছু সাহসী 'মজুরের' ['hands'] চেষ্টায় যে সব সমবায়মূলক কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার কথা। এই ধরনের বিরাট

সামাজিক পরীক্ষার মূল্য অসীম বিপুল। যুক্তি তর্কের বদলে কাজ দিয়েই এই সমবায়গুলি দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর নিয়োগকারী মালিক শ্রেণী না থাকলেও বৃহৎ আকারে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের নির্দেশানুযায়ী উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া যায়; দেখিয়ে দিয়েছে যে, সার্থক হতে হলে শ্রমজীবীর ওপর আধিপত্য ও তাকে লুণ্ঠিত করার মাধ্যমরূপে শ্রমের উপায়কে একচেটিয়াধীন করার প্রয়োজন পড়ে না; দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঠিকা শ্রম হচ্ছে দাসশ্রম ও ভূমি দাসশ্রমের মতোই শ্রমের এক নিকৃষ্ট ও স্বল্পস্থায়ী রূপমাত্র, উৎসুক হাতে প্রস্তুত মনে প্রফুল্ল চিত্তে চালানো সংঘবদ্ধ শ্রমের সামনে যা অদৃশ্য হতে বাধ্য। ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন সমবায় পদ্ধতির বীজ বপন করেন; ইউরোপখণ্ডে শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে যে সব পরীক্ষা করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা উদ্ভাবিত নয়, ১৮৪৮ সালে সরবে ঘোষিত তত্ত্বাদির ব্যবহারিক পরিণতি।

সেইসঙ্গে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত সময়কালের অভিজ্ঞতা থেকে এটাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, নীতির দিক থেকে যতই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহারের দিক থেকে যতই উপযোগী হোক না কেন, সমবায় শ্রমকে ব্যক্তিগত শ্রমিকদের অনিয়মিত প্রচেষ্টার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখলে, একচেটিয়া মালিকানার জ্যামিতিক হারের ক্রমবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়া বা জনসাধারণকে মুক্ত করা অথবা তাদের দুর্দশার বোঝাটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাঘব করাও কখনও সম্ভব হবে না। বোধহয় ঠিক এই কারণেই, মধুভাষী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, বুর্জোয়া শ্রেণীর মানব হিতৈষী বাক্যবাগীশরা এবং এমন কি উৎসাহী অর্থতাত্ত্বিকেরা পর্যন্ত সকলেই হঠাৎ এই সমবায় শ্রম পদ্ধতির ধিনাধিনে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন, যদিও ঠিক এই পদ্ধতিকেই তাঁরা স্বপ্নচারীর ইউটোপিয়া বলে উপহাস অথবা সমাজবাদীর অনাচার বলে নিন্দিত করে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। মেহনতী জনসাধারণকে উদ্ধার করতে হলে সমবায় শ্রমকে দেশজোড়া আয়তনে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং কাজেই তাকে সারা জাতির সম্পদ দিয়ে পরিপোষণ করতে হবে। কিন্তু ভূমিপতি ও পুঁজিপতিরা তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া রক্ষা ও চিরস্থায়ী করার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা সর্বদাই ব্যবহার করবে। সুতরাং, শ্রমের মুক্তির পথে সাহায্য করা দূরে থাক, সে পথে সর্বপ্রকার বাধা সৃষ্টির

কাজই তারা করে যাবে। মনে করে দেখুন, গত অধিবেশনে লর্ড পামারস্টোন আইরিশ প্রজাস্বত্ব বিলের প্রবক্তাদের অপদস্থ করার জন্য কী রকম বিদ্রূপ করেছিলেন। তিনি বলে দিলেন, 'কমন্স-সভা হচ্ছে ভূস্বামীদের সভা।'

অতএব রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এক মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা তারা উপলব্ধি করেছে বলেই মনে হয়, কেননা ইংলন্ড, জার্মানি, ইতালি এবং ফ্রান্সে একই সঙ্গে নবজাগরণ শুরু হয়েছে এবং সর্বত্র একসঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির রাজনৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টাও চলছে।

সাফল্যের একটা উপাদান শ্রমিক শ্রেণীর আছে — সংখ্যা; কিন্তু সঙ্ঘের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হতে পারলে তবেই সংখ্যার পাল্লা ভারী হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে থাকা উচিত ও তাদের মুক্তি সংগ্রামে পরস্পরের জন্য একযোগে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করা উচিত সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি অবহেলা তাদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলিকে কী রকম সাধারণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে ফেলে। এই চিন্তাই ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরে সেণ্ট মার্টিন হলে এক সভায় সমবেত বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষকে তাদের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আর একটি প্রত্যয়ও এই সভাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যদি তাদের ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার জন্য অনুসৃত যে পররাষ্ট্র নীতি জাতিগত কুসংস্কার ব্যবহার করছে, দস্যু-যুদ্ধে জনগণের রক্ত ও সম্পদ অপচয় করছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এ মহান ব্রতটি কী করে পূর্ণ করা যাবে? আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে দাসত্বকে কায়েম রাখার ও প্রচারিত করার কলঙ্কময় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে পশ্চিম ইউরোপকে বাঁচিয়েছিল শাসক শ্রেণীর বিজ্ঞ মনোভাব নয়, বাঁচিয়েছিল সেই অপরাধসূচক মূর্খামির বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীরই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ। ককেশাসের পার্বত্য দুর্গটি যখন রাশিয়ার শিকারে পরিণত হচ্ছিল এবং বীর পোল্যান্ডকে রাশিয়া যখন হত্যা করছিল তখন ইউরোপের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে নির্লজ্জ সমর্থন, ভন্ড সহানুভূতি বা আহাম্মকসুলভ

উদাসীনতাই দেখিয়েছিল, যে বর্বর শক্তির মাথা রয়েছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এবং যার হাত রয়েছে ইউরোপের প্রত্যেকটি মন্ত্রিসভায়, সেই রাশিয়ার যে ব্যাপক ও অপ্রতিহত অনধিকার হস্তক্ষেপ ঘটছে; তা থেকে শ্রমিক শ্রেণী শিখেছে যে, তার কর্তব্য হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির রহস্য আয়ত্ত করা; নিজ নিজ সরকারের কূটনৈতিক কার্যকলাপের উপর নজর রাখা; প্রয়োজন হলে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে সে কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা, তাকে ব্যর্থ করতে অক্ষম হলে অন্তত সকলে একসঙ্গে তার প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং নীতি ও ন্যায়ের যে সব সহজ নিয়ম দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক শাসিত হওয়া উচিত, তাদেরই প্রতিষ্ঠা করা জাতিসমূহের মধ্যেকার যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম হিসাবে।

এই রকমের পররাষ্ট্র নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের একাংশ।

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

১৮৬৪ সালের অক্টোবর ২১-২৭ তারিখে মার্কস কর্তৃক লিখিত

'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির **অভিভাষণ এবং খসড়া নিয়মাবলি, লঙ একর, লণ্ডন, সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত'**, পুস্তিকায় প্রকাশিত লণ্ডনে, ১৮৬৪ সালের নভেম্বরে মুদ্রিত। জর্মান ভাষায় লেখকের অনুবাদ ২ ও ৩ নং 'Social-Demokrat' পত্রিকায়, ১৮৬৪ সালের ২১শে ও ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত

ইংরেজি পুস্তিকার পাঠ অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলি (১)

যেহেতু

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম;

শ্রম করে যে মানুষ, শ্রম-উপায়ের অর্থাৎ জীবনধারণের বিভিন্ন উৎসের একচেটিয়া মালিকের কাছে সেই মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতাই রয়েছে সকল রকম দাসত্বের, সব ধরনের সামাজিক দুর্গতি, মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলে;

সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, যা সাধনের উপায় হিসেবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তার অধীনস্থ হতে হবে;

সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মধ্যকার বহুবিধ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়;

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর;

ইউরোপের সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুজ্জীবন যেমন এক নতুন আশার সঞ্চার করছে, তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ

সাবধান বাণীও জানিয়ে দিচ্ছে যেন পুরানো ভুল আর না করা হয়, এবং আহ্বান জানাচ্ছে আজ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির আশু একত্রীকরণের;

এই সব কারণের জন্য শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।

এই সংস্থা ঘোষণা করছে যে:

যে সমস্ত সঙ্ঘ ও ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাঁরা বর্ণ, ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয়তা নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি তাঁদের আচরণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতা;

এই সমিতি মানে যে **কর্তব্য ব্যতিরেকে অধিকার এবং অধিকার ব্যতিরেকে কর্তব্য নেই।**

এই মনোভাব নিয়েই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী রচনা করা হল:

১। শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষা, অগ্রগতি ও পূর্ণমুক্তি — এই এক লক্ষ্য নিয়ে গঠিত বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘ আছে, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার একটি কেন্দ্রীয় মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।

২। এই সমিতির নাম হবে 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'।

৩। সমিতির শাখাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতি বৎসর শ্রমজীবী মানুষের একটি সাধারণ কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করবে, আন্তর্জাতিক সমিতির কাজকে সফলভাবে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংস্থার সাধারণ পরিষদ নিয়োগ করবে।

৪। প্রত্যেক কংগ্রেস পরবর্তী কংগ্রেসের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে প্রতিনিধিরা সমবেত হবেন এবং এর জন্য তাদের কোনো বিশেষ আমন্ত্রণ জানান হবে না। প্রয়োজন হলে, সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু অধিবেশনের সময় স্থগিত রাখার ক্ষমতা এই পরিষদের নেই। প্রতি বৎসর কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের কর্মকেন্দ্র স্থির করে দেবে, এর সভ্যদের নির্বাচিত করবে। এইভাবে নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা থাকবে নিজেদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার।

সাধারণ কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় সাধারণ পরিষদের বৎসরের

কাজকর্মের একটি প্রকাশ্য হিসাব উপস্থিত করা হবে। জরুরী অবস্থায় সাধারণ পরিষদ নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশনের আগেও সাধারণ কংগ্রেস আহবান করতে পারবে।

৫। আন্তর্জাতিক সমিতিতে যে সব দেশের প্রতিনিধিত্ব আছে তাদেরই শ্রমিক সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। কাজকর্ম চালাবার জন্য সাধারণ পরিষদ তার সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নির্বাচিত করবে; যেমন, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন দেশের জন্য এক একজন করেস্পণ্ডিং সম্পাদক ইত্যাদি।

৬। যাতে একদেশের শ্রমজীবী মানুষ অন্য প্রত্যেকটি দেশের স্বশ্রেণীর আন্দোলনের খবরাখবর সদা সর্বদাই পেতে পারে; যাতে একই সঙ্গে একই সাধারণ পরিচালনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চলতে পারে; একটি সঙ্ঘের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি যাতে সমস্ত সঙ্ঘ দ্বারাই আলোচিত হতে পারে; এবং যখন কোনো আশু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় — উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে তখন যাতে সংযুক্ত সঙ্ঘগুলির কার্যক্রম একযোগে একইরকম হতে পারে, তার জন্য সমিতির বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় শাখাগুলির পক্ষে সাধারণ পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সঙ্ঘগুলির সামনে প্রস্তাব উপস্থিত করার উদ্যোগ সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য সাধারণ পরিষদ কিছুকাল পর পর বিবরণী প্রকাশ করবে।

৭। যেহেতু ঐক্য ও সংহতির শক্তি ছাড়া কোনো দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে সফলতা আনা সম্ভব নয়, এবং যেহেতু অন্যদিকে, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘের অল্প কয়েকটি জাতীয় কেন্দ্রকে নিয়ে, নাকি অনেকগুলি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সঙ্ঘ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তার উপরই আন্তর্জাতিক সাধারণ পরিষদের উপযোগিতা নির্ভর করছে, সেইজন্য আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্যদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবী মানুষের বিচ্ছিন্ন সঙ্ঘগুলিকে যুক্ত করে এক একটি জাতীয় সংগঠনে পরিণত করতে পারা যায়, যার প্রতিনিধিত্ব করবে এক একটি

কেন্দ্রীয় জাতীয় সংস্থা। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নিয়মের এই ধারার প্রয়োগ নির্ভর করবে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিশেষ আইনের উপর, এবং আইনগত প্রতিবন্ধকতার কথা বাদ দিলে কোনো স্বাধীন স্থানীয় সঙ্ঘের পক্ষে সরাসরি সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপ করারও কোনো বাধা থাকবে না।

৮। সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপের জন্য সমিতির প্রত্যেক শাখার নিজ নিজ করেস্পণ্ডিং সম্পাদক নিয়োগ করার অধিকার থাকবে।

৯। যারাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নীতিসমূহ স্বীকার ও সমর্থন করে তাদের প্রত্যেকেই এর সদস্য হবার যোগ্য। প্রত্যেক শাখা সেই শাখা কর্তৃক গৃহীত সদস্যদের সততার জন্য দায়ী থাকবে।

১০। আন্তর্জাতিক সমিতির কোনো সদস্য একদেশ থেকে আর একদেশে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করলে, তিনি সংস্থাভুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের ভ্রাতৃত্বসুলভ সাহায্য পাবেন।

১১। শ্রমজীবী মানুষের যে সঙ্ঘগুলি আন্তর্জাতিক সমিতিতে যোগ দিচ্ছে সেগুলি ভ্রাতৃসূচক সহযোগিতার চিরস্থায়ী বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হলেও, তাদের বর্তমান সংগঠনকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

১২। প্রত্যেক কংগ্রেসে এই নিয়মাবলী সংশোধন করা যেতে পারে, তবে সেরূপ সংশোধনের পক্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তিনভাগের দুভাগের সমর্থন থাকা চাই।

১৩। বর্তমান নিয়মাবলীতে সন্নিবিষ্ট হয় নি এরূপ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য বিশেষ বিধান করা যাবে, সেগুলি হবে প্রত্যেক কংগ্রেসের সংশোধন সাপেক্ষ।

২৫৬, High Holborn, W. C.
London, ১৮৭১ সালের ২৪ অক্টোবর

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ইংরেজি ও ফরাসিতে ১৮৭১ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর, জার্মান ভাষায় ১৮৭২ সালে ফেব্রুয়ারিতে।

ইংরেজি ভাষায় লিখিত ১৮৭১-এর পুস্তিকা অনুসারে অনূদিত।

কার্ল মার্কস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন সমীপে (১০)

মান্যবর!

বিপুল সংখ্যাধিক্যে আপনার পুনর্নির্বাচনে আমরা আমেরিকার জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনার প্রথম নির্বাচনের নরমপন্থী ধ্বনিতে যেক্ষেত্রে দাসমালিকদের প্রভুত্বের প্রতিরোধ করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আপনার দ্বিতীয় নির্বাচনের বিজয়ী জঙ্গী জিগির ঘোষণা করছে: নিপাত যাক দাসপ্রথা!

আমেরিকায় এই মহাসংঘর্ষের গোড়া থেকেই ইউরোপের শ্রমিকেরা স্বতঃবোধে অনুভব করছিল যে তাদের ভাগ্য তারকালাঞ্ছিত পতাকার সঙ্গে জড়িত। ভূখণ্ডের জন্য যে সংগ্রাম থেকে এই নিষ্করুণ মহাকাব্যের শুরু তা কি এই মীমাংসা করবে না — দুর্নিরীক্ষ্য বিস্তারের অনাহত মৃত্তিকা কি তুলে দেওয়া হবে অভিবাসীদের শ্রমের নিকট নাকি তা কলঙ্কিত হবে দাসেদের তত্ত্বাবধায়কদের চলন ভঙ্গিতে?

৩ লক্ষ দাসমালিকের গোষ্ঠীতন্ত্র যখন বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের পতাকায় 'দাসত্ব' কথাটা লেখার স্পর্ধা করল, যেখানে প্রায় শত বর্ষ পূর্বে দেখা দিয়েছিল একটি একক, মহান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা, যেখানে ঘোষিত হয়েছিল প্রথম মানবাধিকারের বিবৃতি (১১) এবং আঠারো শতকের ইউরোপীয় বিপ্লবগুলির জন্য সঞ্চার করেছিল প্রথম প্রেরণা, যখন ঠিক সেই সব জায়গাগুলিতেই প্রতিবিপ্লব অবিচল সঙ্গতিপরায়ণতার সঙ্গে এই বলে বড়াই করছে যে 'আগেকার সংবিধান গড়ার সময়কার ধ্যানধারণা' তা দূরীভূত করেছে, ঘোষণা করছে যে 'দাসপ্রথাই একটা উপকারী প্রতিষ্ঠান, শ্রমের সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ক বিষয়ক বিপুল সমস্যাটার মূলত একমাত্র সমাধান' এবং বেহায়ার মতো দাবি করেছে যে মানুষের ওপর মালিকানা 'নবসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর' — ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী তখন তৎক্ষণাৎ বুঝেছিল — উচ্চ শ্রেণীগুলির পক্ষ থেকে জেন্ট্রি-কনফেডারেটদের উদ্দাম পোষকতা যে অশুভ হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, তারও আগে — বুঝেছিল যে

দাসমালিকদের বিদ্রোহে বাজছে শ্রমের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমালিকানার সাধারণ জেহাদের ডঙ্কা, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে এই বিশাল যুদ্ধে মেহনতীদের ভাগ্য, তাদের ভবিষ্যৎ আশা, এমনকি তাদের অতীত অর্জনও বাজি ধরা হয়েছে। তাই তুলা সংকট (১২) যে দুর্দশায় নিপতিত করেছে, শ্রমিক শ্রেণী সর্বত্র তা সহ্য করেছে ধৈর্য ধরে, দাস মালিকানার অনুকূলে যে হস্তক্ষেপের জন্য তাদের উত্তমদের যে পীড়াপীড়ি চলছিল তার তীব্র বিরোধিতা করেছে, — এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে তারা ন্যায্য কর্মের জন্য রক্তের চাঁদা দিয়েছে।

উত্তরের যারা সত্যকার রাজনৈতিক শক্তি সেই শ্রমিকেরা যতক্ষণ তাদের নিজ প্রজাতন্ত্রকে অপবিত্র করতে দিয়েছে দাসপ্রথায়, যে নিগ্রোদের সম্মতির অপেক্ষা না করে কেনা-বেচা হত, তাদের সামনে তারা যতক্ষণ শ্বেত শ্রমিকের এই মহা সুবিধায় গরব করছিল যে তারা নিজেই নিজেদের বেচতে পারে, বেছে নিতে পারে নিজের মালিককে — এতক্ষণ তারা শ্রমের সত্যকার স্বাধীনতা অর্জনের অবস্থায় ছিল না, মুক্তির জন্য সংগ্রামে তাদের ইউরোপীয় ভ্রাতাদের সমর্থন করার মতো অবস্থাতেও ছিল না; কিন্তু প্রগতির পথে এই বাধা এখন দূর হয়েছে গৃহযুদ্ধের রক্ত তরঙ্গে।

ইউরোপের শ্রমিকদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে স্বাধীনতার জন্য আমেরিকান যুদ্ধ (১৩) যেমন বুর্জোয়া প্রভুত্বের যুগটার সূত্রপাত করেছিল, তেমনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আমেরিকান যুদ্ধও শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্যের যুগটার সূত্রপাত করবে। আসন্ন যুগের পূর্বাভাষ তারা দেখছে এই ব্যাপারে যে দাসকৃত জাতিকে মুক্ত করার জন্য এবং সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য অভূতপূর্ব একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেশটাকে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সাধু সন্তান আব্রাহাম লিংকনের ওপর।

ক. মার্কস লেখেন ১৮৬৪ সালের ২২
ও ২৯ নভেম্বরের মধ্যে
ছাপা হয় ১৮৬৫ সালের ৭ নভেম্বর,
১৬৯ নং 'The Bee-Hive Newspaper'
পত্রিকায়

খবরের কাগজের ভাষ্য অনুসারে
অনূদিত

কার্ল মার্কস

প্রুধোঁ প্রসঙ্গে

(ই. বি. শ্‌ভাইৎসার-এর নিকট লিখিত পত্র) (১৪)

লণ্ডন, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৬৫

প্রিয় মহাশয়!

গতকাল আমি একটি চিঠি পেয়েছি, তাতে **প্রুধোঁ** সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে একটি বিস্তারিত অভিমত আপনি চেয়েছেন। আপনার ইচ্ছা পূরণের অন্তরায় হয়েছে আমার সময়াভাব। উপরন্তু তাঁর **কোনো** রচনাও আমার কাছে নেই। যাই হোক, আপনাকে আমার সম্প্রীতি জানাবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া খাড়া করেছি। আপনি তারপর এর সম্পূরণ, সংযোজন, বিয়োজন এক কথায় এটিকে নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারেন।*

প্রুধোঁর আদি প্রয়াসের কথা এখন আর আমার মনে পড়ে না। **'সর্বজনীন ভাষা'** (১৬) সম্বন্ধে তাঁর স্কুল জীবনের একটি লেখা থেকে বোঝা যায় যে, যেসব সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর সামান্যতম জ্ঞানেরও অভাব ছিল তাতে হাত দিতে তিনি কত কম ইতস্তত করেছিলেন!

তাঁর প্রথম গ্রন্থ **'সম্পত্তি কী?'** সর্বতোভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য না হলেও, অন্তত যে নতুন এবং উদ্ধত ভঙ্গিতে পুরনো বক্তব্য বলা হয়েছে তার জন্য বইখানা যুগান্তকারী। যেসব ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের রচনা তিনি জানতেন সেখানে অবশ্য **'সম্পত্তি'** শুধু নানাভাবে সমালোচিতই হয় নি, ইউটোপীয় কায়দায় **'নির্মূলও'** হয়েছে। এই বইতে সাঁ-সিমোঁ ও ফুরিয়ের সঙ্গে প্রুধোঁর সম্পর্ক প্রায় হেগেলের সঙ্গে ফয়েরবাখ-এর সম্পর্কেরই মতো। হেগেল-এর সঙ্গে তুলনায় ফয়েরবাখ

---

* কোনো সংশোধন ছাড়া এই চিঠি প্রকাশ করা ভালো বলে মনে করেছি। ['Social-Demokrat' (১৫) **পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর টীকা**]

আত্যন্তিকভাবেই অকিঞ্চিৎকর। তাসত্ত্বেও তিনি ছিলেন হেগেল-এর **পরবর্তী কালের** পক্ষে যুগান্তকারী, কারণ তিনি এমন কতকগুলি বিষয়ের উপর **জোর দিয়েছিলেন** যেগুলি খ্রীষ্টীয় চেতনার কাছে অপ্রীতিকর অথচ সমালোচনার অগ্রগতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এবং যাদের হেগেল রহস্যময় অর্ধ-অস্পষ্টতার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

প্রুধোঁর এই গ্রন্থখানিতে, বলা যেতে পারে, একটি বলিষ্ঠ পেশীবহুল বাচনভঙ্গি তখনও বজায় ছিল। আর আমার মতে এই বাচনভঙ্গিই এর মুখ্য গুণ। যে কেউ দেখতে পাবেন যে, শুধু পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করার সময়েও প্রুধোঁ যেন নিজস্ব আবিষ্কার উপস্থিত করতেন: তিনি যা বলছেন তা তাঁর নিজের কাছেই নূতন, এবং নূতনের মর্যাদা পাচ্ছে। অর্থশাস্ত্রের 'পূতাধিক পূতের' উপর হস্তক্ষেপের উত্তেজক ঔদ্ধত্য, অপূর্ব আপাতবিরোধী বক্তব্যে বুর্জোয়া মামুলীবুদ্ধিকে ঠাট্টা, সুতীব্র সমালোচনা, তিক্ত বিদ্রূপ, প্রচলিত সমস্ত জঘন্যতার সম্বন্ধে এখানে ওখানে গভীর আন্তরিক রোষ প্রকাশ, বৈপ্লবিক একাগ্রতা — এইসব কিছুর জন্য **'সম্পত্তি কী?'** গ্রন্থখানি পাঠকদের ওপর এক বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থশাস্ত্রের সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে এই গ্রন্থ প্রায় উল্লেখযোগ্যই নয়। কিন্তু এই ধরনের হুজুগে গ্রন্থ যেমন ললিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটা ভূমিকা নেয়। **ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা প্রসঙ্গে'** বইখানির কথাই ধরুন। প্রথম সংস্করণে বইখানি একটি **'হুজুগে পুস্তিকা'** এবং তদুপরি, আদ্যোপান্ত **অন্যের লেখা চুরি ছাড়া** আর কিছু নয়। কিন্তু, তবু, **মানবজাতির মানহানিকর এই বস্তুটির** দ্বারা কী উত্তেজনার না সৃষ্টি হয়েছিল!

আমার হাতের কাছে প্রুধোঁর গ্রন্থটি থাকলে আমি তাঁর অনুসৃত **প্রথম পদ্ধতির** ব্যাখ্যার জন্য সহজেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম। যে অংশগুলি তিনি নিজেই সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতেন সেখানে **অ্যাণ্টিনমির** (দ্বন্দ্ব-পরম্পরার) আলোচনায় **কাণ্ট** যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তিনি তারই অনুসরণ করেছেন। প্রুধোঁ অনুবাদের মাধ্যমে একমাত্র যে জার্মান দার্শনিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি কাণ্ট। আর মনে এই ধারণাই প্রবল হয় যে, কাণ্টের পক্ষেও যেমন তাঁর পক্ষেও তেমনি

অ্যান্টিনমির মীমাংসার ব্যাপারটি মানুষের বোধ **'বহির্ভূত'**, অর্থাৎ ব্যাপারটি এমন একটি কিছু যার সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাটাই তমসাচ্ছন্ন।

কিন্তু তাঁর যত কিছু মেকি স্বর্গজয় সত্ত্বেও 'সম্পত্তি কী?' বইখানির মধ্যেও এই স্ববিরোধ চোখে পড়বে যে, প্রুধোঁ একদিকে ছোট জমির মালিক কৃষকের (পরে পেটি বুর্জোয়ার) চোখ দিয়ে ও তার মতবাদ থেকে সমাজের সমালোচনা করছেন, অথচ অন্যদিকে প্রয়োগ করেছেন সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া মাপকাঠি।

বইখানির ত্রুটি একেবারে তার নামকরণের মধ্যেই দেখা যায়। প্রশ্নটা এমন ভ্রান্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া যায় না। **প্রাচীন 'সম্পত্তি-সম্পর্কসমূহ'** লোপ পেয়েছিল **সামন্ততান্ত্রিক** সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে; এবং তারা আবার লোপ পায় **'বুর্জোয়া'** সম্পত্তি-সম্পর্কের ভিতর। এইভাবে ইতিহাস নিজেই অতীত **সম্পত্তি-সম্পর্কের** সমালোচনা চালিয়েছে। প্রুধোঁর আসল বিচার্য বিষয় ছিল **আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তি** — যা আজ বর্তমান। বস্তুটি যে কী, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত কেবল **'অর্থশাস্ত্রের'** সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে যাতে সমগ্র **সম্পত্তি-সম্পর্ক** ধরা হচ্ছে, **ইচ্ছাগত সম্পর্কের আইনগত** অভিব্যক্তি হিসাবে নয়, **উৎপাদন-সম্পর্ক-রূপ** বাস্তব মূর্তিতে। কিন্তু যেহেতু প্রুধোঁ এই সমগ্র অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে **'সম্পত্তির'** সাধারণ আইনগত সংজ্ঞার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাই ১৭৮৯ সালের আগেই এই ধরনের রচনায় **ব্রিসো** একই ভাষায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন (১৭) 'সম্পত্তির অর্থ হল চুরি', তাকে অতিক্রম করতে তিনি পারলেন না।

এর ভিতর থেকে খুব বেশী হলে এইটুকু পাওয়া যেতে পারে যে **'চৌর্য'** সম্বন্ধে বুর্জোয়া আইনী প্রত্যয় বুর্জোয়াদের নিজেদের **'সদুপায়ে'** অর্জিত লাভ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। অপরপক্ষে, যেহেতু **'চৌর্য'** সম্পত্তির বলপূর্বক লঙ্ঘন বললে **সম্পত্তিকেই আগে ধরে নেওয়া হচ্ছে,** সেইহেতু **প্রকৃত বুর্জোয়া সম্পত্তি** সম্বন্ধে প্রুধোঁ সর্বপ্রকার অলীক কল্পনার জালে নিজেকে জড়িয়েছেন যা এমন কি তাঁর নিজের কাছেও দুর্বোধ্য।

১৮৪৪-এ প্যারিসে অবস্থানকালে আমি প্রুধোঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলাম। এখানে এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল

দেওয়াকে ইংরেজরা যে **'মিশ্রণদৃষ্টি'** ['Sophistication'] আখ্যা দিয়ে থাকে, প্রুধোঁর এই মিশ্রণদৃষ্টির জন্য আমিও কিছুটা পরিমাণে দোষী। প্রায়ই সারা রাত্রি ব্যাপী দীর্ঘ বিতর্কের সময় আমি তাঁকে হেগেলীয় মতবাদের দ্বারা সংক্রামিত করে তাঁর ক্ষতি সাধনই করেছিলাম — জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাবে তিনি এবিষয়ে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন নি। প্যারিস থেকে আমার বহিষ্কারের পর, আমি যা শুরু করেছিলাম তা চালিয়ে নিয়ে গেলেন **কার্ল গ্র্যুন** মহাশয়। জার্মান দর্শনের শিক্ষক হিসেবে আমার চেয়ে তাঁর এই সুবিধা ছিল যে, তিনি নিজেই এ বিষয়ে কিছু বুঝতেন না।

প্রধোঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ **'দারিদ্র্যের দর্শন, ইত্যাদি'** প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিন পূর্বে, তিনি নিজে একখানি অতি বিস্তারিত পত্রে আমার কাছে সে কথা জানান এবং প্রসঙ্গক্রমে লেখেন: 'আমি আপনার কঠোর সমালোচনার প্রত্যাশায় রইলাম।' এই সমালোচনা শীঘ্রই তাঁর উপর গিয়ে পড়ে **(প্যারিস থেকে ১৮৪৭-এ** প্রকাশিত আমার **'দর্শনের দারিদ্র্য, ইত্যাদি'** গ্রন্থে) এমনই ভাবে যে, চিরতরেই আমাদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটে।

আমি এখানে যা বলেছি তা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, **'সম্পত্তি কী?'** এই প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে প্রথম ছিল প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন বা অর্থনৈতিক বিরোধের পদ্ধতি' গ্রন্থখানির মধ্যে। বস্তুত এই পুস্তক প্রকাশের পরেই মাত্র তিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন; আবিষ্কার করেছিলেন যে, তিনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন **গালাগালি** দিয়ে তার জবাব দেওয়া যাবে না, জবাব দেওয়া যাবে একমাত্র আধুনিক **'অর্থশাস্ত্রের' বিশ্লেষণের** মাধ্যমে। একই সময়ে অর্থনৈতিক সংজ্ঞা-বিভাগের প্রণালীকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। **কাণ্টের** অসমাধেয় **'অ্যাণ্টিনমির'** পরিবর্তে বিকাশের পন্থা হিসেবে **হেগেলীয় 'বিরোধ'** প্রবর্তিত করার কথা থাকে তাতে।

প্রত্যুত্তরে লিখিত আমার রচনায় তাঁর দুখানি স্থূলকায় খণ্ডের সমালোচনা আপনি পাবেন। সেখানে অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে আমি দেখিয়েছিলাম বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের অন্তঃস্থলে তিনি কত কম প্রবেশ করেছিলেল; অপরপক্ষে দেখিয়েছিলাম কী ভাবে তিনি নিজেই অনুমানভিত্তিক

দর্শনের মোহ পোষণ করেন, কারণ **অর্থনৈতিক সংজ্ঞাগুলিকে বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশধারার কোনো বিশেষ স্তরের সমানুবর্তী ঐতিহাসিক উৎপাদন-সম্পর্কের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি** হিসেবে না দেখে তিনি সেগুলিকে পূর্ব থেকে বিদ্যমান **চিরন্তন ভাবসংজ্ঞায়** বিকৃত করেছেন, এবং কী ভাবে তিনি এই বাঁকা পথে আবার বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতেই এসে পড়লেন।*

যে অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন সেই 'অর্থশাস্ত্রের' বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত চরম অসম্পূর্ণ, এমন কি স্থানে স্থানে স্কুল-ছাত্র-সুলভ তাও আমি দেখিয়েছি; দেখিয়েছি যে ঐতিহাসিক গতি নিজেই **মুক্তির বাস্তব শর্তাবলী** সৃষ্টি করে তার বিশ্লেষণী জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান গড়ে তোলার পরিবর্তে কী ভাবে তিনি এবং ইউটোপীয়রা ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটি তথাকথিত **'বিজ্ঞান'এর** সন্ধানে — যা থেকে 'সামাজিক সমস্যা সমাধানের' একটি সূত্র সরাসরি বানিয়ে নেওয়া যায়। আর, সমগ্র বিষয়টির ভিত্তি, **বিনিময়-মূল্যের** সম্বন্ধে প্রুধোঁর চিন্তা যে কী পরিমাণ গোলমেলে, ভ্রান্ত ও অপরিপক্ব থেকে গেছে, আর কী ভাবে নূতন একটি বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে তিনি **রিকার্ডোর** মূল্যতত্ত্বের একটি ইউটোপীয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার মতো ভুলও করেন সে বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত সামূহিক অভিমত ব্যক্ত করেছি:

'প্রতিটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি ভাল এবং একটি মন্দ দিক আছে; এটিই হল একমাত্র কথা যেখানে শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ নিজেকে মিথ্যাভাষণে লিপ্ত করেন না। তিনি অর্থতাত্ত্বিকদের দেখানো ভালো দিকটি দেখেন, আবার

---

* 'অর্থতত্ত্ববিদরা যখন বলেন যে, আজকের দিনের সম্পর্ক — বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ — **স্বাভাবিক,** তখন তাঁরা এই অর্থপ্রকাশ-ই করেন যে, সেই সম্পর্কসমূহে প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে পারম্পর্য বজায় রেখেই সম্পদ উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটে। সুতরাং এই সম্পর্কগুলি হল নিজেরা কালের প্রভাব নিরপেক্ষ **প্রাকৃতিক নিয়ম।** এগুলি **শাশ্বত নিয়ম** এবং সমাজকে সর্বকালেই নিয়ন্ত্রণ করবে। সুতরাং ইতিহাস আগে ছিল কিন্তু এখন আর থাকছে না।' (আমার গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠা) [মার্কসের টীকা।]

সমাজতন্ত্রীদের নিন্দিত খারাপ দিকটিও দেখেন। অর্থতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে তিনি ধার করেছেন চিরন্তন অর্থনৈতিক সম্পর্কের আবশ্যিকতা আর সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে ধার করেছেন এই মোহ যে দারিদ্র্যের মধ্যে দারিদ্র্য ছাড়া দর্শনীয় আর কিছু নেই (এর ভিতরের বিপ্লবী, বিধ্বংসী যে দিকটি পুরাতন সমাজের উচ্ছেদসাধন করবে সেই দিকটা না দেখে*)। নিজের পক্ষে বিজ্ঞানের সমর্থন উদ্ধৃত করার প্রচেষ্টায় তিনি এদের উভয়ের সঙ্গেই মতৈক্য পোষণ করেন। বিজ্ঞান তাঁর কাছে ক্ষীণাবয়ব বৈজ্ঞানিক সূত্রমাত্রে পর্যবসিত; তিনি কেবল সূত্র-সন্ধানেই ব্যস্ত। এইভাবেই শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ অর্থশাস্ত্র এবং কমিউনিজম এই দুই-এরই সমালোচনা করেছেন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন -- বস্তুত, তিনি এই দুইয়েরই নিচে। অর্থতত্ত্ববিদদের তুলনায় নিচে এই কারণে যে, হাতের কাছে একটি যাদু-সূত্র তৈরি আছে এমন একজন দার্শনিক হিসেবে তিনি মনে করেন নিছক অর্থনৈতিক খুঁটিনাটিগুলিকে তিনি পরিহার করে চলতে পারেন; সমাজতন্ত্রীদের নিচে এই কারণে যে, মননের দিক থেকেও বুর্জোয়া দৃষ্টিসীমার ঊর্ধ্বে নিজেকে তোলার মতো তাঁর সাহসও নেই, অন্তর্দৃষ্টিও নেই। বিজ্ঞানের মানুষ হিসেবে তিনি বুর্জোয়া এবং প্রলেতারীয় উভয়েরই সংস্পর্শের ঊর্ধ্বে আকাশচারী হতে চান; আসলে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে, অর্থশাস্ত্র এবং কমিউনিজমের মধ্যে নিরন্তর দোদুল্যমান **পেটি বুর্জোয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই নন।**'**

উপরের এই অভিমত কঠোর শোনালেও আজও এর প্রতিটি শব্দ আমি অনুমোদন করব। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যখন আমি প্রুধোঁর গ্রন্থখানিকে পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সংহিতা আখ্যা দিয়েছিলাম, এবং তত্ত্বগতভাবে সে কথা প্রমাণ করেছিলাম, তখনও অর্থতত্ত্ববিদরা এবং সমাজতন্ত্রীরা সমস্বরে তাঁকে একজন চরম অতিবিপ্লবী বলে নিন্দিত করছিলেন। ঠিক এই কারণেই পরবর্তীকালেও বিপ্লবের প্রতি তাঁর **'বিশ্বাসঘাতকতা'** নিয়ে সোরগোলে আমি কখনো যোগ দিই নি। প্রথম থেকে তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজেরও উপলব্ধিটাই

* মার্কস এই প্রবন্ধে যোগ করেন বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া কথা। — সম্পাঃ

** উপরোক্ত গ্রন্থ — ১১৯-২০ পৃষ্ঠা। মার্কসের টীকা।

ছিল ভ্রান্ত; তাই তিনি যদি অন্যায্য আশাকে নিরাশ করে থাকেন তবে সে দোষ তাঁর নয়।

'সম্পত্তি কী?' গ্রন্থের তুলনায় **'দারিদ্র্যের দর্শন'** বইখানিতে প্রুধোঁর উপস্থাপন পদ্ধতির সব ত্রুটিগুলিই অত্যন্ত প্রতিকূলভাবে প্রকট হয়েছে। প্রকাশভঙ্গি প্রায়শঃ হয়েছে ফরাসীরা যাকে বলে ampoulé*। যেখানেই তাঁর গ্যালিক বিচক্ষণতার ঘাটতি পড়েছে সেখানেই হাজির হয়েছে বাগাড়ম্বরী জল্পনামূলক বুলি, যাকে ভাবা হয়েছে বুঝি জার্মান-দার্শনিক উক্তি। উন্নাসিক, আত্মম্ভরী এবং উদ্ধত সুর, বিশেষ করে **'বিজ্ঞান'** সম্বন্ধে তাঁর বাজে বকুনি, আর তার ভুয়া ভড়ং যা সর্বদাই অতি অপ্রীতিকর তা অবিরত কর্ণকুহর ভারাক্রান্ত করে। তাঁর প্রথম রচনাকে তাপোদ্দীপ্ত করেছিল যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা, তার পরিবর্তে এখানে রীতিমত শব্দালঙ্কার প্রয়োগ করে কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে একটা সাময়িক রুগ্ন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত করুন স্বয়ংশিক্ষিতের আনাড়ী ও বিরক্তিকর পণ্ডিতীপনা — যে স্বয়ংশিক্ষিত ব্যক্তিটির মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার অন্তর্নিহিত গর্ববোধ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে, অথচ যিনি একজন হঠাৎবিজ্ঞানী হিসেবে যা তিনি নন বা যা তাঁর নেই তাই নিয়ে জাঁক করে বেড়ানো দরকার মনে করেন। তারপরে তাঁর পেটি বুর্জোয়া মনোভাব; ফরাসী প্রলেতারিয়েতের প্রতি ব্যবহারিক মনোভাবের জন্য যাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিত, সেই **কাবে-র** মতন লোকের বিরুদ্ধে তিনি চালালেন অভদ্র জানোয়ারের মতো আক্রমণ — যে আক্রমণে না আছে তীক্ষ্ণতা, না আছে গভীরতা, না আছে ন্যায্যতা, আর অপরদিকে তিনি সৌজন্য দেখালেন **দ্যুনুয়ার** মতো লোকের প্রতি (অবশ্য তিনি হলেন 'রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা'); অথচ এই লোকটির তাবৎ গুরুত্ব হল তাঁর হাস্যোদ্দীপক সেই গাম্ভীর্য যে গাম্ভীর্য সহকারে তিনটি স্থূলকায় অসহ্য বিরক্তিকর গ্রন্থখণ্ডের (১৮) মাধ্যমে তিনি প্রচার করেছেন এক কৃচ্ছ্রসাধনবাদ [rigourism] যাকে হেলভেশিয়াস বর্ণনা করেছেন এইভাবে: 'হতভাগ্যেরা হবে নিখুঁত — এটাই দাবি।'

প্রুধোঁর পক্ষে নিশ্চয়ই এক অতি অসুবিধাজনক মুহূর্তে এসেছিল

* বাগাড়ম্বরপূর্ণ। — সম্পাঃ

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (১৯), কারণ তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, '**বিপ্লবের যুগ**' চিরতরেই শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় সভায় তাঁর উক্তিসমূহের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যত কমই অন্তর্দৃষ্টি দেখা যাক না কেন, সেগুলি সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় (২০)। জুন অভ্যুত্থানের পর (২১) সে বক্তব্য ছিল প্রচণ্ড সাহসের কাজ। তা ছাড়া তার সুফল হল এই যে, প্রুধোঁর প্রস্তাব সমষ্টির বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত **তিয়ের** তাঁর বক্তৃতায় (২২), পরে যা বিশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সমগ্র ইউরোপের কাছে প্রমাণ করে দিলেন কী শিশুসুলভ প্রশ্নোত্তরিকা [catechism] ফরাসী বুর্জোয়াদের এই আধ্যাত্মিক স্তম্ভটির পাদপীঠ হিসেবে কাজ করছিল। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীযুক্ত **তিয়ের-এর** তুলনায় **প্রুধোঁ** স্ফীত হয়ে যেন প্রাকপ্লাবন যুগের অতিকায় জীবের আয়তন লাভ করেন।

প্রুধোঁর সর্বশেষ অর্থশাস্ত্রবিষয়ক 'কীর্তি' হল তাঁর '**বিনাসুদে ক্রেডিট**' এবং তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো '**জনগণের ব্যাঙ্কের**' আবিষ্কার। বুর্জোয়া 'অর্থশাস্ত্রের' প্রথম উপাদান, অর্থাৎ **পণ্য ও মুদ্রার** সম্পর্কটি বুঝবার অক্ষমতা থেকেই যে তাঁর ধারণার তত্ত্বগত ভিত্তির উদ্ভব, অথচ তার ব্যবহারিক উপরিকাঠামোটা যে ঢের বেশী পুরনো ও অনেক বেশী ভালো বিকশিত পরিকল্পনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার প্রমাণ আমার '**অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' প্রথম খণ্ড,** বার্লিন, ১৮৫৯, গ্রন্থেই (পৃঃ ৫৯-৬৪) পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থায় ক্রেডিট-প্রথা যে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ত্বরান্বিত করার সহায়ক হতে পারে যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ আঠারো শতকের সূচনায়, আবার পরে উনিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে তা এক শ্রেণীর কাছ থেকে আর এক শ্রেণীর কাছে সম্পদ হস্তান্তরের সহায়ক হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহেই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু **সুদ-দায়ী পুঁজিকেই পুঁজির প্রধানরূপ** বলে গণ্য করা, ক্রেডিট-প্রথার একটি বিশেষ ধরনের প্রয়োগকে, অর্থাৎ সুদের তথাকথিত বিলোপ সাধনকে, সমাজ রূপান্তরের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে চাওয়া একেবারে পুরোপুরি **কূপমণ্ডূক** কল্পনাবিলাস। বস্তুত এই কল্পনা, আরো দীর্ঘায়িত রূপে **সতেরো শতকের ইংরেজ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুখপাত্রদের মধ্যে** আগেই পাওয়া গেছে। সুদ-বিশিষ্ট পুঁজি বিষয়ে (২৩) বাস্তিয়ার সঙ্গে

প্রুধোঁর বাদানুবাদ (১৮৫০) **'দারিদ্র্যের দর্শনের'** থেকে অনেক নিম্নস্তরের। তিনি এমন অবস্থা তৈরী করেন যে এমন কি বাস্তিয়ার হাতেও মার খেতে হয়; প্রতিপক্ষ যখন তাঁর উপর মোক্ষম আঘাত হানে তিনি তখন ভাঁড়ামি করে হেহে করে ওঠেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে প্রুধোঁ — আমার মনে হয়, লসান সরকারের নির্দেশক্রমেই — **'করনীতি'** বিষয়ে একটি পুরস্কার-প্রার্থী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এখানে প্রতিভার শেষ দীপ্তিটুকুও নির্বাপিত। নিখাদ **নিছক পেটি বুর্জোয়া** ছাড়া আর কিছুই এখানে বাকি রইল না।

আর তাঁর রাজনৈতিক ও দর্শন সম্বন্ধীয় যা রচনা — তার সবকটির মধ্যেই তাঁর অর্থতত্ত্বসংক্রান্ত রচনার মতো এই একই স্ববিরোধী এবং দ্বৈত চরিত্র প্রকট। উপরন্তু, সেগুলির উপযোগিতা একান্তই স্থানিক, ফ্রান্সের মধ্যেই সীমিত। এ সব সত্ত্বেও যে যুগে ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা ধার্মিকতায় আঠারো শতকের বুর্জোয়া ভল্টেয়র-পন্থা অথবা উনিশ শতাব্দীর জার্মান নিরীশ্বরতার তুলনায় উন্নততর প্রতিপন্ন হওয়া কাম্য মনে করত, সেযুগে ধর্ম এবং গির্জার উপর তাঁর আক্রমণের বিরাট স্থানীয় তাৎপর্য ছিল। মহান পিটার যদি রুশ বর্বরতাকে পরাস্ত করে থাকেন বর্বরতা দিয়ে তবে প্রুধোঁও ফরাসী বাগাড়ম্বরকে বাক্যছটায় পরাজিত করার জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন।

'ক্ষমতা জবরদখল' বিষয়ক যে রচনায় লুই বোনাপার্টকে নিয়ে তিনি দহরম-মহরম করেছিলেন ও প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ফরাসী শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান; এবং **পোল্যান্ডের** (২৪) বিরুদ্ধে লেখা তাঁর সর্বশেষ যে রচনায় তিনি জারের মহিমা কীর্তনের জন্যই চরম ক্লীবতাগ্রস্ত নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিয়েছেন, সে দুটি রচনাকে শুধু খারাপ নয়, ইতর লেখা বলেই নিশ্চয় অভিহিত করতে হবে; সে ইতরতা অবশ্য পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুবর্তী।

প্রুধোঁকে প্রায়ই **রুসোর** সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর চেয়ে ভ্রান্ত আর কিছুই হতে পারে না। তিনি বরং **নিকোলা লেংগে-রই** সমগোত্র, প্রসঙ্গত, যাঁর বই **'দেওয়ানী আইনের তত্ত্ব'** খুবই দীপ্তিমান লেখা।

দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের দিকে প্রুধোঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি কখনো প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নি

সেইহেতুই তিনি কূটতর্কের বেশি আর গেলেন না। বস্তুত তাঁর পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই এটি জড়িয়েছিল। ইতিহাসকার **রাউমার** মতোই পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিটিই হল 'একদিকে একথা অপরদিকে সেকথা' দিয়ে গঠিত। এটা আছে তার অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এবং **সেই কারণেই** তাঁর রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতেও। নীতিবোধের বেলায় তাই, সর্বত্রই তাই। সে হল জীবন্ত স্ববিরোধ। তদুপরি, প্রুধোঁর মতো যদি সে বুদ্ধিমান লোক হয়, তবে অবিলম্বেই সে নিজের বিরোধগুলি নিয়ে খেলতে শিখবে এবং অবস্থানুসারে তাকে পরিণত করবে চিত্তাকর্ষক, জমকালো কখনো যাচ্ছেতাই, কখনো বা দীপ্যমান অসঙ্গতিতে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতুড়েপনা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আপোসসন্ধান হচ্ছে এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এর একটি মাত্রই নিয়ামক উদ্দেশ্য থাকে -- সে উদ্দেশ্য হল কর্তার **অহমিকা;** আর সমস্ত অহংসর্বস্ব মানুষের মতো তার একমাত্র প্রশ্নটা হল বর্তমান মুহূর্তের সাফল্য, দিনের হুজুগ। এইরূপে অনিবার্যভাবেই সেই সাধারণ নৈতিক শালীনতাটুকুও মিলিয়ে যায়, যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্ষমতাধিকারীদের সঙ্গে আপোসের ছায়াটা থেকেও রুসোকে দূরে রাখতে পেরেছিল।

সম্ভবত ফ্রান্সের বিকাশের এই সর্বাধুনিক পর্যায়কে উত্তরপুরুষ এই বলেই বিশেষিত করবে যে, লুই বোনাপার্ট ছিলেন তার নেপোলিয়ন এবং প্রুধোঁ হলেন তার রুসো-ভল্টেয়র।

এবার ভদ্রলোকের মৃত্যুর পরে এত তাড়াতাড়ি আপনি যে আমাকে তাঁর মরণোত্তর বিচারকের ভূমিকার ভার চাপালেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

আপনাদের অতি বিশ্বস্ত **কার্ল মার্কস**

১৮৬৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে লিখিত

১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারির ১, ৩ ও ৫ তারিখের ১৬, ১৭ ও ১৮ নং 'Social-Democrat' পত্রিকায় প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে ১৮৮৫ সালের সংস্করণ মুদ্রণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা

জার্মান থেকে অনূদিত ইংরেজি ভাষার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

মজুরি দাম মুনাফা (২৫)

প্রারম্ভিক মন্তব্য

নাগরিকগণ,

আলোচ্য বিষয়ে যাবার আগে আপনাদের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি প্রারম্ভিক মন্তব্য করব।

ইউরোপীয় মহাদেশ জুড়ে এখন বাস্তবিকই সংক্রামক আকারে ধর্মঘট চলেছে ও মজুরি-বৃদ্ধির সার্বজনীন দাবি উঠছে। আমাদের কংগ্রেসে (২৬) এ প্রশ্ন উঠবে। আন্তর্জাতিক সমিতির নেতা হিসেবে আপনাদের এই একান্ত জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে স্থির মত থাকা উচিত। আপনাদের ধৈর্যের উপরে কড়া রকম জবরদস্তি করার ঝুঁকি নিয়েও আমার তরফ থেকে তাই আমি এ প্রসঙ্গের পূর্ণ আলোচনা করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।

নাগরিক ওয়েস্টন সম্পর্কে গোড়াতেই আর একটা মন্তব্য আমায় করতে হচ্ছে। তিনি শুধু যে আপনাদের কাছে কতগুলি মতামত হাজির করেছেন তা নয়, প্রকাশ্যে সে মতামত সমর্থনও করেছেন, যেগুলি তাঁর ধারণায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে হলেও শ্রমিক শ্রেণীর কাছে অতি অপ্রিয় বলে তিনি জানেন। এ ধরনের নৈতিক সাহস প্রদর্শন আমাদের সকলের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আমি আশা করি যে, আমার নিবন্ধের অমার্জিত ধরন সত্ত্বেও এর উপসংহারে তিনি দেখতে পাবেন, তাঁর থিসিসগুলির মূলে যেটুকু খাঁটি ভাবনা আছে তাকে সত্য বলে আমি মনে করি, তার সঙ্গে আমি একমত, যদিও তার বর্তমান আকারে সে থিসিসগুলিকে আমি তত্ত্বের দিক থেকে ভুল ও কার্যক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে মনে না করে পারছি না।

এবারে আমি সরাসরি আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়টি শুরু করব।

১। উৎপাদন ও মজ্বরি

নাগরিক ওয়েস্টনের যুক্তি আসলে নির্ভর করছে দুটি প্রতিজ্ঞার উপরে:

প্রথমত, **জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ** হচ্ছে **একটি স্থির নির্দিষ্ট বস্তু**, যা হল **অপরিবর্তিত** পরিমাণ, গাণিতিকেরা যাকে বলবেন **স্থির** [constant] রাশি বা পরিমাণ;

দ্বিতীয়ত, **আসল মজ্বরির পরিমাণ**, অর্থাৎ তা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য কেনা চলে তার হিসাবে মাপা মজ্বরির পরিমাণ হচ্ছে একটা **অপরিবর্তনশীল** রাশি, একটা **স্থির** পরিমাণ।

তাঁর প্রথম উক্তিটি স্পষ্টতই ভুল। আপনারা দেখতে পারেন, বছরের পর বছর উৎপন্নের মূল্য ও পরিমাণ বেড়ে চলেছে, জাতীয় শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বাড়ছে এবং এই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সঞ্চালনের জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, ক্রমাগতই তার পরিবর্তন ঘটছে। বছর-শেষের হিসাবে যা সত্য, বিভিন্ন বছরের তুলনামূলক হিসাবে যা সত্য — বছরের প্রতিটি গড়পড়তা দিনের পক্ষেও তা-ই সত্য। জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বা আয়তন নিরন্তর বদলাচ্ছে। এটি **স্থির** নয়, বরং এটি একটা **পরিবর্তনশীল** পরিমাণ, আর জনসংখ্যায় পরিবর্তনের কথা না ধরলেও **পংজি সঞ্চয়** ও **শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে** ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটনের দরুন তা পরিবর্তনশীল না হয়ে পারে না। একথা খুবই ঠিক যে, আজ যদি **মজ্বরির সাধারণ হার বৃদ্ধি** পায় তবে তার পরিণাম ফল যাই হোক না কেন ঐ বৃদ্ধি **আপনা থেকেই, অবিলম্বে** উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাবে না। প্রথমে বর্তমান অবস্থা থেকেই তার যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু মজ্বরি-বৃদ্ধির **আগে** জাতীয় উৎপন্ন যদি **স্থির** না হয়ে **পরিবর্তনশীল** থেকে থাকে, তবে মজ্বরি-বৃদ্ধির **পরেও** তা স্থির না থেকে পরিবর্তনশীল হয়েই থাকবে।

কিন্তু ধরুন, জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ **পরিবর্তনশীল** না হয়ে **স্থিরই** আছে। সে ক্ষেত্রেও বন্ধু ওয়েস্টন যাকে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচনা করছেন, তা এক অযৌক্তিক ঘোষণাই থেকে যাবে। যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া থাকে, ধরুন আট, তাহলে এই সংখ্যাটির **অনপেক্ষ** সীমা আছে বলে

তার অংশগুলির **আপেক্ষিক সীমার** পরিবর্তন আটকায় না। যদি মুনাফা ছয় ও মজুরি দুই হয়, তবে মজুরি বেড়ে ছয় ও মুনাফা কমে দুই হতে পারে, কিন্তু তখনও মোট সংখ্যাটি থাকবে আট-ই। কাজেই, উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলেই তার থেকে কোনো ক্রমেই প্রমাণিত হয় না যে মজুরির মাত্রাও স্থির। বন্ধু ওয়েস্টন তাহলে মজুরির মাত্রার স্থিরতা প্রমাণ করছেন কী করে? শুধু তা জোর গলায় ঘোষণা করেই।

কিন্তু তাঁর ঘোষণা যদি মেনেও নেওয়া যায় তবে দু-দিকেই তা কাটবে, অথচ তিনি কেবল একদিকেই জোর দিচ্ছেন। মজুরির পরিমাণ যদি একটা স্থির রাশি হয় তবে তাকে বাড়ানোও যায় না, কমানোও যায় না। কাজেই, যদি জোর করে সাময়িকভাবে মজুরি বাড়ানো মজুরদের পক্ষে বোকামি হয়, তবে জোর করে সাময়িকভাবে মজুরি কমানো পুঁজিপতিদের পক্ষেও কম নির্বুদ্ধিতা নয়। বন্ধুবর ওয়েস্টন অস্বীকার করেন না যে, অবস্থাবিশেষে মজুরেরা জোর করে মজুরি বাড়িয়ে নিতে **পারে** বটে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ স্বভাবতই নির্দিষ্ট থাকার ফলে এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। অপরপক্ষে, এও তিনি জানেন যে, পুঁজিপতিরা জোর করে মজুরি কমাতে **পারে,** আর বস্তুত তারা অনবরতই সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মজুরির স্থিরতার নীতি অনুসারে এক্ষেত্রেও যতটুকু প্রতিক্রিয়া ঘটা উচিত, প্রথম ক্ষেত্রের থেকে তা মোটেই কম নয়। সুতরাং, মজুরি হ্রাস কিংবা তার চেষ্টার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মজুরেরা ঠিক কাজই করবে। আর জোর করে **মজুরি-বৃদ্ধির** জন্য সংগ্রাম করে তারা ঠিকই করবে, কারণ মজুরি-হ্রাসের বিপক্ষে প্রত্যেকটি **প্রতিক্রিয়া** হচ্ছে মজুরি-বৃদ্ধির স্বপক্ষে **ক্রিয়াস্বরূপ**। অতএব নাগরিক ওয়েস্টনের নিজস্ব **মজুরি স্থিরতার** নীতি অনুসারেই মজুরদের উচিত অবস্থাবিশেষে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও সংগ্রাম করা।

এ সিদ্ধান্ত তিনি যদি না মানেন তবে যে প্রতিজ্ঞা থেকে এর উদ্ভব সেটিকেই তাঁকে অস্বীকার করতে হবে। মজুরির পরিমাণ একটা **স্থির রাশি** বলা তাঁর চলবে না, বরং তাঁকে বলতে হবে যে, যদিও মজুরি **বাড়তে** পারে না ও **বাড়া** উচিত নয় তবুও পুঁজির তরফ থেকে যখনই মজুরি কমানোর মর্জি হবে তখনই তা **কমানো** যেতে পারবে ও তাকে **কমতে** হবে। পুঁজিপতির যদি খুশি হয় আপনাকে মাংসের বদলে আলু আর গমের বদলে জই খাইয়ে

রাখবে, তবে তার সেই খেয়ালকেই ধরতে হবে অর্থশাস্ত্রের নিয়ম বলে ও তা মেনে নিতে হবে। এক দেশের মজুরির হার যদি আর এক দেশের তুলনায় বেশি হয়, যেমন ধরা যাক, যুক্তরাষ্ট্রের হার যদি ইংলণ্ডের তুলনায় বেশি হয়, তবে মজুরির হারের এই তফাৎটাকে আপনাকে মার্কিন পুঁজিপতি ও ইংরেজ পুঁজিপতির মর্জির তফাৎ বলেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এ পদ্ধতি শুধু অর্থনৈতিক ঘটনাবলী নয়, অন্যান্য সবরকম ঘটনার পর্যালোচনাকেও নিশ্চয় ভারি সহজ করে দেবে।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি: মার্কিন পুঁজিপতির মর্জি ইংরেজ পুঁজিপতির মর্জি থেকে ভিন্ন হয় **কেন?** আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আপনাকে যেতে হবে **মর্জির** আওতা ছাড়িয়ে। কোনো পাদ্রি হয়ত আমায় বলতে পারেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ফ্রান্সে একরকম, ইংলণ্ডে অন্যরকম। এবম্বিধ দ্বৈত ইচ্ছা কেন বুঝিয়ে দেবার জন্য জেদ করলে তিনি হয়ত নির্লজ্জভাবে বলে বসবেন যে. ফ্রান্সে একরকম ইচ্ছা আর ইংলণ্ডে অন্যরকম ইচ্ছা থাকাটাই ঈশ্বরের মর্জি। কিন্তু বন্ধু ওয়েস্টন নিশ্চয়ই যুক্তিকে এভাবে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে কথা বলার মতো লোক নন।

যতদূর সম্ভব আদায় করে নেওয়াই অবশ্য পুঁজিপতির **মর্জি**। আমাদের উচিত, পুঁজিপতির **মর্জির** কথা তোলা নয়, তার **ক্ষমতা, সে-ক্ষমতার সীমা** ও **সেই সব সীমার চরিত্র** সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

২। উৎপাদন, মজুরি, মুনাফা

নাগরিক ওয়েস্টন যে-ভাষণ পড়ে আমাদের শোনালেন সেটা খুব সংক্ষেপেই বলা যেত।

তাঁর সমস্ত যুক্তিটা দাঁড়াচ্ছে এই: শ্রমিক শ্রেণী যদি আর্থিক মজুরি হিসেবে চার শিলিং-এর জায়গায় পাঁচ শিলিং দিতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাধ্য করে তবে পণ্য হিসেবে পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং-এর বদলে দেবে চার শিলিং মূল্যের জিনিস। মজুরি বাড়বার আগে শ্রমিক শ্রেণী চার শিলিং দিয়ে যা কিনত, এখন তার জন্য পাঁচ শিলিং খরচ করতে হবে। কিন্তু কেন

এমন হবে? কেন পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং-এর বিনিময়ে মাত্র চার শিলিং মূল্যের জিনিস দেবে? কারণ মোট মজুরির পরিমাণ হচ্ছে নির্দিষ্ট। কিন্তু চার শিলিং মূল্যের পণ্যের পরিমাণেই বা তা নির্দিষ্ট কেন? কেন তিন, দুই বা অন্য কোনো মূল্যের পণ্যের পরিমাণে তা আবদ্ধ নয়? মজুর ও পুঁজিপতি এই উভয়েরই ইচ্ছা নিরপেক্ষ এক অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা যদি মজুরির পরিমাণের মাত্রা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে নাগরিক ওয়েস্টনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল সে নিয়মকে বিবৃত ও প্রমাণিত করা। তাছাড়া এও তাঁর প্রমাণ করা উচিত ছিল যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তবিশেষে যে পরিমাণ মজুরি বাস্তবিকই দেওয়া হয়ে থাকে তা সর্বদাই আবশ্যিক মজুরির পরিমাণের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় — একচুল এদিক ওদিক হয় না। অপর পক্ষে, মজুরির পরিমাণের ঐ বিশেষ মাত্রা যদি পুঁজিপতির **মর্জিমাত্রের** উপরে অথবা তার অর্থলোভের মাত্রার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে তা এক মন-গড়া মাত্রা। তার মধ্যে আবশ্যিক কিছু নেই। পুঁজিপতির মর্জি **অনুসারে** সেই মাত্রা বদলে যেতে পারে — সুতরাং পুঁজিপতির মর্জির **বিরুদ্ধেও** এই মাত্রা বদলানো যায়।

নাগরিক ওয়েস্টন তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে আপনাদের কাছে উদাহরণ দিয়েছেন এই বলে যে, একটি পাত্রে যখন নির্দিষ্ট কয়েকজন লোকের খাওয়ার মতো কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ শুরুয়া থাকে, তখন চামচগুলিকে চওড়ার দিকে বাড়ানোর ফলে শুরুয়ার পরিমাণ বাড়ে না। এই দৃষ্টান্তকে যদি আমি বেকুবি* বলে মনে করি, তবে কিন্তু আমায় মাপ করতে হবে। এতে মেনেনিয়াস এ্যাগ্রিপ্পা যে উপমা প্রয়োগ করেছিলেন, খানিকটা সে কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। রোমের সাধারণ জন যখন রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানে তখন অভিজাত এ্যাগ্রিপ্পা তাদের বলেন যে, অভিজাতরূপী উদরটাই রাষ্ট্রদেহের সাধারণ লোকরূপ অন্যান্য অঙ্গকে আহার্য জোগায়। এ্যাগ্রিপ্পা অবশ্য দেখাতে পারেন নি যে, একজনের পেট ভর্তি করে অপর একজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট করা চলতে পারে। নাগরিক ওয়েস্টন তেমনি ভুলে গেছেন

---

* ইংরেজিতে এখানে শব্দের খেলা আছে: spoon — 'চামচ', 'সাদাসিধে ব্যক্তি' আর spoony — 'বোকা', 'বেকুব'। — সম্পাঃ

যে, মজুরেরা যে পাত্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে তা গোটা জাতীয় শ্রমের উৎপন্ন দিয়েই পূর্ণ, আর তা থেকে তারা যে আরও বেশি নিতে পারছে না তার কারণ হল পাত্রের সংকীর্ণতা নয়, তার ভিতরকার জিনিসের স্বল্পতাও নয়, বরঞ্চ তাদের চামচের ক্ষুদ্রতাই।

পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং নিয়ে চার শিলিং মূল্যের জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারে কী কৌশলে? সে যে পণ্য বিক্রি করে তার দাম বাড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু পণ্যের দাম বৃদ্ধি, আরো সাধারণভাবে বললে, ঐ দামের কোনো পরিবর্তন, পণ্যের দাম জিনিসটাই কি নিতান্ত পুঁজিপতির ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে? নাকি সে ইচ্ছা সফল হতে হলে বিশেষ কতকগুলি অবস্থার প্রয়োজন? তা না হলে বাজার-দরের ওঠানামা, তার নিরন্তর হ্রাসবৃদ্ধি এক অভেদ্য রহস্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা যখন ধরে নিয়েছি, শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে বা নিয়োজিত পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণে বা যে-মুদ্রায় উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য প্রকাশিত হয় তার দামে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, **পরিবর্তন** ঘটেছে **শুধু মজুরির হারেই,** তখন এই **মজুরি-বৃদ্ধি** কী ভাবে **পণ্যের দামকে** প্রভাবিত করতে পারবে? পারবে শুধু এসব পণ্যের চাহিদার সঙ্গে যোগানের বাস্তব অনুপাতের উপর প্রভাব বিস্তার করেই।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, সমগ্রভাবে বিচার করলে শ্রমিক শ্রেণী **আবশ্যিক দ্রব্যাদি** ক্রয়ের খাতে তার আয় খরচ করে ও খরচ করতে হয়। কাজেই, সাধারণভাবে মজুরি বাড়লে **আবশ্যিক দ্রব্যাদির** চাহিদাও বেড়ে যায় এবং ফলে **সেগুলির বাজার-দরও** বাড়ে। যে পুঁজিপতিরা এইসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি তৈরি করে তারা তাদের পণ্যের চড়তি বাজার-দরের ফলে বাড়তি মজুরির খরচা পুষিয়ে নেয়। কিন্তু যেসব পুঁজিপতি এইসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে **না** তাদের ক্ষেত্রে কী হবে? ভাববেন না যে সংখ্যায় তারা অল্প। একবার ভাবুন তো যে, জাতীয় উৎপন্নের দুই-তৃতীয়াংশ ভোগ করছে জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মানুষ। কমন্স সভায় একজন সভ্য সম্প্রতি বলেছেন যে, এরা হল জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ মাত্র। তাহলে বুঝবেন যে, জাতীয় উৎপাদনের কী বিপুল অংশ বিলাসদ্রব্য হিসেবে উৎপন্ন হয় বা বিলাসদ্রব্যের জন্য **বিনিময় করা হয়** এবং কী বিপুল পরিমাণ আবশ্যিক

দ্রব্যাদি অপচয় করা হয় চাপরাশী, ঘোড়া, বিড়াল প্রভৃতির পিছনে। এই অপব্যয় যে আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই বহুলাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে — এ কথা তো আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

তাহলে যেসব পুঁজিপতি আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে না তাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? সাধারণভাবে মজুরি বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের মুনাফার হার যেটুকু কমে যায়, নিজেদের উৎপন্ন পণ্যের দর বাড়িয়ে তারা কিন্তু সেটুকু পুষিয়ে নিতে পারে না, কারণ ঐ সব পণ্যের চাহিদা তো আর বাড়ে নি। তাদের আয় যাবে কমে আর ঐ কমতি আয় থেকে বাড়তি দামের আবশ্যিক দ্রব্যাদি আগের মতো পরিমাণে কিনতে গিয়ে আরো বেশি টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আয় হ্রাস পেল বলে বিলাসদ্রব্যের জন্য ব্যয়ের খাতে তাদের টান ধরবে, আর তাই তাদের নিজ নিজ পণ্যের পারস্পরিক চাহিদা যাবে কমে। এই চাহিদা হ্রাসের ফলে তাদের পণ্যের দাম কমতে থাকবে। সুতরাং শিল্পের এইসব শাখায় মুনাফার হার কমে যাবে — কমে যাবে কেবল সাধারণ মজুরি-হার বৃদ্ধির সরল অনুপাতে নয়, সাধারণ মজুরি-বৃদ্ধি, আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি ও বিলাসদ্রব্যের দাম হ্রাসের চক্রবৃদ্ধি হারেও।

শিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত পুঁজির মুনাফার হারে এই তারতম্যের ফল কী হতে পারে? যখনই, যে-কোনো কারণেই হোক, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফার গড়পড়তা হার বিভিন্ন হলে সাধারণত যা ঘটে থাকে, এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য তাই হবে। কম লাভজনক থেকে বেশি লাভজনক শাখায় পুঁজি ও শ্রম স্থানান্তরিত হতে থাকবে এবং এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলবে যতক্ষণ না শিল্পের এক শাখার পণ্য-যোগান বর্ধিত চাহিদা অনুপাতে বেড়ে উঠছে এবং অপর শাখার পণ্য-যোগান পড়তি চাহিদা অনুযায়ী কমে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন ঘটার পর বিভিন্ন শাখায় মুনাফার সাধারণ হার আবার সমীকৃত হবে। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের অনুপাতের একটা পরিবর্তন থেকেই যেহেতু সমস্ত অব্যবস্থাটা গোড়ায় শুরু হয়েছিল, তাই কারণটুকু চলে গেলে তার ফলাফলও থাকবে না, ফলে দামগুলি আবার তাদের পুরানো স্তরে ও সাম্যাবস্থায় ফিরে যাবে। মজুরি-বৃদ্ধির ফলে মুনাফার হার হ্রাস শ্রমশিল্পের কয়েকটি শাখায় সীমাবদ্ধ না থেকে তখন হয়ে দাঁড়াবে সাধারণ। যে অবস্থা আমরা ধরে নিয়েছি সেই দিক থেকে কথাটা দাঁড়াল এই —

শ্রমের উৎপাদন-শক্তির কোনো বদল হচ্ছে না, উৎপন্নের মোট পরিমাণেরও বদল হচ্ছে না, **কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের রূপটা বদলে যাচ্ছে।** উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ এখন থাকবে আবশ্যিক দ্রব্যাদির আকারে, ক্ষুদ্রতর অংশ থাকবে বিলাসদ্রব্যের রূপে। অথবা যা একই কথা, বিদেশী বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্রতর অংশ বিনিময় হবে ও তার আদি আকারেই ভোগে আসবে, অর্থাৎ ঐ একই কথা, দেশের উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় না হয়ে বিনিময় হবে বিদেশী আবশ্যিক দ্রব্যাদির সঙ্গে। সুতরাং মজুরির হার সাধারণভাবে বেড়ে গেলে বাজার-দরের একটা সাময়িক বিচলিতির পর তার ফল হয় শুধু মুনাফা হারের একটা সাধারণ পড়তি, পণ্যের দামে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে না।

যদি বলা হয় যে, পূর্ববর্তী যুক্তিতে আমি ধরে নিয়েছি সমস্ত বাড়তি মজুরিই আবশ্যিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের খাতে ব্যয় হচ্ছে, তাহলে জবাব দেব যে, আমি নাগরিক ওয়েস্টনের মতের পক্ষে সব থেকে অনুকূল অবস্থাটিই ধরেছি। মজুরেরা আগে ব্যবহার করত না এমন জিনিসপত্রের জন্য যদি বাড়তি মজুরি ব্যয় করা হয় তবে তাদের ক্রয়ক্ষমতা যে সত্যসত্যই বেড়েছে তার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধি পাওয়াতেই এর উৎপত্তি বলে মজুরের ক্রয়ক্ষমতা যতটুকু বাড়ে পুঁজিপতিদের ক্রয়ক্ষমতা ঠিক ততটুকু কমে যাওয়া চাই। অতএব পণ্যসম্ভারের **মোট চাহিদা বাড়বে না,** কিন্তু ঐ চাহিদার বিভিন্ন অংশে **পরিবর্তন ঘটবে।** একদিকে বাড়তি চাহিদার তাল সামলাবে অন্যদিকের কমতি চাহিদা। কাজেই, মোট চাহিদা সমান থাকায় পণ্যসম্ভারের বাজার-দরের কোনোরকম পরিবর্তন ঘটতে পারবে না।

সুতরাং আপনারা দাঁড়াবেন এই উভয়সংকটের মুখোমুখি: হয়, বাড়তি মজুরি সবরকম ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য সমানভাবে ব্যয় হবে; সেক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর তরফের চাহিদা-স্ফীতি পুঁজিপতি শ্রেণীর তরফের চাহিদা-সঙ্কোচনের দ্বারা সমতা বজায় রাখবে। নয়তো, বাড়তি মজুরি ব্যয় হবে শুধু কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য ক্রয়ের খাতেই; সেক্ষেত্রে সেই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বাজার-দর সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে শিল্পের কোনো কোনো শাখায় মুনাফা-হারের বৃদ্ধি ও অন্যান্য শাখায় মুনাফা-হার হ্রাসের জন্য পুঁজি ও শ্রমের বণ্টনে পরিবর্তন ঘটবে এবং তা চলতে থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না পণ্য-

যোগান শিল্পের এক শাখায় বর্ধিত চাহিদার স্তর অবধি ওঠে এবং অন্যান্য শাখায় হ্রাসপ্রাপ্ত চাহিদার স্তর পর্যন্ত নেমে আসে। প্রথম সম্ভাবনা মেনে নিলে পণ্যের দামের কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্বিতীয়টি অনুসারে, বাজার-দরের কিছুটা ওঠানামার পর পণ্যের বিনিময়-মূল্য পুরনো স্তরে ফিরে যাবে। উভয় অবস্থাতেই মজুরি হারের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত মুনাফা-হারের সাধারণ হ্রাস ছাড়া আর কিছু ঘটবে না।

আপনাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নাগরিক ওয়েস্টন অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনারা যেন ভেবে দেখেন ইংলণ্ডের কৃষি-মজুরি সার্বজনীনভাবে নয় শিলিং থেকে আঠারো শিলিং পর্যন্ত বেড়ে গেলে তার ফলাফল কী মুশকিল ঘটাবে। সাবেগে তিনি বলে উঠেছেন, আবশ্যিক দ্রব্যাদির চাহিদার বিপুল বৃদ্ধি ও তারই ফল হিসাবে ভয়াবহ দাম বৃদ্ধির কথা একবার ভেবে দেখুন! কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, মার্কিন কৃষি-মজুরের গড়পড়তা মজুরি ইংরেজ কৃষি-মজুরের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি, যদিও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপন্নের দর ইংলণ্ড থেকে কম, যদিও যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজি ও শ্রমের সাধারণ সম্পর্ক ইংলণ্ডের মতোই এবং যদিও ইংলণ্ডের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ অনেক কম। তবে কেন আমাদের বন্ধু এই পাগলা ঘণ্টি বাজাচ্ছেন? শুধু আমাদের সামনেকার আসল প্রশ্নটিকে সরিয়ে দেবার জন্যই। হঠাৎ নয় শিলিং থেকে আঠারো শিলিং মজুরি বাড়া হচ্ছে সহসা শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি। ইংলণ্ডে মজুরির সাধারণ হার হঠাৎ শতকরা ১০০ ভাগ বাড়তে পারে কিনা আমরা এখানে মোটেই সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বৃদ্ধির **পরিমাণের** সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই — সে পরিমাণ প্রত্যেকটি বাস্তব দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট অবস্থার উপরে নির্ভর করবে ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে। আমাদের দেখতে হবে শুধু মজুরি-হারের সাধারণ বৃদ্ধি, এমন কি যদি তা শতকরা একভাগের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলেও তার ক্রিয়া কী হবে।

বন্ধুবর ওয়েস্টনের কল্পনাপ্রসূত শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধির কথা ছেড়ে দিয়ে আমি গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সত্যসত্যই মজুরির যে বৃদ্ধি ঘটেছিল তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আপনারা সকলেই ১৮৪৮ সাল থেকে যে দশ ঘণ্টা রোজ, অথবা

সঠিকভাবে বললে সাড়ে দশ ঘণ্টা রোজের আইন প্রবর্তিত হয়েছে তার কথা জানেন। আমাদের দেখা বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কয়েকটি স্থানীয় শিল্পব্যবসার ক্ষেত্রে নয়, বরঞ্চ ইংলন্ড দুনিয়ার বাজারে যার জোরে কর্তৃত্ব করে শিল্পের সেই সব অগ্রগণ্য শাখাতেই এ হল এক আকস্মিক ও বাধ্যতামূলক মজুরি-বৃদ্ধি। এই মজুরি-বৃদ্ধি ঘটল একান্ত অসুবিধাজনক ব্যবস্থার মধ্যেই। ডঃ উর, অধ্যাপক সিনিয়র ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য সরকারী অর্থনৈতিক মুখপাত্রেরা **প্রমাণ করেছিলেন** — বলতেই হবে বন্ধু ওয়েস্টনের থেকে অনেক জোরাল যুক্তির জোরেই প্রমাণ করেছিলেন যে, এর ফলে ব্রিটিশ শিল্পের অন্তিম দশা উপস্থিত হবে। তাঁরা প্রমাণ করে দেন যে, এর অর্থ নিছক সাদাসিধে মজুরি-বৃদ্ধি নয় — বরং এর অর্থ হচ্ছে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ-হ্রাস দ্বারা সূচিত এবং তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত মজুরি-বৃদ্ধি। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, যে ১২শ ঘণ্টাটি আপনারা পুঁজিপতির কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছেন সেইটিই হল একমাত্র ঘণ্টা যার থেকে সে মুনাফা কামায়। সঞ্চয় হ্রাস, দাম বৃদ্ধি, বাজার হাতছাড়া, উৎপাদন সংকোচন, সেইহেতু মজুরির উপরে এর প্রতিক্রিয়া এবং পরিণামে সর্বনাশের ভয় দেখান তাঁরা। বস্তুত, তাঁরা বলেই বসলেন যে, মাক্সিমিলিয়ান রবেস্পিয়েরের 'ঊর্ধ্বতম আইন' (২৭) তো এর তুলনায় তুচ্ছ ব্যাপার এবং এক হিসাবে তাঁরা ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল? দৈনিক খাটুনির ঘণ্টা কমে যাওয়া সত্ত্বেও কারখানার মজুরদের মাইনে বৃদ্ধি, কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রমাগত দর হ্রাস, তাদের শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ, পণ্যের জন্য বাজারের একটা অশ্রুতপূর্ব ক্রমবর্ধমান প্রসার। ১৮৬১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে 'বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির' সভায় আমি নিজে মিঃ **নিউম্যানকে** এ কথা স্বীকার করতে শুনেছি যে তিনি, ডাঃ উর, সিনিয়র ও অর্থনীতি বিজ্ঞানের অন্যান্য সরকারী প্রবক্তারা ভুল করেছিলেন আর জনসাধারণের সহজবুদ্ধিই ছিল নির্ভুল। অধ্যাপক ফ্রান্সিস নিউম্যান নন, মিঃ ডব্লিউ নিউম্যানের (২৮) উল্লেখই আমি করছি, কারণ মিঃ **টমাস টুকের** অপূর্ব গ্রন্থ -- যাতে ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত দামের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে -- সেই **'দামের ইতিহাস'এর** সম্পাদক ও অন্যতম লেখক হিসেবে তিনি অর্থনীতি বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি, স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন, শ্রমের উৎপাদন-শক্তির স্থির নির্দিষ্ট মাত্রা, পুঁজিপতিদের স্থির নির্দিষ্ট ও চিরন্তন ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদের বন্ধু ওয়েস্টনের স্থির নির্দিষ্ট ধারণা এবং তাঁর অন্যান্য সব স্থির নির্দিষ্টতা ও চরমকথা যদি ঠিক হয় তবে অধ্যাপক সিনিয়রের সখেদ আশঙ্কাই নির্ভুল হত, আর রবার্ট ওয়েন — ১৮১৫ সালেই যিনি দৈনিক খাটুনির সময় বেঁধে দেওয়াকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির (২৯) প্রথম পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সাধা সংস্কারের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সত্যসত্যই তাঁর নিউ ল্যানার্কের কাপ কলে নিজের দায়িত্বেই তার প্রবর্তনও করেছিলেন — তিনিই ভুল প্রতি হতেন।

দশ ঘণ্টা রোজ আইনের প্রবর্তন ও তার ফলে মজুরি-বৃদ্ধি যে সম ঘটে ঠিক সেই সময়েই গ্রেট ব্রিটেনে **কৃষি-মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি** পায় কী কারণে তা ঘটে এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

আপনারা যাতে বিভ্রান্ত না হন তার জন্য আমার আশু লক্ষ্যের দি থেকে প্রয়োজনীয় না হলেও কয়েকটি গোড়ার কথা বলে নিতে চাই।

কোনো লোক যদি সপ্তাহে দু-শিলিং মজুরি পায় আর তার মজ যদি বেড়ে চার শিলিং হয় তাহলে তার **মজুরির হার** শতকরা ১০০ ভ বৃদ্ধি পায়। এটাকে **মজুরির হারে বৃদ্ধি** হিসাবে দেখলে একটা চমৎ ব্যাপার বলে মনে হবে, যদিও **মজুরির বাস্তব পরিমাণ** — সপ্তাহে শিলিং — তখনও একটা অতি শোচনীয় অনশনমাত্রার আয় হয়েই থাক কাজেই মজুরির **হারের** গালভরা শতকরা হিসাবে নিজেদের ভেসে দেবেন না। সব সময়েই প্রশ্ন তুলতে হবে — **মূল** পরিমাণটা কত

তাছাড়া এ কথাও বোঝা যায়, হপ্তায় ২ শিলিং করে পায় এমন দশ ৫ শিলিং করে পায় এমন পাঁচজন ও ১১ শিলিং করে পায় এমন পাঁ লোক যদি থাকে, তবে কুড়িজন লোক মিলে সপ্তাহে পাবে ১০০ শিলি ৫ পাউন্ড। এখন ধরুন যদি এদের **মোট** সাপ্তাহিক মজুরির পরিমাণ শ ২০ ভাগ বেড়ে যায় তা হলে ৫ পাউন্ড বেড়ে দাঁড়াবে ৬ পাউন্ডে। গড় নিয়ে বলা যায় যে **মজুরির সাধারণ হার** শতকরা ২০ ভাগ বাড়ল, আসলে সেই দশজনের মজুরি একরকমই থেকে গেছে, পাঁচজন লো

একটা দলের মজনুরি মাত্র ৫ শিলিং থেকে ৬ শিলিং বেড়েছে, আর পাঁচজনের অন্য দলের মজনুরি ৫৫ শিলিং থেকে ৭০ শিলিং-এ উঠেছে। অর্ধেক লোকের অবস্থা এখানে কিছনুমাত্র উন্নত হল না, এক-চতুর্থাংশের উন্নতি হল নগণ্য মাত্রায় আর বাকি এক-চতুর্থাংশের অবস্থা বাস্তবিকই উন্নত হয়ে উঠেছে। তবনুও **গড়ের হিসাবে** ঐ কুড়িজন ব্যক্তির মোট মজনুরির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ, আর যে-পনুঁজি তাদের কাজে লাগাচ্ছে তার মোট পরিমাণের ও যে-পণ্য তারা তৈরি করছে তার দামের দিক থেকে ব্যাপারটা হবে ঠিক এমনই যেন তারা সবাই সমানভাবে গড়পড়তা মজনুরি-বৃদ্ধির ভাগ পেয়েছে। কৃষি-মজনুরদের ক্ষেত্রে মজনুরির মান ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন জেলায় বহনুলাংশেই বিভিন্ন রকমের হওয়ায় মজনুরি-বৃদ্ধির ফল তারা পেয়েছে অত্যন্ত অসমভাবে।

সর্বশেষে, ঐ মজনুরি-বৃদ্ধি যে-সময়ে ঘটে সেই সময়েই কতকগনুলি বিরনুদ্ধ প্রভাব কাজ করছিল — যেমন রনুশ যনুদ্ধজনিত (৩০) নতুন ট্যাক্স, ব্যাপকভাবে কৃষি-মজনুরদের বসত-কুটিরের ধনুংসসাধন (৩১), ইত্যাদি।

এইটুকু মনুখবন্ধ করে বলা যাক যে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে কৃষি-মজনুরির গড়পড়তা হার **বেড়েছিল প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ।** আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে আমি আপনাদের কাছে প্রচুর খনুঁটিনাটি তথ্য পেশ করতে পারতাম, কিন্তু বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি নীতিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণী প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট মনে হয়। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু **'কৃষিতে প্রযনুক্ত শক্তিসমনুহ',** লোকান্তরিত মিঃ **জন চ. মর্টন** ১৮৫৯ সালে লন্ডন আর্ট সোসাইটিতে (৩২) এটি পাঠ করেছিলেন। স্কটল্যান্ডের বারোটি ও ইংলন্ডের পঁয়ত্রিশটি কাউন্টির অধিবাসী প্রায় একশ জন কৃষকের কাছ থেকে তিনি যে-সব বিল ও অন্যান্য প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকেই মিঃ মর্টন তাঁর হিসাব খাড়া করেন।

বন্ধনু ওয়েস্টনের মত অননুসারে, ও সেইসঙ্গে কারখানা-মজনুরদের যে যনুগপৎ মজনুরি-বৃদ্ধি ঘটেছিল তার হিসাব এর সঙ্গে ধরলে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যেকার যনুগে কৃষিজাত জিনিসপত্রের দাম প্রচন্ডভাবে বাড়া উচিত ছিল। কিন্তু আসলে ঘটেছিল কী? রনুশ যনুদ্ধ ও ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত পর পর ফসলের মন্দা সত্ত্বেও ইংলন্ডের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে

প্রধান ফসল গমের গড়পড়তা দর ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ এই পর্বের কোয়ার্টার পিছু প্রায় ৩ পাউন্ড থেকে ১৮৪৯-১৮৫৯ পর্বের কোয়ার্টার পিছু প্রায় ২ পাউন্ড ১০ শিলিং-এ নেমে গিয়েছিল। কৃষি-মজুরদের শতকরা ৪০ ভাগ মজুরি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ হল শতকরা ১৬ ভাগেরও বেশি গমের দর হ্রাস। ঐ সময়ের ভিতর যদি আমরা ঐ যুগের প্রথমদিকের সঙ্গে শেষদিকের, অর্থাৎ ১৮৪৯-এর সঙ্গে ১৮৫৯-এর যদি তুলনা করি তবে তার মধ্যে দেখা যায় যে, নিঃস্বদের সরকারী সংখ্যা ৯,৩৪,৪১৯ থেকে কমে গিয়েছিল ৮,৬০,৪৭০-এ — পার্থক্যটা ৭৩, ৯৪৯ জনের। আমি মানছি যে, এ হ্রাস খুবই কম এবং পরের বছরগুলিতে তা বজায়ও থাকে নি, কিন্তু তবু তা হ্রাস তো বটেই।

বলা যেতে পারে শস্য আইন (৩৩) বাতিল হবার ফলে ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ সাল এই পর্বের তুলনায় ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ এই পর্বে বিদেশী শস্য আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাতেই বা কী? নাগরিক ওয়েস্টনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক যে, বিদেশী বাজারে এই আকস্মিক, বিপুল ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা সেখানকার কৃষিজাত দ্রব্যের দরকে নিশ্চয়ই মারাত্মক রকম চড়িয়ে দেবে — বাইরে থেকেই হোক বা ভিতর থেকেই হোক বর্ধিত চাহিদার ফলাফল এক হবারই কথা। আসলে ঘটল কী? ফসল-মন্দার সামান্য কয়েকটি বছর ছাড়া এই গোটা যুগটাতেই শস্যের দরের সর্বনাশা পড়তি নিয়ে ফরাসী দেশে একটানা চেঁচামেচি চলে; মার্কিনদের বার বার করে পোড়াতে হল উদ্বৃত্ত উৎপন্ন; আর মিঃ আর্কার্টের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, রাশিয়াও তখন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের প্ররোচনা যোগায়, কারণ ইউরোপের বাজারে তার কৃষি-রপ্তানি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল মার্কিন প্রতিযোগিতার চাপে।

নাগরিক ওয়েস্টনের যুক্তির **বিমূর্ত রূপটা** দাঁড়ায় এই রকম: সর্বদাই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের ভিত্তিতেই প্রতিটি চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সুতরাং তার ফলে **কখনও ঈপ্সিত দ্রব্যাদির যোগান বাড়তে** পারে না, **বাড়তে** পারে **শুধু তার মুদ্রা-দর**। কিন্তু সবথেকে মামুলি পর্যবেক্ষণের ফলেও দেখা যায় যে, চাহিদা-বৃদ্ধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্যের বাজার-দরকে একেবারেই অপরিবর্তিত রাখে এবং অপরক্ষেত্রে বাজার-দর সাময়িকভাবে চড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে যোগান বাড়বে এবং তারপরে দর **আগের পর্যায়ে**

ও অনেক সময় আগের পর্যায়েরও নিচে নেমে যাবে। বাড়তি মজুরি বা অন্য যে কোনো কারণের জন্যই চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটুক না কেন, তাতে মোটেই সমস্যার অবস্থান্তর ঘটে না। নাগরিক ওয়েস্টনের মত অনুসরণ করতে গেলে মজুরি বৃদ্ধির অনন্যসাধারণ অবস্থার ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলির ব্যাখ্যা যত কঠিন হয়, এই সাধারণ অবস্থার ঘটনাবলির ব্যাখ্যাও তেমনি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সে সম্পর্কে তাঁর যুক্তির কোনও বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা নেই। যে নিয়মগুলির ফলে চাহিদা-বৃদ্ধির দরুন শেষ পর্যন্ত বাজার-দর না চড়ে বরং যোগানই বৃদ্ধি পায়, সে নিয়মগুলির হেতু নির্ণয়ে তাঁর হতবুদ্ধিতাই শুধু এতে প্রকাশ পাচ্ছে।

৩। মজুরি ও কারেন্সি

বিতর্কের দ্বিতীয় দিনে আমাদের বন্ধু ওয়েস্টন তাঁর পুরনো বক্তব্যগুলি নতুন ছাঁদে সাজালেন। তিনি বললেন: আর্থিক মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেলে তার ফলে সেই মজুরি দিতে বেশি মুদ্রা লাগবে। যেহেতু মুদ্রার পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট, সুতরাং সেই স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার সাহায্যে কী করে আপনারা বর্ধিত আর্থিক মজুরি দিতে পারবেন? প্রথমে আর্থিক মজুরি-বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মজুরের বরাদ্দ পণ্যের পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট বলে বিপত্তি ঘটল; এখন মুশকিল বাধছে পণ্যের পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট হলেও আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে। অবশ্য তাঁর গোড়ার আপ্তবাক্যটা যদি আপনারা বাতিল করেন তাহলে তাঁর পরবর্তী নালিশও দূর হয়ে যায়।

যা হোক, আমি দেখাব যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই কারেন্সি সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই।

আপনাদের দেশে আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা ইউরোপের যে কোনো দেশের চাইতে অনেক বেশি উন্নত। ব্যাঙ্কব্যবস্থার পরিধি ও কেন্দ্রীকরণের কল্যাণে একই পরিমাণ মূল্যের সঞ্চালনে এবং একই, এমন কি অধিক পরিমাণ ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য অনেক কম কারেন্সির প্রয়োজন হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মজুরির দিক থেকে দেখলে ইংরেজ কারখানা-মজুর প্রতি সপ্তাহে দোকানদারকে তার মজুরি-লব্ধ অর্থ তুলে দেয়, দোকানদার আবার প্রতি সপ্তাহে সেই অর্থ ব্যাঙ্কমালিককে জমা দেয়। ব্যাঙ্ক আবার প্রতি সপ্তাহে শিল্পপতিকে সে অর্থ ফেরত দেয়। সে আবার সেই অর্থ মজুরদের দেয় ইত্যাদি। এই কৌশলের ফলে একজন মজুরের গোটা বছরের মজুরিই, ধরুন ৫২ পাউন্ড, কেবল একটিমাত্র পাউন্ড মুদ্রার সাহায্যে দেওয়া চলে, যা প্রতি সপ্তাহে এই চক্রে ঘুরে আসে। এমন কি ইংলণ্ডেও এ ব্যবস্থা স্কটল্যাণ্ডের মতো উন্নত নয় এবং সর্বত্র সমান উন্নতও নয়; কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, নিছক শিল্পপ্রধান অঞ্চলের তুলনায় কোনো কোনো কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অনেক কম পরিমাণ মূল্য চলাচলের জন্য অনেক বেশি কারেন্সির প্রয়োজন হয়।

আপনারা যদি ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে যান তবে দেখবেন **আর্থিক মজুরি** সেখানে ইংলণ্ডের থেকে অনেক কম, কিন্তু জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে তা সঞ্চালিত হয় **অনেক বেশি পরিমাণ কারেন্সির** সাহায্যে। স্বর্ণ মুদ্রাটি সেখানে অত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের হাতে পড়বে না বা শিল্পপুঁজিপতির কাছে ফেরত যাবে না; আর তাই একটি স্বর্ণ মুদ্রার মাধ্যমে বছরে ৫২ পাউন্ড সঞ্চালন করানোর জায়গায় হয়তো ২৫ পাউণ্ডের মতন মজুরি সঞ্চালন করাতেই তিনটি স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হবে। সুতরাং ইউরোপীয় ভূখণ্ডের দেশগুলির সঙ্গে ইংলণ্ডের তুলনা করলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবেন যে, বেশি আর্থিক মজুরির চাইতে হয়তো কম আর্থিক মজুরি সঞ্চালন করাতেই অনেক বেশি কারেন্সির প্রয়োজন হতে পারে। এটা হচ্ছে আসলে আমাদের বর্তমান আলোচনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত একটা টেকনিকাল ব্যাপারমাত্র।

সবথেকে ভাল হিসাব যা আমার জানা আছে সে অনুসারে এই দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বাৎসরিক আয় ২৫ কোটি পাউন্ড বলে ধরা যেতে পারে। এই বিপুল অঙ্কটির সঞ্চালনে লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউন্ড। ধরুন শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি বেড়ে গেল। তা হলে ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের জায়গায় ৪৫ লক্ষ পাউন্ড লাগবে। মজুরদের দৈনিক খরচের মস্ত বড় একটা অংশ রুপো ও তামায় অর্থাৎ সোনার সঙ্গে যার আপেক্ষিক মূল্য অভাঙ্গা কাগুজে মুদ্রার

মতো আইনের দ্বারা মনগড়াভাবে নির্ধারিত হয় এমন প্রতীক-মুদ্রাতেই চলে। এইজন্য আর্থিক মজুরি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়লে বেশি করে ধরলেও দশ লক্ষ পাউন্ড পরিমাণ অতিরিক্ত স্বর্ণ মুদ্রার চলাচলই যথেষ্ট হবে। ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড বা বেসরকারী ব্যাঙ্কের ভান্ডারে বর্তমানে যে দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণপিন্ড বা মুদ্রা নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে আছে, তাই তখন সঞ্চালন করতে থাকবে। প্রয়োজনীয় বাড়তি কারেন্সির অভাবের দরুন কোনো অসুবিধা উপস্থিত হলে ঐ দশ লক্ষের বাড়তি মুদ্রণ বা ব্যবহারজনিত বাড়তি ক্ষয়ক্ষতির সামান্য খরচটুকুও এড়ানো যেতে পারে এবং এড়ানোই হবে। আপনারা সবাই জানেন যে, এ দেশের কারেন্সি দুটো মস্ত ভাগে বিভক্ত। একটা ভাগ হল বিভিন্ন মূল্যের ব্যাঙ্ক-নোট — ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়ী লেনদেনের জন্য এবং ভোক্তাদের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের মোটা রকমের মূল্য দেবার সময়ে এর ব্যবহার হয়। আর এক ধরনের কারেন্সি — ধাতব মুদ্রা চলে খুচরো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে। স্বতন্ত্র হলেও এই দুই ধরনের কারেন্সি পরস্পরের ক্ষেত্রেও কাজ চালায়। তাই এমনকি মোটা রকমের পাওনা মেটাবার সময়েও ৫ পাউন্ডের কম খুচরো অঙ্কের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বর্ণমুদ্রা চলে। ধরুন যদি আগামীকাল ৪ পাউন্ড, ৩ পাউন্ড বা ২ পাউন্ডের নোট চালু হয় তাহলে এই সব চলাচলের খাতে যে সোনা চলছে তা তখনই সেখান থেকে হঠে গিয়ে চলে যাবে সেইসব খাতে যেখানে আর্থিক মজুরি বাড়ার ফলে তা প্রয়োজন। এইভাবে শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি-বৃদ্ধির দরুন যে বাড়তি দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন — একটি স্বর্ণমুদ্রা না বাড়িয়েও তার যোগান দেওয়া সম্ভব হতে পারে। আবার একটি মাত্র বাড়তি ব্যাঙ্ক-নোট ছাড়াও ঐ এক ফলই পাওয়া যেতে পারে বাড়তি হুন্ডি চলাচল মারফত — যেমন বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল ল্যাঙ্কাশায়ারে।

নাগরিক ওয়েস্টন কৃষি-মজুরদের মজুরির ক্ষেত্রে যেমন ধরেছেন, মজুরির হার ঐ রকম শতকরা একশ ভাগ বৃদ্ধি পেলে আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম যদি বিপুল পরিমাণে বাড়ে এবং তাঁর কথা মতো এমন বাড়তি টাকার দরকার পড়ে যা যোগানো অসম্ভব, তা হলে **সাধারণভাবে মজুরি কমে গেলে** বিপরীত দিকেও নিশ্চয়ই একই ফল একই মাত্রায় দেখা যাবে। বেশ! আপনারা সবাই জানেন যে, ১৮৫৮-১৮৬০ এই কটা বছর তুলাশিল্পের পক্ষে সবচেয়ে

শ্রীবৃদ্ধির বছর ছিল আর সেইদিক থেকে আশ্চর্যরকম ভাবেই ১৮৬০ সালটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে অতুলনীয় হয়ে রয়েছে, আবার সেই সঙ্গে শিল্পের অন্য সব শাখাগুলিতেও সে বছরে সমৃদ্ধতম অবস্থা ছিল। তুলাশিল্পের মজুরদের ও সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত শিল্পের মজুরদের মজুরি ১৮৬০ সালে আগের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তারপর এল আমেরিকার সঙ্কট এবং ঐ মোট মজুরি হঠাৎ আগেকার পরিমাণের প্রায় এক-চতুর্থাংশে নেমে গেল। বিপরীত দিকে হলে এটা হত শতকরা ৩০০ ভাগ মজুরিবৃদ্ধি। মজুরি পাঁচ থেকে বেড়ে কুড়ি হলে আমরা বলি যে, শতকরা ৩০০ ভাগ বেড়েছে; যদি কুড়ি থেকে কমে তা পাঁচে দাঁড়ায় আমরা বলি শতকরা ৭৫ ভাগ কমেছে, অথচ বাড়তির ক্ষেত্রেই হোক অথবা কমতির ক্ষেত্রেই হোক, মজুরি বাড়া-কমার পরিমাণ ঠিক একই অর্থাৎ পনেরো শিলিংই থাকছে। তাই তখন এসেছিল মজুরি-হারের এক অভূতপূর্ব ও আকস্মিক পরিবর্তন। তুলাব্যবসায়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত শুধু তারাই নয়, তার উপরে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল সমস্ত মজুরের হিসাব যদি আমরা রাখি তাহলে দেখি যে, সে পরিবর্তনের আওতার মধ্যে যত মজুর পড়েছে তাদের সংখ্যা কৃষি-মজুরদের সংখ্যার দেড়গুণ। কিন্তু গমের দাম কি তখন কমেছিল? ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সাল এই তিন বছরে ঐ দাম কোয়ার্টার পিছু বাৎসরিক গড়পড়তা ৪৭ শিলিং ৮ পেন্স থেকে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ এই তিন বছরে কোয়ার্টার পিছু বাৎসরিক গড়পড়তা ৫৫ শিলিং ১০ পেন্সে **বেড়ে উঠল**। আর কারেন্সির ব্যাপারে, ১৮৬০ সালে যেখানে ৩৩,৭৮,১০২ পাউন্ড মুদ্রা টাঁকশালে মুদ্রিত হয়েছিল সেখানে ১৮৬১ সালে ৮৬,৭৩,২৩২ পাউন্ড মুদ্রা মুদ্রিত হল। অর্থাৎ ১৮৬০ সালের থেকে ১৮৬১ সালে ৫২,৯৫,১৩০ পাউন্ড মুদ্রা বেশি মুদ্রিত হয়। এ কথা ঠিক যে, ১৮৬০ সালের চেয়ে ১৮৬১ সালে ব্যাঙ্ক-নোট চালু থাকে ১৩,১৯,০০০ পাউন্ড কম। সেটা বাদ দিন। তা হলেও ১৮৬০ সালের সমৃদ্ধ বছর থেকে ১৮৬১ সালের ৩৯,৭৬,১৩০ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪০,০০,০০০ পাউন্ড বেশি মুদ্রা থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গেই ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের স্বর্ণপিন্ডের মজুদ ঠিক ততটাই না হলেও প্রায় সমানুপাতে কমে যায়।

১৮৪২-এর সঙ্গে ১৮৬২ সালের তুলনা করুন। চালু পণ্যের মূল্য ও পরিমাণের প্রচণ্ড বৃদ্ধি ছাড়াও ১৮৬২ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের রেলওয়ের শেয়ার, ঋণ ইত্যাদির নিয়মিত লেনদেনের বাবদই শুধু পুঁজি ব্যয়িত হয় ৩২,০০,০০,০০০ পাউণ্ড; ১৮৪২ সালে এ সংখ্যা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য বলে বোধ হত। তবু মোট চালু মুদ্রার পরিমাণ ১৮৬২ ও ১৮৪২ সালে প্রায় সমানই ছিল, এবং শুধু পণ্যই নয়, মোটামুটি সমস্ত রকম আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই মূল্যের প্রচণ্ড ক্রমবর্ধমানতা সত্ত্বেও সাধারণভাবে আপনারা কারেন্সির ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণই দেখতে পাবেন। বন্ধু ওয়েস্টনের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এ ধাঁধার সমাধান নেই।

ব্যাপারটাকে আর একটু তলিয়ে দেখলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, মজুরির কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও, তাকে স্থির বলে ধরে নিলেও সঞ্চালনীয় পণ্যের মূল্য ও পরিমাণ এবং সাধারণভাবে যে পরিমাণ আর্থিক লেনদেন মেটানো হয়, তার পরিমাণ প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়; যে ব্যাঙ্ক-নোট ছাড়া হয় তার পরিমাণ প্রতিদিন বদলায়; মুদ্রার মাধ্যম বিনাই বিল, চেক, খাতাপত্রে ঋণ, ক্লিয়ারিং হাউস মারফত যে পরিমাণ প্রাপ্য মেটানো হয় প্রতিদিনই তার পরিবর্তন হচ্ছে; নগদ ধাতব কারেন্সির যতটা দরকার পড়ে সেক্ষেত্রেও, যে মুদ্রা চালু রয়েছে এবং যে মুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড মজুদ রয়েছে কিংবা ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে নিষ্ক্রিয় রয়েছে তার অনুপাত প্রতিদিন বদলায়; দেশের আভ্যন্তরিক লেনদেনের জন্য যে পরিমাণ স্বর্ণ লাগে এবং আন্তর্জাতিক সঞ্চালনের জন্য বাইরে যে পরিমাণ স্বর্ণ চালান হয় তার অনুপাতও রোজই বদলে যাচ্ছে। তিনি দেখতে পেতেন যে কারেন্সির স্থিরতা সম্পর্কে তাঁর অন্ধ বিশ্বাসটি একটা মস্ত ভুল, দৈনন্দিন ঘটনাগতির সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতিই নেই। কারেন্সির নিয়ম সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাকে মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হিসেবে খাড়া না করে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে কোন্ কোন্ নিয়মের বলে কারেন্সি নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় বরং সেই সম্পর্কেই তিনি অনুসন্ধান করতে পারতেন।

৪। যোগান ও চাহিদা

আমাদের বন্ধু ওয়েস্টন 'repetitio est mater studiorum' (পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বিদ্যাভ্যাসের জননী) এই ল্যাটিন প্রবাদ মানেন। তাই তিনি আবার তাঁর গোড়াকার আপ্তবাক্যটির পুনরাবৃত্তি করছেন এই নতুন রূপে যে, মজুরি-বৃদ্ধিজনিত কারেন্সি সংকোচের ফলে পুঁজি কমে যাবে, ইত্যাদি। কারেন্সি সম্পর্কে তাঁর উদ্ভট ধারণা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি; তাই কারেন্সি সম্পর্কিত তাঁর কাল্পনিক দুর্বিপাক থেকে যেসব কাল্পনিক ফলাফল উৎসারিত হবে বলে তিনি আন্দাজ করেছেন সে নিয়ে আলোচনা আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় তাঁর যে **একটিমাত্র অভিন্ন আপ্তবাক্যের** বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, আমি আর কালক্ষেপ না করে **সেটির সহজতম তাত্ত্বিক রূপটি** দেখাব।

একটিমাত্র মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে কী রকম বিচারবিমুখ মনোভাব নিয়ে তিনি বিষয়টিতে হাত দিয়েছেন। তিনি ওকালতি করেছেন মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, অথবা সেই বৃদ্ধিজনিত উচ্চ মজুরির বিরুদ্ধে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি — বেশি মজুরি আর কম মজুরি বলতে তিনি কী বোঝেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, সপ্তাহে পাঁচ শিলিং মজুরি কেন কম ও বিশ শিলিং মজুরিই বা বেশি কেন? বিশের তুলনায় পাঁচ যদি কম হয় তবে দু'শর তুলনায় বিশ তো আরো কম। তাপমান যন্ত্রের সম্পর্কে যদি কাউকে বক্তৃতা করতে হয় আর যদি তিনি বেশি ও কম তাপমাত্রা নিয়ে গলাবাজি শুরু করেন তবে কোনও জ্ঞানই তিনি বিতরণ করবেন না। তাঁকে গোড়াতেই বলতে হবে, কী করে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বার করতে হয় আর কীভাবে তাপমান যন্ত্রের বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারকের খামখেয়ালির দ্বারা নয়, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই ঐ প্রমাণ-মাত্রাগুলি নির্দিষ্ট। মজুরি ও মুনাফার ব্যাপারে নাগরিক ওয়েস্টন যে শুধু অর্থনৈতিক নিয়ম থেকে ঐ ধরনের প্রমাণ-মাত্রা বার করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। কম ও বেশি — বাজার-চলতি এই বুলিটার নির্দিষ্ট অর্থ আছে এই কথা মেনে নিয়েই তিনি খুশী, যদিও এ কথা

স্বতঃসিদ্ধ যে মজুরি মাপবার মতো একটা প্রমাণ-মাত্রার সঙ্গে তুলনা করেই বলা চলে মজুরি বেশি কি কম।

তিনি আমায় বলতে পারবেন না কেন বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। যদি তিনি জবাব দেন — যোগান ও চাহিদার নিয়ম দ্বারাই এটা নির্দিষ্ট হয়েছে, তাহলে আমি তাঁকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব, যোগান ও চাহিদা নিজেরাই বা কোন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়? সে জবাব তখন তাঁকেই ফেলবে বেকায়দায়। শ্রমের যোগান ও চাহিদার মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় ও তারই সঙ্গে বদলায় শ্রমের বাজার দর। চাহিদা যদি যোগানকে ছাপিয়ে যায় তাহলে মজুরি বাড়ে; যোগান যদি চাহিদাকে ছাপায় তবে মজুরি কমে, যদিও সে পরিস্থিতিতে যোগান ও চাহিদার সংক্রান্ত অবস্থা **যাচাই করার** জন্য, ধরুন, ধর্মঘট বা অন্য কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যোগান ও চাহিদাকেই যদি আপনি মজুরি-নিয়ামক নিয়ম বলে মেনে নেন তাহলে মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গলাবাজি করা যেমন ছেলেমানুষি তেমনই নিরর্থক হবে, কারণ যে পরম নিয়মের আপনি দোহাই পাড়ছেন সেই নিয়ম অনুসারেই কিছুদিন অন্তর অন্তর মজুরি হ্রাসের মতোই কিছুদিন পরে পরে মজুরি-বৃদ্ধিও সমান আবশ্যিক ও সঙ্গত। যোগান ও চাহিদাকে যদি আপনি মজুরি-নিয়ামক নিয়ম বলে না মানেন তাহলে আমি আবার প্রশ্ন তুলব — কেন বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়?

কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে বিবেচনা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই: শ্রম বা অন্য কোনো পণ্যের মূল্য শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় যোগান ও চাহিদার দ্বারা — একথা ভাবলে আপনারা সম্পূর্ণ ভুল করবেন। বাজার-দরের সাময়িক **উঠতি-পড়তিটুকু** ছাড়া যোগান ও চাহিদা আর কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে না। কোনো পণ্যের বাজার-দর কেন তার **মূল্যের** ওপরে ওঠে বা নিচে নামে যোগান ও চাহিদা তার কারণ আপনাদের বোঝাতে পারবে, কিন্তু সেই খাস **মূল্যটা** সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা তারা দিতে পারবে না। ধরুন, যোগান ও চাহিদা সমান সমান হল, অথবা অর্থতাত্ত্বিকেরা যা বলেন, সাম্যাবস্থায় উপনীত হল। এই বিপরীত শক্তিদুটি সমান সমান হওয়া মাত্রই তো তারা পরস্পরকে অকেজো করে ফেলবে, এদিক বা ওদিক কোনো দিকেই তারা তখন কাজ করতে

পারবে না। যে মুহূর্তে যোগান ও চাহিদা পরস্পর সমান সমান হয় এবং তার ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখনই পণ্যের বাজার-দর তার আসল মূল্যের সঙ্গে, যাকে ঘিরে পণ্যের বাজার-দর ওঠানামা করে সেই নির্দিষ্টমান দামের সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং, ঐ মূল্যের প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে হলে বাজার-দরের ওপর যোগান ও চাহিদার সাময়িক প্রভাবের কোনো কথা আসে না। মজুরি ও অন্য সমস্ত পণ্যের দামের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৫। মজুরি ও দাম

সহজতম তত্ত্বগতরূপে পর্যবসিত করলে আমাদের বন্ধুর সমস্ত যুক্তিগুলি এই একটিমাত্র আপ্তবাক্যে দাঁড়ায়: **'পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় মজুরির দ্বারা।'**

এই অচল ও ভ্রান্তপ্রমাণিত যুক্তিবিভ্রমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে আমি বাস্তব পর্যবেক্ষণের আবেদন জানাতে পারতাম। আপনাদের বলতে পারতাম যে, ইংরেজ কারখানা-মজুর, খনি-শ্রমিক, জাহাজী-মজুর প্রভৃতি যাদের শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত উঁচু — সস্তা উৎপন্নের দরুন সব জাতির থেকে কম দামে তাদের মাল বিকোয়। অথচ ধরুন ইংরেজ কৃষি-মজুর, যার শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত কম, তার উৎপন্ন সামগ্রীর উঁচু দামের ফলে প্রায় সবদেশই পণ্য বিক্রয় করে তার থেকে কম দামে। একই দেশের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশের পণ্যের মধ্যে তুলনা টেনে দেখাতে পারতাম যে, কিছু ব্যতিক্রম — যতটা বাহ্যিক ততটা আসলে নয় — বাদ দিলে গড়পড়তায় উঁচু দামের শ্রম উৎপাদন করে সস্তা দামের পণ্য এবং সস্তা দামের শ্রম উৎপাদন করে উঁচু দামের পণ্য। অবশ্য এর থেকে প্রমাণ হবে না যে, একক্ষেত্রে শ্রমের উঁচু দাম ও অন্যক্ষেত্রে তার সস্তা দামই যথাক্রমে ঐ ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফলের কারণ। তবু এর থেকে অন্তত এটা প্রমাণ হয় যে, পণ্যের দাম শ্রমের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। অবশ্য এই ধরনের হাতুড়ে পদ্ধতি প্রয়োগ আমাদের পক্ষে একেবারেই বাহুল্য।

'পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় মজুরির দ্বারা' — বন্ধুবর ওয়েস্টন এই আপ্তবাক্যের অবতারণা করেছেন বললে তা হয়ত অস্বীকার

করা হবে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি কখনও একে সূত্রাকারে উপস্থিত করেন নি। বরঞ্চ তিনি এ কথাই বলেছেন যে, পণ্যের দামের মধ্যে মুনাফা ও খাজনারও অংশ রয়েছে, কারণ পণ্যের দাম থেকে শুধু মজুরের মজুরি নয়, পুঁজিপতির মুনাফা ও ভূস্বামীর খাজনাও দিতে হয়। তাহলে তাঁর ধারণা অনুসারে দাম গঠিত হয় কী ভাবে? প্রথমত, মজুরি দিয়ে। তারপরে তার সঙ্গে বাড়তি একটি শতকরা অংশ যোগ করা হয় পুঁজিপতি বাবদ এবং আর একটি অংশ ভূস্বামী বাবদ। ধরুন কোনো পণ্য-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের মজুরি হচ্ছে দশ। মুনাফা-হার যদি শতকরা ১০০ ভাগ হয় তবে যে মজুরি আগাম দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পুঁজিপতি যোগ দেবে দশ, আর খাজনা-হারও মজুরির শতকরা ১০০ ভাগ হলে এর সঙ্গে যোগ হবে আরো দশ। তাহলে পণ্যের মোট দাম দাঁড়াবে ত্রিশ। কিন্তু এভাবে দাম নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে নিতান্ত মজুরি দ্বারাই দাম নির্ধারণ। এ ক্ষেত্রে যদি মজুরি বেড়ে বিশে দাঁড়ায় তাহলে পণ্যের দাম হবে ষাট ইত্যাদি। তদনুসারে অর্থশাস্ত্রের যেসব সেকেলে লেখকেরা মজুরিই দাম নিয়ন্ত্রণ করে এই আপ্তবাক্যের পত্তন করেছিলেন, তাঁরা এ সূত্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুনাফা ও খাজনাকে **মজুরির উপর বাড়তি কিছু শতকরা অংশ হিসেবে** দেখিয়ে। অবশ্য তাঁদের কেউই ঐ শতকরা অংশের মাত্রাকে কোনো অর্থনৈতিক নিয়মের মধ্যে ফেলতে পারেন নি। বরঞ্চ মনে হয় যেন তাঁরা ভাবেন ঐতিহ্য, প্রচলিত প্রথা, পুঁজিপতির ইচ্ছা বা এই ধরনের যথেচ্ছ ও ব্যাখ্যাতীত কোনো পদ্ধতিতেই মুনাফা নির্ধারিত হয়। যদি তাঁরা বলেন যে, মুনাফা নির্দিষ্ট হয় পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে, তাহলেও কিছুই বলা হবে না। সেই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যবসায়ের ভিন্ন ভিন্ন মুনাফার হারকে নিশ্চয়ই সমান করতে থাকে, অথবা বিভিন্ন হারকে একটা গড়পড়তা মাত্রায় এনে ফেলে, কিন্তু মাত্রাটিকে অথবা সাধারণ মুনাফা-হারকে তা কখনই নির্ধারিত করতে পারে না।

পণ্যের দাম মজুরির দ্বারা নির্ধারিত হয় এ কথা বলতে কী বোঝায়? শ্রমের দামের নামই যেহেতু মজুরি, তাই বোঝায় যে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমের দাম দিয়ে। যেহেতু '**দাম**' হচ্ছে বিনিময়-মূল্য -- এবং মূল্য বলতে আমি সর্বদা বিনিময়-মূল্যই বুঝিয়েছি -- **মুদ্রার অঙ্কে ব্যক্ত** বিনিময়-মূল্য, তাই বক্তব্যটি দাঁড়ায় এই রকম যে, '**পণ্যের মূল্য** নির্ধারিত হয়

শ্রমের মূল্য দিয়ে'। অথবা **'শ্রমের মূল্যই হল মূল্যের সাধারণ পরিমাপ'**।

কিন্তু **'শ্রমের মূল্যটা'** তাহলে স্থির হয় কী ভাবে? এইখানেই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য থমকাতে হয় যদি যুক্তিসম্মতভাবে আমরা চিন্তা করতে চাই। এ মতবাদের প্রবক্তারা অবশ্য যুক্তিগত নীতিনিষ্ঠার পরোয়া করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বন্ধু ওয়েস্টনকেই ধরুন। গোড়ায় তিনি আমাদের বললেন যে, মজুরিই পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে আর কাজেই মজুরি বাড়ালে দামও বাড়তে বাধ্য। তারপর তিনি উল্টো গেয়ে আমাদের দেখালেন যে, মজুরি বাড়লে কিছু লাভ নেই, কারণ পণ্যের দাম বেড়ে যাবে এবং কারণ, যেসব পণ্যের পেছনে মজুরি খরচ করা হয় তাদের দাম দিয়েই আসলে তা মাপা হয়। অর্থাৎ এই বলে শুরু করা হল যে, শ্রমের মূল্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে, আর শেষ করা হল এই বলে যে, পণ্যের মূল্য শ্রমের মূল্য স্থির করে। এইভাবে এক অতি জটিল কুম্ভীপাকের মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাব, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছব না।

মোটের উপর এটা স্পষ্ট যে, কোনো একটা পণ্যের মূল্যকে যেমন ধরুন শ্রম, শস্য, বা অন্য কোনো পণ্যের মূল্যকে, মূল্যের সাধারণ পরিমাপ ও নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করলে সংকট ঠেলে রাখা হয় মাত্র, কারণ একটি মূল্য যার নিজেরই পরিমাপ প্রয়োজন তাকে দিয়েই আমরা স্থির করেছি আর একটি মূল্য।

'মজুরি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে' — এই আপ্তবাক্যকে সব থেকে অমূর্তভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় এই যে, 'মূল্য নির্ধারিত হয় মূল্যের দ্বারাই' এবং এই পুনরাবৃত্তির অর্থ এই যে, আসলে মূল্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলে অর্থশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কিত সমস্ত যুক্তিতর্ক শুধু বাচালতাতেই পর্যবসিত হয়। তাই রিকার্ডোর মস্ত কীর্তি হল এই যে, তিনি ১৮১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর **'অর্থশাস্ত্রের নীতিসমষ্টি'** গ্রন্থে 'মজুরি দাম নির্ধারণ করে' এই সাবেকী অতি প্রচলিত, জরাজীর্ণ যুক্তিবিভ্রম সমূলে খন্ডন করেন — সেই যুক্তিভ্রম যা অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর ফরাসী পূর্বগামীরা তাঁদের গবেষণার সত্যকার বৈজ্ঞানিক অংশে বর্জন করলেও জন-প্রচারিত স্থূল অধ্যায়গুলিতে আবার তা পুনরুদ্ধৃত করেছিলেন।

৬। মূল্য ও শ্রম

নাগরিকগণ, আমি এখন এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে আমাকে প্রশ্নটির সত্যকার পরিব্যাখ্যানের মধ্যে যেতে হবে। খুব সন্তোষজনক ভাবে এ কাজ করার প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না, কারণ তা করতে হলে আমাকে অর্থশাস্ত্রের সমগ্র এলাকা ধরে টান দিতে হবে। ফরাসীরা যাকে বলে মাত্র 'effleurer la question' আমি তেমনি শুধু মূল কথাগুলি ছুঁয়ে যেতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন তুলতে হবে: পণ্যের **মূল্য** কী? কী ভাবে তা নির্ধারিত হয়?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পণ্যের মূল্য জিনিষটা বুঝি একেবারেই **আপেক্ষিক**; একটি পণ্যকে অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে না দেখলে বুঝি মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। বাস্তবিকই, মূল্য বলতে, অর্থাৎ কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য বলতে আমরা অন্য সব পণ্যের সঙ্গে আনুপাতিক পরিমাণে তার যে লেনদেন হয় তা-ই বুঝে থাকি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে: পণ্যসমূহের ভিতর পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাতটাই বা নির্ধারিত হয় কী ভাবে?

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, এই অনুপাতগুলি অসংখ্য ধরনের হতে পারে। কোনো একটি পণ্যকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ গমকে ধরলে আমরা দেখব যে, বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে প্রায় অসংখ্য রকমের নানা অনুপাতে এক কোয়ার্টার গমের বিনিময় হতে পারে। তবু **তার মূল্য বরাবরই একই থাকায়** রেশম, সোনা বা অন্য যে-কোনো পণ্যের মাধ্যমেই তা প্রকাশ পাক না কেন, বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে **বিনিময়ের বিভিন্ন হার** থেকে তাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটা সত্তা হতেই হবে। বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে এই বিভিন্ন সমীকরণগুলিকে একেবারেই অন্যরূপে প্রকাশ করা অবশ্য সম্ভব।

তাছাড়া আমি যদি বলি এক কোয়ার্টার গমকে এক বিশেষ অনুপাতে লোহার সঙ্গে বিনিময় করা যায়, বা এক কোয়ার্টার গমের মূল্য এক বিশেষ পরিমাণ লোহার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহলে আমি এ কথাই বলি যে, গমের মূল্য ও লোহার ক্ষেত্রে তার তুল্যমূল্য হচ্ছে **তৃতীয় একটি জিনিসের** সমান যা গমও নয় লোহাও নয়, কারণ আমি ধরে নিয়েছি যে দুই বিভিন্ন রূপে

ওরা একটা পরিমাণকেই প্রকাশ করছে। কাজেই দুয়ের মধ্যে যে-কোনোটিকে, তা সে গমই হোক আর লোহাই হোক, অপরটির ওপর নির্ভর না করেই তৃতীয় একটি জিনিসে পরিণত করা যেতে পারে, যে তৃতীয় জিনিসটি হল তাদের উভয়েরই সাধারণ পরিমাপ।

এই ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করার জন্য আমি খুবই সহজ একটি জ্যামিতিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। সবরকম সম্ভাব্য রূপ ও আয়তনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তুলনা করার সময়, অথবা চতুষ্কোণ বা অন্য যে কোনো ঋজুরেখ ক্ষেত্রের সঙ্গে ত্রিকোণের ক্ষেত্রফল তুলনা করার সময়ে আমরা কী করি? আমরা যে কোনো ত্রিকোণের ক্ষেত্রফলকে পরিণত করি এমন একটা আকারে যা তার দৃশ্য-রূপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ত্রিকোণের ক্ষেত্রফল তার ভূমি ও উচ্চতার গুণফলের অর্ধেক — ত্রিকোণের চরিত্র থেকে একথা জেনে আমরা এবার নানারকম ত্রিকোণের এবং যে কোনো ঋজুরেখ ক্ষেত্রের নানা মূল্য তুলনা করতে পারি, কারণ সমস্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্রকেই কতকগুলি ত্রিকোণে ভাগ করা সম্ভব।

বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের বেলায়ও ঐ একই ধরনের পদ্ধতি থাকা উচিত। সমস্ত পণ্যকেই পরিণত করতে পারা চাই এমন একটা অভিব্যক্তিতে যা তাদের সকলকার পক্ষেই সাধারণ এবং এই একই পরিমাপটা যে বিভিন্ন অনুপাতে তাদের মধ্যে বর্তমান তাই দিয়েই তাদের পার্থক্য।

যেহেতু পণ্যের **বিনিময়-মূল্য** ঐসব দ্রব্যের নিছক **সামাজিক ক্রিয়া**, তাদের **স্বাভাবিক** গুণাগুণের সঙ্গে এ বিনিময়-মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেহেতু গোড়াতেই আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে: সমস্ত পণ্যের ভিতরকার সাধারণ **সামাজিক সারবস্তু** কী? সে হচ্ছে **শ্রম**। কোনো পণ্য উৎপাদন করতে গেলে তার উপর কিছু পরিমাণ শ্রম লাগাতে হবে, তার মধ্যে কিছু শ্রম রূপায়িত করতেই হবে। এখানে আমি শুধু **শ্রমই** নয়, **সামাজিক** শ্রমের কথাই বলছি। যদি কেউ তার নিজের আশু ব্যবহারের জন্য এবং নিজেই তা ভোগ করার জন্য কোনো সামগ্রী উৎপাদন করে তাহলে সে যা সৃষ্টি করল তা হল **উৎপন্ন দ্রব্য**, কিন্তু **পণ্য** নয়। একজন আত্মপোষক উৎপাদনকারী হিসেবে সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটি **পণ্য** উৎপাদন করতে গেলে মানুষকে শুধু **সামাজিক** চাহিদা মেটাবার মতো কোনো সামগ্রী উৎপাদন

করলেই চলবে না, তার নিজের শ্রমকেও **সমাজ** যে **শ্রম** ব্যয় করে তার সমগ্র পরিমাণের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হতে হবে। এ **শ্রমকে সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রমবিভাগের** অধীন হতে হবে। অন্যান্য শ্রমবিভাগ না থাকলে সে শ্রম কিছুই নয়, এবং তার কাজও আবার ঐ শ্রমবিভাগকে **সুসম্পূর্ণ** করা।

পণ্যকে যদি আমরা **মূল্য হিসেবে** বিবেচনা করি তবে আমরা তাকে কেবল **মূর্ত, নির্দিষ্ট** অথবা বলা যায় **ঘনীভূত সামাজিক শ্রম** — এই একটা দিক থেকেই বিচার করি। এই দিক থেকে তাদের ভিতরে **পার্থক্য হতে** পারে কেবল তাদের মধ্যে নিহিত কম বা বেশি পরিমাণ শ্রম দিয়ে। যেমন একটা ইটের চেয়ে রেশমী রুমালের মধ্যে হয়ত বেশি পরিমাণ শ্রম নিহিত হয়েছে। কিন্তু **শ্রমের পরিমাণ** কী করে মাপা যায়? **যতক্ষণ শ্রম চলল সেই সময়টা** দিয়ে, ঘণ্টা, দিন প্রভৃতির মাপে শ্রমকে পরিমাপ করেই। অবশ্য এই মাপকাঠি প্রয়োগ করতে গেলে বিভিন্ন রকমের শ্রমকে দাঁড় করাতে হয় তাদের একক হিসেবে গড়পড়তা বা সরল শ্রমে।

তাই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হচ্ছি: পণ্যের **মূল্য** থাকে, কারণ তা **সামাজিক শ্রমের ঘনীভূত রূপ।** তার মূল্যের, অর্থাৎ **আপেক্ষিক** মূল্যের **বিপুলতা** নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত এই সামাজিক সারবস্তুর পরিমাণের কমবেশির ওপরে, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের জন্য যে শ্রম লাগে তার আপেক্ষিক পরিমাণের ওপরে। সুতরাং **পণ্যসমূহের আপেক্ষিক মূল্য যথাক্রমে তাদের** মধ্যে **নিযুক্ত, মূর্ত, নির্দিষ্ট শ্রমের পরিমাপ** বা **পরিমাণের দ্বারাই** নির্ধারিত হয়। **একই শ্রম-সময়ের** মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের **যথাক্রমে** যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তা **সমান।** অথবা কোনো দুই পণ্যের মূল্যের অনুপাত যথাক্রমে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রম-পরিমাণের অনুপাতের সমান।

আমার আশঙ্কা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করবেন: তাহলে মজুরি দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং তার উৎপাদনের জন্য যে **আপেক্ষিক পরিমাণ** শ্রম লাগে তার দ্বারা নির্ধারণ এই দুয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই অত বিপুল, অথবা আদৌ কোনো পার্থক্য আছে? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, শ্রমের **পারিশ্রমিক** ও শ্রমের **পরিমাণ** হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এক কোয়ার্টার গম ও এক আউন্স সোনায় **সমান**

পরিমাণ শ্রম নিহিত আছে। আমি এ দৃষ্টান্ত নিচ্ছি কারণ **বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন** ১৭২৯ সালে প্রকাশিত 'কাগজী মুদ্রার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান' শীর্ষক তাঁর প্রথম প্রবন্ধে এটি ব্যবহার করেন; মূল্যের সত্যকার প্রকৃতি যাঁরা সবার আগে ধরতে পেরেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। যাই হোক, আমরা তাহলে ধরে নিচ্ছি যে, এক কোয়ার্টার **গম** ও এক আউন্স সোনা **সমান মূল্যের** বা **তুল্যমূল্য,** কারণ তারা হচ্ছে **সমান পরিমাণ গড়পড়তা শ্রমের ঘনীভূত রূপ,** তাদের মধ্যে যথাক্রমে অত দিন বা অত সপ্তাহের শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে। সোনা ও শস্যের আপেক্ষিক মূল্য এইভাবে নির্ধারণের সময়ে আমরা কি কোনক্রমে কৃষি-মজুর ও খনি-মজুরের **মজুরির** কথা টেনে আনছি? মোটেই না। রোজকার বা সপ্তাহের শ্রমের দরুন **কী ভাবে** তাদের পাওনা দেওয়া হয়েছিল অথবা মজুরি-শ্রম আদৌ নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা -- এসব আমরা সম্পূর্ণ **অনির্ধারিত** রাখছি। মজুরি-শ্রম নিয়োগ করা হলেও মজুরি খুবই অসমান থাকতে পারে। এক কোয়ার্টার গমের মধ্যে যে মজুরের শ্রম রূপ পেয়েছে সে হয়ত পেয়েছে মাত্র দু'বুশেল গম আর খনিতে নিযুক্ত মজুরের জুটে থাকতে পারে ঐ এক আউন্স সোনার আধখানা। অথবা তাদের মজুরি সমান ধরলে সে-মজুরি তাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য থেকে সর্ববিধসম্ভব অনুপাতে ভিন্ন হতে পারে। এক কোয়ার্টার গম বা এক আউন্স সোনার অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ অথবা অন্য যে কোনো আনুপাতিক অংশ হতে পারে ঐ মজুরি। অবশ্য তাদের **মজুরি** তারা যে পণ্য উৎপাদন করছে তার মূল্যকে **ছাপিয়ে যেতে** বা তার থেকে **বেশি** হতে পারে না, কিন্তু তার থেকে **কম** হতে পারে সম্ভাব্য সবরকম মাত্রায়। উৎপন্ন সামগ্রীর **মূল্য** দিয়ে তাদের **মজুরি সীমাবদ্ধ** হবে, কিন্তু মজুরি দিয়ে **তাদের উৎপন্নের মূল্য** সীমাবদ্ধ হবে না। আর সর্বোপরি মূল্য, উদাহরণস্বরূপ শস্য ও সোনার আপেক্ষিক মূল্য স্থির হবে নিহিত শ্রমের মূল্য অর্থাৎ **মজুরির** সাথে কোনরকম সম্পর্ক না রেখেই। যে **আপেক্ষিক পরিমাণ শ্রম তাদের মধ্যে বিধৃত** আছে তাই দিয়ে পণ্যসমূহের মূল্য বিচার হল শ্রমের মূল্য বা **মজুরি** দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের যে একই কথা বলার পদ্ধতি রয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই ব্যাপারটা অবশ্য পরে এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য নিরূপণের সময় **সর্বশেষে** যে শ্রম নিয়োগ করা হল তার পরিমাণের সঙ্গে পণ্যের কাঁচামালের ভিতরে **ইতিপূর্বেই** যে শ্রম বিধৃত রয়েছে এবং যেসব সরঞ্জাম, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও বাড়িঘরের সহায়তা নিয়ে ঐ শ্রম করা হয়েছে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণটাও যোগ দিতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতোর মূল্য হল সুতো কাটা প্রক্রিয়ায় তুলার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম যোগ করা হল, তুলার নিজের ভিতরেই ইতিপূর্বে যে পরিমাণ শ্রম মূর্ত ছিল, কয়লা, তেল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যেসব সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে তাদের ভিতরে যে পরিমাণ শ্রম মূর্ত রয়েছে, বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও টাকু বা কারখানাঘর প্রভৃতিতে যে পরিমাণ শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে, এ সব কিছু শ্রমের ঘনীভূত রূপ। সঠিকভাবে যাকে উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়, যেমন হাতিয়ারপত্র, যন্ত্রপাতি, ভবন, উৎপাদনের পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি কাল ধরে এগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়। কাঁচামালের মতো এগুলি যদি এক দফাতেই ব্যবহৃত হয়ে যেত তাহলে যেসব পণ্য উৎপাদনে এরা সহায়তা করে তাদের মধ্যে এদের সমগ্র মূল্যই হয়ে যেত সঞ্চারিত। কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেহেতু একটি টাকু ক্রমশ ক্ষয় পায় তাই তার গড় আয়ুষ্কালের উপরে ভিত্তি করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ধরুন একদিনে তার মোটামুটি ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অপচয়ের উপরে ভিত্তি করে একটা গড়পড়তা হিসাব করা হয়। এইভাবে আমরা হিসাব করি প্রতিদিন যে সুতো কাটা হয় তার মধ্যে টাকুর কতটা মূল্য সঞ্চারিত হচ্ছে, এবং ধরুন এক পাউন্ড সুতোর মধ্যে যে মোট পরিমাণ শ্রম বিধৃত থাকে তার মধ্যে কতটা অংশ উক্ত টাকুটির মধ্যে নিহিত শ্রম পরিমাণ থেকে পাওয়া গেল। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ ব্যাপার নিয়ে আর বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

মনে হতে পারে যে পণ্যের মূল্য যদি **তার উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম বিধৃত হয়েছে** তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাহলে মানুষ যত কুড়ে বা যত বেশি আনাড়ি হবে তার পণ্যও তত মূল্যবান হবে, কারণ পণ্য তৈরি করতে পরিশ্রমের সময় তার বেশি লাগবে। এটা অবশ্য একটা শোচনীয় ভুল। আপনাদের হয়ত মনে আছে যে আমি এর আগে **'সামাজিক** শ্রম' কথাটি ব্যবহার করেছি এবং **'সামাজিক'** এই বৈশিষ্ট্য আরোপের মধ্যে অনেক কথাই

নিহিত আছে। পণ্যের মূল্যে নির্ধারিত হয় তার মধ্যে যে **পরিমাণ শ্রম বিধৃত** বা ঘনীভূত রয়েছে — একথা বলতে তাই সমাজের একটা নির্দিষ্ট অবস্থায়, উৎপাদনের কতকগুলি নির্দিষ্ট সামাজিক গড়পড়তা পরিস্থিতিতে, বিশেষ এক সামাজিক গড়পড়তা প্রখরতায়, এবং নিয়োজিত শ্রমের গড়পড়তা দক্ষতার সাহায্যে পণ্য উৎপাদনে যে **পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন** হয় তার কথা বোঝাচ্ছি। ইংলণ্ডে হাতে-চালানো তাঁতের সঙ্গে কলের তাঁত যখন পাল্লা দিয়ে এল, তখন একটা বিশেষ পরিমাণ সুতোকে এক গজ কাপড়ে পরিণত করতে আগে যতক্ষণ শ্রম করতে হত তার মাত্র অর্ধেক সময়ের প্রয়োজন হল। অবশ্য হাতে-চালানো তাঁতের তাঁতী বেচারাকে আগে যেখানে নয়-দশ ঘণ্টা কাজ করলেই চলত এখন সেখানে দিনে সতেরো-আঠারো ঘণ্টা খাটতে হল। তবুও তার নিজস্ব শ্রমের বিশ ঘণ্টার ফল এখন মাত্র দশ ঘণ্টা সামাজিক শ্রমের, অর্থাৎ এক বিশেষ পরিমাণ সুতোকে কাপড়ে পরিণত করতে সামাজিকভাবে আবশ্যিক দশ ঘণ্টা শ্রমের তুল্য হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং তার বিশ ঘণ্টার শ্রমের ফলের এখন যা মূল্য সেটা পূর্বেকার দশ ঘণ্টা শ্রমের ফলের চেয়ে বেশি নয়।

অতএব পণ্যে যে পরিমাণ সামাজিকভাবে আবশ্যিক শ্রম মূর্ত হয়েছে তাই যদি তার বিনিময়-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে কোনো পণ্য উৎপাদনে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার মূল্যও বৃদ্ধি পাবে, আর তা হ্রাস পেলে মূল্যও হ্রাস পাবে।

বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ যদি স্থির থাকে তাহলে তাদের আপেক্ষিক মূল্যও স্থির থাকবে। কিন্তু তা ঘটে না। নিয়োজিত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের পক্ষে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণও ক্রমাগত বদলাতে থাকে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত বেশি হবে, এক বিশেষ শ্রম-সময়ের মধ্যে তত বেশি জিনিস উৎপন্ন হবে; আর শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত কম হবে, সেই সময়ের মধ্যে জিনিস তত কম তৈরি হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিগুলি চাষ করার দরকার পড়ে তাহলে একই পরিমাণ ফসল পাওয়া যেতে পারে কেবল বেশি পরিমাণে শ্রম করেই, আর কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্যও তার ফলে বেড়ে যাবে। অন্যদিকে আধুনিক উৎপাদনের উপায়ের সাহায্যে একদিনের শ্রমে একজন সুতোকাটুনী যদি

ঐ একই সময়ে চরকায় কাটা সুতোর বহু হাজার গুণ সুতো কাটতে পারে, তাহলে এটাও পরিষ্কার যে, প্রতি পাউন্ড তুলায় আগের থেকে বহু হাজার গুণ কম সুতোকাটুনী শ্রম নিহিত থাকবে, কাজেই প্রতি পাউন্ড তুলোর সঙ্গে সুতো কাটার ফলে যে মূল্য যুক্ত হবে তা আগের তুলনায় হাজার ভাগ কম। সুতোর মূল্যও পড়ে যাবে সেই অনুপাতে।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম স্বাভাবিক কর্মশক্তি ও অর্জিত কর্মদক্ষতার কথা বাদ দিলে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি প্রধানত নির্ভর করবে:

প্রথমত, শ্রমের **প্রাকৃতিক** অবস্থার উপরে, যেমন জমির উর্বরতা, খনির সমৃদ্ধি ইত্যাদি;

দ্বিতীয়ত, **শ্রমের সামাজিক শক্তির** ক্রমান্বয় উন্নতিসাধনের ওপর, যা আসে বিপুল মাত্রায় উৎপাদন, পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সংযোজন, শ্রমের বিভাজন, যন্ত্রের প্রয়োগ, উন্নত পদ্ধতি, রাসায়নিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ ও পরিবহণের ফলে দেশ ও কালের সংকোচন, এবং আর যেসব কৌশলে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিকে শ্রমের কাজে লাগায় ও যাতে শ্রমের সামাজিক বা সমবায়ী চরিত্র বিকশিত হয়, তা থেকে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত বেশি হয়, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রীর উপর ব্যয় হয় তত কম শ্রম। কাজেই সেই সামগ্রীর মূল্যও ততই কম হবে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত কম হয় সম পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রী তত বেশি শ্রমসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই ততই বেশি হয় তার মূল্য। একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে তাই আমরা বলতে পারি:

পণ্যের মূল্য নির্ণীত হয় তার উৎপাদনে যতটা শ্রম-সময় প্রযুক্ত হয় তার সাক্ষাৎ অনুপাতে এবং প্রযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিপরীত অনুপাতে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু **মূল্যের** কথা বলার পরে এবার আমি **দাম** সম্পর্কে কয়েকটি কথা যোগ করব। দাম হচ্ছে মূল্যেরই একটি বিশেষ রূপ।

স্বতন্ত্রভাবে দেখলে **দাম মূল্যের মুদ্রাগত অভিব্যক্তি** ছাড়া আর কিছু নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে সমস্ত পণ্যের মূল্য সোনার দামের মারফৎ প্রকাশ পায় আর ইউরোপীয় ভূখন্ডে তার প্রকাশ প্রধানত রূপার দামের মারফৎ। অন্যান্য পণ্যের মতো সোনা বা রূপার মূল্যও নিয়ন্ত্রিত হয় তা আহরণের জন্য যে শ্রম লাগে তার পরিমাণ দ্বারাই। আপনাদের দেশের উৎপন্নের একটা

নির্দিষ্ট পরিমাণ যার মধ্যে দেশবাসীদের **শ্রমেরই** একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘনীভূত রয়েছে, তা আপনারা বিনিময় করছেন সোনা ও রূপা উৎপাদনকারী অন্য দেশের উৎপন্নের সঙ্গে, যার মধ্যে ঘনীভূত রয়েছে **তাদের** শ্রমেরও নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ। এইভাবেই আসলে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেই আপনারা সমস্ত পণ্যের মূল্যকে অর্থাৎ ঐসব পণ্যের উপরে যথাক্রমে যে শ্রম প্রযুক্ত হয়েছে তাকে, সোনা ও রূপায় প্রকাশ করতে শেখেন। **মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ** বা অন্য কথায় **মূল্যের দামে রূপান্তরের** ব্যাপারটিকে একটু তলিয়ে দেখলে আপনারা বুঝবেন যে, সেটা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা আপনি সমস্ত পণ্যের **মূল্যকে** একটা **স্বাধীন ও সমমাত্রিক রূপ** দিচ্ছেন, অথবা যার দ্বারা আপনি তাদের প্রকাশ করছেন **সমান** সামাজিক শ্রমের বিভিন্ন পরিমাণরূপে। এই পর্যন্ত যেহেতু দাম হচ্ছে মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ মাত্র, সেহেতু **অ্যাডাম স্মিথ** তাকে বলেছেন **স্বাভাবিক দাম**, ফরাসী ফিজিওক্রাটরা বলেছেন **'আবশ্যিক দাম'** [prix nécessaire]

মূল্য ও **বাজার-দর** অথবা **স্বাভাবিক দাম** ও **বাজার-দরের** মধ্যে **সম্পর্কটা** তাহলে কী? আপনারা সবাই জানেন, ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদনের অবস্থায় যতই তারতম্য থাকুক না কেন, একই ধরনের সমস্ত পণ্যের **বাজার-দর একই**। উৎপাদনের গড়পড়তা পরিস্থিতিতে, বাজারে একটি বিশেষ সামগ্রী নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করার জন্য **সামাজিক শ্রমের** যে **গড়পড়তা পরিমাণ** প্রয়োজন হয়, বাজার-দর তাকেই প্রকাশ করে। নির্দিষ্ট ধরনের কোনো পণ্যের সমগ্র পরিমাণের উপরেই এই হিসাব করা হয়।

একটা পণ্যের **বাজার-দর** আর তার **মূল্য** এই পর্যন্ত একই। অন্যদিকে মূল্য বা স্বাভাবিক দামের কখনো উপরে, কখনো বা নিচে বাজার-দরের যে উঠতি-পড়তি, তা যোগান ও চাহিদার ওঠানামার ওপরেই নির্ভরশীল। মূল্য থেকে বাজার-দর অনবরত বিচ্যুত হয়ে চলে, কিন্তু **অ্যাডাম স্মিথের** কথা অনুসারে,

স্বাভাবিক দাম হচ্ছে যেন কেন্দ্রীয় দাম, যার দিকে সমস্ত পণ্যের দাম ক্রমাগতই আকর্ষিত হচ্ছে। নানা আকস্মিক ঘটনা কখনো কখনো দামকে ঐ স্বাভাবিক দামের বহু উপরে উঠিয়ে দিতে পারে, কখনো বা এমন কি তার কিছুটা নিচেও নামিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু স্থিরতা ও অপরিবর্তনীয়তার এই কেন্দ্রে স্থিতিলাভ করার পথে যে প্রতিবন্ধকই ব্যাহত করুক না কেন, ওরই (৩৬) দিকে দামের অবিরত আকর্ষণ।'

এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের অবকাশ নেই। শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, **যদি** যোগান ও চাহিদা পরস্পরের ভারসাম্য ঘটায়, তাহলে পণ্যের বাজার-দর তার স্বাভাবিক দাম অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের যথাক্রমিক পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত যে মূল্য তারই অনুরূপ হবে। কিন্তু যোগান ও চাহিদা পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য ঘটাবার চেষ্টা **করবেই** যদিও তা করবে মাত্র এক ধরনের বিচ্যুতিকে আর এক ধরনের বিচ্যুতি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে, উঠতিকে পড়তি দিয়ে এবং পড়তিকে উঠতি দিয়ে। শুধু রোজকার উঠতি-পড়তি বিচারের বদলে আপনারা যদি দীর্ঘতর কাল জুড়ে বাজার-দরের গতি বিশ্লেষণ করেন, যেমন করেছেন মিঃ টুক তাঁর **'দামের ইতিহাস'** গ্রন্থে, তাহলে দেখবেন যে, বাজার-দরের হ্রাসবৃদ্ধি, মূল্য থেকে তাদের বিচ্যুতি, তাদের ওঠানামা পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে ও পরস্পরের ক্ষতিপূরণ করে। কাজেই একচেটিয়া শিল্পের ফলাফল ও আরো কয়েকটি ব্যতিক্রমের প্রসঙ্গ যা আমাকে আপাতত এড়িয়ে যেতে হচ্ছে তাদের বাদ দিলে, সব ধরনের পণ্যই গড়ে তাদের নিজ নিজ **মূল্য** বা স্বাভাবিক দামেই বিক্রয় হয়। যে গড়পড়তা কালের মধ্যে বাজার-দরের উঠতি-পড়তি পরস্পরের কাটাকুটি করে যায় তা ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, কারণ চাহিদার সঙ্গে যোগান খাপ খাওয়ানো কোনো একটা পণ্যের পক্ষে সহজ, কোনো পণ্যের পক্ষে কঠিন।

কাজেই মোটামুটিভাবে এবং কিছুটা দীর্ঘতর কাল হিসাবে ধরলে যদি বলা চলে সবরকমের পণ্য তাদের আপন আপন মূল্যেই বিক্রয় হয়, তাহলে বিশেষ কোনো একটি ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন ব্যবসায়ের নিয়মিত ও স্বাভাবিক মুনাফা উদ্ভূত হয় পণ্যের দাম **বাড়িয়ে** অথবা **মূল্যের** তুলনায় উচ্চতর দামে তাকে বিক্রয় করে — একথা ভাবা অর্থহীন। সামগ্রিকভাবে উপস্থিত করলে এ ধারণার অসম্ভাব্যতা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বিক্রেতা হিসেবে লোকে অনবরত যা লাভ করতে থাকবে, সমান অনবরত তাই লোকসান দেবে ক্রেতা হিসেবে। একথা বললে চলবে না যে, এমন মানুষ আছে যারা বিক্রেতা

নয়, শুধুই ক্রেতা বা উৎপাদক নয়, শুধুই ভোক্তা। এই লোকেরা উৎপাদকদের যা দিয়ে থাকে তা প্রথমে উৎপাদকদের কাছ থেকেই বিনা প্রতিদানেই তাদের পাওয়া চাই। যদি কোনো লোক প্রথমে আপনার টাকা নেয় ও পরে আপনার পণ্য কিনতে গিয়ে সেই টাকাই ফেরৎ দেয়, তাহলে আপনি ঐ লোকের কাছে পণ্য অতিরিক্ত চড়া দামে বিক্রয় করে কখনই বড়লোক হতে পারবেন না। এই ধরনের লেনদেন হয়তো লোকসান কমাতে পারে, কিন্তু কখনও মুনাফা কামাতে সহায়তা করবে না।

সুতরাং **মুনাফার সাধারণ প্রকৃতি** ব্যাখ্যা করতে গেলে আপনাকে শুরু করতে হবে এই সূত্র থেকেই যে, গড়পড়তা হিসাবে পণ্য **বিক্রয় হয় তার আসল মূল্যে** এবং **পণ্যকে তার মূল্যে** অর্থাৎ তার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম নিহিত রয়েছে সেই অনুপাতে **বিক্রি করেই মুনাফা অর্জিত হয়।** এই কথাটি মেনে নিয়ে যদি আপনি মুনাফার হেতু নির্ধারণ না করতে পারেন তাহলে কোনদিনই আপনি তার হদিশ পাবেন না। কথাটা আপাতবিরোধী ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বোধ হয়। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে আর জল যে দুটি ভীষণ দাহ্য বাষ্প দিয়ে গড়া এও তো আপাতবিরোধী। পদার্থের বিভ্রান্তিকর বাহ্যরূপটাই শুধু ধরা পড়ে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়, তাই সেই অভিজ্ঞতার দৃষ্টি থেকে বৈজ্ঞানিক সত্য তো সর্বদাই আপাতবিরোধী।

৭। শ্রম-শক্তি

তাড়াহুড়ো করে যতটা সম্ভব তার মধ্যে **মূল্যের, যে কোনো পণ্যের মূল্যের** প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার পর এখন আমাদের নজর ফেরাতে হবে বিশেষ করে **শ্রমের মূল্যের** দিকে। আর এখানেও আবার এক আপাতবিরোধী বক্তব্য দিয়ে আপনাদের চমকে দিতে হবে। আপনাদের সকলেরই নিশ্চিত ধারণা এই যে, প্রত্যহ শ্রমিকেরা যা বিক্রয় করে তা হচ্ছে তাদের শ্রম, তাই শ্রমের একটা দাম আছে আর যেহেতু পণ্যের দাম শুধু তার মূল্যের মুদ্রাগত অভিব্যক্তি, তাই **শ্রমের মূল্য** বলেও নিশ্চয় একটা জিনিস আছে। কিন্তু

সাধারণভাবে কথাটি যে অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেভাবে **শ্রমের মূল্য** বলে কোনো জিনিসই নেই। আমরা দেখেছি পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় শ্রম ঘনীভূত থাকে তাই হল তার মূল্য। এখন, মূল্য সম্পর্কে এই ধারণা প্রয়োগ করে কী করে আমরা, ধরুন, দশ ঘণ্টা খাটুনির রোজের মূল্য বিচার করব? ঐ রোজের ভিতর কতটা শ্রম আছে? দশ ঘণ্টার শ্রম। দশ ঘণ্টার খাটুনির রোজের মূল্য দশ ঘণ্টার শ্রম বা তার মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণ একথা বলা মানে কেবল একই কথা ঘুরিয়ে বলা এবং তদুপরি একটা অর্থহীন কথা বলার সামিল। অবশ্য **'শ্রমের মূল্য'** কথাটির প্রকৃত অথচ প্রচ্ছন্ন অর্থটি একবার ধরতে পারলে আমরা মূল্যের এই অযৌক্তিক আপাত-অসম্ভব প্রয়োগের ব্যাখ্যা করতে পারব, ঠিক যেমন নভোচারী গ্রহ নক্ষত্রের প্রকৃত গতি সম্পর্কে একবার নিশ্চিত হতে পারলে আমরা তাদের আপাতগোচর অথবা কেবল পরিদৃশ্যমান গতিবিধিরও ব্যাখ্যা করতে পারি।

শ্রমিক যা বিক্রয় করে তা সরাসরি তার **শ্রম** নয়, বরং তার **শ্রম-শক্তি**, সাময়িকভাবে সেটা সে তুলে দেয় পুঁজিপতির হাতে। ব্যাপারটা এতই সঠিক যে, ইংরাজী আইনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশের আইন অনুসারে তো বটেই, একজন মানুষ কতক্ষণ তার শ্রম-শক্তি বেচতে পারবে তার **ঊর্ধ্বতম সময়** নির্দেশ করা আছে। যে কোনো অনির্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম-শক্তি বিক্রয় মঞ্জুর করা মাত্রই সেটা হবে দাসত্ব প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বিক্রয় যদি জীবদ্দশা পর্যন্ত ধরা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক এতে মালিকের আজীবন ক্রীতদাস হয়ে পড়বে।

ইংলন্ডের প্রাচীনতম অর্থতাত্ত্বিক ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তার দার্শনিকদের অন্যতম **টমাস হব্‌স** ইতিপূর্বেই তাঁর **'লেভিয়াথান'** নামক গ্রন্থে পরবর্তী সমস্ত পণ্ডিতদের দ্বারা উপেক্ষিত এই ব্যাপারটিকে সহজ বুদ্ধির বলে আঁচ করে যান। তিনি বলেন,

> 'অন্যান্য জিনিসের মতো মানুষের মূল্য বা কদর হচ্ছে তার যা দাম, অর্থাৎ তার শক্তি ব্যবহারের জন্য তাকে যতটা দেওয়া হবে তাই।'

এই ভিত্তি থেকে শুরু করলে আমরা অন্যান্য পণ্যের মতো **শ্রমের মূল্যও** স্থির করতে পারি।

কিন্তু তা করার আগে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি: বাজারে যে চোখে পড়ে একদিকে একদল ক্রেতা যারা জমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও জীবনধারণের উপকরণাদি, যার মধ্যে অনাবাদী জমি ছাড়া বাকি সবই হল **শ্রমোৎপন্ন জিনিস**, এ সমস্ত কিছুরই মালিক, এবং অন্যদিকে অপর একদল বিক্রেতা, যাদের শ্রম-শক্তি, খাটবার দু-খানা হাত ও মাথা ছাড়া বেচবার মতো আর কিছুই নেই — এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে কী করে? একটি দল মুনাফা লুটবার ও বড়লোক হবার জন্য ক্রমাগত কিনছে আর অপর দলটি জীবিকা অর্জনের জন্য ক্রমাগত বেচছে — এ কেমন ঘটনা। এই প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধানের অর্থ হচ্ছে অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন **'পূর্ববর্তী** বা **আদি সঞ্চয়'**, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাকে বলা উচিত **আদি লুণ্ঠন**, তার সম্পর্কে অনুসন্ধান। আমরা দেখতে পাব যে, এই তথাকথিত **আদি সঞ্চয়** এমন কতগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয় যার ফল হল মেহনতী মানুষের সঙ্গে তার শ্রমের উপকরণের **আদি ঐক্যের ভাঙন**। সে অনুসন্ধান অবশ্য আমার বর্তমান বিচার্য বিষয়ের বাইরে। মেহনতী মানুষ এবং তার শ্রমের উপকরণের ভিতরকার **বিচ্ছেদ** একবার কায়েম হয়ে যাবার পর সে অবস্থা চালু থাকবে আর ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তার ব্যাপকতা বেড়ে চলবে, যতদিন না উৎপাদন-পদ্ধতিতে নূতন ও মূলগত এক বিপ্লব আবার তাকে উলটিয়ে দেয় এবং নতুন এক ঐতিহাসিক রূপে সেই আদি ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটায়।

শ্রম-শক্তির মূল্য তাহলে কী?

অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই এর মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ দ্বারাই। মানুষের শ্রম-শক্তির অস্তিত্ব শুধু তার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যেই। বেড়ে ওঠা ও বেঁচে থাকার জন্যই মানুষকে কতকগুলি আবশ্যিক দ্রব্যাদি ভোগ করতেই হয়। কিন্তু মানুষও যন্ত্রের মতোই জীর্ণ হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় অন্য মানুষকে নিতে হবে। **তার নিজের** জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তা ছাড়াও শ্রমের বাজারে তার স্থান গ্রহণ এবং শ্রমিকদের বংশ রক্ষা করতে পারে এমন কিছু সংখ্যক সন্তান পালনের জন্য সে চায় আরও কিছু পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি। তাছাড়া তার শ্রম-শক্তির উন্নয়ন ঘটাতে ও নির্দিষ্ট একটা

দক্ষতা অর্জন করতে হলে আরও কিছু পরিমাণ মূল্য খরচ করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে শুধুমাত্র **গড়পড়তা** শ্রমের বিচারই যথেষ্ট, যার মধ্যে শিক্ষণ ও উন্নয়নের খরচটা নগণ্য পরিমাণ। তবু এই উপলক্ষের সুযোগে আমি বলতে চাই যে, যেমন বিভিন্ন গুণাগুণের শ্রম-শক্তি উৎপাদনের খরচও বিভিন্ন, তেমনই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রম-শক্তির মূল্যও ভিন্ন হতে বাধ্য। **সমান মজুরির** জন্য সোরগোলটা তাই একটা ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে হল এমন এক **নির্বোধ** কামনা যা কখনও সার্থক হবার নয়। এই দাবি আসছে সেই মিথ্যা ও ভাসাভাসা এক র‍্যাডিকালপনা থেকে যা হেতুভিত্তিটা মানে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত এড়াবার চেষ্টা করে। মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে শ্রম-শক্তির মূল্য অন্য যে কোনো পণ্যের মূল্যের মতো একই পদ্ধতিতে স্থির হয়, আর যেহেতু বিভিন্ন ধরনের শ্রম-শক্তির মূল্য বিভিন্ন, অর্থাৎ তা উৎপন্নের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন, তাই শ্রমের বাজারে তারা অবশ্যই বিভিন্ন দাম **পাবেই**। দাসপ্রথার ভিত্তিতে **স্বাধীনতার** জন্য গলাবাজি করাও যা, মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে **সমান এমন কি ন্যায্য পারিশ্রমিকের** জন্য হৈচৈ করাও তাই। আপনি যাকে ঠিক বা ন্যায্য বলে মনে করেন সে প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্ন হচ্ছে: একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনটা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য?

যা বলা হল তার থেকে দেখা যাবে যে, **শ্রম-শক্তির মূল্য** নির্ধারিত হয় সেই শ্রম-শক্তির উৎপাদন, উন্নয়ন, পোষণ ও ধারারক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় **আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যের দ্বারাই।**

৮। বাড়তি মূল্যের উৎপাদন

এখন ধরুন, একজন শ্রমিকের গড়ে প্রতিদিন যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তার উৎপাদনের জন্য **ছয় ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম** লাগে। এও ধরে নিন যে, ৩ শিলিং পরিমাণ সোনার মধ্যেও নিহিত রয়েছে ছয় ঘণ্টা গড়পড়তা শ্রম। তাহলে ঐ মানুষটির **শ্রম-শক্তির প্রাত্যহিক মূল্যের দাম** বা মুদ্রাগত রূপ হচ্ছে ৩ শিলিং। সে প্রতিদিন যদি ছয় ঘণ্টা খাটে তাহলে

প্রতিদিন গড়ে তার যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি প্রয়োজন ঠিক ততটা ক্রয়ের মতো, অর্থাৎ মেহনতী হিসেবে নিজেকে বজায় রাখার মতো মূল্য সে উৎপন্ন করতে পারে।

কিন্তু আমাদের এই মানুষটি হচ্ছে মজুরি-খাটা শ্রমিক। কাজেই পুঁজিপতির কাছে তাকে তার শ্রম-শক্তি বিক্রি করতেই হবে। সে যদি রোজ ৩ শিলিং-এ অথবা সপ্তাহে ১৮ শিলিং-এ শ্রম-শক্তি বেচে তবে সে প্রকৃত মূল্যেই তা বেচবে। ধরুন, সে একজন সুতো কাটুনী। প্রতিদিন যদি সে ছ'ঘণ্টা খাটে তাহলে তুলার সঙ্গে সে রোজ ৩ শিলিং মূল্য যোগ করবে। এইভাবে প্রতিদিন সে যে মূল্য যোগাবে তা হবে সে প্রতিদিন যে মজুরি অথবা শ্রম-শক্তির দাম পাচ্ছে ঠিক তার সমান। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনো **উদ্বৃত্ত মূল্য** বা **উদ্বৃত্ত উৎপন্ন** পুঁজিপতির হাতে যাবে না। এইখানেই হল মুশকিল।

মজুরের শ্রম-শক্তি কেনার ও তার মূল্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে কোনো ক্রেতার মতোই পুঁজিপতি ক্রীত পণ্যকে ভোগ বা ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করেছে। যন্ত্র চালিয়েই যেমন আপনি যন্ত্রকে ভোগ বা ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি মানুষকে খাটিয়েই আপনি ভোগ বা ব্যবহার করেন তার শ্রম-শক্তিকে। সুতরাং মজুরের শ্রম-শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক মূল্য দিয়ে পুঁজিপতি **গোটা দিন বা সপ্তাহ** জুড়ে তাকে ব্যবহার অর্থাৎ খাটাবার অধিকার অর্জন করেছে। অবশ্য শ্রম-দিবস, শ্রম-সপ্তাহের কতগুলি সীমা আছে, পরে আমরা আরো ভাল করে সেদিকে নজর দেব।

বর্তমানে একটি চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রম-শক্তির **মূল্য** তার পরিপোষণ বা পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, কিন্তু সেই শ্রম-শক্তির **ব্যবহার** কেবল শ্রমিকের সক্রিয় কর্মক্ষমতা ও শারীরিক শক্তি দিয়েই সীমায়িত। শ্রম-শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **মূল্য** ঐ শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **প্রয়োগের** থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, ঠিক যেমন ঘোড়ার যে খাদ্য দরকার আর যে সময় ধরে সে আরোহীকে নিয়ে বেড়াতে পারে, এ দুটো হচ্ছে একেবারেই আলাদা জিনিস। শ্রম-শক্তির মূল্য যে পরিমাণ শ্রমের দ্বারা সীমাবদ্ধ সেটা কখনই তার সেই শক্তি যে পরিমাণ শ্রম করতে সক্ষম তার

সীমা নির্ধারণ করে না। আমাদের **সুতোকাটুনীর** দৃষ্টান্তই নিন। **আমরা** দেখেছি যে, প্রতিদিন তার **শ্রম-শক্তি পুনরুৎপাদনের** জন্য তাকে প্রতিদিনই তিন শিলিং মূল্য পুনরুৎপাদন করতে হবে, প্রতিদিন ছ'ঘণ্টা খেটেই সে তা করতে পারে। অথচ এর ফলে প্রতিদিন দশ, বারো বা আরো বেশি ঘণ্টা খাটতে সে অপারগ হয়ে পড়ে না। কিন্তু সুতোকাটুনীর শ্রম-শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **মূল্য** দিয়ে পুঁজিপতি **গোটা দিন বা সপ্তাহ** জুড়ে সেই শক্তি ব্যবহারের অধিকার অর্জন করেছে। কাজেই সে তাকে, ধরুন, রোজ **বারো** ঘণ্টা খাটাবে। মজুরি হিসেবে তাকে যা দেওয়া হয় তা তুলে নেবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছ'ঘণ্টার ওপরেও অর্থাৎ তার শ্রম-শক্তির মূল্যের **ওপরেও** তাই তাকে **আরো ছ-ঘণ্টা** খাটতে হবে; সময়টাকে আমি বলব **বাড়তি শ্রমের** ঘণ্টা, এ বাড়তি **শ্রম** আবার **বাড়তি মূল্য ও বাড়তি উৎপন্নের** মধ্যে রূপায়িত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের সুতোকাটুনী যদি তার দৈনন্দিন ছ-ঘণ্টা শ্রমের ফলে তুলার সঙ্গে তিন শিলিং মূল্য যোগ করে থাকে, যে মূল্য হচ্ছে ঠিক তার মজুরির সমান, তাহলে বারো ঘণ্টায় সে তুলার সঙ্গে ছ-শিলিং মূল্য যোগ করবে এবং **সেই অনুপাতে বাড়তি সুতো** তৈরী করবে। কিন্তু সে তার শ্রম-শক্তি পুঁজিপতিকে বেচেছে বলে তার উৎপন্নের সমগ্র মূল্য যাবে পুঁজিপতির কাছে, তার শ্রম-শক্তির তৎকালীন মালিকের মালিকানায়। তিন শিলিং আগাম দিয়ে পুঁজিপতি তাই ছ-শিলিং মূল্য উশুল করবে, কারণ ছ'ঘণ্টার শ্রম ঘনীভূত হয়েছে এমন মূল্য আগাম দিয়ে পুঁজিপতি তার বদলে পাচ্ছে এমন একটা মূল্য যার ভিতরে রূপ লাভ করেছে বারো ঘণ্টার শ্রম। প্রতিদিন এই একই প্রক্রিয়া চালিয়ে পুঁজিপতি রোজ আগাম দেবে তিন শিলিং আর রোজ পকেটে পুরবে ছ-শিলিং যার অর্ধেক যাবে ফের মজুরি দেবার জন্য, আর বাকি অর্ধেক হবে **বাড়তি মূল্য,** যার বদলে পুঁজিপতিকে কোনো প্রতিমূল্য দিতে হবে না। **পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে এই ধরনের বিনিময়ের** উপরেই প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী উৎপাদন বা মজুরি শ্রমের ব্যবস্থা এবং এই থেকেই মজুরের মজুর হিসেবে আর পুঁজিপতির পুঁজিপতি হিসেবে অবিরাম পুনরুৎপাদন হতে থাকে।

বাকি সমস্ত অবস্থা যথাপূর্ব থাকলে **বাড়তি মূল্যের হার** নির্ভর করবে শ্রম-শক্তির মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য শ্রম-দিবসের যে অংশটি প্রয়োজন

তার সঙ্গে পুঁজিপতির জন্য যে **বাড়তি সময়** বা **বাড়তি শ্রম** দেওয়া হয় তার অনুপাতের ওপরেই। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে মজুর তার শ্রম-শক্তির মূল্য পুনঃসৃষ্টি করে বা তার মজুরি পরিশোধ করে, **তার ওপরেও শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য যে হারে বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে** সেই হারের উপর তা নির্ভর করবে।

৯। শ্রমের মূল্য

এবার আমাদের ফিরতে হবে '**শ্রমের মূল্য বা দাম**' কথাটিতে।

আমরা দেখেছি যে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু শ্রম-শক্তির মূল্য, যা মাপা হয় ঐ শক্তিকে পরিপোষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য দিয়ে। কিন্তু যেহেতু মজুর তার মজুরি পায় **শ্রম সম্পাদনের পরে**, তাছাড়া এও সে জানে যে, পুঁজিপতিকে আসলে যা সে দিচ্ছে তা হল তার শ্রম, সেহেতু তার শ্রম-শক্তির মূল্য বা দাম তার কাছে স্বভাবতই প্রতিভাত হয় **তার শ্রমেরই দাম** বা **মূল্য** হিসেবে। তার শ্রম-শক্তির দাম যদি হয় তিন শিলিং যার ভিতরে নিবদ্ধ থাকছে ছ'ঘণ্টার শ্রম আর যদি সে খাটে বারো ঘণ্টা জুড়ে, তাহলে স্বভাবতই তার মনে হয় যে এই তিন শিলিংই হচ্ছে তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য বা দাম, যদিও তার ঐ বারো ঘণ্টার শ্রম রূপ লাভ করছে ছ-শিলিং মূল্যের মধ্যে। এর থেকে দু-রকম ফলাফলের উদ্ভব হয়:

প্রথমত, **শ্রম-শক্তির মূল্য বা দাম, শ্রমেরই দাম বা মূল্যের** আকারে প্রতিভাত হয়, যদিও সঠিকভাবে বলতে গেলে শ্রমের মূল্য ও শ্রমের দাম কথাটা অর্থহীন।

দ্বিতীয়ত, যদিও মজুরের প্রতিদিনকার শ্রমের একটি অংশের জন্যই শুধু তাকে **পারিশ্রমিক দেওয়া হয়** ও অপর অংশের জন্য তাকে **কিছুই দেওয়া হয় না**, আর যদিও ঠিক ঐ বিনা পয়সার বাড়তি শ্রম থেকেই সেই তহবিল গড়ে ওঠে যার থেকে আসে **বাড়তি মূল্য** বা **মুনাফা**, তবু মনে হয় মোট শ্রমের জন্যই বুঝি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে।

এই ভ্রান্ত প্রতীতিই শ্রমের অন্যান্য **ঐতিহাসিক** রূপগুলি থেকে **মজুরি-শ্রমকে** একটা বিভিন্নতা দান করে। মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে এমন কি **পারিশ্রমিকহীন** শ্রমকেও **পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত** শ্রম বলে বোধ হয়। উল্টোদিকে **ক্রীতদাসের** বেলায় তার শ্রমের যে অংশটির জন্য তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, মনে হয় যেন তার জন্যও তাকে কিছুই দেওয়া হয় নি। কাজ করতে গেলে অবশ্যই ক্রীতদাসকে বাঁচতে হবে, তাই তার শ্রম-দিবসের একাংশ তার নিজের জীবনধারণের মূল্য সংস্থান করতেই যায়। কিন্তু তার ও তার প্রভুর মধ্যে যেহেতু কোনো লেনদেন হয় নি, এবং দু-পক্ষের মধ্যে যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার চলে না, তাই মনে হয় যেন তার সমস্ত শ্রমের বদলে বুঝি সে কিছুই পেল না।

অন্যদিকে, বলতে পারি এই সেদিন অবধি গোটা পূর্ব ইউরোপে যার অস্তিত্ব ছিল সেই কৃষক-ভূমিদাসের কথাটা ধরুন। এই কৃষক-ভূমিদাস তার নিজের বা বরাদ্দ জমিটুকুতে নিজের জন্য তিন দিন কাজ করত, আর পরের তিন দিন তাকে তার প্রভুর জমিদারিতে বাধ্যতামূলকভাবে ও বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হত। এক্ষেত্রে তাই শ্রমের পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অংশ ও পারিশ্রমিকহীন অংশ যুক্তিভাবে স্থান কাল হিসেবে পৃথক করা হয়েছে; তাই আমাদের উদারপন্থীরা মানুষকে বেগার খাটানোর এই বিকট ব্যাপারে নৈতিক ক্রোধে উদ্বেল হয়ে উঠতেন।

একজন মানুষের সপ্তাহে তিন দিন নিজের জন্য নিজের জমিতে ও তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে প্রভুর জমিতে কাজ করা, আর ফ্যাক্টরি বা কারখানায় রোজ ছ'ঘণ্টা নিজের জন্য ও ছ'ঘণ্টা মালিকের জন্য খাটা আসলে এ দুটো কিন্তু **একই** ব্যাপার, যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন অংশ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মেশানো থাকে আর গোটা লেনদেনের চরিত্রটি সম্পূর্ণ গোপন থাকে একটি **চুক্তির মধ্যস্থতা** ও সপ্তাহান্তিক **বেতনের** আড়ালে। পারিশ্রমিকহীন খাটুনি একক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক ও অপরক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বলে বোধ হয়। এইটুকুই যা তফাৎ।

'শ্রমের মূল্য' কথাটা আমি **'শ্রম-শক্তির মূল্যের'** শুধু একটা বহু প্রচলিত, আটপৌরে প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহার করব।

১০। পণ্যকে তার যথা মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা মেলে

ধরুন এক ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছ-পেনি মূল্যের ভিতরে অর্থাৎ বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছ-শিলিং-এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। আরো ধরা যাক, শ্রমের মূল্য হচ্ছে তিন শিলিং অথবা ছ-ঘণ্টার শ্রমের উৎপন্ন। এখন যদি পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে চব্বিশ ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম রূপায়িত হয়ে থাকে তাহলে সে সবের মূল্য হল বারো শিলিং। এর উপরে যদি পুঁজিপতি কর্তৃক নিযুক্ত মজুর উৎপাদনের ঐ সব উপায়ের বারো ঘণ্টার সঙ্গে তার শ্রম যোগ করে, তাহলে ঐ বারো ঘণ্টা আরো ছ-শিলিং মূল্যের মধ্যে রূপ লাভ করবে। **উৎপন্নের সামগ্রিক মূল্য** তাহলে দাঁড়াবে ছত্রিশ ঘণ্টার রূপায়িত শ্রম বা আঠারো শিলিং-এর সমান। কিন্তু মজুরের শ্রমের মূল্য বা মজুরি তিন শিলিং মাত্র হওয়াতে মজুর ছ'ঘণ্টা ধরে যে উদ্বৃত্ত শ্রম করল এবং যে শ্রম পণ্যের মূল্যের মধ্যে রূপ পেল, তার বদলে পুঁজিপতিকে কোনো প্রতিমূল্য দিতে হল না। এই পণ্যটিকে তার যথা মূল্য — আঠারো শিলিং-এ বিক্রি করে পুঁজিপতি তাই তিন শিলিং মূল্য উশুল করবে — যার বদলে সে প্রতিমূল্য কিছুই দেয় নি। এই তিন শিলিংই হবে বাড়তি মূল্য বা মুনাফা যা যাবে তারই পকেটে। ফলে পুঁজিপতি তিন শিলিং মুনাফা করবে পণ্যটিকে তার মূল্যের চেয়ে **বেশি** দরে বিক্রি করে নয়, তাকে **তার যথার্থ মূল্যে** বিক্রি করেই।

পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার ভিতরে যে **শ্রম** বিধৃত থাকে তার **সমগ্র পরিমাণের** দ্বারাই। কিন্তু শ্রমের ঐ পরিমাণের এক অংশ রূপায়িত হচ্ছে একটি মূল্যের ভিতরে যার তুল্যমূল্য মজুরি রূপে দেওয়া হয়েছে, আর একটি অংশ উশুল হচ্ছে এক মূল্যের ভিতরে যার জন্য **কোনো** তুল্যমূল্য দেওয়া **হয় নি**। পণ্যের ভিতরে যে শ্রম রয়েছে তার এক অংশ হচ্ছে **পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত** শ্রম, আরেক অংশ হচ্ছে **পারিশ্রমিকহীন** শ্রম। কাজেই পণ্যকে **তার মূল্য** অর্থাৎ তার মধ্যে নিবদ্ধ **শ্রমের গোটা পরিমাণের** ঘনীভূত রূপ হিসেবে বিক্রি করে পুঁজিপতি নিশ্চয়ই মুনাফা রেখেই তা বেচতে পারে। যার জন্য পুঁজিপতিকে তুল্যমূল্য দিতে হয়েছে শুধু তাই নয়, যার জন্য তার মজুরকে গতর খাটাতে হলেও নিজেকে কিছুই দিতে হয় নি তাও

সে বিক্রি করে। পণ্যের জন্য পুঁজিপতি যে খরচটা করল ও আসলে যে খরচ হল এ দুটো আলাদা ব্যাপার। তাই আবার বলি, স্বাভাবিক ও গড়পড়তা মুনাফা আসে পণ্যকে তার মূল্যের চাইতে **বেশি** মূল্যে নয়, **তার যথার্থ মূল্যে** বিক্রি করেই।

১১। বিভিন্ন অংশে বাড়তি মূল্যের বাঁটোয়ারা

উদ্বৃত্ত মূল্য, অর্থাৎ সমগ্র পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যার ভিতরে মজুরের উদ্বৃত্ত বা **পারিশ্রমিকহীন শ্রম** রূপ পেয়েছে, তাকেই আমি বলি **মুনাফা।** সেই মুনাফার সবটাই নিয়োগকারী পুঁজিপতির পকেটে যায় না। কৃষি, নির্মাণ, রেলপথ অথবা অন্য যে কোনো উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যেই জমি ব্যবহৃত হোক না কেন, জমির ওপরে একচেটিয়া থাকায় ভূস্বামী **খাজনা** নামে এই **বাড়তি মূল্যের** একাংশ হস্তগত করতে পারে। অন্যদিকে **শ্রমের উপকরণসমূহ** অধিকারে থাকে বলেই নিয়োগকারী পুঁজিপতি **বাড়তি মূল্য** উৎপাদন করতে পারে অর্থাৎ অন্য কথায় **পারিশ্রমিকহীন শ্রমের একটা অংশ আত্মসাৎ করতে** পারে, তাই শ্রমের উপকরণসমূহের যে মালিক নিয়োগকারী পুঁজিপতিকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ঐসব উপকরণ ধার দেয় — অর্থাৎ এক কথায় **মহাজনী পুঁজিপতি — সুদ** নাম দিয়ে ঐ বাড়তি মূল্যের আর এক অংশ নিজের বলে দাবি করতে পারে। ফলে **নিছক** নিয়োগকারী পুঁজিপতির জন্য যা বাকি থাকে তাকে বলা হয় **শিল্পগত** বা **কারবারী** মুনাফা।

এই তিন ধরনের লোকের মধ্যে গোটা বাড়তি মূল্যের এই ভাগাভাগি কোন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এ প্রশ্ন একেবারেই আমাদের বিষয় বহির্ভূত। তবু যা বলা হয়েছে তার থেকে অন্তত এটুকু বেরিয়ে আসে:

খাজনা, সুদ ও শিল্পগত মুনাফা হচ্ছে পণ্যের **বাড়তি মূল্যের** অথবা **পণ্যের ভিতরে নিবদ্ধ পারিশ্রমিকহীন শ্রমের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম** মাত্র এবং **এই উৎস থেকে, কেবল মাত্র এই উৎস থেকেই একইভাবে** এগুলির **উদ্ভব**। নিছক **জমি** থেকে বা নিছক **পুঁজি** থেকেই তারা উদ্ভূত নয়। কিন্তু নিয়োগকারী পুঁজিপতি মজুরের কাছ থেকে যে বাড়তি মূল্য আদায় করে

নেয়, তাতেই জমি ও পুঁজির মালিকরা নিজ নিজ ভাগ বসাতে সমর্থ হয় তাদের জমি ও পুঁজির জোরে। মজুরের বাড়তি শ্রম বা পারিশ্রমিকহীন শ্রম থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মূল্য সবটাই সাক্ষাৎ নিয়োগকারী পুঁজিপতির পকেটে গেল কিংবা শেষোক্ত লোকটি খাজনা ও সুদের খাতে তার কিছু অংশ তৃতীয় পক্ষের হাতে দিতে বাধ্য হল -- মজুরের নিজের কাছে এর গুরুত্ব নিতান্তই গৌণ। ধরুন, নিয়োগকারী পুঁজিপতি শুধু তার নিজের পুঁজি ব্যবহার করছে ও সে নিজেই নিজের ভূস্বামী, তাহলে সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্যই যাবে তারই পকেটে।

নিয়োগকারী পুঁজিপতিই মজুরের কাছ থেকে সাক্ষাৎভাবে ঐ বাড়তি মূল্য উশুল করে, তা শেষ পর্যন্ত তার যতটা অংশই সে নিজের হাতে রাখতে পারুক না কেন। সুতরাং নিয়োগকারী পুঁজিপতি ও মজুরি-খাটা শ্রমিকের মধ্যেকার এই সম্পর্কের ওপরেই সমগ্র মজুরি-প্রথা ও গোটা বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা নির্ভর করছে। আমাদের বিতর্কে যে নাগরিকেরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটাকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে এবং নিয়োগকারী পুঁজিপতি ও মজুরের ভিতরকার এই মূল সম্পর্ককে গৌণ প্রশ্ন হিসেবে দেখে তাই ভুল করেছেন, যদিও বর্তমান অবস্থায় দামের বৃদ্ধি ঘটলে তার প্রভাব যে সাক্ষাৎ নিয়োগকারী পুঁজিপতি, ভূস্বামী, মহাজনী পুঁজিপতি এবং, বলতে পারেন, ট্যাক্স আদায়কারীর ওপরেও খুব অসমান মাত্রায় পড়তে পারে, একথা তাঁরা ঠিক বলেছিলেন।

যা বলা হল তার থেকে আর একটি সিদ্ধান্ত এসে পড়ছে।

পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, এক কথায় উৎপাদনের উপায়াদি যতটা ব্যবহৃত হয়েছে ততটার মূল্যেরই সমান, সেটা কোনো **আয় নয়,** তা **শুধু পুঁজির** স্থান পূরণ করে। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও পণ্য-মূল্যের অপর যে অংশটা **হল আয়,** অর্থাৎ যা মজুরি, মুনাফা, খাজনা আর সুদ রূপে খরচ হয়, তা মজুরির মূল্য, খাজনার মূল্য, মুনাফার মূল্য প্রভৃতি দিয়ে **গঠিত হয়** এ কথাটা ভুল। গোড়ায় আমরা মজুরির কথা ছেড়ে দেব এবং শুধু শিল্পগত মুনাফা, সুদ ও খাজনার আলোচনাই করব। আমরা একটু আগেই দেখেছি যে পণ্যের মধ্যে নিবদ্ধ **বাড়তি মূল্য,** অথবা তার মূল্যের সেই অংশ যার মধ্যে বিধৃত হয়েছে **পারিশ্রমিকহীন শ্রম,** তা তিনটি বিভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই তিন উপাদানের স্বতন্ত্র মূল্যের

সমষ্টিই হল সে মূল্য, অথবা তাদের **যোগফলের** দ্বারাই সে মূল্য **গঠিত হয়** — এ কথা বললে পুরোপুরিই সত্যের বিপরীত কথা বলা হবে।

এক ঘণ্টার শ্রম যদি ছ-পেনি মূল্যের ভিতরে রূপ পায়, মজুরের শ্রম-দিবস যদি হয় ১২ ঘণ্টার, এর অর্ধেকটা সময় যদি হয় পারিশ্রমিকহীন শ্রম, তাহলে পণ্যের সঙ্গে ঐ বাড়তি শ্রম যোগ করবে তিন শিলিং পরিমাণ **বাড়তি মূল্য**, অর্থাৎ সেই মূল্য যার বদলে প্রতিমূল্য কিছু দেওয়া হয় নি। তিন শিলিং-এর এই বাড়তি মূল্যই হল সেই **মোট তহবিল** যেটুকু নিয়োগকারী পুঁজিপতি, যে অনুপাতেই হোক না কেন, ভূস্বামী ও মহাজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারে। যে মূল্যটা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে পারে তার সীমা হল এই তিন শিলিং। নিয়োগকারী পুঁজিপতিই পণ্য-মূল্যের সঙ্গে স্বীয় মুনাফা বাবদ খুশিমতো একটা মূল্য যোগ করল আর একটা মূল্য যোগ করা হল ভূস্বামী বাবদ, এবং এই ভাবে চালিয়ে খুশিমতো নির্ধারিত মূল্যগুলির যোগফল হল মোট মূল্য — ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তাই, তিনটি অংশে একটি **নির্দিষ্ট মূল্যের বিভাগকে** তিনটি **স্বাধীন** মূল্যের যোগফল দ্বারা সেই মূল্যটির **গঠন** বলে ভুল করা, এবং এইভাবে যে মোট মূল্য থেকে খাজনা, মুনাফা ও সুদ আসছে তাকে একটা খুশিমতো নির্ধারিত পরিমাণে পরিণত করার প্রচলিত ধারণাটির যুক্তিবিভ্রম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

পুঁজিপতি যে মোট মুনাফা কামাল তা যদি ১০০ পাউন্ডের সমান হয় তাহলে **অনপেক্ষ** রাশি হিসেবে দেখে এই সংখ্যাকে আমরা বলি **মুনাফার পরিমাণ**। কিন্তু ঐ ১০০ পাউন্ডের সঙ্গে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে তার অনুপাতের যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এই **আপেক্ষিক** পরিমাণকে আমরা বলি **মুনাফার হার**। স্পষ্টতই এই মুনাফার হার দু-ভাবে প্রকাশ করা চলে।

ধরা যাক, **মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া** পুঁজি হচ্ছে ১০০ পাউন্ড। যে বাড়তি মূল্যের সৃষ্টি হয়েছে তাও ধরুন ১০০ পাউন্ড অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, মজুরের শ্রম-দিবসের অর্ধেকটা **পারিশ্রমিকহীন** শ্রম। এখন ঐ মুনাফাকে যদি আমরা মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজির মূল্য দিয়েই পরিমাপ করি তাহলে আমাদের বলতে হবে যে, **মুনাফার হার** হচ্ছে শতকরা একশ, কারণ যে মূল্য আগাম দেওয়া হয়েছে তা হল একশ আর যে মূল্য পাওয়া গেল তা হল দুইশত ভাগ।

অপর পক্ষে যদি আমরা শুধু **মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজি** নয়, বরং আগাম ঢালা **মোট পুঁজির** কথাই ধরি, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন ৫০০ পাউন্ড, যার মধ্যে ৪০০ পাউন্ড যাচ্ছে কাঁচামাল, মেশিন প্রভৃতির মূল্য বাবদ, তাহলে আমরা বলব যে, **মুনাফার হার** হচ্ছে শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র, কারণ একশ পাউন্ড মুনাফা হল আগাম-দেওয়া **মোট** পুঁজির এক-পঞ্চমাংশ মাত্র।

মুনাফার হার প্রকাশের শুধু প্রথম পদ্ধতিটি থেকেই পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমের প্রকৃত অনুপাত, অর্থাৎ **শ্রম** exploitation-এর (এই ফরাসী শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি নিতে হচ্ছে) যথার্থ মাত্রা আমরা দেখতে পাই। প্রকাশের অন্য পদ্ধতিটিই সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং কোনো বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তা সত্যই উপযোগী। অন্তত মজুরের কাছ থেকে পুঁজিপতি বিনা মজুরির শ্রম কী হারে আদায় করছে তা গোপন রাখার পক্ষে এটা খুবই উপযুক্ত।

বাকি বক্তব্যে আমি বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বাড়তি মূল্য ভাগাভাগির হিসাব না করে পুঁজিপতি যে মোট বাড়তি মূল্য আদায় করে সেই সবখানির জন্যই **মুনাফা** শব্দটি ব্যবহার করব আর **মুনাফার হার** কথাটি ব্যবহারের সময়ে সর্বদাই মুনাফার পরিমাপ করব মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজির মূল্য দিয়েই।

১২। মুনাফা, মজুরি ও দামের সাধারণ সম্পর্ক

একটি পণ্যের মূল্য থেকে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের মূল্যটা বাদ দিন, অর্থাৎ যে মূল্য পণ্যের মধ্যে বিধৃত **অতীতের** শ্রমকে প্রকাশ করে তা বাদ দিন, যেটা বাকি রইল সেটা হল **সর্বশেষে** নিযুক্ত মজুরের যোগ করা শ্রম। ঐ মজুর যদি দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করে, বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম যদি ছয় শিলিং-এর সমান পরিমাণ সোনার মধ্যে ঘনীভূত হয়, তবে এই ছ-শিলিং পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্যই হচ্ছে **একমাত্র** মূল্য যা তার শ্রমের সৃষ্টি। তার শ্রমের সময়ের দ্বারা নির্ধারিত এই নির্দিষ্ট

মূল্যটাই হচ্ছে একমাত্র ভান্ডার যার থেকে মজুর ও পুঁজিপতি উভয়েই তাদের নিজের নিজের ভাগ বা পাওনা নিতে পারে — একমাত্র মূল্য যা বণ্টিত হবে মজুরি ও মুনাফায়। দু-পক্ষের মধ্যে নানা রকম অনুপাতে তা ভাগ করা যায়, কিন্তু তার দ্বারা খাস মূল্যটার যে কোনো বদল হয় না তা স্পষ্টই। একজন শ্রমিকের জায়গায় যদি আপনি সমগ্র শ্রমিক জনসংখ্যাকে ধরেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শ্রম-দিবসের জায়গায় যদি এক কোটি বিশ লক্ষ শ্রম-দিবস নেন, তাহলেও হিসাবে পরিবর্তন হবে না।

যেহেতু এই সীমাবদ্ধ মূল্য, অর্থাৎ যেটুকু মূল্যের পরিমাপ হল মজুরের মোট শ্রম, সেটুকুই শুধু পুঁজিপতি ও মজুর ভাগাভাগি করে নিতে পারে, তাই এক পক্ষ যত বেশি পায়, অন্য পক্ষ পায় তত কম, আর এক পক্ষ যত কম পায় অন্য পক্ষ তত বেশি পায়। পরিমাণটা নির্দিষ্ট থাকলে তার এক অংশ বাড়লে অপর অংশ কমবে যথাযথ অনুপাতে। মজুরির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে মুনাফার পরিবর্তন ঘটবে উল্টো দিকে। মজুরি কমলে মুনাফা বাড়বে আর মজুরি বাড়লে মুনাফা কমবে। আমরা আগে যে রকম ধরেছিলাম সেই হিসাবে মজুর যদি পায় তিন শিলিং, অর্থাৎ সে যে মূল্য সৃষ্টি করেছে তার অর্ধেকের সমান, অথবা তার সমস্ত শ্রম-দিবস যদি হয় অর্ধেক পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত, অর্ধেক পারিশ্রমিকহীন শ্রম নিয়ে গঠিত, তাহলে **মুনাফার হার** হবে শতকরা ১০০, কারণ পুঁজিপতিও পাচ্ছে তিন শিলিং। মজুর যদি পায় মাত্র দু-শিলিং, অর্থাৎ যদি সে সমস্ত দিনের তিনভাগের একভাগ মাত্র খাটে নিজের জন্য, তাহলে পুঁজিপতি পাবে চার শিলিং এবং মুনাফার হার হবে শতকরা ২০০। মজুর যদি পায় চার শিলিং, পুঁজিপতি পাবে মাত্র দু-শিলিং এবং মুনাফার হার কমে দাঁড়াবে শতকরা ৫০। কিন্তু এসব বাড়তি-কমতির কোনো প্রভাব পড়বে না পণ্য-মূল্যের উপরে। সুতরাং মজুরি সাধারণভাবে বাড়লে তার ফলে মুনাফার সাধারণ হার কমবে, কিন্তু মূল্যের উপরে তার কোনো প্রভাব পড়বে না।

শেষ পর্যন্ত বাজার-দর যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে পণ্যের সেই মূল্য যদিও একমাত্র তার ভিতরে বিধৃত শ্রমের মোট পরিমাণ দিয়েই নির্ধারিত হয়, ঐ পরিমাণের মধ্যে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমের ভাগাভাগি দিয়ে,

নয়, তবু তার থেকে এটা মোটেই ধরা চলে না যে, বারো ঘণ্টায় উৎপন্ন একই পণ্য বা নানা পণ্যের মূল্য একরকমই থাকবে। একটা নির্দিষ্ট কালের বা নির্দিষ্ট পরিমাণের শ্রম দ্বারা **কতগুলি** বা কী পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হবে, তা নির্ভর করে নিয়োজিত শ্রমের **উৎপাদন-শক্তির** উপরে, তার **প্রসার** বা দৈর্ঘ্যের উপরে নয়। সুতোকাটুনীর শ্রমের উৎপাদন-শক্তির এক ধরনের মাত্রায় ধরুন বারো ঘণ্টা শ্রমের ফলে একদিনে বারো পাউন্ড সুতো তৈরি হতে পারে, কম মাত্রার উৎপাদন-শক্তিতে হয়ত হবে মাত্র দু-পাউন্ড। যদি তাই বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছয় শিলিং মূল্যে পরিণতি লাভ করে তাহলে একক্ষেত্রে বারো পাউন্ড সুতোর দাম হবে ছয় শিলিং, অন্যক্ষেত্রে দু-পাউন্ডের দামও হবে ছয় শিলিং। তাই একক্ষেত্রে এক পাউন্ড সুতোর দাম হবে ছয় পেনি, অন্যক্ষেত্রে — তিন শিলিং। দামের এই পার্থক্য ঘটছে যে শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে তার উৎপাদন-শক্তির তারতম্যের দরুন। বেশি উৎপাদন-শক্তির ক্ষেত্রে যেখানে এক ঘণ্টার শ্রম এক পাউন্ড সুতোয় রূপায়িত হবে সেখানে কম উৎপাদন-শক্তির বেলায় ছয় ঘণ্টার শ্রমের পরিণতি হবে সেই এক পাউন্ড সুতো। একক্ষেত্রে মজুরি অপেক্ষাকৃত বেশি ও মুনাফার হার কম হলেও এক পাউন্ড সুতোর দাম হবে মোটে ছয় পেনি, অন্যক্ষেত্রটিতে মজুরি কম ও মুনাফার হার বেশি হলেও তার দাম হবে তিন শিলিং। এ রকমটা হবে তার কারণ এক পাউন্ড সুতোর দাম তার মধ্যে **মোট যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে** তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই **মোট পরিমাণ শ্রমটা** কী **অনুপাতে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন** শ্রমে বিভক্ত তার দ্বারা নয়। তাই চড়া দামের শ্রমে সস্তা এবং সস্তা দামের শ্রমে চড়া দামের পণ্য উৎপন্ন করা যায় এই যে কথাটা আগে বলেছি তার আপাতবিরোধী চেহারাটা আর থাকে না। এই সাধারণ নিয়মটিরই তা অভিব্যক্তি যে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তার মধ্যে নিহিত শ্রম দিয়ে এবং বিধৃত শ্রমের পরিমাণ নির্ভর করে নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির ওপর আর তাই তা শ্রমোৎপাদিকা শক্তির প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়।

১৩। মজুরি-বৃদ্ধি বা মজুরি-হ্রাস প্রতিরোধ প্রচেষ্টার প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত

মজুরি-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অথবা মজুরি-হ্রাসের প্রতিরোধ যে যে ক্ষেত্রে ঘটে তার প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত এবার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যাক।

১। আমরা দেখেছি যে **শ্রম-শক্তির মূল্য** বা আরো চলতি ভাষায় **শ্রমের মূল্য** নির্ধারিত হয় তার আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যে বা তাদের উৎপাদনোপযোগী শ্রম-পরিমাণ দ্বারা। ধরুন কোনো একটি বিশেষ দেশে একজন মজুরের প্রতিদিন গড়ে যেসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি লাগে তার মূল্য যদি তিন শিলিং-এ প্রকাশিত ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান হয় তাহলে মজুরকে প্রতিদিনকার জীবনধারণের সমগ্র পরিমাণ জিনিস তৈরি করতে হলে রোজ খাটতে হবে ছ-ঘণ্টা। পুরো শ্রম-দিবস যদি হয় বারো ঘণ্টা তাহলে পুঁজিপতি তাকে তিন শিলিং দিলেই তার শ্রমের মূল্য দেওয়া হবে। শ্রম-দিবসের অর্ধেক হবে পারিশ্রমিকহীন শ্রম আর মুনাফার হার দাঁড়াবে শতকরা ১০০ ভাগ। এখন ধরা যাক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের ফলে একই পরিমাণ কৃষিজাত সামগ্রী তৈরি করতে বেশি শ্রমের দরকার পড়েছে, যার ফলে প্রতিদিনকার গড়পড়তা আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম তিন শিলিং থেকে চার শিলিং-এ উঠেছে। সেক্ষেত্রে **শ্রমের মূল্য** তিনভাগের একভাগ বা শতকরা ৩৩⅓ ভাগ বাড়বে। তার পুরানো জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরের প্রতিদিনকার জীবনধারণের সমপরিমাণ জিনিসের উৎপাদনে লাগবে শ্রম-দিবসের আট ঘণ্টা। বাড়তি শ্রম তাই ছয় থেকে চার ঘণ্টায় নামবে আর মুনাফার হার নামবে শতকরা ১০০ থেকে ৫০-এ। আর মজুরি-বৃদ্ধির দাবি তুলে মজুর তার **শ্রমের বর্ধিত মূল্যই** শুধু দাবি করবে, যেমন যে কোনো পণ্য বিক্রেতা তার পণ্য তৈরির খরচা বেড়ে গেলে সেই বর্ধিত মূল্যটা পাবার চেষ্টা করে। আবশ্যিক দ্রব্যাদির বর্ধিত মূল্য পোষাবার মতো মজুরি যদি না বাড়ে অথবা যথেষ্ট না বাড়ে তাহলে শ্রমের দাম নেমে যাবে **শ্রমের মূল্যের** নিচে আর অবনতি ঘটবে মজুরের জীবনযাত্রার মানে।

উল্টো দিকেও কিন্তু পরিবর্তন সম্ভব। শ্রমের বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির ফলে একই পরিমাণ গড়পড়তা আবশ্যিক দ্রব্যাদি তিন শিলিং থেকে দু-শিলিং-এ নেমে আসতে পারে অথবা ছ-ঘণ্টার বদলে শ্রম-দিবসের মাত্র চার

ঘণ্টা লাগতে পারে আবশ্যিক দ্রব্যাদির তুল্যমূল্য পুনরুৎপাদনে। মজুরটি আগে তিন শিলিং দিয়ে যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি কিনত এখন দু-শিলিং-এই তাই কিনতে পারবে। বাস্তবিকই **শ্রমের মূল্য** যাবে কমে, কিন্তু সেই হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে আগে যা পাওয়া যেত তার সমপরিমাণ পণ্যই মিলবে। মুনাফা তখন তিন থেকে চার শিলিং-এ উঠবে আর মুনাফার হার চড়বে শতকরা ১০০ ভাগ থেকে ২০০-তে। যদিও মজুরের অনপেক্ষ জীবনযাত্রার মান একই থাকবে তবু পুঁজিপতির তুলনায় তার **আপেক্ষিক মজুরি** ও সেই সঙ্গে তার **আপেক্ষিক সামাজিক স্থান** নেমে যাবে। মজুর যদি এই আপেক্ষিক মজুরি-হ্রাসে বাধা দেয় তাহলে সে শুধু তারই নিজের শ্রমের বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির একটা অংশ পাবার এবং সামাজিক ক্রমবিন্যাসে তার সাবেকী আপেক্ষিক স্থান বজায় রাখবারই চেষ্টা করবে। এইভাবে 'শস্য আইন' বাতিল হওয়ার পর শস্য আইন-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে সগাম্ভীর্যে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ঘোরতরভাবে তা লঙ্ঘন করে ইংরেজ কারখানা মালিকেরা সাধারণভাবে শতকরা দশ ভাগ মজুরি কমিয়ে দেয়। গোড়ার দিকে মজুরদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু যে শতকরা দশ ভাগ খোয়া গিয়েছিল পরে তা আবার ফিরে পাওয়া যায়, কী অবস্থাচক্রের ফলে তা আপাতত আলোচনা করছি না।

২। আবশ্যিক দ্রব্যাদির **মূল্য** ও তার ফলে **শ্রমের মূল্য** একই থাকতে পারে, কিন্তু আগেই **মুদ্রার মূল্যের যে অদলবদল** ঘটেছে তার ফলে ঐ সব সামগ্রীর **মুদ্রা-দামে** পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আরো বেশি স্বর্ণগর্ভা খনি আবিষ্কারাদির ফলে ধরুন দু'আউন্স সোনা তৈরী করতে যা শ্রম পড়ছে তা আগে এক আউন্সে যা পড়ত তার চেয়ে বেশি নয়। সোনার **মূল্য** তাহলে অর্ধেক অথবা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে যাবে। অন্য সমস্ত পণ্যের **মূল্য** তখন যেমন তাদের আগেরকার **মুদ্রা-দামের** দ্বিগুণ সংখ্যায় প্রকাশ পাবে, **শ্রমের মূল্যের** বেলায় ঠিক তাই হবে। বারো ঘণ্টার শ্রম আগে যেখানে ছ-শিলিং-এ প্রকাশ পেত এখন সেখানে লাগবে বারো শিলিং। মজুরের মজুরি যদি ছ-শিলিং-এ না উঠে তিন শিলিংই থেকে যায় তাহলে **তার শ্রমের মুদ্রা-দাম তার শ্রম-মূল্যের** মাত্র **অর্ধেকেরই** সমান হয়ে দাঁড়াবে আর তার জীবনযাত্রার মান খুব কমে যাবে। কম-বেশি মাত্রায় এই

ব্যাপারই ঘটবে যদি তার মজুরি বাড়ে, কিন্তু সোনার মূল্য যতটা কমেছে সেই অনুপাতে না বাড়ে। সেক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বা যোগান ও চাহিদা, অথবা মূল্য — এর কোনটির বেলাতেই কোনো অদলবদল হচ্ছে না। ঐ সব মূল্যের আর্থিক **নামটুকু** ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মজুরের আনুপাতিক মজুরি-বৃদ্ধির জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয় — এই কথা বলাও যা, জিনিসের বদলে নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা তার উচিত এই কথা বলাও তা। সমগ্র অতীত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যখনই ঐ রকম মুদ্রার মূল্য-হ্রাস ঘটে তখনই পুঁজিপতিরা মজুরদের ঠকিয়ে নেবার এই সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য তৈরী থাকে। অর্থনীতিবিদদের একটি মস্ত স্কুল জোর গলায় বলেন যে, নতুন নতুন স্বর্ণাঞ্চল আবিষ্কার, রূপার খনিগুলিতে উন্নততর পদ্ধতি এবং সস্তা দরে পারা সরবরাহের ফলে দামী ধাতুগুলির মূল্য আবার কমে গিয়েছে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যে সাধারণ ও যুগপৎ মজুরি-বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে তার কারণ এইটে।

৩। এখন পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি যে, **শ্রম দিবসের** একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। শ্রম-দিবসের কিন্তু এমনিতে কোনো চিরন্তন সীমা নেই। পুঁজির নিরবচ্ছিন্ন ঝোঁক হল তাকে শারীরিক ভাবে যতদূর সম্ভব টেনে বাড়ানো, কারণ ততটা পরিমাণেই উদ্বৃত্ত শ্রম ও তার ফলে উদ্ভূত মুনাফা বেড়ে উঠবে। পুঁজি শ্রম-দিবসকে যত দীর্ঘ করতে পারবে অপরের শ্রম সে তত বেশি আত্মসাৎ করবে। সতেরো শতকে ও এমন কি আঠারো শতকের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ কালে ১০ ঘণ্টা শ্রম-দিবসই ছিল সারা ইংলণ্ডের স্বাভাবিক শ্রম-দিবস। আসলে যে যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ মেহনতীজনদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ব্যারনদেরই যুদ্ধ সেই জ্যাকোবিনবিরোধী যুদ্ধের সময় (৩৫) পুঁজির উদ্দাম মরশুম গেছে, পুঁজি সেই সময়ে শ্রম-দিবসকে দশ ঘণ্টা থেকে বারো, চৌদ্দ, আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। ম্যালথাসকে আপনারা নিশ্চয়ই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ বলে কখনোই সন্দেহ করবেন না, তিনি পর্যন্ত ১৮১৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ঘোষণা করেন যে, ব্যাপারটা এই রকম চললে জাতির জীবনমূলেই কুঠারঘাত করা (৩৬) হবে। নব-আবিষ্কৃত যন্ত্র সাধারণভাবে চালু হওয়ার বছর কয়েক আগে, ১৭৬৫ সাল নাগাদ ইংলণ্ডে 'ব্যবসা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ' নামে এক পুস্তিকা বেরোয়। শ্রমিক

শ্রেণীর প্রকাশ্য শত্রু এই বেনামী প্রবন্ধকার* খাটুনির ঘণ্টার সীমা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন সম্পর্কে গলাবাজি করেন। এই অভিসন্ধি সিদ্ধির অন্যান্য উপায়ের মধ্যে তিনি **শ্রম-আগারের** (৩৭) প্রস্তাব করেছেন, যেগুলি তাঁর মতে হওয়া উচিত 'বিভীষিকা-আগার'। আর এই 'বিভীষিকা-আগারের' জন্য তিনি কতটা দীর্ঘ শ্রম-দিবস প্রস্তাব করেছেন? **বারো-ঘণ্টা** — ঠিক সেই ক-ঘণ্টাই ১৮৩২ সালে যাকে পুঁজিপতি, অর্থনীতিবিদ ও মন্ত্রীরা শুধু চলতিই নয়, বারো বছরের নীচের শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বলেই ঘোষণা করেন।

মজুর তার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে গিয়ে — বর্তমান ব্যবস্থায় তাকে তা করতেই হবে — পুঁজিপতির হাতে ঐ শক্তি ব্যবহারের ভার তুলে দেয়, কিন্তু তা দেয় একটা যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে। শ্রম-শক্তির স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির কথা বাদ দিলে বলা যায়, সে তার যে শ্রম-শক্তি বেচে তা বজায় রাখার জন্যই, তাকে নষ্ট করার জন্য নয়। শ্রম-শক্তিকে তার দৈনিক বা সাপ্তাহিক মূল্যে বিক্রয় করার সময়ে এ কথা ধরে নেওয়া হয় যে, একদিনেই বা এক সপ্তাহেই ঐ শ্রম-শক্তিকে দু'দিন অথবা দু'সপ্তাহের অপচয় বা ক্ষয়ক্ষতি সইতে হবে না। ১,০০০ পাউন্ড দামের একটি যন্ত্রের কথা ধরুন। যদি দশ বছরে সেটি পুরো ব্যবহৃত হয়ে যায়, তাহলে যেসব পণ্য উৎপাদনে এটি সাহায্য করে তাদের মূল্যের সঙ্গে যন্ত্রটি বছরে ১০০ পাউন্ড যোগ দেবে। পাঁচ বছরে পুরো ব্যবহৃত হলে সেটি বছরে ২০০ পাউন্ড যোগ দেবে অথবা তার বাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্য হল যে সময়ে সেটি পুরো ব্যবহৃত হয়ে যায় তার বিপরীত অনুপাতে। কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে মজুরের তফাৎ এইখানেই। যন্ত্রপাতি ঠিক যে-হারে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেই অনুপাতে সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। উল্টোদিকে মানুষ যত বাড়তি কাজ করে তার সংখ্যাগত যোগফল থেকে যতটা দেখা যায়, তার থেকে বেশি অনুপাতে সে ক্ষয় পায়।

শ্রম-দিবসকে তার আগের যুক্তিযুক্ত আয়তনের মধ্যে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে, অথবা যেখানে স্বাভাবিক খাটুনির ঘণ্টা আইন বেঁধে নির্দিষ্টকরণ শ্রমিকরা বলবৎ করতে পারছে না সেখানে মজুরি-বৃদ্ধি মারফৎ — শুধু যে বাড়তি সময় খাটতে হচ্ছে সেই অনুপাতে নয়, তার থেকে বেশি অনুপাতে

* হয়ত জ. কানিনহেম। — সম্পাঃ

মজুরি-বৃদ্ধি মারফৎ অতিখাটুনি ঠেকানোর চেষ্টা করে মজুরেরা নিজেদের ও নিজ বংশধরদের প্রতি কর্তব্য পালন করছে মাত্র। তারা শুধু পুঁজির অত্যাচারী জবরদখলের ওপর সীমারোপ করছে মাত্র। সময়ের পরিসরেই ঘটে মানুষের বিকাশ। যে লোকের হাতে খুশিমতো কাটাবার কোনো নিরঙ্কুশ সময় নেই, ঘুম, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি নিতান্ত দৈহিক ধরনের ছেদগুলি ছাড়া যার সমস্ত জীবনই পুঁজিপতির জন্য খাটতে হয়, সে ভারবাহী পশুরও অধম। দেহের দিক থেকে জীর্ণ ও মনের দিক থেকে পশুত্বের স্তরে অধঃপতিত হয়ে সে হয় অপরের সমৃদ্ধি সৃষ্টির একটি যন্ত্র মাত্র। অথচ আধুনিক শিল্পের সমগ্র ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, বাধা না পেলে পুঁজি সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকেই এই চূড়ান্ত অবনতির স্তরে নিয়ে ফেলার জন্য বেপরোয়া ও নির্মমভাবে কাজ করে যাবে।

খাটুনির ঘণ্টা বাড়ানোর সময়ে পুঁজিপতি **উচ্চতর মজুরি** দিয়েও শ্রমের মূল্য কমিয়ে দিতে পারে, যদি যে বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম আদায় করা হচ্ছে ও তার ফলে শ্রম-শক্তির যে দ্রুততর ক্ষয় হচ্ছে তার সঙ্গে সমানুপাতিক মজুরি-বৃদ্ধি না ঘটে। আর এক ভাবে তা করা চলে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া পরিসংখ্যানবিদেরা হয়তো আপনাদের বলবেন যে দৃষ্টান্তস্বরূপ, ল্যাঙ্কাশায়ার কারখানা এলাকার শ্রমিক পরিবারগুলির গড়পড়তা মজুরি বেড়ে গেছে। তাঁরা ভুলে যান যে, একটা লোকের শ্রমের জায়গায় পরিবারের কর্তা পুরুষটি, তার স্ত্রী ও হয়ত তিন-চারটি ছেলেমেয়েও এখন পুঁজির জগন্নাথী রথচক্রে পিষ্ট হচ্ছে এবং পরিবারটি থেকে মোট যে উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় করা হচ্ছে সেটার সঙ্গে মোট মজুরি-বৃদ্ধি তাল রাখে নি।

শিল্পের যেসব শাখা কারখানা-আইনের আওতায় পড়ে সেখানে এমন কি শ্রম-দিবসের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেও শুধু **শ্রম-মূল্যের** সাবেক মান বজায় রাখার জন্যই মজুরি-বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। শ্রমের **তীব্রতা** বাড়িয়ে আগে দু-ঘণ্টায় যতটা জীবনী শক্তি ব্যয় হত এখন এক ঘণ্টাতেই ততটা ব্যয় করতে একজনকে বাধ্য করা যেতে পারে। কারখানা-আইনের অধীন শিল্পগুলিতে যন্ত্রবেগ বাড়িয়ে ও একজন মানুষকে যেসব কর্মযন্ত্রের তত্ত্বাবধান করতে হয় তার সংখ্যাবৃদ্ধি করে এই ব্যাপারই কিছুটা করা হয়েছে। শ্রমের তীব্রতাবৃদ্ধি অথবা এক ঘণ্টায় যে শ্রম ঢালতে হয় তার পরিমাণ যদি

শ্রম-দিবসের মাত্রাহ্রাসের সঙ্গে কিছুটা ন্যায্য অনুপাতে চলে তাহলেও মজুরেরই জিত। এইমাত্রা পেরোলেই একদিকে সে যা জিতবে অন্যদিকে তাই সে হারাবে এবং সেক্ষেত্রে দশ ঘণ্টার শ্রম আগেকার বারো ঘণ্টার শ্রমের মতোই সর্বনাশা হতে পারে। পুঁজির এই ঝোঁককে ঠেকিয়ে, শ্রমের তীব্রতাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করে মজুর শুধু তার শ্রমের মূল্য-হ্রাসকে এবং তার উত্তরপুরুষের অবনতিকেই প্রতিরোধ করছে।

৪। আপনারা সবাই জানেন যে কতকগুলি কারণের দরুন, যা এখন আমার ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, পুঁজিবাদী উৎপাদন কতকগুলি পর্যায়িক চক্রের ভিতর দিয়ে চলে। নিস্পন্দভাব, ক্রমবর্ধমান তেজীভাব, সমৃদ্ধি, অতি-বাণিজ্য, সঙ্কট ও অচলাবস্থা — এই সব পর্যায়ের ভিতর দিয়েই তা অগ্রসর হয়। পণ্যের বাজার-দর ও মুনাফার বাজার-হার এই সব পর্যায় অনুসরণ করে চলে কখনও তার গড়পড়তা হারের নিচে নেমে যায়, কখনও বা তার ওপরে ওঠে। সমগ্র চক্রটির কথা ধরলে আপনারা দেখবেন যে, বাজার-দরের একটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করছে আর একটি বিচ্যুতি এবং সমগ্র চক্রের গড় ধরলে পণ্যের বাজার-দর তাদের মূল্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পড়তি বাজার-দর, সঙ্কট ও অচলাবস্থার পর্যায়ে মজুরের কাজ যদি বা একেবারেই না যায় তাহলে তার মজুরি অন্তত নিশ্চয়ই কমে যাবে। না ঠকতে হলে বাজার-দরের ঐ রকম হ্রাস সত্ত্বেও কতটা আনুপাতিক হারে মজুরি-হ্রাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছে — এই নিয়ে পুঁজিপতির সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হবে। সমৃদ্ধির পর্যায়ে, যখন বাড়তি মুনাফা কামানো হয় তখন যদি সে মজুরি-বৃদ্ধির লড়াই না করে থাকে, তাহলে একটি শিল্প চক্রের গড়ের হিসাব অনুসারে সে তার **গড়পড়তা মজুরি** বা তার শ্রমের মূল্য পর্যন্তও পাবে না। চক্রের প্রতিকূল পর্যায়গুলিতে তার মজুরি অনিবার্য ভাবে প্রভাবিত হলেও চক্রের সমৃদ্ধ পর্যায়ে উচিত ক্ষতিপূরণের চেষ্টা থেকে তার বিরত থাকার দাবি করা নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত। চাহিদা ও যোগানের অবিশ্রাম উঠতি-পড়তি থেকে উদ্ভূত নিরন্তর পরিবর্তনশীল বাজার-দরের ক্ষতিপূরণ মারফতই কেবল সাধারণত সমস্ত পণ্যের **মূল্য** হাসিল হয়। বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রম অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই নিছক একটি পণ্য। তাই তাকেও তার মূল্য অনুযায়ী গড়পড়তা দাম পেতে হলে সমান উঠতি-পড়তির ভিতর দিয়ে

যেতে হবে। একদিকে শ্রমকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা আর অন্যদিকে পণ্যের দাম যে-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার আওতা থেকে তাকে বাদ দিতে চাওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিহীন হবে। ক্রীতদাস একটা স্থায়ী ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরণপোষণ পায়, মজুরি-খাটা শ্রমিক তা পায় না। তাকে এক সময়ে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতেই হবে, আর কিছু না হোক শুধু অন্য সময়ের মজুরি-হ্রাস পূরণ করার জন্যই। পুঁজিপতির ইচ্ছা ও হুকুমকে শাশ্বত অর্থনৈতিক নিয়ম হিসেবে মেনে যদি সে হাল ছেড়ে দেয় তবে তার ভাগ্যে ক্রীতদাসের সমস্ত দুর্গতি জুটবে, কিন্তু জুটবে না ক্রীতদাসের ভরণপোষণ।

৫। যতগুলি দৃষ্টান্ত আমি বিবেচনা করলাম, তার সবগুলিতেই (আর একশ-র মধ্যে এগুলিই হচ্ছে নিরানব্বই) আপনারা দেখেছেন যে, মজুরি-বৃদ্ধির সংগ্রাম শুধু **পূর্ববর্তী** পরিবর্তনের পিছু পিছু চলে এবং উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রমের উৎপাদন-শক্তি, শ্রমের মূল্য, মুদ্রার মূল্য, যে শ্রম আদায় করা হচ্ছে তার মাত্রা বা তীব্রতা, চাহিদা ও যোগানের উঠতি-পড়তির ওপরে নির্ভরশীল এবং শিল্পচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাজার-দরের উঠতি-পড়তি — এই সব ক্ষেত্রে আগেই যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, স্বভাবত তার থেকেই তার উদ্ভব। এক কথায়, পুঁজির পূর্বতন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তার উদ্ভব। এই সমস্ত অবস্থা থেকে মজুরি-বৃদ্ধির সংগ্রামকে স্বতন্ত্র করে দেখলে, অন্য যেসব পরিবর্তন থেকে তার উদ্ভব তাকে উপেক্ষা করে শুধু মজুরির পরিবর্তনটুকুই দেখলে, আপনারা ভ্রান্ত পূর্বপ্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করবেন এবং পৌঁছবেন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে।

১৪। পুঁজি ও শ্রমের সংগ্রাম এবং তার ফলাফল

১। মজুরি-হ্রাসের বিরুদ্ধে মজুরদের পর্যায়িক প্রতিরোধ ও মজুরি-বৃদ্ধির জন্য তাদের পর্যায়িক প্রচেষ্টা মজুরি-প্রথারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; শ্রম পণ্য হয়ে ওঠার দরুনই তার উদ্ভব, এবং সেই কারণে দামের সাধারণ গতিবিধি নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলির তা অধীন — এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণভাবে মজুরি-বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফার হার পড়ে যাবে, কিন্তু তার ফলে পণ্যের

গড়পড়তা দাম বা তাদের মূল্য প্রভাবিত হবে না — এও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এখন এই প্রশ্ন ওঠে: পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার এই অবিরাম সংগ্রামে শ্রমের পক্ষে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা কতটুক?

একটা সাধারণসূত্রে আমি এর জবাবে দিতে পারি, বলতে পারি যে, অন্য সব পণ্যের মতো শ্রমের ক্ষেত্রেও তার বাজার-দর শেষ পর্যন্ত তার মূল্যের সঙ্গে মিলবে, সুতরাং সমস্ত উঠতি-পড়তি সত্ত্বেও, যত চেষ্টাই সে করুক না কেন গড়পড়তায় মজুর পাবে শুধু তার শ্রমের মূল্যই অর্থাৎ যা হচ্ছে শ্রম-শক্তির মূল্য এবং যা নির্ধারিত হয় ঐ শ্রম-শক্তি সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাগে তার মূল্যের দ্বারা — সেসব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও আবার শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম লাগে তার দ্বারাই।

কিন্তু শ্রম-শক্তির মূল্য বা শ্রমের মূল্য অন্য সব পণ্যের মূল্য থেকে কতগুলি অদ্ভুত রকমের বৈশিষ্ট্যের ফলে স্বতন্ত্র। শ্রম-শক্তির মূল্য গঠিত হয় দুটি উপাদান নিয়ে — একটি শুধুমাত্র দৈহিক, অন্যটি ঐতিহাসিক বা সামাজিক। তার চূড়ান্ত সীমানা দৈহিক উপাদানের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ নিজেকে জীইয়ে রাখার ও পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য, নিজের শারীরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে একেবারে অপরিহার্য আবশ্যিক দ্রব্যাদি পেতেই হবে। কাজেই ঐ আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যই শ্রমের মূল্যের চূড়ান্ত সীমা নির্দেশ করে। অন্য-দিকে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যও কতকগুলি চূড়ান্ত, যদিও অত্যন্ত নমনীয় সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট। মেহনতকারী মানুষের দৈহিক শক্তিই তার চূড়ান্ত সীমারেখা নির্দেশ করে। তার জীবনীশক্তির প্রাত্যহিক ক্ষয় যদি একটা বিশেষ মাত্রা ছাপিয়ে যায়, তাহলে নতুন করে প্রতিদিন আর তা পুনঃপ্রয়োগ করা চলে না। অবশ্য আমি আগেই বলেছি এই সীমারেখা অত্যন্ত নমনীয়। সবল ও দীর্ঘায়ু শ্রমিকরা বংশানুক্রমিকভাবে যেমন শ্রম-বাজারের চাহিদা মেটাতে পারে, দ্রুত বংশ-পরম্পরায় ভগ্নস্বাস্থ্য ও স্বল্পায়ু শ্রমিকরাও তেমনি শ্রম-বাজারের চাহিদা মেটাবে।

শুধুমাত্র এই দৈহিক উপাদান ছাড়াও প্রত্যেক দেশে শ্রমের মূল্য একটি ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রার মানের দ্বারা নির্ধারিত। এ শুধু দেহাশ্রিত

জীবনধারণই নয়, জনসাধারণ যে সামাজিক অবস্থায় রয়েছে ও যার মধ্যে তারা লালিতপালিত হয়েছে, তার থেকে উদ্ভূত কতগর্বলি প্রয়োজনের পরিতৃপ্তিও চাই। ইংরেজী জীবনযাত্রার মানকে আইরিশদের মানে, জার্মান কৃষকের জীবনযাত্রার মানকে লিভোনিয়ান কৃষকের মানে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এ দিক দিয়ে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও সামাজিক অভ্যাস যে গর্বর্ত্বপর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তা আপনারা **মিঃ থর্নটনের 'অতিরিক্ত জনসংখ্যা'** গ্রন্থ থেকে জানতে পারেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভূমিদাস প্রথার কবল থেকে ইংলন্ডের বিভিন্ন কৃষিপ্রধান জেলাগর্বলি যেমন যেমন অন্বকূল অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে মোটের উপর সেই অন্বসারেই এখনও তাদের গড়পড়তা মজ্বরিতে তারতম্য রয়েছে।

শ্রম-ম্বল্যের মধ্যে অন্বপ্রবিষ্ট এই ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপাদানকে বাড়িয়ে, কমিয়ে বা একেবারে নির্মর্বল করেও দেওয়া যায়; যাতে একমাত্র **দৈহিক সীমা** ছাড়া আর কিছ্বই অবশিষ্ট থাকে না। ব্বড়ো জর্জ রোজ — সেই ঝান্ব, ট্যাক্সোখোর ও পরভোজী জর্জ রোজের কথামতো যে জ্যাকোবিনবিরোধী যদ্ধ চালানো হয়েছিল ফরাসী কাফেরদের হাত থেকে আমাদের পবিত্র ধর্ম রক্ষা করার জন্য, সেই যদ্ধের আমলে যে সৎ ইংরেজ খামারীদের সম্পর্কে আমাদের আগেকার এক বৈঠকে খ্বব নরমভাবে বলা হয়েছিল তারা কৃষি-মজ্বরদের মজ্বরি একেবারে **ন্যূনতম দৈহিক মাত্রারও** নীচে নামিয়ে দেয় আর মজ্বরদের দৈহিক বংশরক্ষার জন্য আরো যেটুকু প্রয়োজন তা **'দ্বঃস্থ আইনের'** ('প্বওর ল') (৩৮) সাহায্যে প্বষিয়ে দেয়। মজ্বরি-খাটা শ্রমিককে ক্রীতদাসে আর শেকস্পীয়রের সেই দৃপ্ত প্রজাকে নিঃস্বে রূপান্তরিত করার এ এক চমৎকার পন্থা।

বিভিন্ন দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে প্রচলিত মজ্বরি-মান বা শ্রম-ম্বল্য তুলনা করলে আপনারা দেখবেন যে, অন্য সমস্ত পণ্যের ম্বল্য স্থির থাকলেও **শ্রম-ম্বল্য** ব্যাপারটাই একটা স্থির রাশি নয়, বরঞ্চ পরিবর্তনশীল রাশিই।

একই রকমের তুলনা করে দেখলে প্রমাণ হবে যে ম্বনাফার **বাজার-হারই** যে শ্বধ্ব বদলায় তাই নয়, তার **গড়পড়তা** হারও বদলায়।

কিন্তু **ম্বনাফার** বেলায় তার **ন্যূনতম সীমা** নির্দেশ করে এমন কোনো

নিয়ম নেই। কোন চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত তা যে কমতে পারে তা আমরা বলতে পারি না। কেন আমরা সে সীমা নির্দেশ করতে পারি না? কারণ **ন্যূনতম** মজুরি স্থির করতে পারলেও আমরা তার **সর্বোচ্চ সীমা** নির্ধারণ করতে পারি না। আমরা শুধু বলতে পারি যে, শ্রম-দিবসের সীমা নির্দিষ্ট থাকলে **মজুরির দৈহিক ন্যূনতম মাত্রার** ক্ষেত্রে হবে **মুনাফার সর্বোচ্চ সীমা** আর মজুরি নির্দিষ্ট থাকলে **সর্বোচ্চ মুনাফা** হবে মজুরের দৈহিক শক্তির পক্ষে যতটা সম্ভব শ্রম-দিবস ততটা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। সর্বোচ্চ মুনাফা তাই মজুরির ন্যূনতম দৈহিক মাত্রা ও শ্রম-দিবসের সর্বোচ্চ দৈহিক মাত্রা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই **মুনাফার সর্বোচ্চ হারের** দুই সীমানার মধ্যে যে অসংখ্য রকমের অদলবদল সম্ভব তা সুস্পষ্ট। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন মাত্রায় তা নির্দিষ্ট হয় পুঁজি ও শ্রমের ভিতরে অবিশ্রাম সংগ্রামের মাধ্যমেই। পুঁজিপতি অবিরাম চেষ্টা করে দৈহিক ন্যূনতম মাত্রা অবধি মজুরি কমানো ও দৈহিক সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত শ্রম-দিবস বাড়ানোর জন্য, আর মজুর অনবরত ঠেলা দেয় এর উল্টো দিকে।

ব্যাপারটা প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের পারস্পরিক শক্তির প্রশ্নেই দাঁড়ায়।

২। অন্য সব দেশের মতো ইংলণ্ডেও **শ্রম-দিবস বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটা** কখনো **আইনগত হস্তক্ষেপ** ছাড়া স্থির হয় নি। বাইরে থেকে মজুরেরা অবিশ্রাম চাপ না দিলে ঐ হস্তক্ষেপ কখনো ঘটত না। সে যাই হোক, মজুর ও পুঁজিপতিদের মধ্যে ঘরোয়া ব্যবস্থায় ঐ ফল পাওয়া সম্ভব হত না কখনোই। **সাধারণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের** এই প্রয়োজন থেকেই প্রমাণ হয় যে, তার নিছক অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পুঁজিই হচ্ছে অধিকতর শক্তিশালী পক্ষ।

শ্রম-মূল্যের সীমার ক্ষেত্রে, আসল নিষ্পত্তিটা সব সময়েই নির্ভর করে যোগান ও চাহিদার উপর অর্থাৎ পুঁজির তরফ থেকে শ্রমের চাহিদা ও মজুরদের তরফ থেকে শ্রমের যোগানের ওপর। উপনিবেশের দেশগুলিতে যোগান ও চাহিদার নিয়ম মজুরদের অনুকূলে কাজ করে। এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারের মজুরি রয়েছে। পুঁজি যতই চেষ্টা করুক মজুরি-খাটা শ্রমিক ক্রমাগত স্বাধীন, আত্মনির্ভর কৃষকে পরিণত হওয়ার ফলে শ্রম বাজারের ক্রমাগত শূন্যতা সে রোধ করতে পারে না। মার্কিন জনসাধারণের মস্ত এক অংশের পক্ষে মজুরি-খাটা শ্রমিকের বৃত্তি শুধু একটা উৎক্রমণ

পর্যায়। আজ হোক, কাল হোক এ বৃত্তি তারা পরিত্যাগ করে যাবেই। এই রকম ঔপনিবেশিক অবস্থার সংশোধনের জন্য পিতৃস্থানীয় ব্রিটিশ সরকার কিছ্বদিনের জন্য তথাকথিত আধ্বনিক ঔপনিবেশিক তত্ত্ব স্বীকার করে নেন; এই তত্ত্ব অন্বযায়ী ঔপনিবেশিক জমিজমার উপরে এক কৃত্রিম চড়া দাম আরোপ করা হয়, যাতে করে মজ্বরি-খাটা শ্রমিকের স্বাধীন কৃষকে দ্রুতগতি র্পান্তর বন্ধ করা যায়।

কিন্তু এখন আসুন সেই প্বরানো সভ্য দেশগ্বলির ব্যাপারে, প‚জি যেখানে সমস্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উপরে আধিপত্য করে। দৃষ্টান্তস্বর্প, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইংলন্ডের কৃষি-মজ্বরদের মজ্বরি বৃদ্ধির কথাটাই ধর্ন। কী তার ফল দাঁড়িয়েছিল? বন্ধ্ববর ওয়েস্টন তাদের যে পরামর্শ দিতেন সেই অন্বসারে খামারীরা গমের ম্ল্য, এমন কি তার বাজার-দরও বাড়াতে পারে নি। বরঞ্চ দর-হ্রাসটাকেই তাদের মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এই এগারো বছরে তারা নানা রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, আরো বেশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, কৃষিযোগ্য জমির কিছ্বটা অংশ র্পান্তর করে চারণ-ভূমিতে, কৃষি খামারের আয়তন এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায় এবং এই ও অন্যান্য সব ব্যবস্থার সাহায্যে তারা শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে শ্রমের চাহিদা কমিয়ে আনে ও কৃষিজীবী জনসংখ্যাকে ফের আপেক্ষিকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তোলে। সাবেকী জন-অধ্যুষিত দেশগ্বলিতে মজ্বরি-বৃদ্ধির বির্দ্ধে প‚জির যে দ্রুত বা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া ঘটে, এই হল তার সাধারণ পদ্ধতি। রিকার্ডো ঠিকই বলেছিলেন যে, শ্রমের সঙ্গে যন্ত্র অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা করছে এবং অনেক সময়েই যন্ত্রের ব্যবহার শ্বর্ব করা সম্ভব হয় তখনই যখন শ্রমের দাম একটা বিশেষ মাত্রায় পেণছয় (৩৯) কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োগ হল শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির বহ্ব পদ্ধতির একটি। এই একই যে ঘটনা একদিকে সাধারণ শ্রমকে আপেক্ষিকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তুলছে, তাই আবার অন্যদিকে দক্ষ শ্রমকেও সরল করে তোলে ও এইভাবে তার ম্ল্য হ্রাস করে।

এই একই নিয়ম কার্যকরী হয় অন্যভাবেও। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চহারের মজ্বরি সত্ত্বেও প‚জি সঞ্চয়ের গতি ত্বরান্বিত হবে। কাজেই **অ্যাডাম স্মিথের** মতো, যাঁর সময়ে আধ্বনিক শিল্প

ছিল শৈশবাবস্থায়, কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন যে, পুঁজির দ্রুততর সঞ্চয় শ্রমের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে মজুরদের অনুকূলেই পাল্লা ঝোঁকাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বহু সমসাময়িক লেখক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন — গত বিশ বছরে ইংরেজ জনসংখ্যার চেয়ে ইংরেজ পুঁজি অত বেশি দ্রুত বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও মজুরি তত বেশি বৃদ্ধি পেল না কেন? কিন্তু সঞ্চয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে **পুঁজির সংবিন্যাসেরও** একটা **ক্রমিক পরিবর্তন** ঘটে। মোট পুঁজির যে-অংশটা গঠিত স্থির পুঁজি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, সমস্ত রকমের উৎপাদনের উপায় দিয়ে, সেই অংশটা পুঁজির অন্য যে-অংশ মজুরির জন্য বা শ্রম ক্রয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় তার তুলনায় উত্তরোত্তর বেশি করে বৃদ্ধি পায়। মিঃ বার্টন, রিকার্ডো, সিসমন্দি, অধ্যাপক রিচার্ড জোনস, অধ্যাপক র‍্যামসি, শেরবুলিয়ে ও অন্যান্যেরা মোটের ওপর সঠিকভাবেই এই নিয়মটিকে বিবৃত করেছেন।

.. পুঁজির এই দুই উপাদানের অনুপাত যদি গোড়ার দিকে সমান সমান থাকে তাহলে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটা হয়ে দাঁড়াবে অন্যটার পাঁচ গুণ ইত্যাদি। মোট পুঁজি ৬০০-র মধ্যে ৩০০ যদি যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতিতে আর ৩০০ মজুরিতে নিয়োগ করা হয়, তাহলে ৩০০-র জায়গায় ৬০০ মজুরের চাহিদা সৃষ্টির জন্য মোট পুঁজিকে মাত্র দ্বিগুণ করলেই চলে। কিন্তু ৬০০ পুঁজির মধ্যে ৫০০ যদি যন্ত্রপাতি, মালপত্র প্রভৃতিতে যায়, আর মাত্র ১০০ যায় মজুরিতে, তাহলে ৩০০-র জায়গায় ৬০০ মজুরের চাহিদা সৃষ্টি করতে হলে ঐ একই পুঁজিকে ৬০০ থেকে ৩,৬০০-তে বেড়ে উঠতে হবে। শিল্পোন্নতির পথে তাই শ্রমের চাহিদা পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলে না। চাহিদাও বাড়তে থাকবে, কিন্তু পুঁজি-বৃদ্ধির তুলনায় তা বাড়বে ক্রমক্ষীয়মাণ হারে।

আধুনিক শিল্পের বিকাশলাভের ঘটনাটাই যে মজুরের বিপক্ষে আর পুঁজিপতির সপক্ষে উত্তরোত্তর বেশি বেশি করে পাল্লা ভারী করবে আর সেইহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হবে গড়পড়তা মজুরির মান বাড়ানোর দিকে নয়, কমানোর দিকে, অথবা **শ্রমের মূল্যকে** কমবেশি তার **ন্যূনতম সীমায়** ঠেলে দেবার দিকেই, তা দেখাবার পক্ষে উপরের কথা কয়টিই যথেষ্ট। এই ব্যবস্থায় ঘটনার প্রবণতা যখন এই দিকে তখন তার অর্থ কি এই যে মজুরদের উচিত পুঁজির জবরদস্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ বন্ধ

করা ও তাদের সাময়িক উন্নতির জন্য কালে-ভদ্রে যে সুযোগ মেলে তার যথাসাধ্য সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া? মজুরেরা যদি তাই করে তাহলে তারা এক উদাসীন হতভাগ্যদলের সমস্তরে নেমে যাবে, মুক্তির কোনো আশা যাদের নেই। মনে হয় আমি দেখাতে পেরেছি যে, মজুরির মানের জন্য তাদের সংগ্রামের ঘটনাগুলি সমগ্র মজুরি-প্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ১০০-র মধ্যে ৯৯ টি ক্ষেত্রেই মজুরি বৃদ্ধির জন্য তাদের সংগ্রামটা হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট শ্রম-মূল্যটা বজায় রাখার চেষ্টামাত্র; আর নিজেদের যে পণ্য হিসেবে বেচতে হয় এই অবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পুঁজিপতির সঙ্গে তাদের শ্রমের দর নিয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজন। পুঁজির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে তারা যদি কাপুরুষের মতো নতিস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই বৃহত্তর কোনো আন্দোলনের উদ্বোধনে তারা নিজেদের অযোগ্য বলেই প্রতিপন্ন করবে।

সেই সঙ্গে মজুরি-প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে মজুরদের দাসত্ব নিহিত রয়েছে তার কথা বাদ দিলেও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিদিনকার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা লড়ছে ফলাফলের সঙ্গে, ঐ ফলাফলের হেতুর সঙ্গে নয়; তারা নিম্ন গতি মন্দীভূত করছে, সে গতির দিক পরিবর্তন করছে না, তারা উপশমের ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে না। সুতরাং পুঁজির অবিরাম আক্রমণ ও বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এই যেসব অনিবার্য গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যেই নিজেদের একান্তভাবে ডুবিয়ে রাখা তাদের উচিত নয়। তাদের বোঝা উচিত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুর্গতিই তাদের উপরে চাপাক না কেন, সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় **বৈষয়িক অবস্থা ও সামাজিক রূপ** সৃষ্টি করছে। **'ন্যায্য শ্রম-দিবসের জন্য ন্যায্য মজুরি!'** — এই **রক্ষণশীল** নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায় এই **বিপ্লবী** মন্ত্র মুদ্রিত করা — **'মজুরি-প্রথার অবসান চাই!'**

আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কিছুটা সুবিচার করার জন্য বাধ্য হয়ে এই অত্যন্ত দীর্ঘ ও হয়তো বা ক্লান্তিকর বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, এখন এই সিদ্ধান্তগুলি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব:

প্রথমত, মজুরি হারের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফা-হার হ্রাস

পায়, কিন্তু মোটের উপর, পণ্যের দামের ওপরে তার কোনো প্রভাব পড়ে না।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে মজুরির গড়পড়তা মান বাড়ানো নয়, তা কমানোর দিকেই।

তৃতীয়ত, পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঘাঁটি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভালো কাজ করে। তাদের আংশিক ব্যর্থতা এইজন্য যে, স্বীয় ক্ষমতা তারা বিবেচকের মতো ব্যবহার করে না। তাদের সাধারণ ব্যর্থতা এইজন্য যে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে একই সঙ্গে পাল্টানোর চেষ্টার বদলে, শ্রমিক শ্রেণীর চরম মুক্তির জন্য অর্থাৎ মজুরি-প্রথার চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য নিজেদের সংগঠিত শক্তিটাকে চালক দন্ড হিসেবে প্রয়োগ করার বদলে এই ব্যবস্থার ফলাফলের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর মধ্যেই তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে।

১৮৬৫ সালের মে মাসের শেষ দিক থেকে ২৭শে জুন তারিখে মার্কসের লিখিত

স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে সর্বপ্রথম ১৮৯৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত

ইংরেজি পুস্তিকার পাঠ অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

বিভিন্ন প্রশ্নে সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট নির্দেশ (৪০)

১। আন্তর্জাতিক সমিতির সংগঠন

সাময়িক নিয়মাবলিতে **সংগঠনের যে পরিকল্পনা** নিবদ্ধ হয়েছে, তা সাধারণভাবে ও পুরোপুরি গ্রহণের সুপারিশ করছে সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদ। এই পরিকল্পনার সঠিকতা এবং কর্মের ঐক্যের ক্ষতি না করে বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়েছে দুই বছরের অভিজ্ঞতায়। পরের বছরের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিষ্ঠানস্থান লণ্ডনেই রেখে দেবার সুপারিশ করছি কেননা ইউরোপীয় ভূখণ্ডের পরিস্থিতি স্পষ্টতই কোনোরূপে পরিবর্তনের অনুকূল নয়।

বলাই বাহুল্য কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যদের নির্বাচিত হতে হবে কংগ্রেস থেকে (§ ৫ সাময়িক নিয়মাবলি) অধিগ্রহণের অধিকার সহ।

সমিতির একমাত্র বেতনভোগী পদাধিকারী হিসেবে এক বছরের জন্য **সাধারণ সম্পাদককে** নির্বাচন করা উচিত কংগ্রেস থেকে। আমরা তাকে সপ্তাহে ২ পাউণ্ড স্টার্লিং দেবার প্রস্তাব করছি।

সমিতির প্রতিটি সভ্যের সমান হারে বার্ষিক চাঁদা স্থির করা হল **আধ পেনি** (হয়ত এক পেনি)। সভ্য কার্ড (বই)-এর দাম এর অতিরিক্ত।

পারস্পরিক সাহায্যের সমিতি গঠন এবং তাদের ভেতর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমরা সমিতির সভ্যদের আহ্বান করলেও আমরা এ প্রশ্নে (পারস্পরিক সাহায্যের সমিতি গঠন; সমিতির সভ্যদের অনাথ শিশুসন্তানদের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য) উদ্যোগ রেখে দিচ্ছি সুইসদের হাতে যাঁরা গত বছরের সেপ্টেম্বরের সম্মেলনে এই প্রস্তাব এনেছিলেন। (৪১)

২। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংগ্রামে সমিতির সাহায্যে কর্মের আন্তর্জাতিক ঐক্য

ক) সাধারণভাবে বললে এ প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক সমিতির সমগ্র ক্রিয়াকলাপেই পরিব্যাপ্ত, এর লক্ষ্য হল মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের যে শ্রমিক এতদিন পর্যন্ত ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা সাধারণ খাতে চালিত করা।

খ) একটা যে মূল কাজ আমাদের সমিতি এতদিন পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে সেটা হল পুঁজিপতিদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করা যারা ধর্মঘট ও লক-আউটের ক্ষেত্রে সর্বদা বিদেশী শ্রমিকদের সদিচ্ছার অপব্যবহার করেছে, তাদের কাজে লাগিয়েছে স্থানীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে। সমিতির একটা মহৎ লক্ষ্য হল – বিভিন্ন দেশের শ্রমিকেরা শুধু **অনুভব করে** না, নিজ-মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ ফৌজে সংগ্রামী ভাই ও কমরেড হিসেবে **কাজও করে**, সেটা ঘটানো।

গ) 'কর্মের আন্তর্জাতিক ঐক্যের' বৃহৎ দৃষ্টান্ত হল **সমস্ত দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা বিষয়ে পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা যা শ্রমিক শ্রেণী নিজেরাই চালাবে**। সাফল্যের কিছু আশা নিয়ে কাজ করতে হলে যেসব মালমশলা নিয়ে খাটতে হবে তা জানা চাই। এমন একটা বড়ো কাজে নেমে শ্রমিকেরা দেখিয়ে দেবে যে তারা নিজেদের ভাগ্য স্বহস্তে নিতে সক্ষম। তাই আমরা প্রস্তাব করছি:

আমাদের সমিতির শাখা যেখানে আছে তেমন সকল স্থানেই কাজ শুরু করা হোক এবং সমীক্ষার প্রস্তাবিত ছকে উল্লিখিত বিভিন্ন ধারায় বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা হোক।

শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত সংবাদ সংগ্রহে অংশ নেবার জন্য কংগ্রেস ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত শ্রমিকদের আহ্বান করছে। রিপোর্ট এবং বাস্তব তথ্যাদি কেন্দ্রীয় পরিষদে পাঠানো উচিত। এইসব মালমশলার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ একটি সাধারণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরিশিষ্ট হিসেবে সংখ্যাতথ্যগুলি যোগ করা হবে তাতে।

পরিশিষ্ট সহ প্রতিবেদন পেশ করা হবে পরবর্তী বার্ষিক কংগ্রেসে এবং অনুমোদিত হবার পর তা ছাপা হবে সমিতির টাকায়।

সমীক্ষার সাধারণ ছক,
বলাই বাহুল্য প্রতিটি স্থান হিসেবে
তাতে পরিবর্তন করা যাবে।

১) উৎপাদনের নাম।

২) তাতে নিযুক্ত লোকেদের বয়স এবং স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা।

৩) নিযুক্ত লোকেদের সংখ্যা।

৪) মজুরি: ক) শিক্ষানবিশদের; খ) দৈনিক নাকি ফুরন মজুরি; মধ্যস্থদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ; গড় সাপ্তাহিক, বার্ষিক রোজগার।

৫) ক) কল-কারখানায় শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য। খ) ছোটো ছোটো উদ্যোক্তাদের ওখানে এবং এই ধরনের উৎপাদন থাকলে কুটির শিল্পে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য। গ) দিনের ও রাতের কাজ।

৬) আহারের জন্য বিরতি এবং শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যবহার।

৭) কর্মশালা এবং শ্রমের প্রকৃতির বিবরণ: ঘিঞ্জি জায়গা, বায়ু চলাচল খারাপ, রোদের অপ্রতুলতা, গ্যাস বাতির প্রয়োগ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

৮) কাজের প্রকৃতি।

৯) শারীরিক অবস্থার ওপর কাজের প্রভাব।

১০) নৈতিক শর্ত। লালন।

১১) উৎপাদনের অবস্থা। সেটা কি মরশুমী নাকি মোটামুটি সমতালে চলে সারা বছর, বড়ো রকমের ওঠা-নামা হয় কি তাতে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে কি, প্রধানত অভ্যন্তরীণ নাকি বাইরের বাজারের জন্য তা খাটে ইত্যাদি।

৩। শ্রম-দিবস সীমিতকরণ

যে প্রাথমিক শর্ত ছাড়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন ও তাদের মুক্তির সমস্ত পরবর্তী প্রয়াসের নির্বন্ধ অসাফল্য, সেটা হল **শ্রম-দিবস সীমিতকরণ।**

সমস্ত জাতির যারা মেরুদন্ড সেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তি

পুনরুদ্ধারের জন্য তা যেমন দরকার, তেমনি দরকার শ্রমিকদের মানসিক বিকাশ, নিজেদের বন্ধুর মতো মেলামেশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যও।

আমরা **আইন করে** শ্রম-দিবস **৮ ঘণ্টায় সীমিত করার** প্রস্তাব করছি। এরূপ সীমিতকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের সাধারণ দাবি (৪২), সারা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ কর্মসূচিতে তাকে পরিণত করার জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত।

সমিতির ইউরোপস্থ যেসব সদস্যের ফ্যাক্টরি আইন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত কম, তাদের অবগতির জন্য যোগ করি, শ্রমের এই ৮ ঘণ্টা **দিনের কোন সময়টায়** পড়বে তার যথাযথ উল্লেখ না থাকলে আইন দ্বারা স্থিরীকৃত কোনো সীমিতকরণেই লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না, পুঁজি তা লঙ্ঘন করবে। এই সময়টার দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হওয়া চাই ৮ ঘণ্টায় এবং আহারের জন্য বিরতির অতিরিক্ত সময়ে। যেমন আহারের বিভিন্ন বিরতির জন্য যদি লাগে **এক ঘণ্টা,** তাহলে আইনে ধার্য দিনটা হওয়া উচিত ৯ ঘণ্টা, ধরা যাক সকাল সাতটা থেকে বিকেল ৪টে, অথবা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি, ইত্যাদি। রাতের খাটুনি, উৎপাদনে অথবা উৎপাদনের শাখায় রাতের খাটুনি অনুমোদিত হতে পারবে কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে, আইনের যথাযথ নির্ধারণ অনুসারে। চেষ্টা করা উচিত রাতের খাটুনি পুরোপুরি বরবাদ করার জন্যে।

এই অনুচ্ছেদটি কেবল বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তবে শেষোক্তদের **কোনোরকম রাতের খাটুনি** এবং যেসব শ্রম নারীর অপেক্ষাকৃত পলকা দেহের পক্ষে বিপজ্জনক এবং বিষাক্ত ও অন্যান্য অনিষ্টকর দ্রব্যে তার দেহ আক্রান্ত তাতে তাদের খাটানো চলবে না। বয়স্ক বলতে আমরা বুঝছি ১৮ বছর বয়স হয়েছে এমন সমস্ত লোককে।

৪। শিশু ও নাবালকদের শ্রম (উভয় লিঙ্গের)

আমরা মনে করি যে আধুনিক শিল্পের পক্ষ থেকে উভয় লিঙ্গের শিশু ও নাবালকদের সামাজিক উৎপাদনের বৃহৎ কর্মকাণ্ডে টেনে আনার প্রবণতাটা প্রগতিশীল, সুস্থ ও বৈধ প্রবণতা, যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাও একটা বিকৃত

রূপ নিয়েছে। বিচক্ষণ সামাজিক ব্যবস্থায় ৯ বছর বয়স থেকে **প্রতিটি শিশুকে** হতে হবে উৎপাদক, ঠিক যেমন শ্রমক্ষম প্রতিটি বয়স্ক লোককেও হতে হবে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের অধীন, যথা: খেতে হলে খাটতে হবে এবং খাটতে হবে শুধু মাথা দিয়ে নয়, হাত দিয়েও। তবে বর্তমানে আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে কেবল শ্রমিক শ্রেণীস্থ শিশু ও নাবালকদের জন্য প্রযত্ন।

শারীরবৃত্তের ভিত্তিতে আমরা মনে করি শিশু ও নাবালকদের **তিনটি ভাগে** ভাগ করা প্রয়োজন যা তাদের প্রতি বিভিন্ন সম্পর্কের দাবি করে: প্রথম গ্রুপে থাকা উচিত ৯ থেকে ১২ বছর, দ্বিতীয় গ্রুপে ১৩ থেকে ১৫ বছর, তৃতীয়তে ১৬ ও ১৭ বছর বয়সীরা। আমরা দাবি করি কোনো একটা কর্মশালায় অথবা বাড়িতে প্রথম গ্রুপের জন্য আইন শ্রম সীমিত করুক **দুই** ঘণ্টায়; দ্বিতীয়ের জন্য **চার** এবং তৃতীয়ের জন্য **ছয়** ঘণ্টায়। তৃতীয় গ্রুপের জন্য আহার অথবা বিশ্রামের জন্য অন্তত এক ঘণ্টা বিরতি থাকা চাই।

সম্ভবত প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ে ৯ বছর বয়সের আগেই ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এখানে আমরা কেবল সমাজব্যবস্থার সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে একান্ত অত্যাবশ্যক বিষনাশক ব্যবস্থার কথা বলছি যা শ্রমিককে নামিয়ে দেয় স্রেফ পুঁজি সঞ্চয়ের হাতিয়ারের স্তরে এবং অভাবে জর্জরিত মাতাপিতাকে পরিণত করে নিজেদের শিশুসন্তান বিক্রেতা দাসমালিকে। শিশু ও নাবালকদের **অধিকার** রক্ষা করতে হবে। নিজেরা তারা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হবার মতো অবস্থায় নেই। তাই তাদের পক্ষ নেওয়া সমাজের কর্তব্য। যদি মধ্য উচ্চতর শ্রেণীরা সন্তানদের প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা করে, সেটা তাদের দোষ। এইসব শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা পেলেও শিশুকে তাদের কুসংস্কার থেকে কষ্ট পেতে হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। শ্রমিক তার ক্রিয়াকর্মে স্বাধীন নয়। বড়ো বেশি ক্ষেত্রে সে এতই অজ্ঞ যে নিজের শিশুর সত্যকার স্বার্থ অথবা মানবিক বিকাশের স্বাভাবিক শর্ত বুঝতে সে অক্ষম। সে যাই হোক — সবচেয়ে অগ্রণী শ্রমিকেরা পুরোপুরি বোঝে যে তাদের শ্রেণীর, সুতরাং মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে শ্রমিকদের উঠতি পুরুষদের মানুষ করে তোলার ওপর। তারা বোঝে যে সর্বাগ্রে কর্মরত

শিশু ও নাবালকদের আড়াল করে রাখতে হবে বর্তমান ব্যবস্থার বিধ্বংসী ক্রিয়া থেকে। এটা অর্জিত হতে পারে কেবল **সামাজিক চেতনাকে সামাজিক শক্তিতে** পরিণত করে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তা ঘটানো সম্ভব কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক চালু করা **সাধারণ আইন** মারফত। এরূপ আইন চালু করায় শ্রমিক শ্রেণী মোটেই সরকারের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করছে না। বরং বিপরীত পক্ষে, যে ক্ষমতাটা বর্তমানে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাকে সে পরিণত করবে নিজের হাতিয়ারে, সাধারণ আইন-প্রণয়নী ক্রিয়ার দ্বারা সে তাই ঘটাবে যা অসংখ্য অর্জনের বৃথা চেষ্টা হতে পারত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রয়াসের পথে।

এইটে থেকে এগিয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে মাতাপিতা ও উদ্যোক্তাদের কোনো ক্রমেই শিশু ও নাবালকদের শ্রম নিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া চলবে না যদি তা না মেলানো হয় লালনের সঙ্গে।

লালন বলতে আমরা তিনটি জিনিস বুঝি:

প্রথমত: **মানসিক লালন।**

দ্বিতীয়ত: **শারীরিক লালন** যা পাওয়া যায় ব্যায়ামের বিদ্যালয়ে ও সামরিক কুচকাওয়াজ থেকে।

তৃতীয়ত: **টেকনিকাল শিক্ষা**, যাতে সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে এবং সেই সঙ্গে শিশু ও নাবালক সমস্ত উৎপাদনের সরলতম হাতিয়ারগুলি চালাবার অভ্যাস আয়ত্ত করবে।

মানসিক ও শারীরিক লালন এবং টেকনিকাল শিক্ষার ক্রমশ জটিল কোর্সকে হতে হবে বয়স অনুসারে শিশু ও নাবালকদের গ্রুপে গ্রুপে বণ্টন অনুসারী। টেকনিকাল বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় আংশিক মেটানো উচিত তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় মারফত।

বেতনযোগ্য শ্রম, মানসিক লালন, শারীরিক অনুশীলন এবং পলিটেকনিকাল শিক্ষাকে মেলালে তা শ্রমিক শ্রেণীকে তুলে দেবে অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মানের অনেক ওপরে।

বলাই বাহুল্য, ৯ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত (১৭ সমেত) সকলের শ্রম রাত্রে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সমস্ত উৎপাদনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে আইন দ্বারা।

৫। সমবায়ী শ্রম

শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সমিতি শ্রমিক শ্রেণীর **স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে** ঐক্যবদ্ধ এবং সাধারণ খাতে চালিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে, কিন্তু মোটেই হুকুম জারি করা বা তাদের ওপর কোনো একটা মতবাগীশ ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার লক্ষ্য নয়। সেইজন্য সমবায়ের কোনো একটা **বিশেষ ব্যবস্থা** ঘোষণা করা কংগ্রেসের উচিত নয়, শুধু কতকগুলি সাধারণ নীতির উল্লেখে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

ক) আমরা মনে করি, সমবায় আন্দোলন শ্রেণী বৈরের ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজ পুনর্গঠনের অন্যতম শক্তি। এ আন্দোলনের একটি বড়ো কীর্তি হল এই যে তা কার্যক্ষেত্রে **স্বাধীন ও সমাধিকারী উৎপাদকদের সমিতিস্বরূপ** প্রজাতান্ত্রিক ও লোকহিতকর ব্যবস্থা দ্বারা পুঁজির নিকট শ্রমের **অধীনতার** যে ব্যবস্থাটা স্বেচ্ছাচারী এবং নিঃস্বতার সৃষ্টি করছে, তার স্থানগ্রহণ সম্ভব।

খ) তবে মজুরি শ্রমের পৃথক পৃথক দাসেরা তাদের নিজেদের প্রয়াসে শুধু যেটুকু গড়তে সক্ষম, তেমন বামনাকার রূপে সীমাবদ্ধ থাকায় সমবায় ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে না। সামাজিক উৎপাদনকে স্বাধীন সমবায়ী শ্রমের একটি একক, প্রসারিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত করার জন্য আবশ্যক **সার্বিক সামাজিক পরিবর্তন**, **সমাজব্যবস্থার বনিয়াদের পরিবর্তন**, যা অর্জিত হতে পারে পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের কাছ থেকে খোদ উৎপাদকদের নিকট সমাজের সংগঠিত শক্তির অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তরে।

গ) সমবায় ব্যবসার চেয়ে **সমবায় উৎপাদন** বাঞ্ছনীয় গণ্য করার জন্য শ্রমিকদের কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রথমোক্তটা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শুধু উপরিভাগটা স্পর্শ করে, শেষোক্তটা তার বনিয়াদ বিদীর্ণ করে দেয়।

ঘ) সাধারণ আয়ের একাংশ যেমন কথায় তেমনি কাজে নিজেদের নীতিগুলির প্রচারের তহবিলে যথা, নিজেদের মতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উৎপাদনী-সমবায়ী সমিতি স্থাপনে সহায়তা করার তহবিলে পরিণত করার জন্য সমবায় সমিতিগুলির নিকট সুপারিশ করা হচ্ছে।

ঙ) সাধারণ বুর্জোয়া শেয়ার কোম্পানিতে [sociétés par actions] সমবায় সমিতিগুলির অধঃপতন পরিহারের জন্য প্রতিটি উদ্যোগের শ্রমিকের তার শেয়ার-হোল্ডার হোক বা না হোক, তা নির্বিশেষে আয়ের সমান ভাগ পাওয়া উচিত। নিছক সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে শেয়ার-হোল্ডাররা যদি সামান্য সুদ পায়, তাতে আমরা সম্মত।

৬। ট্রেড-ইউনিয়ন। তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ক) তাদের অতীত।

পুঁজি হল পুঞ্জীভূত সামাজিক শক্তি যেক্ষেত্রে শ্রমিক শুধু শ্রম-শক্তির অধিকারী। সুতরাং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চুক্তি কখনোই হতে পারে না ন্যায্য ভিত্তিতে, এমন কি যে সমাজে জীবনধারণ ও শ্রমের বাস্তব উপায় জীবন্ত উৎপাদন-শক্তির বিরোধী তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ন্যায্য। শ্রমিকদের সামাজিক শক্তি নিহিত কেবল তাদের সংখ্যায়। কিন্তু সংখ্যায় শ্রেষ্ঠতার শক্তি ধ্বংস পায় তাদের ঐক্যহীনতায়। শ্রমিকদের ঐক্যহীনতা গড়ে ওঠে ও টিকে থাকে তাদের নিজেদের মধ্যেই অনিবার্য প্রতিযোগিতার ফলে।

অন্তত সাধারণ দাসের অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেবে, চুক্তিতে এরূপ শর্ত আদায়ের জন্য এই প্রতিযোগিতা দূর করা অথবা নিদেন পক্ষে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস থেকে প্রথমে উদ্ভব হয় ট্রেড-ইউনিয়নগুলির। তাই ট্রেড-ইউনিয়নগুলির অব্যবহিত কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজনে, পুঁজির অবিরাম আক্রমণ থামাবার প্রয়াসে, এক কথায় — মজুরি ও শ্রম-সময়ের প্রশ্নে। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির এরূপ ক্রিয়াকলাপ শুধু আইনসঙ্গত নয় আবশ্যিকও। যতদিন উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতি টিকে থাকছে, ততদিন তা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। শুধু তাই নয়, সমস্ত দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ে ও ঐক্যবদ্ধ করে এই ক্রিয়াকলাপের সার্বিক প্রসার হওয়া উচিত। অন্যদিকে নিজেদের অজ্ঞাতেই ট্রেড-ইউনিয়নগুলি হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সাংগঠনিক কেন্দ্র, ঠিক মধ্য যুগের মিউনিসিপ্যালিটি ও কমিউনগুলি যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়ার কাছে সাংগঠনিক কেন্দ্র। ট্রেড-ইউনিয়ন যদি

প্রয়োজনীয় হয় পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে খন্ডযুদ্ধের লড়াইয়ের জন্য, তাহলে খোদ মজুরি প্রথাটাকেই ও পুঁজির ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য সংগঠিত শক্তি হিসেবে তা আরো বেশি দরকার।

খ) তাদের বর্তমান।

পুঁজির সঙ্গে একান্তরূপে স্থানিক ও অব্যবহিত সংগ্রামে বড়ো বেশি ঘন ঘন লিপ্ত থাকায় ট্রেড-ইউনিয়নগুলি খোদ মজুরি দাসত্বের ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধেই সংগ্রামে কী শক্তি ধরে সে বিষয়ে এখনো তারা পুরো সচেতন হয়ে ওঠে নি। সেইজন্য সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তারা বড়ো বেশি দূরে সরে থেকেছে। তাহলেও ইদানীং তাদের ভেতর তাদের মহান ঐতিহাসিক ব্রতের চেতনা জেগে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলন্ডে বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ তার সাক্ষ্য (৪৩), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নিজেদের কাজের ব্যাপকতর বোধ রয়েছে (৪৪) এবং শেফিল্ডে (৪৫) ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বৃহৎ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত:

'বর্তমান সম্মেলন সমস্ত দেশের শ্রমিকদের একক ভ্রাতৃসংঘে মিলিত করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমিতির ক্রিয়াকলাপের উচিতমতো মূল্যায়ন করে এই সমিতিতে প্রবেশের জন্য এখানে বিভিন্ন যেসব সঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে তাদের কাছে সনির্বন্ধ সুপারিশ করছে এবং এইটে ধরে নিচ্ছে যে সেটা সমগ্র শ্রমিক মানুষের অগ্রগতি ও প্রস্ফুরণে রীতিমতো সহায়তা করবে।'

গ) তাদের ভবিষ্যৎ।

নিজেদের প্রাথমিক লক্ষ্য যাই থাকুক, এখন এগুলিকে শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ মুক্তির মহাকর্তব্য নিয়ে তাদের সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসেবে সচেতনভাবে কাজ করা শিখতে হবে। সর্ববিধ যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই অভিমুখে চলেছে তাকে সমর্থন করতে হবে তাদের। সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থের জন্য সংগ্রামী বলে নিজেদের গণ্য করে এবং কার্যক্ষেত্রে তদনুসারে কাজ চালিয়ে তারা নিজেদের পঙক্তিতে অসংগঠিত শ্রমিকদেরও টানতে বাধ্য। উৎপাদনের যেসব শাখার শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সবচেয়ে খারাপ, যেমন কৃষি-মজুর, প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন যারা একেবারে

অসহায়, তাদের স্বার্থের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া তাদের উচিত। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির উচিত সারা বিশ্বকে এইটে দেখানো যে তারা লড়ছে সংকীর্ণ আত্মপরায়ণ স্বার্থের জন্য নয়, কোটি কোটি নিপীড়িতের মুক্তির জন্য।

৭। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর

ক) করধার্যের ধরনে কোনো পরিবর্তনেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কে কোনো মৌলিক রকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে না।

খ) তাহলেও করধার্যের এই দুই ধরনের ব্যবস্থা মধ্যে বাছাই করতে হলে আমরা **পরোক্ষ কর পুরোপুরি নাকচ করে তৎস্থলে সর্বত প্রত্যক্ষ করের** সুপারিশ করব।

কারণ, পরোক্ষ কর পণ্যের দর বাড়িয়ে দেয়, কেননা ব্যবসায়ীরা এই দরের ওপর শুধু পরোক্ষ করের পরিমাণটুকু নয়, তা পরিশোধের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম পুঁজির সুদ ও মুনাফাও যোগ করে।

কারণ, পরোক্ষ কর আলাদা প্রত্যেকটি লোকের কাছ থেকে চেপে রাখে রাষ্ট্রকে কতটা তারা দিচ্ছে, যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর কোনো ছদ্মবেশ না নিয়ে সেটা আদায় করে খোলাখুলি, সবচেয়ে তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিকেও তা বিভ্রান্ত করে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রবুদ্ধ করে সবাইকে যেক্ষেত্রে পরোক্ষ কর আত্মনিয়ন্ত্রণের সর্ববিধ প্রয়াসকে দমন করে।

৮। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট

এ বিষয়ে উদ্যোগ দেওয়া উচিত ফরাসীদের।

৯। পোলীয় প্রশ্ন

ক) ইউরোপীয় শ্রমিক কেন এই প্রশ্নটা তুলছে? প্রথমত, তার কারণ ইউরোপীয় লেখক ও আন্দোলনকেরা এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার চক্রান্ত করেছে যদিও তারাই ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমস্ত জাতির পৃষ্ঠপোষক এমনকি

আয়র্ল্যাণ্ডেরও। এই নীরবতার কারণ কী? কারণ এই যে, তমসাচ্ছন্ন যে এশীয় শক্তি রয়েছে গৌণ অবস্থানে, অভিজাত এবং বুর্জোয়া উভয়েই তাকে দেখছে শ্রমিক আন্দোলনের উদীয়মান তরঙ্গের বিরুদ্ধে শেষ দুর্গ হিসেবে। এই শক্তিটা সত্যসত্যই চূর্ণ হতে পারে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠনের পথে।

খ) মধ্য ইউরোপের, বিশেষত জার্মানির অবস্থার বর্তমান পরিবর্তনে গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব এখন যতটা প্রয়োজন তেমন আর কখনো হয় নি। তা ছাড়া জার্মানি পরিণত হবে পবিত্র-জোটের (৪৬) অগ্রঘাঁটিতে, আর তা থাকলে জার্মানি যোগ দেবে প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায়। এই গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন সর্বদা প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হবে, পরাজয় বরণ করবে এবং তার বিকাশ আটকে থাকবে।

গ) এই প্রশ্নে উদ্যোগ নেওয়াটা জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য, কেননা জার্মানি হল পোল্যান্ড ভাগবিভাগের অন্যতম অংশী।

১০। ফৌজ

ক) **উৎপাদনের** ওপর বড়ো বড়ো স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর সর্বনাশা প্রভাব যথেষ্ট প্রদর্শিত হয়েছে নানা নামের বুর্জোয়া কংগ্রেসে, শান্তিকামী, অর্থনৈতিক, পরিসংখ্যানমূলক, লোকহিতৈষী ও সমাজবিদ কংগ্রেসে। তাই আমরা এ প্রশ্নের বিস্তারণ একেবারে বাহুল্য মনে করি।

খ) আমরা জনগণের সার্বিক সশস্ত্রীকরণ ও সার্বিক অস্ত্রশিক্ষার প্রস্তাব করছি।

গ) সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে আমরা অনতিবৃহৎ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী অনুমোদন করছি, যা হবে মিলিসিয়ার নায়কবৃন্দকে তালিম দেবার বিদ্যালয়; প্রতিটি পুরুষ অতি অল্প সময়ের জন্য এই ফৌজে যোগ দেবে।

১১। ধর্মের প্রশ্ন

এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ফরাসীদের।

১৮৬৬ সালের অগস্টের শেষে মার্কস এটি লেখেন।

প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি 'The International Courier' পত্রিকার ৬-৭ নং সংখ্যায়, ১৩ মার্চ ৮-১০ নং সংখ্যায়; ১৮৬৭ সালের ৯ ও ১৬ মার্চ 'Le Courrier international' পত্রিকার ১০ ও ১১ নং সংখ্যায় এবং ১৮৬৬ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে 'Der Vorbote' পত্রিকার ১০ ও ১১ নং সংখ্যায়

'The International Courier' পত্রিকার ভাষ্য অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নিকট অভিভাষণ (৪৭)

কমরেড শ্রমিকগণ!

আমাদের সমিতির প্রতিষ্ঠা কর্মসূচিতে আমরা ঘোষণা করেছিলাম: 'আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে দাসত্বকে কায়েম রাখার ও প্রচারিত করার কলঙ্কময় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে পশ্চিম ইউরোপকে বাঁচিয়েছিল শাসক শ্রেণীর বিজ্ঞ মনোভাব নয়, বাঁচিয়েছিল সেই অপরাধসূচক মূর্খামির বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীরই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ।'* এবার আপনাদের পালা এসেছে এমন একটা যুদ্ধ ঠেকানো যার ফলে আটলাণ্টিকের উভয় পারে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আন্দোলন নিঃসন্দেহেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হবে।

আপনাদের এ কথা বোঝাবার বড়ো একটা প্রয়োজন নেই যে এমন কিছু রাষ্ট্রশক্তি আছে যারা ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনতে উদগ্ররূপে অভিলাষী। বাণিজ্য পরিসংখ্যানের তথ্যে চোখ বুলালেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে গৃহযুদ্ধ হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত রুশী কাঁচামালের রপ্তানি -- এবং রাশিয়া থেকে রপ্তানির আর কিছু নেই -- দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছিল আমেরিকান রপ্তানির কাছে। ঠিক এখনই আমেরিকান লাঙলকে পিটিয়ে খড়্গ করতে পারলেই দেউলিয়াপনার বিপদ থেকে পরিত্রাণ সূচিত হবে এই স্বেচ্ছাচারী শক্তিটির যাকে আপনাদের অতিপ্রাজ্ঞ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুরুষেরা নিজেদের নিকটতম উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কোনো না কোনো সরকারের বিশেষ স্বার্থ নির্বিশেষে আমাদের অধিকতর

---

* বর্তমান খণ্ডের ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। -- সম্পাঃ

পরাক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে অন্তর্যুদ্ধে পরিণত করা কি আমাদের উৎপীড়কদের সাধারণ স্বার্থ নয়?

পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষে মিঃ লিঙ্কনকে যে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলাম তাতে আমরা এই প্রত্যয় প্রকাশ করেছিলাম যে বুর্জোয়ার বিকাশের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য আমেরিকান যুদ্ধ যে তাৎপর্য ধরেছিল, শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের পক্ষে আমেরিকার গৃহযুদ্ধও তেমনি বিপুল তাৎপর্য ধরে।* এবং প্রকৃতপক্ষেই দাস-মালিকানার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিজয়ী সমাপ্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসে নবযুগের উদ্বোধন হয়েছে। ঠিক এই সময় থেকেই খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলন, যেটাকে আপনাদের পুরনো পার্টিরা আর তাদের পেশাদার রাজনীতিকেরা দেখছে বিদ্বেষের চোখে। এই আন্দোলনকে পরিপক্ক হবার অবকাশ দিতে হলে দরকার বছরের পর বছর শান্তি। তাকে ধ্বংস করতে হলে দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ।

গৃহযুদ্ধের সরাসরি দৃষ্টিগোচর ফল হয়েছে স্বভাবতই আমেরিকান শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেমন ইউরোপেও, পৈশাচিক রক্তচোষা বাদুড় — জাতীয় ঋণ — স্কন্ধ থেকে স্কন্ধে স্থানান্তরিত হয়ে অবশেষে বর্তেছে শ্রমিক শ্রেণীর ঘাড়ে। আপনাদের একজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বলছেন — প্রাথমিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদির দাম ১৮৬০ সাল থেকে বেড়ে উঠেছে ৭৮%, যেক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে মাত্র ৫০%, দক্ষদের — ৬০%।

উনি অভিযোগ করেছেন, 'আমেরিকায় এখন নিঃস্বতা বাড়ছে জনসংখ্যার চেয়ে বেশি।'

তদুপরি শ্রমিক শ্রেণীর ক্লেশভোগের প্রেক্ষাপটে আরো প্রকট হয়ে ওঠে ফিনান্স অভিজাত, ভুঁইফোড় অভিজাত (৪৮), এবং যুদ্ধে সম্ভূত অন্যান্য পরজীবীদের দৃষ্টিকটু বিলাস। এবং তাহলেও এসব সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধের ফল হয়েছে ইতিবাচক — দাসেদের মুক্তি এবং তাতে করে নৈতিক প্রেরণা

* বর্তমান খণ্ডের ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পেয়েছে আপনাদের নিজেদের শ্রেণী আন্দোলন। কোনো নৈতিক আদর্শ, মহতী সামাজিক আবশ্যিকতা, কোনো কিছুতেই যা ন্যায়সঙ্গত নয়, পুরনো দুনিয়ার মনোভাবে এমন একটা নতুন যুদ্ধের ফল হবে বন্দীদের শৃঙ্খলমোচন নয়, স্বাধীন শ্রমিকদের জন্য নতুন শেকল। এতে যে নিঃস্বতাবৃদ্ধি ঘটবে তাতে স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর হৃদয়হীন খড়্গাঘাতে শ্রমিক শ্রেণীর সাহসী ও ন্যায্য প্রয়াস থেকে তাদের বিচ্যুত করার জন্য আপনাদের পুঁজিপতিরা অজুহাত এবং উপায়, দুই-ই পাবে।

ঠিক এইজন্যই আপনাদের ওপর বর্তাচ্ছে বিশ্বকে এইটে দেখানোর দায়িত্ব যে অবশেষে এখন ইতিহাসের মল্লভূমিতে শ্রমিক শ্রেণী অবতীর্ণ হচ্ছে বশংবদ আজ্ঞানির্বাহী হিসেবে নয়, স্বাধীন শক্তি হিশেবে, যা নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তথাকথিত কর্তারা যেখানে যুদ্ধের চিৎকার তুলছে, সেখানে শান্তির হুকুম জারি করতে তা সক্ষম।

লণ্ডন, ১২ মে, ১৮৬৯

'Address to the National Labour Union of the United States' নামক প্রচারপত্র হিসেবে মুদ্রিত, লণ্ডন, ১৮৬৯

প্রচারপত্রের ভাষ্য অনুসারে অনূদিত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধ (৪৯)

১৮৭০ সালের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালে, সদ্যসমাপিত প্রতিবিপ্লবের ছাপ যখন তখনো তাজা, সেসময় লন্ডনে নিম্নলিখিত লেখাটি রচিত হয়েছিল; প্রকাশিত হয়েছিল কার্ল মার্কস সম্পাদিত 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue' (৫০) পত্রিকার পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায়, ১৮৫০ সালে, হামবুর্গে। জার্মানিস্থ আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের ইচ্ছা যে এটি পুনর্মুদ্রিত হোক। খুবই খেদের ব্যাপার যে লেখাটি আজও সময়োপযোগী; তাই তাঁদের ইচ্ছা আমি মেনে নিলাম।

নিজস্ব গবেষণা থেকে সঙ্কলিত মালমশলা সরবরাহের কোনো দাবি এ লেখা করে না। বরং, কৃষক অভ্যুত্থানগুলো ও টমাস মুনৎসার সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সমস্তটাই নেওয়া হয়েছে ত্সিমেরমানের কাছ থেকে (৫১)। জায়গায় জায়গায় কিছু ফাঁক থাকলেও তথ্যের দিক থেকে তাঁর বইটি এখনো সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাছাড়া, বুড়ো ত্সিমেরমান তাঁর আলোচ্য বিষয়টি খুবই পছন্দ করতেন। যে বিপ্লবী প্রবৃত্তি তাঁকে এখানে সর্বত্র অত্যাচারিত শ্রেণীর সমর্থক করে তুলেছে, তারই ফলে পরে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টে চরম বামপন্থীদের (৫২) শ্রেষ্ঠ একজন হয়ে দাঁড়ান।

তবুও যদি ত্সিমেরমানের উপস্থাপিত বক্তব্যে অন্তর্নিহিত পারস্পারিক যোগাযোগগুলির অভাব থাকে; যদি তাঁর লেখা সে যুগের ধর্মীয় রাজনৈতিক বিতর্কগুলিকে সমসাময়িক শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিবিম্ব হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে না পেরে থাকে; যদি এই শ্রেণী-সংগ্রামে শুধু অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, ভাল লোক ও খারাপ লোক এবং খারাপ লোকদের চূড়ান্ত বিজয়ই দেখানো থাকে;

যে সামাজিক অবস্থা সে সংগ্রামের উদ্ভব ও পরিণতি নির্ধারণ করেছিল সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যদি খুবই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে সে সব হল যে যুগে এই বইটি লেখা হয় তারই দোষ। বরং সে যুগের তুলনায় বইখানি লেখা হয়েছিল খুবই বাস্তবানুভাবে, ইতিহাস সম্পর্কে জার্মান ভাববাদীদের রচনার মধ্যে এটি একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম।

আমি বক্তব্যের মধ্যে, এই সংগ্রামের ঘটনাস্রোতের শুধু সামান্য রূপরেখাটুকু দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি কৃষকযুদ্ধের উৎপত্তির কারণ: এতে যে বিভিন্ন দল অংশ নিয়েছিল তাদের অবস্থান; যেসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের সাহায্যে এই দলগুলি নিজেদের অবস্থান উপলব্ধি করতে চেয়েছিল সেই সব মতবাদ; এবং সর্বশেষে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির সামাজিক জীবনের ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই সংগ্রামের ফলাফল; অর্থাৎ দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, সে যুগের জার্মানির রাজনৈতিক কাঠামো, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলো এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদসমূহ জার্মানির কৃষি, শিল্প, স্থলপথ ও জলপথ, পণ্যদ্রব্য ও অর্থ ব্যবসায়ের বিকাশের তৎকালীন স্তরটার ফল মাত্র, কারণ নয়। ইতিহাসের এই যে একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, এর স্রষ্টা আমি নই, মার্কস। ঐ আলোচনীতে, ১৮৪৮-৪৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে* তাঁর যে লেখা বেরিয়েছিল তাতে এবং 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে** এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

১৫২৫ সালের জার্মান বিপ্লবের সঙ্গে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের মিল এত স্পষ্ট যে সে সময়ে তাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা চলত না। তবু বিভিন্ন স্থানীয় বিদ্রোহ একই রাজকীয় বাহিনীর হাতে একের পর এক যে দমিত হল, ঘটনাবলীর এই সমতা সত্ত্বেও, উভয় ক্ষেত্রে পৌরজনের [city burghers] ব্যবহারে অনেক সময় হাস্যকর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, পার্থক্যটাও পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট।

---

* ক. মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' (এই সংস্করণের ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

'১৫২৫ সালের বিপ্লবে কার লাভ হয়েছিল? **রাজাদের।** ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে কার লাভ হল? বড় রাজাদের, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার। ১৫২৫ সালে ছোট রাজাদের পিছনে ছিল ক্ষুদে পৌরজন, — করের শৃঙ্খলে নিজেদের সঙ্গে এরা তাদের বেঁধে রেখেছিল। ১৮৫০ সালে বড় রাজাদের পিছনে, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পিছনে রয়েছে আধুনিক বৃহৎ বুর্জোয়া — রাষ্ট্রঋণের মাধ্যমে এরা তাদের দ্রুত নিজের অধীনে আনছে। আবার বৃহৎ বুর্জোয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী।'*

দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই অনুচ্ছেদে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি বড় বেশী সম্মান দেখানো হয়েছিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুই দেশেই এই শ্রেণী 'রাষ্ট্রঋণের মাধ্যমে' রাজতন্ত্রকে 'দ্রুত নিজের অধীনে আনার' সুযোগ পেয়েছিল; কোথাও আর কখনো সে এই সুযোগকে কাজে লাগায় নি।

১৮৬৬ সালের যুদ্ধের ফলে (৫৩) ভাগ্যের দানের মতো বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এসে পড়েছিল অস্ট্রিয়া। কিন্তু এ বুর্জোয়ারা শাসন করতে জানে না, তারা শক্তিহীন, কোনো কিছু করতেই অক্ষম। শুধু একটা কাজই তারা করতে পারে: শ্রমিকেরা চঞ্চল হতে শুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বর্বরভাবে আক্রমণ। **হাঙ্গেরীয়দের** প্রয়োজন ছিল বলেই শুধু এই শ্রেণী নেতৃত্বে থেকে গেছে।

আর প্রাশিয়াতে? সত্য বটে রাষ্ট্রঋণ লাফ দিয়ে বেড়ে গেছে, ঘাটতি একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাষ্ট্রীয় ব্যয় বছরে বছরে বেড়ে চলেছে, কক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, আর তাদের সম্মতি ব্যতীত করও বাড়ানো চলে না বা নূতন ঋণও ছাড়া যায় না — কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাদের ক্ষমতা কোথায়? মাত্র কয়েক মাস আগে যখন আবার ঘাটতি পড়েছিল তখন তাদের অবস্থা দাঁড়ায় খুবই সুবিধাজনক। শুধু **সামান্য** একটু চেপে বসে থাকলেই তারা চমৎকার অনেক সুবিধা জোর করে আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু তারা কী করল? শুধু **এক** বছরের জন্য নয়, না, না, **প্রতি বছরেই**, আর চিরকাল ধরে বাৎসরিক নব্বই লক্ষের মতো মুদ্রা

---

* ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ'। — সম্পাঃ

সরকারের পায়ে সঁপে দেওয়ার **অনুমতি পাওয়াটাই তারা** যথেষ্ট সুবিধা বলে গণ্য করল।

কক্ষের বেচারী 'জাতীয় উদারনীতিকদের' (৫৪) আমি তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দোষ দিতে চাই না। আমি জানি যে তাদের পিছনে যারা আছে, তারা অর্থাৎ ব্যাপক বুর্জোয়া-জনেরা বিপদের মুখে তাদের পরিত্যাগ করে গেছে। এই বুর্জোয়া-জনেরা শাসন করতে চায় না। ১৮৪৮ সাল এখনো রয়ে গেছে এদের মজ্জার মধ্যে।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী যে কেন এমন উল্লেখযোগ্য কাপুরুষত্ব দেখায় তা পরে আলোচনা করা হবে।

অন্যান্য দিকে অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্যটি পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। ১৮৫০ থেকে শুরু করে ছোট ছোট রাজ্যগুলি ক্রমশ আরও স্পষ্টভাবে পিছনে সরে গিয়ে এখন শুধু প্রুশীয় আর অস্ট্রীয় চক্রান্তের হাতল হিসেবে কাজ করছে; অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার মধ্যে এক কর্তৃত্বের জন্য লড়াই ক্রমশ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছে; সবার উপরে রয়েছে ১৮৬৬ সালের জবরদস্তি নিষ্পত্তি যার ফলে অস্ট্রিয়া তার নিজের প্রদেশগুলি হাতে রাখল, প্রাশিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরো উত্তরটা দখল করে নিল (৫৫), আর দক্ষিণ-পশ্চিমের তিনটি রাজ্যকে* আপাতত বাইরে ফেলে রাখা হল।

এই বিরাট রাষ্ট্রীয় খেলার সমস্তটার মধ্যে একমাত্র যে ব্যাপার জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তা হল:

প্রথমত, সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রমিকদের আইন সভায় সাক্ষাৎ প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এনে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভগবানের অনুগ্রহে লালিত অন্য তিনটি রাজমুকুট** গ্রাস করে (৫৬) প্রাশিয়া সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ভগবানের অনুগ্রহে যে রাজমুকুটের অধিকারী বলে সে আগে দাবি করত, এখনো, এই কার্যকলাপের **পরেও**, যে সেই নিষ্কলঙ্ক মুকুট তার থেকে গেল এ কথা এমন কি জাতীয় উদারনীতিকেরাও বিশ্বাস করে না।

---

* ব্যাভেরিয়া, বাদেন, ভ্যুর্টেমবের্গ। — সম্পাঃ

** হানোভার, হেসেন-কাসেল, নাসাউ। — সম্পাঃ

তৃতীয়ত, এখন জার্মানিতে বিপ্লবের গুরুতর **শত্রু শুধু একটিই** রইল — প্রুশীয় সরকার।

আর চতুর্থত, শেষ পর্যন্ত এখন জার্মান অস্ট্রিয়ানদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে তারা কী হতে চায়, জার্মান না অস্ট্রিয়ান, কার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছা তাদের, জার্মানির সঙ্গে না তাদের জার্মান-বহির্ভূত লেইতা নদীর পারের লেজুড়দের সঙ্গে। বহুদিন থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এর মধ্যে তাদের একটাকে ছাড়তে হবে। কিন্তু পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ক্রমাগত প্রশ্নটা চাপা দিয়ে গেছে।

১৮৬৬ সাল সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যত বিতর্ক তখন থেকে একদিকে 'জাতীয় উদারনীতিকেরা' আর অন্যদিকে 'জনতা পার্টি' (৫৭) ন্যক্কারজনকভাবে চালিয়ে এসেছে, তার সম্বন্ধে বলা যায় যে পরবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দুইটি প্রান্ত বলেই তাদের মধ্যে বিরোধ এমন তিক্ত।

১৮৬৬ সাল জার্মানির সামাজিক অবস্থায় প্রায় কোনো পরিবর্তন আনে নি। সামান্য কয়েকটি বুর্জোয়া সংস্কার — সর্বত্র একই ওজন ও মাপের প্রচলন, গতিবিধির স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা ইত্যাদি সবই ছিল আমলাতন্ত্রের গ্রহণযোগ্য সীমারই মধ্যে। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী বহুকাল ধরে যেসব অধিকার ভোগ করে এসেছে এগুলি তার কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছয় নি, আর আসল ব্যাধি অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের প্রথাটাকে (৫৮) স্পর্শও করে নি। পুলিশের প্রচলিত কান্ডকারখানার ফলে আবার গতিবিধির স্বাধীনতা, আইনসিদ্ধ উপায়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার, ছাড়পত্র বিলোপ ইত্যাদি সম্পর্কে সকল বিধানই প্রলেতারিয়েতের পক্ষে মায়ায় পর্যবসিত হয়।

১৮৬৬ সালের বিরাট রাষ্ট্রীয় খেলের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ১৮৪৮ থেকে জার্মান শিল্প ও বাণিজ্যের, রেলপথের, টেলিগ্রাফের ও সমুদ্রগামী বাষ্পচালিত জাহাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি। এই একই পর্বে ইংলন্ডের বা এমন কি ফ্রান্সের তুলনায় এ প্রগতি যতই সামান্য হোক না কেন, জার্মানির ক্ষেত্রে এর তুলনা মেলে না; পূর্ববর্তী এক গোটা শতাব্দীতে যা হয়েছিল তার থেকে বেশী সাধিত হল কুড়ি বছরে। শুধুমাত্র এতদিনে

জার্মানি গুরুত্বসহকারে ও চিরকালের মতন **বিশ্ববাণিজ্যে** জড়িত হল। শিল্পপতিদের পুঁজি খুব দ্রুত তালে বেড়ে উঠেছে; সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক পদমর্যাদা। শিল্প সমৃদ্ধির সবচেয়ে নিশ্চিত লক্ষণ — **জুয়াচুরি** — অবাধ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর তার বিজয়ী রথের চাকায় বেঁধে নিয়েছে কাউণ্ট ও ডিউকদের। জার্মান পুঁজি এখন রুশ ও রুমানীয় রেলপথ গড়ছে — আহা, তার যেন ভাগ্যে বিপত্তি না আসে! অথচ মাত্র পনেরো বছর আগে পর্যন্ত জার্মান রেলপথকেই ইংরেজ শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হয়েছিল। তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণী যে রাজনৈতিক ক্ষমতাটাও দখল করে নিল না, সরকার সম্পর্কে সে যে এমন কাপুরুষোচিত ব্যবহার করে চলে তা সম্ভব হয় কী করে?

জার্মানির বুর্জোয়া শ্রেণীর দুর্ভাগ্য এই যে জার্মানদের অভ্যস্ত প্রথানুযায়ী সে বড় দেরিতে এসে পেঁছেছে। তার যখন সমৃদ্ধির যুগ, তখন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক অধোগতি শুরু হয়ে গেছে। যে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করে তবেই ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী তার সত্যিকারের প্রতিনিধি ব্রাইটকে সরকারে ঢোকাতে পেরেছিল তার অনিবার্য ফল হবে সমগ্র বুর্জোয়া শাসনেরই অবসান। ফ্রান্সে যে বুর্জোয়া শ্রেণী সামগ্রিকভাবে শ্রেণী হিসেবে মাত্র দু বছর অর্থাৎ ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে শাসনক্ষমতা ভোগ করেছিল, — তারা লুই বোনাপার্ট ও সৈন্যবাহিনীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তবেই নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। আর সবচেয়ে উন্নত তিনটি ইউরোপীয় দেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এত বেশী বেড়ে গেছে যে যখন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসনের উপযোগিতা শেষ হয়ে গেল, তখন আজকের দিনে জার্মানিতে আর বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে স্বচ্ছন্দ রাজনৈতিক শাসনে জাঁকিয়ে বসাটা সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী সকল শাসক শ্রেণীর বিপরীতে বুর্জোয়া শ্রেণীরই বিশেষত্ব হল যে তার বিকাশের ধারা একটা বিন্দুতে পেঁছোনের পর তার ক্ষমতার উপায়, সুতরাং মূলত তার পুঁজি, যত বাড়তে থাকে, রাজনৈতিক আধিপত্যের পক্ষে সে ততই অক্ষম হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখায়। **'বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রলেতারিয়েত।'** বুর্জোয়া শ্রেণী তার শিল্প, বাণিজ্য

ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যতই বিকাশ সাধন করতে থাকে সেই অনুপাতে সে সৃষ্টি করে যায় প্রলেতারিয়েতকে। আর বিশেষ একটা বিন্দুতে গিয়ে সে লক্ষ্য করতে শুরু করে যে তার এই প্রলেতারীয় জুড়ি তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে — অবশ্য সর্বত্র একই সময়ে বা বিকাশের একই স্তরে তা ঘটে না। সেই মুহূর্ত থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য সামর্থ্য হারাতে থাকে; সে চারিদিকে এমন মিত্র খুঁজতে থাকে যার সঙ্গে সে একজোটে শাসন ভাগাভাগি করে নেয়, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী যার হাতে নিজের শাসন পুরোটাই ছেড়ে দেয়।

জার্মানিতে ১৮৪৮ সালের মধ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণী মোড় ফেরার এই বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল। অবশ্যই, জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী জার্মান প্রলেতারিয়েতকে যত না ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে বেশী ভয় পেল ফরাসী প্রলেতারিয়েতকে দেখে। ১৮৪৮ সালে প্যারিসে জুন সংগ্রাম বুর্জোয়া শ্রেণীকে দেখিয়ে দিল তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে। সেই একই ফসলের বীজ যে ইতিমধ্যে জার্মানির মাটিতেও পোঁতা হয়ে গেছে ঠিক সে কথাটুকু প্রমাণ করার সত্যেই তখন যথেষ্ট অশান্ত হয়ে উঠেছিল জার্মান প্রলেতারিয়েত। তাই ঠিক সেদিন থেকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক কাজকর্মের সব ধারটুকু নষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়া শ্রেণী মিত্র খুঁজতে লাগল চারপাশে, মূল্যের দিকে নজর না রেখে নিজেকে তাদের কাছে বিকিয়ে দিল — আর আজও সে এক পা এগোতে পারে নি।

এই মিত্রদের সবারই প্রকৃতি প্রতিক্রিয়াশীল। এদের মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্র তার সৈন্যবাহিনী আর আমলাবর্গ নিয়ে; রয়েছে বৃহৎ সামন্ত অভিজাত শ্রেণী; রয়েছে ক্ষুদে নগণ্য য়ুঙ্কারেরা আর আছে এমন কি পুরোহিতরাও। শুধু নিজের গায়ের বহুমূল্য চামড়াটি বাঁচানোর জন্যই বুর্জোয়া শ্রেণী এদের সঙ্গে চুক্তি ও কারবার করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত বিনিময় করার মতন তার আর কিছুই হাতে থাকে নি। আর প্রলেতারিয়েত যতই বেশী বিকশিত হয়েছে, তার শ্রেণী-বোধ ও শ্রেণী-কর্ম যত শুরু হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেয়ে গেছে ততই বেশী। যখন সাদোভাতে (৫৯) প্রুশীয়দের আশ্চর্য রকম খারাপ রণকৌশল অস্ট্রীয়দের আরও বেশী আশ্চর্য রকম খারাপ রণকৌশলকে পরাজিত করল, তখন সাদোভাতে যে প্রুশীয়

বুর্জোয়াদেরও হার হয়, সেই প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, অথবা অস্ট্রীয় বুর্জোয়ারা, কে গভীরতর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল তা বলা শক্ত।

১৫২৫ সালের মাঝারি বার্গাররা যে রকম আচরণ করত আমাদের ১৮৭০ সালের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও অবিকল তাই করছে। আর পেটি বুর্জোয়া, কারিগর ও দোকানের মালিকদের সম্পর্কে বলা চলে যে তারা চিরকাল একরকমই থাকবে। তারা আশা রাখে যে ওপরে বেয়ে উঠে, জুয়াচুরি করে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে; তাদের ভয় এই যে তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পড়ে যেতে হবে। এই ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে তারা লড়াই-এর সময় নিজেদের গায়ের বহুমূল্য চামড়াটি বাঁচিয়ে চলবে, আর লড়াই শেষ হয়ে গেলে যোগ দেবে বিজয়ীদের দলে। তাদের স্বভাবই হল এই।

প্রলেতারিয়েতের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকলাপ ১৮৪৮ সাল থেকে শিল্পের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। আজকের দিনে জার্মান শ্রমিকেরা তাদের ট্রেড-ইউনিয়নে, সমবায় সমিতিতে, রাজনৈতিক সঙ্ঘে ও সভায়, নির্বাচনে এবং তথাকথিত রাইখ্‌স্টাগে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, শুধু তাতেই যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় গত বিশ বছরে অলক্ষ্যে জার্মানির কী রূপান্তর ঘটেছে। জার্মানির শ্রমিকদের খুবই কৃতিত্বের কথা যে **একমাত্র তারাই** শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের এবং স্বয়ং শ্রমিকদেরও পাঠাতে পেরেছে পার্লামেন্টে, ফরাসী বা ইংরেজরা এখন পর্যন্ত সে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

কিন্তু ১৫২৫ সালের সঙ্গে যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছিল, প্রলেতারিয়েতও এখন পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সারা জীবন যে শ্রেণীকে পুরাপুরিভাবে মজুরির উপর নির্ভর করে থাকতে হয় তাদের পক্ষে জার্মান জনগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠতে এখনও অনেক দেরী। কাজেই এই শ্রেণীকেও মিত্র খুঁজতে হয়। একমাত্র পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী, শহরের লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত, ক্ষুদে চাষী এবং কৃষি-মজুরদের মধ্যেই সে মিত্রের খোঁজ মেলে।

পেটি বুর্জোয়াদের কথা আগেই বলেছি। কোনো ব্যাপারে জয়লাভের পর যখন বিয়ারখানায় তাদের হুল্লোড়ের সীমা থাকে না, সেই সময়টুকু ছাড়া

তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তবু তাদের মধ্যে খুব ভাল অনেকে আছে, যারা নিজের থেকেই শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়।

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত হল সম্ভাব্য সব মিত্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, সব শ্রেণীর অধঃপতিত অংশের গাঁজ [scum] এরা, বড় বড় শহরে সদরঘাঁটি গেড়ে থাকে। আজেবাজে এই লোকগুলি পুরাপুরি অর্থলিপ্সু এবং পুরাপুরি লজ্জাহীন। প্রত্যেক বিপ্লবের সময়েই যদি ফরাসী শ্রমিকেরা ঘরবাড়ির গায়ে লিখে রেখে থাকে: 'Mort aux voleurs!' (চোরেরা নিপাত যাক!) এবং এদের কয়েকজনকে যদি গুলিও করে থাকে, তাহলে সম্পত্তি রক্ষার উৎসাহে তারা এ কাজ করে নি, সঠিকভাবেই তারা মনে করেছে যে এই দঙ্গলটাকে দূরে রাখাই সব চাইতে দরকার। যদি কোনো শ্রমিকনেতা এই দুর্বৃত্তদের রক্ষিবাহিনী হিসেবে কাজে লাগায় বা এদের সমর্থনের উপরই নির্ভর করে, তাহলে শুধু তার থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে আন্দোলনের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

ক্ষুদে চাষীরা — বড় কৃষকেরা অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পড়ে — নানা রকমের হয়:

তারা হয়ত **সামন্ত কৃষক** হতে পারে, এবং এখনও বাধ্য হয় তাদের দয়ালু প্রভুর জন্য বেগার [corvée] খেটে যেতে। বুর্জোয়া শ্রেণী এদের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করার কর্তব্য যখন পালন করতে পারে নি, তখন এদের বোঝাতে অসুবিধা হবে না যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকেই তারা উদ্ধারলাভের আশা রাখতে পারে।

নয়ত বা তারা **খাজনাদায়ী কৃষক** [tenant farmers]। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা প্রধানত আয়র্ল্যান্ডেরই মতো। খাজনা এত বাড়িয়ে তোলা হয়েছে যে স্বাভাবিক ফসল হলেও কৃষক আর তার পরিবার কোনোক্রমে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকু করতে পারে; ফসল যখন খারাপ হয় তখন সে প্রায় উপবাসে থাকে, খাজনা দিতে পারে না, আর ফলে হয়ে পড়ে পুরাপুরিভাবে জমিদারের কৃপার মুখাপেক্ষী। একমাত্র বাধ্য হলে তবেই বুর্জোয়া শ্রেণী এই ধরনের লোকদের জন্য কিছু করে। শ্রমিক ছাড়া তবে আর কাদের কাছ থেকেই এরা উদ্ধারলাভের আশা করবে?

বাকি থাকে সেই সব কৃষক যারা নিজস্ব **ছোট ক্ষেত** চাষ করছে। বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই তারা মর্গেজে এমনই জর্জরিত যে খাজনা-দেওয়া চাষী যেমন জমিদারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এদেরও তেমনই নির্ভর করতে হয় মহাজনের উপর। এদের জন্যও অবশিষ্ট থাকে সামান্য পারিশ্রমিক মাত্র, উপরন্তু সব বছর ফসল সমান না হওয়াতে সেটার পরিমাণও খুবই অনিশ্চিত। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশা এদের সবচেয়ে কম, কারণ এই বুর্জোয়ারা, এই পুঁজিপতি মহাজনেরাই এদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তবু, এই কৃষকদের বেশির ভাগই প্রাণপণে তাদের সম্পত্তি আঁকড়ে থাকে, যদিও আসলে সে সম্পত্তি তাদের নয়, মহাজনদেরই। তাহলেও এদের হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যে জনগণের উপর নির্ভরশীল কোনো সরকার যখন সমস্ত মর্গেজকে রাষ্ট্রের কাছে ঋণে রূপান্তরিত করবে এবং ফলে সুদের হার কমিয়ে ফেলবে, একমাত্র তখনই এরা মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। আর সে কাজ সম্পন্ন করতে পারে শুধু শ্রমিক শ্রেণীই।

যেখানেই মাঝারি ও বড় আকারের আবাদ-মহাল রয়েছে সেখানেই গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হল **কৃষি-মজুরেরা**। উত্তর ও পূর্ব জার্মানি জুড়ে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। আর **এখানেই** শহরের শিল্প-শ্রমিকেরা তাদের **সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক মিত্রের** খোঁজ পায়। পুঁজিপতি যেমনভাবে শিল্প-শ্রমিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনভাবে কৃষি-মজুরদের মুখোমুখি রয়েছে ভূস্বামী বা বড় জোতদার। যে ব্যবস্থায় প্রথমোক্তদের উপকার হয় অন্যদেরও নিশ্চয় তাতে উপকার হবে। শিল্পরত শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের পুঁজিকে অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রাণধারণের উপকরণকে সামাজিক সম্পত্তিতে, নিজেদের দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত নিজস্ব সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেইভাবে একমাত্র তখনই কৃষি-মজুরেরা তাদের ভয়াবহ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবে যখন সর্বপ্রথমেই তাদের শ্রমের মূল উপায় অর্থাৎ জমি বৃহৎ কৃষকদের ও বৃহত্তর সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং চাষ হবে কৃষি-মজুরদের সমবায় সমিতির দ্বারা একযোগে। এখানেই আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষদের বাসেল কংগ্রেসের সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্তে এসে পড়ি: ভূমি সম্পত্তিকে সাধারণ জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করাই সমাজের স্বার্থ (৬০)। যেসব দেশে

বৃহৎ ভূমি মালিকানা আছে এবং যেখানে সেই সূত্রে এই বৃহৎ আবাদ মহালগুলি একজন প্রভু ও বহু মজুরের মাধ্যমে চালানো হয়, মূলত সেইসব দেশ সম্পর্কেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। তবুও সামগ্রিকভাবে জার্মানিতে এখনো এই ব্যবস্থারই প্রাধান্য দেখা যায়। কাজেই ইংলণ্ডের পরেই, **ঠিক জার্মানির পক্ষেই** এ সিদ্ধান্ত ছিল **সবচেয়ে সময়োপযোগী।** রাজাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ সংগৃহীত হয় কৃষি প্রলেতারিয়েত, কৃষি-মজুর-শ্রেণীরই মধ্য থেকে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে এই শ্রেণীই পার্লামেণ্টে পাঠায় বহুসংখ্যক সামন্ত প্রভু ও যুঙ্কারদের, কিন্তু আবার এই শ্রেণীই হল শহরের শিল্প-শ্রমিকদের নিকটতম, এরা তাদের মতন অবস্থাতেই জীবনধারণ করে, তাদের চেয়েও গভীর দুর্দশায় ডুবে থাকে। বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত বলেই এই শ্রেণী অক্ষম, কিন্তু এদের গুপ্ত শক্তির কথা সরকার ও অভিজাতবর্গের এতটা ভালভাবে জানা আছে যে যাতে এরা অজ্ঞ হয়ে থাকে সেইজন্য তারা ইচ্ছা করেই স্কুলগুলি নষ্ট হয়ে যেতে দিচ্ছে। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে এদের আন্দোলনে টেনে আনাই হল জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে আশু জরুরী কর্তব্য। যেদিন থেকে কৃষি-মজুর জনগণ তাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝতে শিখবে সেদিন থেকে জার্মানিতে অসম্ভব হয়ে উঠবে প্রতিক্রিয়াশীল — সামন্ত, আমলাতান্ত্রিক অথবা বুর্জোয়া — সরকারের অস্তিত্ব।

১৮৭০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির আগে ফ. এঙ্গেলস লিখিত

১৮৭০ সালের অক্টোবরে লাইপজিগে প্রকাশিত ফ. এঙ্গেলসের 'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসারে অনূদিত

১৮৭৫ সালের তৃতীয় সংস্করণের জন্য লিখিত ১৮৭০ সালের সংস্করণে সংযোজন

উপরের লাইন কয়টি লিখেছিলাম চার বছরেরও বেশী আগে। আজও কিন্তু কথাগুলি সত্য। সাদোভা ও জার্মানি বিভাগের পর যা সত্য ছিল তা আবার প্রমাণিত হচ্ছে সেদান (৬১) এবং প্রুশীয় জাতির পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্য (৬২) প্রতিষ্ঠার পর। তথাকথিত উচ্চ রাজনীতির ক্ষেত্রে 'পৃথিবী কাঁপানো' বিরাট বিরাট রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক গতি এত সামান্যই বদলে যেতে পারে।

পক্ষান্তরে বিরাট রাষ্ট্রীয় এই অনুষ্ঠানগুলি যা করতে পারে তা হল সে গতি দ্রুততর করা। এবং এ ব্যাপারে উপরোক্ত 'পৃথিবী কাঁপানো ঘটনাবলীর' নায়কেরা অনিচ্ছাকৃত সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁদের নিজেদের কাছে সে সাফল্য নিশ্চয়ই খুবই অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেগুলো গ্রহণ করতেই হয়।

১৮৬৬ সালের যুদ্ধ ইতিপূর্বেই পুরানো প্রাশিয়ার ভিতে নাড়া দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের পর পশ্চিম প্রদেশগুলির বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়, শিল্পসংশ্লিষ্ট উভয় ধরনের বিদ্রোহী ব্যক্তিদের আবার পুরাতন শৃঙ্খলার বশে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়; তবুও কাজটা সম্পন্ন হল আর সৈন্যবাহিনীর স্বার্থের পরই, পূর্ব প্রদেশগুলির যুঙ্কারদের স্বার্থটাই আবার হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রের শাসক স্বার্থ। ১৮৬৬ সালে প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিম জার্মানি হয়ে গেল প্রুশীয়। ভগবানের আশীর্বাদে অর্জিত আর তিনটি রাজমুকুট গ্রাস করার ফলে ভগবানের আশীর্বাদে অর্জিত প্রুশীয় রাজমুকুটের অপূরণীয় নৈতিক ক্ষতি হওয়া ছাড়াও রাজশক্তির ভারকেন্দ্র এখন পশ্চিমের দিকে অনেকখানি সরে যায়। প্রত্যক্ষ রাজ্যগ্রাসের ফলে চল্লিশ লক্ষ জার্মান এবং তারপর উত্তরজার্মান লীগের মাধ্যমে (৬৩) পরোক্ষভাবে ষাট লক্ষ জার্মান যুক্ত হওয়ার ফলে শক্তি বৃদ্ধি হল পঞ্চাশ লক্ষ রাইনল্যান্ডার ও ওয়েস্টফালিয়ানদের। ১৮৭০ সালে আবার আরও আশি লক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মান এসে যোগ দিল (৬৪)। ফলে 'নবীন সাম্রাজ্যে' এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পুরাতন প্রাশিয়ানদের (এরা পূর্ব এলবীর ছটি প্রদেশের লোক, তাছাড়া

আবার এদের মধ্যে কুড়ি লক্ষ পোলও আছে) মুখোমুখি দাঁড়াল প্রায় আড়াই কোটি এমন মানুষ যারা পুরানো প্রুশীয় যুঙ্কার সামন্ততন্ত্র বহুদিন কাটিয়ে উঠেছে। এইভাবে প্রুশীয় সৈন্যবাহিনীর জয়লাভের ফলেই সরে যায় প্রুশীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গোটা ভিত্তিটা; এমন কি সরকারের পক্ষেও এখন যুঙ্কারদের আধিপত্য আরও বেশী অসহনীয় হয়ে উঠল। অবশ্য ঠিক একই সঙ্গে অতি দ্রুত শিল্পোন্নতির ফলে যুঙ্কার ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার রেষারেষিকে ছাপিয়ে উঠল বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের সংগ্রাম। এর ফলে আভ্যন্তরীণভাবেও পুরানো রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। ১৮৪০ সাল থেকেই ধীরে পচনোন্মুখ রাজতন্ত্রের মৌলিক পূর্বশর্ত ছিল অভিজাত ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার লড়াই, যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত রাজতন্ত্র। যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিজাতবর্গকে রক্ষা করার প্রশ্নের বদলে শ্রমিক শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল সম্পত্তিবান শ্রেণীকে রক্ষা করার প্রশ্ন এসে দাঁড়াল, সেই মুহূর্ত থেকেই পুরানো একচ্ছত্র রাজতন্ত্র পুরাপুরি গ্রহণ করতে বাধ্য হল বিশেষ করে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় রূপটা, অর্থাৎ **বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রের** রূপ। বোনাপার্টতন্ত্রে প্রাশিয়ার এই রূপান্তরণের কথা আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র আলোচনা করেছি ('বাস-সংস্থান সমস্যা', দ্বিতীয় ভাগ, ২৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি)*। সেখানে যে কথার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন হয় নি, অথচ এখানে যেটা খুব দরকার তা হল এই যে, আধুনিক বিকাশের দিক থেকে প্রাশিয়া এত পিছিয়ে ছিল যে এই রূপান্তরই হল ১৮৪৮ সালের পর থেকে প্রাশিয়ার **সবচেয়ে বড় অগ্রগতি**। অবশ্য প্রাশিয়া নিশ্চয়ই তখনো আধা-সামন্ত রাষ্ট্র অথচ বোনাপার্টতন্ত্র, অন্ততঃপক্ষে রাষ্ট্রের একটা আধুনিক রূপ, যাতে ধরে নেওয়া হয় যে সামন্ত ব্যবস্থা লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং প্রাশিয়াকে তার সামন্ত ব্যবস্থার অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বিলুপ্ত করার, যুঙ্কারতন্ত্রই বিসর্জন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্বভাবতই কাজটা চলেছে যতটা সম্ভব নরম ধাঁচে এবং Immer langsam voran!** এই প্রিয় গানের তালে। যেমন

---

* ৮ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** সব সময়ে ধীরে এগোও! — সম্পাঃ

ধরা যাক কুখ্যাত জেলা অর্ডিন্যান্সটা। এতে নিজস্ব জমিদারিতে য়ুঙ্কারের ব্যক্তিগত সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকার লোপ করা হয়; অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল সমগ্র জেলার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বৃহৎ ভূস্বামীবর্গের হাতে। সারবস্তুটা একই রইল, শুধু অনুবাদ হল সামন্ত থেকে বুর্জোয়া উপভাষায়। পুরানো প্রুশীয় য়ুঙ্কার বাধ্য হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে ইংরেজ স্কোয়ারের* মতো এক বস্তুতে; এতখানি প্রতিরোধের তার কোনোই কারণ ছিল না, কারণ উভয়েই সমান নির্বোধ।

প্রাশিয়ার অদ্ভুত ভাগ্যলিপিটাই হল এই যে ১৮০৮ থেকে ১৮১৩ সালে শুরু হওয়া এবং ১৮৪৮ সালে আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়া তার বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাধা করতে হল শতাব্দীর শেষে বোনাপার্টতন্ত্রের প্রীতিকর রূপের ভিতর। যদি সবকিছু ভাল মতো চলে, আর পৃথিবীটা থাকে বেশ শান্তশিষ্ট, আমরাও যদি যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই — ধরা যাক ১৯০০ সালে — দেখে যেতে পারি যে প্রুশীয় সরকার সত্যিসত্যি সামন্ত বিধিব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দিয়েছে, অর্থাৎ ১৭৯২ সালেই ফ্রান্স যেখানে পৌঁছেছিল প্রাশিয়া শেষ পর্যন্ত সেই বিন্দুতে এসে পড়েছে।

ইতিবাচক রূপে প্রকাশ পেলে সামন্ততন্ত্রের বিলোপের মানে দাঁড়ায় বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। অভিজাতবর্গের বিশেষ অধিকার লোপের সঙ্গে সঙ্গে আইনব্যবস্থা ক্রমশ বেশি বুর্জোয়া হয়ে উঠতে থাকে। আর এইখানেই আমরা সরকারের সঙ্গে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্কের মূলকথাটায় এসে যাই। আমরা দেখেছি যে সরকার এই ধীরগতি সামান্য সংস্কারগুলি প্রবর্তন করতে **বাধ্য হচ্ছে।** কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে সে এইগুলিকে দেখায় বুর্জোয়াদের খাতিরে **স্বার্থত্যাগ** হিসেবে, রাজার কাছ থেকে বহুকষ্টে অর্জিত দাবি আদায় হিসেবে, যার বদলে বুর্জোয়া শ্রেণীরও উচিত সরকারের জন্য কিছুটা আত্মত্যাগ করা। আর, আসল অবস্থাটা বুর্জোয়াদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার হলেও তারা নিজেরা বোকা সাজতে রাজী হয়। যে অব্যক্ত বোঝাপড়া বার্লিনে রাইখস্টাগ ও প্রাদেশিক কক্ষের [Chamber] সব

* স্কোয়ার — ইংরেজ নিম্ন অভিজাতদের উপাধি। — সম্পাঃ

বিতর্কের নির্বাক ভিত্তি, তার উৎপত্তি হল এইখানে: একদিকে, সরকার বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে শামুকের গতিতে আইনের সংস্কার করে; শিল্পের পথে সামন্ততান্ত্রিক বাধা, তথা বহুসংখ্যক ক্ষুদে রাজ্যের অস্তিত্বজনিত বাধা অপসারিত করে; সকল অঞ্চলে এক মুদ্রাব্যবস্থা, এক ওজন ও এক মাপের ব্যবস্থার প্রচলন এবং পেশার স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে; যাতায়াতের স্বাধীনতা মঞ্জুর করে জার্মানির শ্রম-শক্তিকে পুঁজির অবাধ কর্তৃত্বের অধীনে এনে দেয়; আর ব্যবসা এবং জুয়াচুরির আনুকূল্য করে। অন্যদিকে, বুর্জোয়া শ্রেণী সত্যিকারের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দেয় সরকারের হাতে; কর, ঋণ ও সৈন্য সংগ্রহের পক্ষে ভোট দেয়; এবং সমস্ত নতুন সংস্কার আইন এমনভাবে রচনা করতে সাহায্য করে যাতে অবাঞ্ছিত লোকজনের উপর পুলিশের পুরানো ক্ষমতাটা থাকে অব্যাহত। নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতার আশু পরিহারের বিনিময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তার ধীরগতি সামাজিক মুক্তি ক্রয় করছে। স্বভাবতই যে প্রধান কারণে এইরকম একটা বোঝাপড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তা সরকারের সম্বন্ধে ভয় নয়, তা হল প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কেই ভয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণী যতই শোচনীয় মূর্তি ধরুক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সে তার কর্তব্য করছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়* শিল্প ও বাণিজ্যের যে উদ্দাম উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা পরবর্তী পর্বে বিপুলতর উদ্দীপনার সঙ্গে বিকাশলাভ করেছে। ১৮৬৯ সালের পর থেকে এই ব্যাপারে রাইন-ওয়েস্টফালিয়ান শিল্পাঞ্চলে যা ঘটেছে জার্মানির ক্ষেত্রে তার কোনো তুলনা মেলে না, বরং মনে পড়ে এই শতাব্দীর গোড়ায় ইংলন্ডের কারখানা অঞ্চলে যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল তার কথা। স্যাক্সনি ও উচ্চ সাইলেসিয়া, বার্লিন, হ্যানোভার ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী শহরগুলি সম্পর্কেও নিশ্চয় একই কথা প্রযোজ্য। শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্ববাণিজ্য, সত্যিকারের বৃহৎ শিল্প ও প্রকৃত আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী পাওয়া গেছে বটে। কিন্তু তার বদলে আমাদের ভাগ্যে একটা সত্যসত্যই বিপর্যয় জুটেছে এবং খাঁটি শক্তিশালী এক প্রলেতারিয়েতও দেখা দিয়েছে।

---

* এই খণ্ডের পৃঃ ১১০-১২০ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদের কাছে জার্মান প্রলেতারিয়েতের নিরহংকার ও ধীর অথচ অবিরামগতি বিকাশের তুলনায় ১৮৬৯-১৮৭৪ সালের জার্মানির ইতিহাসে স্পিখার্ন, মারস-লা-তুর (৬৫) ও সেদানের রণক্ষেত্রে হুংকার এবং তৎসংক্রান্ত সকল ব্যাপারের গুরুত্ব হবে অনেক কম। ১৮৭০ সালেই জার্মান শ্রমিক শ্রেণীকে কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল: সে পরীক্ষা হল বোনাপার্টীয় যুদ্ধ-প্ররোচনা ও তার স্বাভাবিক ফল, অর্থাৎ জার্মানিতে ব্যাপক জাতীয় উত্তেজনা। জার্মান সমাজতন্ত্রী শ্রমিকেরা নিজেদের একমুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হতে দিল না। তাদের মধ্যে উগ্রজাতিবাদের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। বিজয়ের চরম উন্মাদনার মধ্যেও তারা শান্ত থেকে দাবি করেছিল 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করা হোক; কোনো দেশ দখল চলবে না'। এমন কি সামরিক আইনও পারল না তাদের নীরব রাখতে। কোনো রণ গৌরব, 'জার্মান সাম্রাজ্যের বিভূতির' কোনো বুলি তাদের মনে রেখাপাত করতে পারে নি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থেকে গেল ইউরোপের সমগ্র প্রলেতারিয়েতের মুক্তি। নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে আর কোন দেশে শ্রমিকেরা এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি এতটা সগৌরবে।

যুদ্ধকালীন সামরিক আইনের পর মামলা এল দেশদ্রোহিতার জন্য, রাজ মানহানির [lèse majesté] জন্য, কর্মচারীদের অপমান করার জন্য; আর সঙ্গে সঙ্গে এল ক্রমবর্ধমান শান্তিকালীন পুলিশী ঠগবাজি। 'Volksstaat' পত্রিকার (৬৬) তিন বা চারজন সম্পাদক সাধারণত একই সঙ্গে জেলে আটক থাকতেন; অন্যান্য কাগজের অবস্থা ছিল একই অনুপাতে। পার্টির প্রত্যেক খ্যাতনামা বক্তাকেই বছরে অন্তত একবার আদালতে হাজির হতে হত, আর প্রায় সবক্ষেত্রেই তারা দোষী সাব্যস্ত হত। শিলাবৃষ্টির মতন একের পর এক চলতে থাকল নির্বাসনদণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ এবং মিটিং ভাঙা, কিন্তু সবই হল বিফল। একজন গ্রেপ্তার বা নির্বাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা নিত আর একজন; একটা মিটিং ভেঙে দিলে তার জায়গায় ডাকা হত দুটো নতুন মিটিং; আর এইভাবে সহ্যশক্তি ও একাগ্র আইনানুবর্তিতার মাধ্যমেই একের পর এক এলাকায় পুলিশের স্বেচ্ছাচারী শক্তি ক্ষয়ে যেতে লাগল। এত অত্যাচারের যা উদ্দেশ্য, ফল দাঁড়াল ঠিক তার বিপরীত। শ্রমিকদের পার্টি

ভেঙে যাওয়া বা নুয়ে পড়ার বদলে, এতে করে নতুন কর্মী এসে পার্টিতে যোগ দিল, সংগঠন হল আরও মজবুত। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রমিকেরা দেখিয়ে দিল যে তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতার দিক দিয়ে উন্নততর। বিশেষ করে তথাকথিত 'কর্মদাতা'দের অর্থাৎ মালিকদের সঙ্গে বিরোধে তারা প্রমাণ করল যে, তারা মজুরেরাই এখন শিক্ষিত শ্রেণী, আর পুঁজিপতিরা হল গণ্ডমূর্খ। তারা আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এমন রসবোধ নিয়ে লড়াই চালায় যে এতে করেই সবচেয়ে ভালভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে তারা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে কতটা নিশ্চিত, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কতটা সচেতন। ইতিহাসের তৈরি মাটিতে সংগ্রাম এইভাবে চালানো হলে তার ফল মহান হতে বাধ্য। আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে জানুয়ারি নির্বাচনের সাফল্য তুলনাহীন (৬৭), এর ফলাফল সারা ইউরোপে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে তা একান্তই সঙ্গত।

ইউরোপের বাকি অংশের শ্রমিকদের তুলনায় জার্মান শ্রমিকদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আছে। প্রথমত, তারা ইউরোপের সবচেয়ে তাত্ত্বিক জাতির অংশ, আর জার্মানির তথাকথিত 'শিক্ষিত' শ্রেণীগুলি তত্ত্বের যে বোধটুকু প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে বসেছে, এরা তাকে রক্ষা করে চলছে। পূর্বগামী জার্মান দর্শন ছাড়া, বিশেষত হেগেলের দর্শন ব্যতীত বৈজ্ঞানিক জার্মান সমাজতন্ত্র — যা হল একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র — তার কখনো সৃষ্টি হত না। শ্রমিকদের মধ্যে তত্ত্বের একটা বোধ না থাকলে, এই বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র তাদের অস্থিমজ্জায় যতখানি জড়িয়ে গেছে তা কখনই সম্ভব হত না। এই সুবিধা যে কতটা অপরিসীম তা একদিকে বোঝা যায় ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর সর্ববিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ভিতর, পৃথক ইউনিয়নগুলির চমৎকার সংগঠন সত্ত্বেও তাদের আন্দোলন এত ধীরগতিতে এগোবার যেটা হল অন্যতম মূল কারণ, অন্যদিকে বোঝা যায় প্রুধোঁবাদের আদিরূপে ফরাসী ও বেলজিয়ানদের মধ্যে, এবং বাকুনিন কর্তৃক তার হাস্যকর বিকৃতি স্পেনীয় ও ইতালীয়দের মধ্যে যে ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তার ভিতর।

দ্বিতীয় সুবিধা হল এই যে তারিখ হিসেবে জার্মানেরাই প্রায় সবচেয়ে শেষে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। যেমন জার্মানদের তত্ত্বগত সমাজতন্ত্র

কোনদিন ভুলবে না যে তার প্রতিষ্ঠা হল সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে এবং ওয়েনের উপর — এঁদের কল্পনাবিলাসী নানা ধারণা ও ইউটোপীয়বাদ সত্ত্বেও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে এই তিনজনের স্থান রয়েছে, এঁদের প্রতিভা এমন বহু ব্যাপারের সন্ধান পেয়েছিল যার যাথার্থ্য আমরা এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করছি, — ঠিক তেমনই জার্মান শ্রমিকদের ব্যবহারিক আন্দোলনের কোনদিন ভোলা উচিত নয় যে ইংরেজ ও ফরাসী আন্দোলনের ভিত্তির উপরই তার বিকাশলাভ ঘটেছে, এদের বহুমূল্যে অর্জিত অভিজ্ঞতাই তারা শুধু কাজে লাগাতে পেরেছে, এবং এদের এমন অনেক ভুল এড়াতে পেরেছে যা এড়ানো সে যুগে প্রায় অসম্ভব ছিল। পূর্বগামী ইংরেজ ট্রেড-ইউনিয়নগুলির দৃষ্টান্ত এবং ফরাসী শ্রমিকদের রাজনৈতিক লড়াই ব্যতীত, প্যারিস কমিউন বিশেষ করে যে বিরাট প্রেরণা জোগাল তা ছাড়া আমাদের অবস্থা এখন কী দাঁড়াত?

জার্মান শ্রমিকদের এই কৃতিত্বটুকু স্বীকার করতেই হবে যে তারা নিজেদের পরিস্থিতির সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে এমন বোধশক্তি নিয়ে যা নিতান্ত দুর্লভ। শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে এই প্রথম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রেখে, ধারাবাহিকভাবে চালানো হচ্ছে আন্দোলনের তিনটি দিকই — তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, এবং ব্যবহারিক-অর্থনৈতিক (পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ)। বলতে গেলে ঠিক এই অনুকেন্দ্রিক আক্রমণের মধ্যেই নিহিত আছে জার্মান আন্দোলনের শক্তি ও অপরাজেয়তা।

একদিকে এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির ফলে, এবং অন্যদিকে ইংরেজ আন্দোলনের দ্বীপবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের দরুন আর ফরাসী আন্দোলন বলপূর্বক দমিত হওয়াতে এই মুহূর্তে জার্মান শ্রমিকেরা এসে দাঁড়িয়েছে প্রলেতারীয় সংগ্রামের পুরোভাগে। ঘটনাস্রোত কতদিন তাদের এই সম্মানিত পদ অধিকার করে থাকতে দেবে তা আগের থেকে বলা যায় না। কিন্তু আশা করা যাক যে যতদিন তারা এই পদে থাকবে ততদিন তারা যোগ্যতার সঙ্গে পদভার বহন করবে। তার জন্য লড়াই ও প্রচারের প্রতিক্ষেত্রে তৎপরতা দ্বিগুণ বাড়াবার প্রয়োজন। বিশেষত নেতাদের কর্তব্য হবে সকল তাত্ত্বিক প্রশ্ন সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা ; পুরানো জগতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে

প্রাপ্ত চিরাচরিত বুলির প্রভাব থেকে নিজেদের ক্রমশ আরও মুক্ত করে তোলা; এবং সব সময়ে মনে রাখা যে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পর থেকে তার দাবি এই যে বিজ্ঞান হিসেবেই তাকে চর্চা করতে হবে, অর্থাৎ তাকে অধ্যয়ন করতে হবে। কর্তব্য হবে, এইরূপে আয়ত্ত স্বচ্ছতর দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বর্ধিত উদ্দীপনার সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, পার্টি ও ট্রেড-ইউনিয়ন উভয়ের সংগঠন আরও দৃঢ়সংবদ্ধ করে তোলা। জানুয়ারি মাসে সমাজতন্ত্রীদের দিকে যত লোক ভোট দিয়েছিল তারা রীতিমতো একটা বাহিনী হয়ে দাঁড়ালেও শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠতে এখনো তাদের অনেক দেরি; তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্যের সাফল্য যতই হোক না কেন, ঠিক এই ক্ষেত্রেই এখনো অজস্র কাজ বাকি পড়ে আছে। সুতরাং আমাদের নজর রাখতে হবে যে, সংগ্রামে যেন ঢিলে না পড়ে, শত্রুর হাত থেকে যেন একটা পর একটা শহর, একটার পর একটা নির্বাচনী জেলা জিতে নেওয়া যায়। প্রধান কথা হল কিন্তু খাঁটি আন্তর্জাতিক প্রেরণা বজায় রাখা, যা কোনো দেশপ্রেমিক শোভিনিজমে প্রশ্রয় দেয় না, আর, যে জাতিরই হোক না কেন, প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রতিটি অগ্রগতিকে সানন্দে স্বাগত জানায়। জার্মান শ্রমিকেরা যদি এইভাবে এগোতে থাকে তাহলে তারা আন্দোলনের ঠিক নেতৃত্বে থাকবে না — কোনো একটা বিশেষ দেশের শ্রমিকেরাই নেতৃত্বে থাকবে এটা আন্দোলনের দিক থেকে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় — বরং সংগ্রামী সারিতে তাদের থাকবে সম্মানের স্থান। আর, অপ্রত্যাশিত গুরুতর পরীক্ষা অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী যদি তাদের কাছ থেকে বর্ধিত সাহস, বর্ধিত সংকল্প ও শক্তি দাবি করে তাহলে সংগ্রামের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়াবে তারা।

লন্ডন, ১ জুলাই ১৮৭৪

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের 'Der Deutsche Bauernkrieg' গ্রন্থে প্রকাশিত, লাইপজিগ, ১৮৭৫

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজি ভাষার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

পত্রাবলী

হানোভারে ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লন্ডন, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৫

বন্ধুবর,

গতকাল আপনার পত্র পেয়েছি। চিঠিখানি আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেগেছে। আপনি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন এখন আলাদা আলাদাভাবে সেগুলির জবাব দেব।

সর্বপ্রথম **লাসালের** প্রতি আমার মনোভাব সংক্ষেপে বিবৃত করব। তিনি যখন আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়: ১) কারণ তাঁর আত্মম্ভরি হামবড়াইভাব এবং সেই সঙ্গে আমার ও আন্যান্যদের লেখা থেকে তার নির্লজ্জতম চুরি; ২) কারণ, তার **রাজনৈতিক** কৌশলকে আমি **চূড়ান্তভাবে নিন্দা করেছি**; ৩) কারণ, তাঁর আন্দোলন সুরু করার **আগেই** আমি এখানে লন্ডনে বসে তাঁর কাছে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করেছি ও 'প্রমাণ করেছি' যে, **'প্রুশীয় রাষ্ট্রের'** দ্বারা প্রত্যক্ষ **সমাজতান্ত্রিক** হস্তক্ষেপটা বাজে কথা। আমার কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে (১৮৪৮-১৮৬৩ সাল) এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বরাবরই নিজেকে আমি যে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করি সেই পার্টিরই সমর্থক বলে ঘোষণা করে এসেছেন। লন্ডনে যে মুহূর্তে (১৮৬২ সালের শেষাশেষি) তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আমার সঙ্গে চাতুরী করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই মুহূর্তে আমার এবং পুরানো পার্টির **বিরুদ্ধে** 'শ্রমিকদের একাধিপতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করলেন। এসব সত্ত্বেও আন্দোলনকারী হিসেবে তাঁর কাজের স্বীকৃতি আমি দিয়েছি, যদিও তাঁর স্বল্পকালীন কর্মজীবনের শেষ দিকে সেই আন্দোলনের প্রকৃতিও আমার কাছে ক্রমেই বেশী করে দ্ব্যর্থক বলে মনে হয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু, পুরাতন বন্ধুত্ব, কাউণ্টেস হাৎসফেল্ডের

কান্নাকাটিভরা সব চিঠি, বেঁচে থাকতে যাঁকে তারা যমের মতো ভয় করত তাঁর প্রতি বুর্জোয়া পত্রিকাগুলির **কাপুরুষোচিত ঔদ্ধত্যে** ক্রোধ, এইসব কিছুর ফলে আমি হতচ্ছাড়া ব্লিন্দের বিরুদ্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করি। (বিবৃতিটি হাৎসফেল্ড 'Nordstern' পত্রিকায় (৬৮) পাঠিয়েছিলেন।) সে বিবৃতিতে আমি লাসালের কাজকর্মের **অন্তর্বস্তু সম্পর্কে** কোনো আলোচনা করি নি। এই একই কারণে এবং আমার কাছে মারাত্মক বলে মনে হয়েছিল যেসব উপাদান তা দূর করতে পারব এই আশায় এঙ্গেলস ও আমি 'Social-Demokrat' পত্রিকায় লিখব বলে প্রতিশ্রুতি দিই (পত্রিকাখানি 'উদ্বোধনী ভাষণের'* একটি তর্জমা প্রকাশ করে, এবং পত্রিকাখানির অনুরোধে আমি প্রুধোঁর মৃত্যু উপলক্ষে প্রুধোঁ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছি**), এবং শ্‌ভাইৎসার তাঁর **সম্পাদকমণ্ডলীর একটি সন্তোষজনক কর্মসূচি** আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার পর, আমরা নিয়মিত লেখক রূপে আমাদের নাম প্রকাশের অনুমতি দিই। বেসরকারী সভ্য হিসেবে **ভি. লিব্‌ক্লেখ্‌টের** সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকাটা আমাদের পক্ষে আরও একটা গ্যারাণ্টি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আমাদের হাতে প্রমাণ এসে গেল যে, **লাসাল** আসলে পার্টির প্রতি **বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।** তিনি তখন বিসমার্কের সঙ্গে রীতিমতো একটা চুক্তি করেছেন (অবশ্য, **নিজের** হাতে **কোনোরূপ** গ্যারাণ্টি না রেখে)। কথা ছিল ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনি হামবুর্গে যাবেন এবং সেখানে (উন্মাদ শ্রাম ও প্রুশীয় পুলিশের গুপ্তচর মারের সঙ্গে একযোগে) বিসমার্ককে **'বাধ্য করবেন'** শ্লেজভিগ-হোলষ্টাইনকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে, অর্থাৎ শ্রমিকদের **নামে** ইত্যাদিতে তার অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করবেন, পরিবর্তে বিসমার্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং কিছু কিছু সোশ্যালিস্ট বুজরুকির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা, এই প্রহসনের শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে যেতে লাসাল পারলেন না! তাহলে তিনি ভয়ানক হাস্যকর ও নির্বোধ বলে প্রমাণিত হতেন, ফলে চিরকালের জন্য এ ধরনের সমস্ত চেষ্টারই অবসান ঘটত!

* এই খণ্ডের পৃঃ ৭-১৭ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** ঐ, পৃঃ ২৪-৩৩ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

লাসাল যে এইভাবে বিপথগামী হয়েছিলেন তার কারণ, তিনি ছিলেন হের মিকেল ধরনের '**বাস্তব রাজনীতিবিদ**' যদিও তাঁর কাঠামো ছিল অনেক প্রকান্ড, লক্ষ্যও ছিল অনেক বড়। (প্রসঙ্গত বলে রাখি, বহুদিন আগেই মিকেলকে আমি যথেষ্ট চিনে রেখেছি তাই বুঝতে পারি, তিনি যে এগিয়ে এসেছিলেন তার কারণ, এই তুচ্ছ **হানোভারীয়ান** উকিলটিকে নিজের চৌহদ্দির বাইরে সারা জার্মানিতে নিজের কণ্ঠস্বর শোনাতে পারার এবং তাতে করে হানোভারীয়ান স্বদেশে নিজের এই পরিস্ফীত '**বাস্তবতার**' প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারার ও '**প্রুশীয়**' আনুকূল্যে **হানোভারীয়ান** মিরাবো সাজার একটি চমৎকার সুযোগ দেয় ন্যাশনাল এসোসিয়েশন (৬৯)।) নিজেদের এবং ন্যাশনাল এসোসিয়েশনকে যোগদান করে 'প্রুশীয় শীর্ষটির' সঙ্গে আঁকড়ে থাকার উদ্দেশ্যে মিকেল ও তাঁর বর্তমান বন্ধুরা যেমন প্রুশীয় রাজপ্রতিনিধি প্রবর্তিত 'নূতন যুগকে' (৭০) লুফে নেন, তারা যেমন সাধারণভাবে **প্রুশীয় রক্ষণাবেক্ষণে** নিজেদের 'নাগরিক গর্ববোধ' বিকশিত করে তোলেন, ঠিক তেমনই লাসালও চেয়েছিলেন উকারমার্কের দ্বিতীয় ফিলিপের (৭১) সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মার্কুইস পোজার ভূমিকা গ্রহণ করতে, আর বিসমার্ক নেবেন তাঁর ও প্রুশীয় রাজ্যের মধ্যে আড়কাঠির ভূমিকা। তিনি শুধু ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের ভদ্রলোকদের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে 'প্রুশীয় প্রতিক্রিয়াকে' আবাহন করেছিলেন আর লাসাল বিসমার্কের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে। লাসালের চেয়ে এই ভদ্রলোকদের যৌক্তিকতা ছিল বেশী, কারণ, বুর্জোয়া ঠিক তাঁদের নাকের সম্মুখের স্বার্থটাকেই '**বাস্তবতা**' বলে মনে করতে অভ্যস্ত, তাছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্রই, এমনকি সামন্ততন্ত্রের সঙ্গেও আপোস করেছে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃতিই হল এই যে, তাকে আন্তরিকভাবে 'বৈপ্লবিক' হতেই হবে।

লাসালের মতো থিয়েটারী দম্ভে ভরা চরিত্রের (চাকুরি, মেয়রের পদ ইত্যাদি তুচ্ছ ঘুষ দিয়ে, অবশ্য, তাঁকে কেনা যায় না) পক্ষে এ চিন্তা ছিল দারুণ প্রলোভনের যে, সরাসরি প্রলেতারিয়েতের হিতার্থে একটি কীর্তি সম্পন্ন করছেন ফের্ডিনান্ড লাসাল! আসলে সে কীর্তির আনুষঙ্গিক বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কে তিনি এতখানি অজ্ঞ ছিলেন যে, নিজের কাজের

সমালোচনামূলক বিচার করার শক্তি তাঁর ছিল না! ওদিকে, ঘৃণিত **'বাস্তব রাজনীতির'** ফলে ১৮৪৯-৫৯ সালের প্রতিক্রিয়াকে বরদাস্ত করতে এবং জনসাধারণের বিহ্বলতাকে চুপ করে দেখে যেতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল, আর জার্মান শ্রমিকদের **'মনোবল এতখানি ভেঙ্গে পড়েছিল'** যে, এক লাফে তাদের স্বর্গে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতিদাতা এই হাতুড়ে পরিত্রাতাকে তারা স্বাগত না জানিয়ে পারে নি।

যাই হোক, এবার পরিত্যক্ত প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'Social-Demokrat' প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, বৃদ্ধা হাৎসফেল্ড লাসালের 'ইচ্ছাপত্রকে' কার্যে পরিণত করতে চান। 'Kreuz-Zeitung' -এর (৭২) ভাগনার মারফৎ তিনি বিসমার্কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ (৭৩), 'Social-Demokrat' ইত্যাদি তিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ঠিক ছিল, শ্লেজভিগ-হোলষ্টাইন গ্রাস 'Social-Demokrat' পত্রিকায় ঘোষিত হবে, বিসমার্ককে সাধারণভাবে পৃষ্ঠপোষক করা হবে ইত্যাদি। লিবক্লেখট বার্লিনে ছিলেন এবং 'Social-Demokrat' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বলেই সমগ্র খাসা পরিকল্পনাটি **বানচাল** হয়ে যায়। যদিও চাটুকারী লাসাল পূজা, মাঝে মাঝে বিসমার্কের সঙ্গে ঢলাঢলি ইত্যাদির জন্য এঙ্গেলস ও আমি পত্রিকাখানির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি প্রসন্ন ছিলাম না, তথাপি বৃদ্ধা হাৎসফেল্ডের চক্রান্ত ও শ্রমিকদের পার্টির পরিপূর্ণ মর্যাদাহানি বানচাল করার জন্য আপাতত পত্রিকাখানির সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সম্পর্ক রাখা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাই, আমরা খারাপ হালের যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করেছিলাম, যদিও ব্যক্তিগতভাবে বরাবর 'Social-Demokrat' পত্রিকার কাছে আমরা লিখে আসছিলাম যে, প্রগতিপন্থীদের (৭৪) মতো বিসমার্কেরও সমানে বিরোধিতা করতে হবে। এমন কি **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির বিরুদ্ধে** বের্নহার্ড বেকার নামক সেই ফাঁকা ফুলবাবুটির চক্রান্তও আমরা সহ্য করে গিয়েছি। লাসালের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত মর্যাদাটা সে রীতিমতো গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছিল।

ইতিমধ্যে 'Social-Demokrat' পত্রিকায় হের শ্‌ভাইৎসারের প্রবন্ধগুলি ক্রমেই বেশী মাত্রায় বিসমার্কগন্ধী হয়ে দাঁড়াতে লাগল। ইতিপূর্বেই আমি

তাঁকে লিখেছিলাম যে 'জোট স্থাপনের প্রশ্নে' (৭৫) প্রগতিপন্থীদের **ভয় পাওয়ানো** যেতে পারে, কিন্তু **কোনো অবস্থাতেই, কখনো, প্রুশীয় সরকার** জোট সংক্রান্ত আইনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি মেনে নেবে না। কারণ, তাতে করে আমলাতন্ত্রে ভাঙ্গন ধরবে, শ্রমিকেরা নাগরিক অধিকার লাভ করবে, চাকরবাকর সংক্রান্ত আইন (৭৬) ভেঙ্গে চুরমার হবে, পল্লী অঞ্চলে অভিজাতগণ কর্তৃক বেত্রাঘাত করা উঠে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, যেটা বিসমার্ক কিছুতেই হতে দিতে পারেন না এবং যা প্রুশীয় **আমলাতান্ত্রিক** রাষ্ট্রের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। আমি আরো জানিয়েছিলাম যে, কক্ষ যদি জোট সংক্রান্ত আইন অগ্রাহ্য করে, তা হলে ঐ আইন বলবৎ রাখার জন্য সরকারকে **কথার প্যাঁচ** তৈরি করতে হবে (যেমন এই ধরনের কথা যে, সামাজিক প্রশ্নটির ক্ষেত্রে 'আরো আমূল' ব্যবস্থাবলী অবলম্বনের প্রয়োজন ইত্যাদি)। এ সবই সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু হের ফন শ্‌ভাইৎসার কী করলেন? তিনি এক প্রবন্ধ লিখলেন 'বিসমার্কের' **সপক্ষে** এবং তাঁর সমস্ত বীরত্ব জমিয়ে রাখলেন শুলৎসে, ফাউখার প্রমুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

আমি মনে করি শ্‌ভাইৎসার কোম্পানির **সদিচ্ছা** আছে, কিন্তু তারা **'বাস্তব রাজনীতিবিদ'। বর্তমান** অবস্থাটা নিয়েই তাঁদের যত হিসাব এবং 'বাস্তব রাজনীতির' **বিশেষ সুবিধাটিকে** তাঁরা শুধু মিকেল কোম্পানির হাতে দিতে রাজী নন। (শেষোক্তরা মনে হয় প্রুশীয় সরকারের সঙ্গে দহরম-মহরমের অধিকারকে তাদের **বিশেষ** অধিকার করে রাখতে চায়।) তারা জানে প্রাশিয়ায় (এবং তজ্জন্য বাকী জার্মানিতেও) শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা এবং শ্রমিকদের আন্দোলন কেবলমাত্র পুলিশের অনুমতিতে টিকে আছে। তাই, অবস্থাটা যা সেইভাবেই তারা তা নিতে চায়, সরকারকে বিরক্ত করা ইত্যাদি তারা চায় না, ঠিক আমাদের **'প্রজাতন্ত্রী'** বাস্তব রাজনীতিবিদদের মতোই, যারা একজন হয়েনৎসলার্ন **সম্রাটকে** মেনে নেয়। কিন্তু আমি 'বাস্তব রাজনীতিবিদ' নই, তাই এঙ্গেলসের সঙ্গে একযোগে আমি একটি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে 'Social-Demokrat' পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন মনে করেছি। (ঘোষণাটি আপনি শীঘ্রই কোনো না কোনো কাগজে দেখবেন।)

সঙ্গে সঙ্গে আপনি এটাও বুঝবেন কেন বর্তমান মুহূর্তে প্রাশিয়ায়

আমি **কিছুই** করতে পারি না। প্রুশীয় নাগরিক হিসেবে আমাকে ফেরত নিতে সেখানকার সরকার সরাসরি অস্বীকার করেছেন (৭৭)। সেখানে আমাকে শুধু সেইভাবেই **আন্দোলন করতে** দেওয়া হবে, যাতে হের বিসমার্কের আপত্তি নেই।

এখানে বসে **আন্তর্জাতিক সমিতি** মারফত আন্দোলন করাকে আমি শতাধিক গুণ বেশী পছন্দ করি। ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের উপর এর প্রভাব হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন এখানে সাধারণ ভোটাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছি, অবশ্য প্রাশিয়ায় এ প্রশ্নটির যে তাৎপর্য, এখানে তার **তাৎপর্য সম্পূর্ণ** (৭৮) **স্বতন্ত্র।**

এখানে, প্যারিসে, বেলজিয়মে, সুইজারল্যাণ্ডে এবং ইতালিতে মোটামুটিভাবে এই সমিতির অগ্রগতি আমাদের **সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।** একমাত্র জার্মানিতেই আমরা লাসালের ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। এ'রা: ১) নির্বোধের মতো নিজেদের প্রভাব হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত; ২) জার্মানরা যাকে বলে 'বাস্তব রাজনীতি' তার প্রতি আমার ঘোষিত বিরোধিতা সম্পর্কে অবহিত। (এই ধরনের **'বাস্তবতার'** জন্যই জার্মানি সমস্ত সভ্য দেশের এত পেছনে পড়ে আছে।)

যেহেতু এক শিলিং দিয়ে কার্ড নিলেই সমিতির সভ্য হওয়া যায়, যেহেতু ফরাসীরা (বেলজিয়ানরাও) এই ধরনের ব্যক্তিগত সভ্যপদ পছন্দ করে, কারণ 'এসোসিয়েশন' হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাদের আইনে বাধা আছে; যেহেতু জার্মানির পরিস্থিতিও এর অনুরূপ — সেইহেতু আমি এখন স্থির করেছি, জার্মানিতে আমার বন্ধুদের বলব যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই ছোট ছোট সোসাইটি গঠন করুক — সভ্য সংখ্যায় কিছু আসে যাবে না; প্রত্যেক সভ্য একখানি করে ইংলিশ সভ্য কার্ড নেবে। ইংলিশ সোসাইটি হচ্ছে **আইনী** সোসাইটি, তাই ফ্রান্সে পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে কোনো বাধা নেই। যদি আপনি ও আপনার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এইভাবে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তবে আনন্দিত হব...

প্রথম 'Sozialistische Auslandpolitik' পত্রিকায়, নং ১৮, ১৯১৮-এ প্রকাশিত

জার্মান পাণ্ডুলিপি অনুসারে অনূদিত

হানোভারে ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ৯ই অক্টোবর*, ১৮৬৬

...জেনেভায় প্রথম কংগ্রেস (৭৯) নিয়ে আমার ভীষণ ভয় ছিল, কিন্তু মোটামুটি, আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালই হয়েছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তার প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত। আমি যেতে পারি নি এবং যেতে চাই নি, কিন্তু লণ্ডনের প্রতিনিধিদলের জন্য কর্মসূচি লিখে দিয়েছিলাম। ইচ্ছা করেই আমি কর্মসূচিটি সেই সব বিষয়েই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম যাতে শ্রমিকদের আশু মতৈক্য এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্ভব হয় এবং যা শ্রেণী-সংগ্রামের এবং একটি শ্রেণীতে শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনকে সরাসরি পুষ্ট করতে ও প্রেরণা দিতে পারে। প্রুধোঁপন্থীদের ফাঁকা বুলিতে প্যারিসের ভদ্রলোকদের মাথাগুলো ছিল ভর্তি। বিজ্ঞান নিয়ে তারা বকে খুব, কিন্তু কিছুই জানে না। সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মকে, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রামসঞ্জাত কর্মকে, সমস্ত সংহত সামাজিক আন্দোলনকে তারা ঘৃণা করে, অতএব, যাকে রাজনৈতিক উপায়ে কার্যকরী করা চলে (যেমন আইন করে শ্রম-দিবসের ঘণ্টা কমানো) তাকেও তারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। স্বাধীনতার অছিলায় এবং শাসন-বিরোধিতা বা কর্তৃত্ব বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অছিলায় এই যে ভদ্রলোকেরা ষোল বছর ধরে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার সহ্য করে এসেছেন, এখনো সহ্য করছেন, তাঁরা আসলে প্রচার করছেন সাধারণ বুর্জোয়া অর্থনীতিই, শুধু তাকে প্রুধোঁমাফিক আদর্শায়িত করে নেওয়া হয়েছে! প্রুধোঁ প্রচণ্ড ক্ষতি করেছেন। ইউটোপীয়দের সম্পর্কে তাঁর ভুয়া সমালোচনা ও ভুয়া বিরোধিতা (তিনি নিজে এক পেটি বুর্জোয়া ইউটোপীয় মাত্র, অথচ ফুরিয়ে, ওয়েন প্রমুখের ইউটোপিয়ায় নূতন জগতের একটা পূর্বাভাষ ও কাল্পনিক অভিব্যক্তি রয়েছে) প্রথমে 'ঝলমলে তরুণদের', ছাত্রদের এবং পরে শ্রমিকদের, আকৃষ্ট ও দুর্নীতিদুষ্ট করে বিশেষত প্যারিসের

---

* মূলে ভুল করে লেখা হয় — 'নভেম্বর'। — সম্পাঃ

শ্রমিকদের, যারা বিলাসিতার পণ্যোৎপাদন শিল্পের শ্রমিক হিসেবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পুরাতন আবর্জনার প্রতি দারুণভাবে মোহগ্রস্ত। অজ্ঞ, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, বাচাল, ভুয়া ঔদ্ধত্যে ফাঁপা এই লোকগুলি সবকিছু প্রায় পয়মাল করে দিতে বসেছিল, কারণ তারা যে সংখ্যায় কংগ্রেসে এসেছিল, তাদের সভ্য সংখ্যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। রিপোর্টে আমি ওদের নাম না করে একটু ঠুকব।

একই সময় বল্টিমোরে অনুষ্ঠিত আমেরিকান শ্রমিক কংগ্রেসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি (৮০)। সেখানকার স্লোগান ছিল পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংগঠন, এবং খুবই আশ্চর্য যে, জেনেভার জন্য যে দাবিগুলি আমি তৈরি করেছিলাম তার অধিকাংশই সেখানেও উপস্থাপিত হয় শ্রমিকদের নির্ভুল সহজাত প্রবৃত্তির কল্যাণে।

আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদ-সৃষ্ট সংস্কার আন্দোলন (৮১) (যাতে আমিও একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিলাম*) এখন বিরাট ও অদম্য আকার ধারণ করেছে। আমি বরাবরই নিজেকে পেছনে রেখেছি এবং এখন যখন ব্যাপারটা চালু হয়ে গেছে তখন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না...

প্রথম 'Die Neue Zeit' Bd. 2 পত্রিকায়, নং ২, ১৯০১-০২-এ প্রকাশিত

জর্মান পাণ্ডুলিপি অনুসারে অনূদিত

* ভার্জিল, 'ইনাইদ', ২য় গ্রন্থ — সম্পাঃ

টীকা

(১) ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমাবেশে গঠিত হয় শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি (পরে তা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত) এবং নির্বাচিত হয় সাময়িক কমিটি, ক. মার্কস ছিলেন তাতে। পরে তিনি সমিতির কর্মসূচিসংক্রান্ত দলিলাদি প্রণয়নের জন্য ৫ অক্টোবর সমিতির প্রথম অধিবেশনে গঠিত কমিশনে নির্বাচিত হন। মার্কসের অসুস্থতাকালে রচিত দলিল সম্পাদনার ভার কমিশন মার্কসকে দেন ২০ অক্টোবর। তৎস্থলে মার্কস লেখেন কার্যত একেবারে নতুন দুটি দলিল — 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্বোধনী ভাষণ' এবং 'সমিতির সাময়িক নিয়মাবলি'। তা অনুমোদিত হয় কমিশনের ২৭ অক্টোবরের অধিবেশনে। সমিতির পরিচালক সংস্থা হিসেবে যে সাময়িক কমিটি গড়া হয়, তা সর্বসম্মতিক্রমে 'ভাষণ' ও 'নিয়মাবলি' অনুমোদন করে ১৮৬৪ সালের ১ নভেম্বর। ইতিহাসে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ বলে পরিচিত এই সংস্থাটির নাম ১৮৬৬ সালের শেষাবধি ছিল কেন্দ্রীয় পরিষদ। কার্যত এই পরিষদে নেতৃত্ব করতেন মার্কস। তিনি ছিলেন এর সংগঠক, নেতা, বহুসংখ্যক অভিভাষণ, বিবৃতি, সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য দলিলাদির রচয়িতা।

প্রথম কর্মসূচিগত দলিল, 'উদ্বোধনী ভাষণে' মার্কস শ্রমিক সাধারণের মধ্যে এই ভাবনা সঞ্চারিত করেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার, স্বাধীন প্রলেতারীয় পার্টি গঠন এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে ভ্রাতৃকল্প সহযোগ আবশ্যক।

১৮৭৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের অবসান পর্যন্ত 'উদ্বোধনী ভাষণ' পুনর্মুদ্রিত হয় বহু বার, যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে। পৃঃ ৭

(২) **টুঁটিচেপারা** [garrotters] — যে লুঠেরারা তাদের বধ্যের টুঁটি টিপে মারত তাদের এই বলা হত। ষাটের দশকের গোড়ায় লণ্ডনে এই ধরনের হামলা হত ঘন ঘন এবং তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় পার্লামেণ্টে। পৃঃ ৮

(৩) **ব্লু বুক** ['Blue Books'] — ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রকাশনা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কূটনৈতিক দলিলাদির সাধারণ নাম। 'ব্লু বুক' নামটা এসেছে তার ব্লু

মলাটের জন্যে যা ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়ে এসেছে সতেরো শতক থেকে। এটা দেশের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাসের সরকারী তথ্য।

এক্ষেত্রে কথাটা 'নির্বাসন ও কয়েদ খাটুনি সংক্রান্ত আইনের কার্যকারিতা বিষয়ের কমিশন রিপোর্ট' নিয়ে। খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৮৬৩। পৃঃ ৮

(৪) **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১-১৮৬৫) চলে উত্তরের শিল্পপ্রধান অঙ্গরাজ্য এবং দক্ষিণের বিদ্রোহী দাসপ্রথাভিত্তিক রাজ্যগুলির মধ্যে। দাসপ্রভু আবাদ-মালিকদের পোষকতা করছিল ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা, তাদের বিরোধিতা করে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী, আমেরিকান গৃহযুদ্ধে তাদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। পৃঃ ৮

(৫) **প্রিভি কাউন্সিল** ইংলণ্ডে দেখা দেয় তেরো শতকে, প্রথমদিকে তাতে ছিল সামন্ত অভিজাত আর উঁচু মহলের যাজক সম্প্রদায়ের লোকেরা। ১৭ শতক পর্যন্ত এ পরিষদ রাজ্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পার্লামেণ্ট প্রথার বিকাশ এবং মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত পরিষদ তার গুরুত্ব হারায়। পৃঃ ৮

(৬) সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ক্যাবিনেট বলতে বোঝানো হচ্ছে রাশিয়ার জার সরকার। ১৮ শতক থেকে রাশিয়ার রাজধানী ছিল সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ)। পৃঃ ১৩

(৭) **চার্টিস্টবাদ** — উনিশ শতকের ৩০-৪০ এর দশকে ব্রিটিশ শ্রমিকদের ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলন। ১৮৩৮ সালে চার্টিস্টরা পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করার জন্য একটি আবেদনপত্র (চার্টার, জনগণের সনদ) রচনা করে। তাতে ২১ বছর বয়স হয়েছে এমন সমস্ত পুরুষের সর্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ব্যালট, পার্লামেণ্টে প্রার্থীদের সম্পত্তিগত শর্ত নাকচ ইত্যাদির দাবি ছিল। আন্দোলন শুরু হয় বড়ো জনসভা আর শোভাযাত্রা দিয়ে, জনগনের সনদ কার্যকর করা ছিল তাদের ধ্বনি। ১৮৪২ সালের ২ মে পার্লামেণ্টে পেশ করা হয় চার্টিস্টদের দ্বিতীয় আবেদন, তাতে ছিল শ্রমদিন সংক্ষেপ, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি সামাজিক চরিত্রের একসারি দাবি। প্রথমটির মতো এই আবেদনও অগ্রাহ্য হয় পার্লামেণ্টে। চার্টিস্টরা এর জবাবে সাধারণ ধর্মঘট করে। ১৮৪৮ সালে তৃতীয় আবেদন নিয়ে পার্লামেণ্টে গণমিছিলের আয়োজন করে, কিন্তু সরকার সৈন্যবাহিনী দিয়ে মিছিল ভেঙে দেয়। আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ১৮৪৮ সালের পরে চার্টিস্ট আন্দোলনে ভাটা পড়ে।

চার্টিস্ট আন্দোলনের অসাফল্যের প্রধান কারণ তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও রণকৌশল এবং সুসঙ্গতরূপে বিপ্লবী পরিচালনা ছিল না। কিন্তু

যেমন ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে, তেমনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল চার্টিস্টরা। পৃঃ ১৩

(৮) ইংলন্ডে আইন করে শ্রমদিন দশ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করার যে আন্দোলন শুরু হয় আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের ৩০-এর দশকের গোড়ায় তা ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু নাবালক ও নারীদের জন্য প্রযোজ্য দশ ঘণ্টার শ্রমদিনের আইন পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় ১৮৪৭ সালের ৮ জুনে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহু কারখানা-মালিক তা উপেক্ষা করে। পৃঃ ১৪

(৯) **'সাধারণ নিয়মাবলি'** গৃহীত হয় ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির লণ্ডন সম্মেলনে। ১ম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময় মার্কস রচিত সাময়িক নিয়মাবলি (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য) ছিল তার ভিত্তি। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে হেগ কংগ্রেসে নিয়মাবলির ৭ ধারার পর 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে' একটি পরিপূরক ৭ক ধারা যোজনার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। পৃঃ ১৮

(১০) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষে আ. লিঙ্কনের কাছে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির অভিভাষণ মার্কস লেখেন সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ জ্বলে ওঠার মুহূর্তে এই অভিভাষণ একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল কেননা আমেরিকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যে সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা তুলে ধরা হয় এতে। সর্ববিধ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের পোষকতা করে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েত এবং আন্তর্জাতিকে তাদের অগ্রণী কর্মীদের শিখিয়েছিলেন যে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সত্যকার আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাব গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। পৃঃ ২২

(১১) ফিলাডেলফিয়ায় উত্তর আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাইয়ে গৃহীত 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র কথা বলা হচ্ছে, যাতে ব্রিটেন থেকে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিচ্ছেদ এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ছিল। এই দলিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা, আইনের কাছে সমস্ত নাগরিকের সমতা, জনগণের সার্বভৌমত্বের বিধান, প্রভৃতির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক নীতিও সূত্রবদ্ধ হয়। ইউরোপে যখন তদবধি সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য চলেছে, তখন এইসব নীতির ঘোষণা ইউরোপের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে, বিশেষ করে আঠারো শতকের শেষের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবকে বিশেষ প্রভাবিত

করে। কিন্তু ঘোষণায় যেসব গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা হয়েছিল, মার্কিন বুর্জোয়া আর বৃহৎ ভূস্বামীরা গোড়া থেকেই তা লঙ্ঘন করতে থাকে, রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত করে জনগণকে, টিকিয়ে রাখে দাসপ্রথা, যাতে প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীদের বড়ো একটা অংশ, নিগ্রোদের বঞ্চিত করা হয় প্রাথমিক মানবিক অধিকার থেকে। পৃঃ ২২

(১২) **তুলা সংকট** ঘটে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় উত্তরের নৌবহর দ্বারা দক্ষিণের দাসমালিক রাষ্ট্রগুলিকে অবরোধ করার ফলে আমেরিকা থেকে ইউরোপে তুলা চালান বন্ধ হয়ে যাবার দরুন। ইউরোপের অধিকাংশ সুতাকল অচল হয়ে পড়ে, ফলে শ্রমিকদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় দুঃসহ। এই সমস্ত ক্লেশভোগ সত্ত্বেও ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে দৃঢ় সমর্থন জানায়। পৃঃ ২৩

(১৩) ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে **ব্রিটেনের উত্তর আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা যুদ্ধ** (১৭৭৫-১৭৮৩) শুরু হয় স্বাধীনতা লাভ এবং পুঁজিবাদ বিকাশের বাধাগুলি দূর করার জন্য দানা-বেঁধে-ওঠা আমেরিকান বুর্জোয়াদের প্রয়াস থেকে। উত্তরী আমেরিকানদের বিজয়ের ফলে গঠিত হয় উত্তর আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র। পৃঃ ২৩

(১৪) **'প্রুধোঁ প্রসঙ্গে'** প্রবন্ধটি মার্কস লেখেন প্রুধোঁর মৃত্যু উপলক্ষে 'Social-Demokrat' পত্রিকার সম্পাদক শ্‌ভাইৎসারের অনুরোধে। 'দর্শনের দারিদ্র্য' এবং অন্যান্য রচনায় মার্কস প্রুধোঁর যে দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন, তার খতিয়ান টেনে তিনি এতে প্রুধোঁবাদী ভাবাদর্শের অসারতা উদ্‌ঘাটন করেন। প্রুধোঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সংকলিত করে মার্কস একে বলেছেন টিপিকাল পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শ। পৃঃ ২৪

(১৫) 'Social-Demokrat' ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') — লাসালপন্থী সারা জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের মুখপত্র। এই নামে পত্রিকাটি বার্লিন থেকে বেরয় ১৮৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত। ১৮৬৪-৬৫ সালে সম্পাদক ছিলেন ই. ব. শ্‌ভাইৎসার। পৃঃ ২৪

(১৬) প্রুধোঁর 'Essai de grammaire générale' (সাধারণ ব্যাকরণের অভিজ্ঞতা)-এর কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২৪

(১৭) জ. প. ব্রিসো দে ভারভিল-এর 'Recherches philosophiques. Sur le droit de propriété et sur le Vol, considérés dans la nature et dans la société' ('দার্শনিক গবেষণা। প্রকৃতিতে ও সমাজের বিচারে মালিকানা ও হরণের অধিকার বিষয়ে') গ্রন্থটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২৬

(১৮) Ch. Dunoyer. 'De la liberté du travail, ou Simple exposé des conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance'. T. I—III, Paris, 1845 (শ. দ্যুনুয়া, 'শ্রমের মুক্তি অথবা এমন পরিস্থিতির সরল বর্ণনা যাতে মানবিক শক্তি দেখা দেবে সর্বাধিক ফলপ্রদ রূপে', খণ্ড ১-৩, প্যারিস, ১৮৪৫)। পৃঃ ৩০

(১৯) ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে যাতে অর্লিয়াঁ রাজবংশ উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। পৃঃ ৩১

(২০) ১৮৪৮ সালের ৩১ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় সভায় প্রুধোঁর বক্তৃতার কথা বলা হচ্ছে। এ বক্তৃতায় প্রুধোঁ পেটি-বুর্জোয়া ইউটোপীয় মতবাদের ধারায় কয়েকটি প্রস্তাব (কর্জা সুদ নাকচ ইত্যাদি) পেশ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনে প্যারিসে প্রলেতারীয় অভ্যুত্থানের দমনকে জুলুম এবং স্বেচ্ছাচারিতা বলে অভিহিত করেন। পৃঃ ৩১

(২১) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনে প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান, অসাধারণ নিষ্ঠুরতায় তা দমন করে ফরাসী বুর্জোয়ারা। এই অভ্যুত্থান হল ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে মহান গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ৩১

(২২) ১৮৪৮ সালের ২৬ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় সভায় ফিনান্স কমিশনে প্রুধোঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিয়েরের বক্তৃতার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩১

(২৩) 'Gratuité du crédit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon.' Paris, 1850. ('খয়রাতী ঋণ, মঁসিয়ে ফ্র. বাস্তিয়া ও মঁসিয়ে প্রুধোঁর মধ্যে আলোচনা', প্যারিস, ১৮৫০)। পৃঃ ৩১

(২৪) P. J. Proudhon. 'Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Actes du futur congrès'. Paris, 1863. (প. জ. প্রুধোঁ, '১৮১৫ সালের চুক্তি কি আর বলবৎ রইল না? ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের বিধানাদি', প্যারিস, ১৮৬৩)। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্তে পোল্যান্ডকে চূড়ান্তরূপে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়, প্রুধোঁ এই রচনায় সেই সিদ্ধান্ত পুনরালোচনা করার বিরোধিতা করেন এবং পোল্যান্ডের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ইউরোপীয় গণতান্ত্রিকদের সমর্থনকেও সমালোচনা করেন, এতে করে রুশ জারতন্ত্রের উৎপীড়নমূলক পলিসিরই পোষকতা করা হয়। পৃঃ ৩২

(২৫) ১৮৬৫ সালের ২০ ও ২৭ জুন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মার্কস ইংরেজি ভাষায় যে প্রতিবেদন পড়ে শোনান, এটি তারই ভাষ্য। এতে মার্কস প্রথম

প্রকাশ্যে তাঁর বাড়তি মূল্য তত্ত্বের মূলকথাগুলি উপস্থিত করেন। প্রতিবেদনের উপলক্ষ ছিল ২ এবং ২৩ মে'তে পরিষদের সদস্য জন ওয়েস্টনের বক্তৃতা। ইনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে মুদ্রাগত পারিশ্রমিকের সাধারণ মানবৃদ্ধি শ্রমিকদের কাছে ভিত্তিহীন এবং এই থেকে তিনি ট্রেড-ইউনিয়নের 'অনিষ্টকরতার' সিদ্ধান্ত টানেন। মার্কসের প্রতিবেদন একই সঙ্গে আঘাত হানে প্রুধোঁপন্থী ও লাসালপন্থীদের ওপর, যারা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড-ইউনিয়নের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি অবলম্বন করেছিল। মার্কস এতে অতি দৃঢ়তার সঙ্গে পুঁজির শোষণের সমক্ষে প্রলেতারিয়েতের নিষ্ক্রিয়তা ও নম্রতা প্রচারের প্রতিবাদ করেন, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভূমিকা ও তাৎপর্য প্রতিপন্ন করেন তত্ত্বের দিক দিয়ে এবং এ সংগ্রামকে তার অন্তিম লক্ষ্য — মজুরি প্রথা বিলোপের লক্ষ্যে অধীনস্থ করার কথাটা তুলে ধরেন। প্রতিবেদন রক্ষিত ছিল মার্কসের পাণ্ডুলিপি আকারে। প্রথম তা প্রকাশ করেন লণ্ডনে ১৮৯৮ সালে মার্কসের কন্যা এলেনোরা 'Value, price and profit' ('মূল্য দাম ও মুনাফা') নামে। তাতে ভূমিকা লিখেছিলেন ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী এ. এভেলিঙ্গ। পাণ্ডুলিপিতে অবতরণিকা এবং প্রথম ছয়টি পরিচ্ছদের কোনো শিরনাম ছিল না, এগুলি দেন এভেলিঙ্গ। এই সংস্করণে সাধারণ নামটা বাদে এইসব শিরনাম রক্ষিত হয়েছে। পৃঃ ৩৪

(২৬) 'সাময়িক নিয়মাবলিতে' ১৮৬৫ সালে ব্রাসেলসে যে কংগ্রেস হবার কথা ছিল তার বদলে লণ্ডনে প্রাথমিক সম্মেলন আহূত হয় (৪১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৪

(২৭) ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ সালের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে শস্য, ময়দা এবং নিত্য প্রয়োজনের আরো কিছু দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্যও দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। পৃঃ ৪৩

(২৮) বিজ্ঞান বিকাশে সহায়তার ব্রিটিশ সমিতি গঠিত হয় ১৮৩১ সালে, অদ্যাবধি তা বিদ্যমান। ১৮৬১ সালের সেপ্টেম্বরে সমিতির অর্থনৈতিক বিভাগের সমাবেশে উ. নিউমার্চের (সঠিক নাম লিখতে মার্কসের কিছু ভুল হয়েছিল) ভাষণের কথা বলছেন তিনি। পৃঃ ৪৩

(২৯) দ্রষ্টব্য R. Owen. 'Observation on the Effect of the Manufacturing System'. London, 1817, p. 76. (র ওয়েন, 'শিল্প ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য', লণ্ডন, ১৮১৭, পৃঃ ৭৬)। পৃঃ ৪৪

(৩০) ১৮৫৩-১৮৫৬ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক আর সার্দিনিয়ার জোটের বিরুদ্ধে রাশিয়া এই লড়াই চালায় নিকট প্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারে আধিপত্যের জন্য। নামাঙ্কিত হয়েছে রণাঙ্গনের মূল ক্ষেত্রের নামে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসান হয় রাশিয়ার পরাজয়ে।

পৃঃ ৪৫

(৩১) উনিশ শতকের মাঝামাঝি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাড়ি ভেঙে ফেলার পেছনে একটা কারণ ছিল এই যে ভূস্বামীদের দেয় দরিদ্র কর অনেকখানি নির্ভর করত তাদের জমিতে বসবাসকারী দরিদ্রদের সংখ্যার ওপর। যেসব ঘরবাড়ি নিজেদের প্রয়োজনে লাগবে না, কিন্তু যা গ্রামাঞ্চলের 'উদ্বৃত্ত' জনতার আশ্রয় হতে পারে, সেগুলি তারা ইচ্ছে করেই ভেঙে ফেলে। পৃঃ ৪৫

(৩২) আর্ট সোসাইটি [Society of Arts] — বুর্জোয়া জ্ঞানপ্রসারণী ও লোক হিতৈষিণী সমিতি, ১৭৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনে। উল্লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন ১৮৬৪ সালে প্রয়াত জন মর্টনের পুত্র জন চালমার্স মর্টন। পৃঃ ৪৫

(৩৩) শস্য আইন বলে যা পরিচিত, বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সংকুচিত বা নিষিদ্ধ করার এ আইন ইংলন্ডে জারি হয় বৃহৎ ভূস্বামী ল্যান্ডলর্ডদের স্বার্থে। ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের কল-মালিক কবডেন ও ব্রাইটন গঠন করেন শস্য আইন বিরোধী লীগ। অবাধ বাণিজ্যের দাবি তুলে লীগ শ্রমিকদের মজুরি কমানো এবং ভূম্যধিকারী অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল করার উদ্দেশ্যে শস্য আইন নাকচ করার চেষ্টা করে। এই সংগ্রামের ফলে ১৮৪৬ সালে শস্য আইন নাকচের বিল গৃহীত হয়, যাতে সূচিত হয় ভূম্যধিকারী অভিজাতদের ওপর শিল্পপতি বুর্জোয়াদের বিজয়। পৃঃ ৪৬

(৩৪) A. Smith. 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'. Vol. I, Edinburgh, 1814, p. 93 (অ্যা. স্মিথ, 'জাতিগুলির সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ নিয়ে জিজ্ঞাসা', খন্ড ১, এডিনবুর্গ, ১৮১৪, পৃঃ ৯৩)। পৃঃ ৬৫

(৩৫) আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটেন যে যুদ্ধবিগ্রহ চালায়, তার কথা বলা হচ্ছে। তখন ব্রিটিশ সরকার মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালু করে। বিশেষ করে এই পর্বে এক সারি জনবিক্ষোভ দমিত হয় এবং গৃহীত হয় শ্রমিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার আইনাদি। পৃঃ ৮৩

(৩৬) ম্যালথাসের 'An Inquiry into the Nature and Progress of Rent, and the Principles by which it is regulated'. London, 1815 ('খাজনার প্রকৃতি ও গতি এবং যেসব নীতিতে তা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা নিয়ে গবেষণা', লণ্ডন, ১৮১৫) নামক পুস্তিকার কথা বলছেন মার্কস। পৃঃ ৮৩

(৩৭) **শ্রম** আগার ইংলণ্ডে চালু হয় সতেরো শতকে। ১৮৩৪ সালে গৃহীত দরিদ্র আইন অনুসারে শ্রম গৃহ পরিণত হয় দরিদ্র ত্রাণের একমাত্র ধরনে। কঠোর কয়েদ-খাটুনির ব্যবস্থা ছিল তাতে, লোকে এগুলিকে বলত 'গরিবের ব্যাস্টিল দুর্গ' (হবুজখানা)। পৃঃ ৮৪

(৩৮) ষোলো শতক থেকে ইংলণ্ডে চালু **দুঃস্থ আইন** অনুসারে প্রতি প্যারিসে দরিদ্রদের উপকারার্থে বিশেষ কর আদায় করা হত। প্যারিসের যেসব অধিবাসীর নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের সংস্থান থাকত না, তারা দরিদ্র ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেত। পৃঃ ৮৯

(৩৯) D. Ricardo. 'On the Principles of Political Economy, and Taxation'. London, 1821, p. 479 (ডে. রিকার্ডো, 'অর্থশাস্ত্র এবং করধার্যের নীতি প্রসঙ্গে', লণ্ডন, ১৮২১, পৃঃ ৪৭৯)। পৃঃ ৯১

(৪০) ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বরে জেনেভায় **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির** যে ১ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তা সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের (পরে সাধারণ পরিষদ নামে অভিহিত) প্রতিনিধিদের জন্য মার্কস এই নির্দেশ লেখেন। কংগ্রেসে আলোচ্য প্রশ্নাদির সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় নির্দেশনামায়। তাতে পেশ করা হয় মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্তব্য, এমন সংগ্রামের কথা, যা শ্রমিক জনগণকে ঘনবদ্ধ করবে, বাড়িয়ে তুলবে তার শ্রেণী চেতনা, শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ সংগ্রামে তাদের টেনে আনবে। মার্কস এতে যে নয়টি ধারা সূত্রবদ্ধ করেছেন, তার ছয়টি কংগ্রেসে গৃহীত হয় সিদ্ধান্ত আকারে, যথা, ক্রিয়ার আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধতা, শ্রম-দিবস হ্রাস, শিশু ও নারীর শ্রম, সমবায়ী শ্রম, ট্রেড-ইউনিয়ন, স্থায়ী ফৌজ সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব। পৃঃ ৯৫

(৪১) ১৮৬৫ সালের ২৫-২৯ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। তার কাজে অংশ নেয় সাধারণ পরিষদের সদস্যরা, এবং বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকেরা। সাধারণ পরিষদের প্রতিবেদন শ্রবণ করে সম্মেলন, তার আর্থিক দাখিলা এবং আসন্ন কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুমোদন করে। আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক রূপলাভে বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছিল এই সম্মেলন। পৃঃ ৯৫

(৪২) ১৮৬৬ সালের ২০ থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত বাল্টিমোরে যে আমেরিকান শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আইন করে আট ঘণ্টা শ্রম-দিবস জারির প্রস্তাব আলোচিত হয়। শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সমবায় সমিতি, ট্রেড-ইউনিয়নে শ্রমিকদের ঐক্যবিধান, ধর্মঘট ইত্যাদি প্রশ্নও আলোচিত হয় কংগ্রেসে। পৃঃ ৯৮

(৪৩) ১৮৬৫-১৮৬৭ সালে দ্বিতীয় ভোটাধিকার সংস্কারের জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্রিটিশ ট্রেড-ইউনিয়নগুলির ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা বলা হচ্ছে, (প্রথম সংস্কার হয়েছিল ১৮৩১-১৮৩২ সালে, তাতে পার্লামেন্টে প্রবেশের সুযোগ পায় বৃহৎ শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা)।

১৮৬৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোটাধিকার সংস্কারের পক্ষপাতীদের সভায় আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে ও ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণে সংস্কার লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় সংস্কারের জন্য শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিচালক কেন্দ্র। মার্কসের পীড়াপীড়িতে সংস্কার লীগ দেশের সমস্ত বয়স্ক পুরুষদের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি পেশ করে। কিন্তু শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলনে আতঙ্কিত সংস্কার লীগের পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়াদের দ্বিধা এবং ট্রেড-ইউনিয়নের সুবিধাবাদী নেতাদের আপোসপ্রবণতায় লীগ সাধারণ পরিষদের লাইন কার্যকর করতে পারে নি। ব্রিটিশ বুর্জোয়া আন্দোলনে ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়, এবং ১৮৬৭ সালে যে খণ্ডিত সংস্কার চালু হয় তাতে ভোটাধিকার পায় কেবল পেটি-বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণীর শীর্ষমহল, শ্রমিক শ্রেণীর মূল জনসাধারণ থাকে আগের মতোই অধিকারহীন। পৃঃ ১০৩

(৪৪) আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কিন ট্রেড-ইউনিয়নগুলি উত্তরের রাষ্ট্রগুলিকে সক্রিয় সমর্থন জানায়। পৃঃ ১০৩

(৪৫) শেফিল্ডে ব্রিটিশ ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সম্মেলন হয় ১৮৬৬ সালের ১৭-২১ জুলাইয়ে। লক-আউটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন আলোচিত হয় তাতে। পৃঃ ১০৩

(৪৬) **পবিত্র-জোট** — এক-একটা দেশে বিপ্লবী আন্দোলন দমন ও সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক আমল রক্ষার জন্য ১৮১৫ সালে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ও প্রাশিয়া কর্তৃক গঠিত ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল মেল। পৃঃ ১০৫

(৪৭) জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নিকট সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ লেখেন মার্কস এবং ১৮৬৯ সালের বসন্তে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধার বিপদ উপলক্ষে তা তিনি পাঠ করেন ১১ মে, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে।

জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন আমেরিকায় গঠিত হয় ১৮৬৬ সালের অগস্টে, বল্টিমোর কংগ্রেসে। গঠনের সময় থেকেই ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতিকে সমর্থনের পক্ষপাতী থাকে এবং ১৮৭০ সালে তাতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় নি। জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা অচিরেই আর্থিক সংস্কারের ইউটোপীয় প্রকল্পে মেতে ওঠেন, এর লক্ষ্য ছিল ব্যাংক ব্যবস্থা বিলোপ করে শস্তা রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রথা প্রবর্তন। ১৮৭০-১৮৭১ সালে ট্রেড-ইউনিয়নগুলি এ সংস্থা পরিত্যাগ করে এবং ১৮৭২ সালে কার্যত এটির অস্তিত্ব আর ছিল না। সমস্ত দুর্বল দিক সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন শ্রমিক সংগঠনাদির স্বাধীন রাজনীতি, নিগ্রো ও শ্বেত শ্রমিকদের একাত্মতা, ৮ ঘণ্টা শ্রম-দিবস এবং নারী শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম গড়ে তোলায় বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছিল। পৃঃ ১০৭

(৪৮) মূলে ছিল 'shoddy aristocrats'; যুদ্ধের কল্যাণে দ্রুত বড়োলোক হয়ে ওঠা লোকেদের প্রসঙ্গে এই কথাটা বলা হত। পৃঃ ১০৮

(৪৯) **'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ'** বইটি ফ. এঙ্গেলস লেখেন ১৮৫০ সালের গ্রীষ্মে, লণ্ডনে। এর বাস্তব তথ্যগুলি তিনি নিয়েছেন প্রধানত জার্মান গণতন্ত্রী ঐতিহাসিক ত্সিমেরমানের বই থেকে।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করেছেন ১৮৪৮ সাল থেকে জার্মানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তন, এই পর্বে বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির ভূমিকা। কৃষকদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের জোট বাঁধার যে তাত্ত্বিক বক্তব্য আছে মার্কসবাদে, এতে তা মূর্ত ও পরিবিকশিত হয়েছে। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বিভিন্ন মনোভাব অবলম্বন প্রয়োজন, বিশ্লেষণ করেছেন কৃষকদের কোন কোন স্তর এবং কী কারণে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামে সহযোগী হতে পারে।

'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ'-এর তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হবার সময় এঙ্গেলস ১৮৭০ সালের ভূমিকার পরিপূরণ করেন সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনে তত্ত্বের গুরুত্ব উল্লেখ করে। ভূমিকার সঙ্গে যোগ করা হয় শ্রমিক শ্রেণী এবং তার পার্টির সংগ্রামের চরিত্র, কর্তব্য এবং রূপের কথা। তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক-অর্থনৈতিক — এই যে তিনটি অবিচ্ছেদ্য ধারায় শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রাম চালাতে হবে, এঙ্গেলস তা নির্দিষ্ট করে দেন। পৃঃ ১১০

(৫০) 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue'. ('নতুন রাইনিশ গেজেট। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা') — মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট লীগের তাত্ত্বিক মুখপত্র। প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালের

ডিসেম্বর থেকে ১৮৫০ সালের নভেম্বর অবধি। বেরিয়েছিল পত্রিকার ছয়টি সংখ্যা। পৃঃ ১১০

(৫১) জার্মান ঐতিহাসিক ত্সিমেরমান-এর 'Allgemeine Geschichte des großen Bauernkrieges' ('মহান কৃষকযুদ্ধের ইতিহাস') বইটি তিন খণ্ডে ১৮৪১-১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় স্টুৎগার্ত থেকে। পৃঃ ১১০

(৫২) ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবকালে মাইন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্টে যে নিখিল জার্মান জাতীয় সভার অধিবেশনগুলি হয়, তাতে চরম বামপন্থী অংশের কথা বলা হচ্ছে। বামপন্থীরা ছিল প্রধানত পেটি-বুর্জোয়া স্বার্থের বাহক, কিন্তু জার্মান শ্রমিকদের একাংশও তাদের সমর্থন করত। এ সভার প্রধান কাজ ছিল জার্মানির রাজনৈতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা দূর করে একটা সর্বজার্মান সংবিধান রচনা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ উদারনৈতিক প্রতিনিধিদের দ্বিধা ও ভীরুতার ফলে সভা দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বহস্তে নিতে ভয় পায়। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে সভাকে তার অধিষ্ঠান সরিয়ে নিতে হয় স্টুৎগার্তে, আর ১৮ জুন সৈন্যবাহিনী তাকে ছত্রভঙ্গ করে। পৃঃ ১১০

(৫৩) ১৮৬৬ সালে অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর বহুজাতিক অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের সংকট বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়ার শাসক শ্রেণীরা হাঙ্গেরির ভূস্বামীদের সঙ্গে একটা রফা করে এবং ১৮৬৭ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় দ্বৈত রাজতন্ত্র গঠনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পৃঃ ১১২

(৫৪) **জাতীয়-উদারনীতিকরা** — ১৮৬৬ সালের শরৎকালে গঠিত জার্মান বুর্জোয়াদের পার্টি। এদের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়ার আধিপত্যে জার্মান রাষ্ট্রগুলির সংযুক্তি। তাদের পলিসিতে প্রতিফলিত হয় বিসমার্কের নিকট জার্মান উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের পরাজয়বরণ। পৃঃ ১১৩

(৫৫) প্রাশিয়ার পক্ষপুটে উত্তর ও মধ্য জার্মানির ১৯টি রাষ্ট্র এবং ৩টি স্বাধীন নগর নিয়ে ১৮৬৭ সালে গঠিত উত্তরজার্মান লীগের কথা বলা হচ্ছে। প্রাশিয়ার আধিপত্যে জার্মানির ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে এই লীগ গঠন একটি নির্ধারক পর্যায়। জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ায় ১৮৭১ সালের জানুয়ারিতে লীগ তুলে দেওয়া হয়। পৃঃ ১১৩

(৫৬) ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর প্রাশিয়ার ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হানোভার রাজ্য, হেসেন-কাসেল ইলেকটোরেট এবং নাসাউ অধিরাজ্যের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১১৩

(৫৭) **জার্মান জনতা পার্টি** গঠিত হয় ১৮৬৫ সালে, এতে ছিল প্রধানত দক্ষিণ

জার্মান রাষ্ট্রগুলির পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক লোকেরা, অংশত বুর্জোয়ারা। এ পার্টি জার্মানিতে প্রাশিয়ার আধিপত্যের বিরোধিতা করে এবং তথাকথিত 'মহাজার্মানির' পরিকল্পনা পেশ করে, যাতে নাকি অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন প্রাশিয়া, তেমনি অস্ট্রিয়াও। একটি কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আকারে জার্মানির ঐক্যবিধানের বিরোধিতা করে তারা ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রচার চালায়। পৃঃ ১১৪

(৫৮) ঊনিশ শতকের ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি প্রাশিয়ায় একসারি শিল্পশাখায় বিশেষ অনুমতির (কনসেশন) ব্যবস্থা চালু হয়, তা ব্যতীত শিল্পোৎপাদনে লিপ্ত হওয়া চলত না। এই অর্ধমধ্যযুগীয় শিল্প-আইনে সংকুচিত হয়েছিল পুঁজিবাদের বিকাশ। পৃঃ ১১৪

(৫৯) সাদোভার লড়াই ঘটে থেকে ১৮৬৬ সালের ৩ জুলাই, এটাই ছিল ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের নির্ধারক সংঘর্ষ, যাতে বিজয়ী হয় প্রাশিয়া। পৃঃ ১১৬

(৬০) ১৮৬৯ সালে ৬-১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ১ম আন্তর্জাতিকের বাসেল কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে। ১০ সেপ্টেম্বর এতে ভূমিস্বত্বের প্রশ্নে মার্কসের পক্ষপাতীদের নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

'১) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে তা সামাজিক মালিকানায় অর্পণের অধিকার আছে সমাজের।

২) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে তা সামাজিক মালিকানায় অর্পণ আবশ্যক।'

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আয়তনে ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির কয়েকটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় কংগ্রেসে। পৃঃ ১১৯

(৬১) ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ১৮৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর সেদানের নিকট পরাজিত হয় ফরাসী সৈন্যবাহিনী এবং সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সমেত তারা বন্দী হয়। সেদান বিপর্যয়ে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয় প্রজাতন্ত্র। প্রাশিয়ার আধিপত্যে জার্মান সাম্রাজ্য গঠনে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। পৃঃ ১২১

(৬২) মধ্যযুগে জার্মান জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য — এই নামটাকে ঈষৎ বদলিয়ে **প্রুশীয় জাতির পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যের উল্লেখ করে এঙ্গেলস** এই কথাটা তুলে

ধরতে চেয়েছেন যে জার্মানির সংযুক্তি ঘটেছে প্রাশিয়ার প্রাধান্যে এবং তার সঙ্গে চলেছে জার্মান ভূমির প্রুশীয়করণ। পৃঃ ১২১

(৬৩) উত্তরজার্মান লীগ সম্পর্কে ৫৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২১

(৬৪) ১৮৭০ সালে উত্তরজার্মান লীগের সঙ্গে ব্যাভেরিয়া, বাদেন, ভুর্টেমবের্গ এবং হেসেন-ডার্মস্টাডের সংযুক্তির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১২১

(৬৫) ১৮৭০-১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সংঘর্ষগুলির কথা বলা হচ্ছে। ১৮৭০ সালের ৬ অগস্ট স্পিখার্ন (লটারিঙ্গিয়া)-র কাছে প্রুশীয় বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয় ফরাসী বাহিনী। ইতিহাসে স্পিখার্ন লড়াই ফরবাখ লড়াই বলেও উল্লিখিত হয়েছে।

১৮৭০ সালের ১৬ অগস্ট **মারস-লা-তুরে** (ভিওর্নভিল নামেও উল্লিখিত) লড়াইয়ে ফরাসী সৈন্যবাহিনী মেৎস ছেড়ে যেতে শুরু করে। জার্মান ফৌজ তা ঠেকাতে সমর্থ হয় এবং পরে তার পশ্চাদপসরণের পথ ছিন্ন করে দেয়।

সেদান সম্পর্কে ৬১ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২৫

(৬৬) 'Der Volksstaat' ('জনরাষ্ট্র') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৬ সাল অবধি। পত্রিকার সাধারণ পরিচালনায় ছিলেন লিবক্নেখ্ট। মার্কস ও এঙ্গেলস এ পত্রিকায় লিখতেন, বরাবর সাহায্য করেছেন তার সম্পাদনায়। পৃঃ ১২৫

(৬৭) ১৮৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি রাইখস্টাগের নির্বাচনে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ৯ জন প্রার্থী জয়ী হয়; তাদের মধ্যে ছিলেন বেবেল ও লিবক্নেখ্ট, এ সময় তাঁরা কারাবাসে থাকেন। পৃঃ ১২৬

(৬৮) 'Nordstern' ('ধ্রুবতারা') — জার্মান সাপ্তাহিক, হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬০-১৮৬৬ সাল অবধি; ১৮৬৩ সাল থেকে লাসালপন্থী ধারার অনুগামী। পৃঃ ১৩০

(৬৯) মাইন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কংগ্রেসে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৮৫৯ সালের ১৫-১৬ সেপ্টেম্বরে। প্রাশিয়ার আধিপত্যে অস্ট্রিয়া বাদে সমস্ত জার্মানির ঐক্যসাধন ছিল এসোসিয়েশনের সংগঠকদের উদ্দেশ্য। উত্তরজার্মান লীগ গঠিত হবার পর ১৮৬৭ সালের ১১ নভেম্বর লীগ তার আত্মবিলুপ্তি ঘোষণা করে। পৃঃ ১৩১

(৭০) ১৮৫৮ সালে প্রিন্স-রিজেন্ট (শাসক প্রিন্স) মান্টেইফেল মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে নরমপন্থী উদারনীতিকদের ক্ষমতায় ডাকেন। বুর্জোয়া সংবাদপত্রে এটা

একটা গালভরা 'নূতন যুগ' বলে নন্দিত হয়। আসলে ১ম ভিলহেল্মের পলিসি ছিল শুধু প্রুশীয় রাজতন্ত্র ও যুঙ্কারপ্রথা (ভূস্বামী আধিপত্য) জোরদার করা। কার্যত 'নূতন যুগ' বিসমার্কের একনায়কত্বের জমি তৈরি করে, যিনি ক্ষমতায় আসেন ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বরে। পৃঃ ১৩১

(৭১) **মার্কুইস পোজা এবং দ্বিতীয় ফিলিপ** — শিলারের 'ডন কার্লোস' নাটকের দুটি চরিত্র; উকারমার্কের দ্বিতীয় ফিলিপ বলতে বোঝানো হয়েছে ১ম ভিলহেল্মকে।

উকারমার্ক — ব্রান্ডেনবুর্গ (প্রাশিয়া) প্রদেশের উত্তরাংশ, প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় যুঙ্কার প্রথার ঘাঁটি। পৃঃ ১৩১

(৭২) 'Kreuz Zeitung' ('ক্রুশ পত্রিকা') — **শিরোনামায় ক্রুশ প্রতীক চিহ্নিত থাকায়** জার্মান 'Neue Preußische Zeitung' ('নতুন প্রুশীয় পত্রিকা') দৈনিক পত্রের এই নাম জুটেছিল; ১৮৪৮ সালের জুনে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে; এটি ছিল প্রতিবিপ্লবী দরবারী চক্র ও যুঙ্কার সম্প্রদায়ের মুখপত্র।

পৃঃ ১৩২

(৭৩) **নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ** — রাজনৈতিক সংগঠন, লাসালের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালে। ১৮৭৫ সালে যখন গোথা কংগ্রেসে লাসালপন্থী ও এইজেনাখপন্থীরা (সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি) মিলিত হয় জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টিতে, ততদিন পর্যন্ত এটি বিদ্যমান ছিল।

'Social-Demokrat' — নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘের মুখপত্র।

পৃঃ ১৩২

(৭৪) **প্রগতিপন্থীরা** — ১৮৬১ সালের জুনে গঠিত প্রুশীয় বুর্জোয়া পার্টির লোকেরা। এ পার্টি প্রাশিয়ার প্রাধান্যে জার্মানির একীকরণ, সারা জার্মান পার্লামেন্ট ডাকা এবং প্রতিনিধি সভার কাছে দায়িত্ববহ উদারনৈতিক মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি করে। পৃঃ ১৩২

(৭৫) শিল্প বিধিবিধানে জোট স্থাপন ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে যেসব ধারা ছিল, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা উপলক্ষে প্রুশীয় লাণ্ডটাগে ১৮৬৫ সালে জানুয়ারিতে জোট স্থাপনের প্রশ্ন আলোচিত হয়। শ্রমিকদের নতিস্বীকারের জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উৎপাদন বন্ধ নিষেধ করে যে ১৮১ ধারা ছিল তা নাকচের দাবি করে প্রগতিপন্থীরা, সেইসঙ্গে ধর্মঘটে প্ররোচনা দেবার জন্য শ্রমিকদের শাস্তি দেবার যে কথা ছিল ১৮২ ধারায়, তাও তুলে দেবার একটা বাগাড়ম্বরী দাবি জানায়। ১৮৬৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রুশীয় লাণ্ডটাগ শুধু ১৮১ ও ১৮২ ধারা নাকচ করে কিন্তু শ্রমিকদের দাবি পূরণ করে না।

পৃঃ ১৩৩

(৭৬) প্রাশিয়ায় প্রচলিত শিল্প বিধানকে মার্কস এই বলে শ্লেষ করেছেন। ১৮ শতকে প্রাশিয়ার প্রদেশগুলিতে 'চাকরবাকর সংক্রান্ত আইন' নামে যা চলত, তাতে প্রাধান্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক নিয়মকানুনের, যাতে ভূমিদাস কৃষকদের ওপর জমিদার ও য়ুংকারদের পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচার মঞ্জুর করা হয়। পৃঃ ১৩৩

(৭৭) ১৮৬১ সালের বসন্তে মার্কস প্রুশীয় নাগরিকত্ব পুনঃপ্রাপ্তির উদ্যোগ নেন, কিন্তু ১৮৪৫ সালে উনি 'স্বেচ্ছায়' প্রুশীয় নাগরিকত্ব বর্জন করেছেন, এই বাহ্যিক অজুহাতে তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয়। পৃঃ ১৩৪

(৭৮) ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩৪

(৭৯) ১ম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বরে। তাতে উপস্থিত থাকেন সাধারণ পরিষদ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের বিভাগ আর শ্রমিক সমিতির ৬০ জন প্রতিনিধি। সাধারণ পরিষদের সরকারী প্রতিবেদন রূপে পঠিত হয় মার্কস রচিত 'বিভিন্ন প্রশ্নে সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট নির্দেশ' (বর্তমান খণ্ডের ৯৫-১০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী প্রুধোঁপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এর অধিকাংশ ধারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। জেনেভা কংগ্রেস শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি ও বিধিবিধানও অনুমোদন করে। পৃঃ ১৩৫

(৮০) ৪২ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩৬

(৮১) ব্রিটেনে দ্বিতীয় ভোটাধিকার সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে (দ্রষ্টব্য ৪৩ নং টীকা)। পৃঃ ১৩৬

নামের সূচি

গ

জ

ট

ত

থ

দ

ন

ভ

ম

ল

শ

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

প

পোজা, মার্কুইস — শিলারের 'ডন কার্লোস' ট্র্যাজেডির চরিত্র; স্বাধীন চিন্তার অনুরাগী উদার রাজসভাসদ। — ১০১

ফ

ফিলিপ ২য় — শিলারের 'ডন কার্লোস' ট্র্যাজেডির একটি চরিত্র। — ১০১

ম

মলোখ — প্রাচীন ফিনিসিয়ান ধর্মে সূর্য দেব, তাঁর পূজায় নরবলি হত; পরে মলোখ নামটা হয়ে দাঁড়ায় সর্বগ্রাসী রুদ্র শক্তির প্রতিমূর্তি। — ১৪

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার মজুর এক হও!

১.৭.৮৪

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

৬

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том 6

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

М $\frac{10101-662}{014(01)-81}$ 685-81 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস

'পুঁজি' গ্রন্থের (১) প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ

আমার আলোচ্য বইখানি — যার প্রথম খণ্ড আমি এখন জনসাধারণের বিচারের জন্যে পেশ করছি, তা হল ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত আমার 'Zur Kritik der politischen Oekonomie' ('অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে') নামের বইখানিতে লিপিবদ্ধ চিন্তাধারারই জের। পূর্বোক্ত ওই প্রথম অংশ ও তার এই বর্তমান জেরের মধ্যেকার দীর্ঘ বিরতির কারণ — বহু বছরের একটি অসুখের ফলে আমার কাজে বারংবার বিঘ্ন ঘটা।

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমার ওই পূর্ববর্তী গ্রন্থের বক্তব্যের সারাংশ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে (২)। দুটি বইয়ের মধ্যে নিছক যোগসূত্র-স্থাপন ও পূর্ণতাসাধনের জন্যেই যে এটি করা হয়েছে তা নয়। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাতেও উন্নতি ঘটানো হয়েছে এর ফলে। অবস্থাগতিকে যতদূর সম্ভব হয়েছে সে-অনুযায়ী আগেকার বইখানিতে যে-সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র দেয়া হয়েছিল তার অনেকগুলিই এ-বইয়ে পূর্ণতররূপে বিকশিত করে তোলা হয়েছে, আবার অন্যদিকে যে-সমস্ত বিষয় আগের বইয়ে পুরোপুরি বিশদ করা হয়েছিল সেগুলি কেবলমাত্র ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে এখানে। মূল্য ও অর্থ-সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির ইতিহাস-বিষয়ক আলোচনার অংশগুলি, বলা বাহুল্য, এ-বই থেকে একেবারেই বাদ দেয়া হয়েছে। তবে যে-পাঠক আমার আগের বইটি পড়েছেন তিনি এ-বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের টীকার মধ্যে উপরোক্ত ওই সমস্ত তত্ত্বের ইতিহাস-সম্পর্কিত অতিরিক্ত কিছু আকর-প্রসঙ্গের সন্ধান পাবেন।

যে-কোনো বিষয় শুরু করাটাই কঠিন, এটা সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্যি। এ-কারণে এ-বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি, বিশেষ করে তার যে-অংশে পণ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত আলোচনাটি বিধৃত, সেটি পাঠকের কাছে সবচেয়ে কঠিন ঠেকবে। তবে বিশেষ করে এই আলোচনার যে-অংশে মূল্যের

সারবস্তু ও ম্ল্যের পরিমাণের আলোচনা আছে সেই অংশটিকে যতদ্র সম্ভব বোধগম্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছি আমি।* ম্ল্যের বাস্তব র্প, যার প্র্ণবিকশিত চেহারা হল অর্থের বাস্তব র্প, তা একেবারেই প্রাথমিক ও সরল ব্যাপার। তা সত্ত্বেও গত দ্'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মান্ষের জ্ঞানব্দ্ধি ব্থাই চেষ্টা করেছে এ-ব্যাপারের ম্লে পৌঁছতে, অথচ অন্যদিকে এর চেয়ে অনেক বেশি যৌগিক ধরনের ও জটিল নানা র্পের সফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্তত্পক্ষে লক্ষ্যবস্তুর সন্নিকটে পৌঁছতে পেরেছে তা। কিন্তু কেন এমনটা সম্ভব হল? এর কারণ আর কিছ্ই নয়, কেবল অখণ্ড জৈবসত্তা হিসেবে কোনো প্রাণীর দেহের বিশ্লেষণ ওই দেহের কোষকলার বিশ্লেষণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজ, তা-ই। তদ্পরি অর্থনৈতিক নানা র্পের বিশ্লেষণে না কাজে লাগে অণ্বীক্ষণ-যন্ত্র, না রাসায়নিক নানা বিকারক। সেক্ষেত্রে ওইসব জিনিসের জায়গায় প্রয়োজন পড়ে বিম্র্তকরণের ক্ষমতার। কিন্তু শ্রমের সাহায্যে উৎপাদিত বস্তুর পণ্য-র্প — কিংবা পণ্যবস্তুর ম্ল্য-র্পই — হল ব্র্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহকোষের বাস্তব র্প। অনভিজ্ঞ লোকের কাছে এই সমস্ত কোষ-র্পের বিচার-বিশ্লেষণ বড্ড বেশি খ্ঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সামিল ঠেকে। বস্তুত এটি ছোটখাট খ্ঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোই বটে, তবে তা অণ্বীক্ষণিক শারীরস্থান নিয়ে মাথা ঘামানোরই সগোত্র।

---

* এটা আরও বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কেননা এমনকি ফের্ডিনান্ড লাসালের গ্রন্থের যে-অংশে লাসাল শ্ল্টসে-ডেলিচের যুক্তিজাল খণ্ডনে ব্যাপ্ত এবং যেখানে তিনি বলছেন যে আলোচ্য এই বিষয়গ্লি (৩) সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যাসম্হের 'বিশ্দ্ধ য্ক্তিসম্মত সারাংশ'টুকুই তিনি বিবৃত করছেন, সেখানেও গ্র্তর নানা ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে। লাসাল তাঁর অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে সবকটি সাধারণ তত্ত্বগত প্রস্তাব — অর্থাৎ প্ঁজির ঐতিহাসিক প্রকৃতি, উৎপাদনের শর্তাবলী ও উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি, সবকিছ্ সম্পর্কিত তত্ত্বগত প্রস্তাবসম্হ ও এমনকি আমার তৈরি-করা পরিভাষা পর্যন্ত সবকিছ্ই যদি আমার রচনাবলী থেকে প্রায় আক্ষরিক অর্থে ও কোনোরকম ঋণস্বীকার না-করেই বেমাল্ম গ্রহণ করে থাকেন, তবে ব্ঝতে হবে তিনি তা করেছেন প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যসাধনেই। আমি অবশ্য তাঁর গৃহীত ওইসব তত্ত্বগত প্রস্তাবের বিশদীকরণ ও সে-সবের হাতে-কলমে প্রয়োগের কথা বলছি না এখানে, কারণ সে-সবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। (মার্কসের প্রদত্ত টীকা।)

অতএব, মূল্যের বাস্তব রূপ-সম্পর্কিত আলোচনার অংশটিকে বাদ দিলে আলোচ্য এই বইখানিকে আর দুরূহতার দায়ে অভিযুক্ত করা চলে না। অবশ্য একথা বলার সময় আমি ধরেই নিচ্ছি যে এ-বইয়ের পাঠক হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে চান আর তাই নিজে কিছু-পরিমাণে মাথা ঘামাতেও ইচ্ছুক।

পদার্থবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে থাকেন হয় সেইখানে যেখানে ওই সমস্ত ঘটনা ঘটে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও লক্ষণীয় ধরনে এবং বিঘ্নসৃষ্টিকারী প্রভাব থেকে সবচেয়ে মুক্ত অবস্থায়, অথবা যেখানে ওই সমস্ত ঘটনা স্বাভাবিকভাবে ঘটানো সম্ভব সেই পরিবেশে পরীক্ষাগারে ঘটনাগুলিকে ঘটান তিনি। আলোচ্য এই বইয়ে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে উৎপাদনের পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক ও বিনিময়-সম্পর্কের ব্যবস্থা। এখনও পর্যন্ত এ-সবের ধ্রুপদী লীলাক্ষেত্র হল ইংলন্ড। আমার তত্ত্বগত ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে ইংলন্ডের নানা ব্যাপার যে প্রধান উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এটাই হল তার কারণ। তবে ইংলন্ডের শিল্প ও কৃষি-শ্রমিকদের এ-বইয়ে বর্ণিত অবস্থা দেখে যদি কোনো জার্মান পাঠক অবহেলাভরে কাঁধ-ঝাঁকানি দেন কিংবা আশাবাদীর ধরনে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে আর যাই হোক জার্মানির অবস্থা ঠিক এতটা খারাপ নয়, তাহলে আমি তাঁকে স্পষ্ট করেই বলব: 'De te fabula narratur!'*

বস্তুত, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মগুলি থেকে সঞ্জাত সামাজিক নানা দ্বন্দ্বের অপেক্ষাকৃত বেশি বা কম মাত্রার বিকাশের প্রশ্ন এটি নয়। এটি হল ওই সমস্ত নিয়মেরই সমস্যা, অবশ্যম্ভাবী নানা ফলাফলের অভিমুখে লৌহদৃঢ় প্রয়োজনীয়তার বশে বিকাশমান ওই সমস্ত প্রবণতারই প্রশ্ন এটি। শ্রমশিল্পে অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশকে তার নিজের ভবিষ্যতের ছবিটিই দেখাচ্ছে মাত্র।

কিন্তু এছাড়া আরও কথা আছে। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থা যেখানে

---

* 'Mutato nomine de te fabula narratur' (অর্থাৎ, নাম বদলে গেলেও কাহিনীটি আপনার সম্বন্ধেই নয় কি)। হোরেস, 'ব্যঙ্গবিদ্রূপ', প্রথম খণ্ড, ব্যঙ্গ-১।—সম্পাঃ

আমাদের দেশে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে (যেমন, কলকারখানাগুলিতে), সেখানকার অবস্থা কিন্তু ইংলন্ডের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। এর কারণ সেখানে ইংলন্ডের ফ্যাক্টরি-আইনের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো আইনকানুনের অভাব। এছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মহাদেশীয় পশ্চিম ইউরোপের বাকি সকল দেশের মতো আমরাও নিপীড়িত হচ্ছি কেবল যে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের কারণে তা নয়, ওই বিকাশের অসম্পূর্ণতার কারণেও। আধুনিক নানা অমঙ্গলের পাশাপাশি আমরা উৎপীড়িত হয়ে চলেছি উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া একটি গোটা পর্যায়ক্রমিক বহুতরো অমঙ্গলের পেষণে, আর এই শেষোক্ত সব অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটেছে কালাতিক্রমণ-দোষদুষ্ট অবশ্যম্ভাবী নানা সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক সহ সেকেলে যত উৎপাদন-পদ্ধতির নিষ্ক্রিয় উদ্বর্তন থেকে। আমরা কষ্ট পাচ্ছি জীয়ন্ত সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেই নয় শুধু, মৃত সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেও। 'Le mort saisit le vif!'*

জার্মানির এবং বাকি মহাদেশীয় পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক নানা ব্যাপারের পরিসংখ্যান ইংলন্ডের পরিসংখ্যানগুলির তুলনায় অনেক বেশি হেলাফেলায় ও বাজে ভাবে সংকলিত। তা সত্ত্বেও এই পরিসংখ্যানগুলি আসল অবস্থার আবরণ এতখানি উন্মোচিত করেছে যে তার ফাঁক দিয়ে দানবী মেডুসার মাথাটা এক-নজর আমরা ঠাহর করে দেখতে পাই। দেশের আসল অবস্থা যে কী তা দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠতাম যদি ইংলন্ডের মতো আমাদের গভর্নমেণ্ট ও পার্লামেণ্টগুলিও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্যে সময়ে-সময়ে তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত করত; যদি সেই সমস্ত কমিশন আসল সত্য অবগত হওয়ার জন্যে অধিকারী হোত ইংলন্ডের কমিশনগুলির মতো একই ধরনের নির্বাধ ক্ষমতার; যদি আমাদের দেশে সম্ভব হোত এই ধরনের কাজের জন্যে ইংলন্ডের ফ্যাক্টরি-পরিদর্শকদের মতো অমন যোগ্য, অতখানি পক্ষপাতিত্বের দোষমুক্ত ও ওপরওয়ালাদের সম্পর্কে ভয়শূন্য মানুষ পাওয়া, ইংলন্ডের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসাবিৎ সংবাদদাতাদের, সেদেশের স্ত্রীলোক ও শিশুদের শোষণ সম্পর্কে, গৃহ ও খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত-কমিশনের সদস্যদের মতো মানুষ পাওয়া।

* 'মৃত ব্যক্তি মরণফাঁসে বেঁধে রেখেছে জীয়ন্তকে!' — সম্পাঃ

পারসিয়ুস যে-দানবীদের পশ্চাদ্‌গমন করেছিলেন তারা যাতে তাঁকে দেখতে না-পায় সেজন্যে তিনি একটি যাদু-টুপি মাথায় পরে নিয়েছিলেন। আর আমরা সেই যাদু-টুপি টেনে নামিয়ে আমাদের চোখ-কান ঢেকে রেখেছি আর দানবের অস্তিত্ব নেই ভেবে মনগড়া কল্পনার জগতে বিচরণ করছি।

এ-ব্যাপারে আমরা যেন আত্মপ্রতারণার আশ্রয় না নিই। আঠারো শতকে যেমন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ (৪) ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের কাছে সঙ্কেতঘণ্টা বাজিয়ে ডাক দিয়েছিল, তেমনই উনিশ শতকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (৫) ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ডাক পাঠিয়েছিল সঙ্কেতঘণ্টা বাজিয়ে। ইংলণ্ডে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই পরিবর্তন যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছবে তখন ইউরোপ মহাদেশে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবেই। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী এই পরিবর্তনের ধরনটি হবে অপেক্ষাকৃত বেশি পাশবিক অথবা বেশি মানবিক অতএব, মহত্তর উদ্দেশ্য ইত্যাদির কথা বাদ দিলে, আপাতত যেগুলি শাসক-শ্রেণী সেই শ্রেণীগুলির নিজস্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহেরই তাগিদ থাকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশের পথে যে-সমস্ত বাধা আইনসঙ্গতভাবে দূর করা সম্ভব তা কার্যকর করে তোলার। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এ-কারণেই এই গ্রন্থে আমি ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি-আইনের ইতিহাস, তার মর্মবস্তু ও ফলাফলের আলোচনায় এতখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। যে-কোনো জাতি অপর জাতিগুলির কাছ থেকে অনেক-কিছু শিখতে পারে ও তা শেখা উচিতও। তবে এ-ও ঠিক যে কোনো সমাজ তার অগ্রগতির স্বাভাবিক নিয়মগুলি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সঠিক রাস্তা ধরলেও (এবং আমার এই গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল আধুনিক সমাজের গতিপথের অর্থনৈতিক নিয়মটি উন্মোচিত করে দেখানো), তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারাবাহিক স্তরগুলি না লম্বা-লম্বা উল্লম্ফন না আইন পাশ কোনোকিছুর সাহায্যেই সেই সমাজের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কেবল সেই আলোচ্য সমাজ পারে এই স্তরগুলির জন্ম-যন্ত্রণাকে স্বল্পস্থায়ী করতে ও যন্ত্রণার তীব্রতা কমাতে।

প্রসঙ্গত, সম্ভাব্য ভুল-বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্যে একটি কথা। পুঁজিতন্ত্রী ও সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীকে আমি কোনো অর্থেই গোলাপি রঙে চিত্রিত করে দেখাই নি। কেবল এ-গ্রন্থে যে-ব্যক্তিবিশেষদের কথা আলোচিত হয়েছে তাদের

উপস্থাপিত করা হয়েছে মাত্র অর্থনৈতিক স্তরসমূহের মূর্ত প্রতিনিধি হিসেবে, বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-স্বার্থের শরীরী প্রতীক হিসেবেই। আমার যে-দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্রমবিকাশকে জীববৃত্তান্তের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়েছে, সে-অনুযায়ী সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তিবিশেষ যে-সমস্ত পরিস্থিতির ক্রীড়নক তাকে সেই পরিস্থিতিগুলির জন্যে দায়ী করার (তা সে যতই নিজেকে আত্মমুখভাবে সেই পরিস্থিতিগুলির ঊর্ধ্বে তুলে ধরুক-না কেন) অবকাশ অন্য যে-কোনো দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে কম।

অর্থশাস্ত্র-আলোচনার ক্ষেত্রে মুক্তমন বৈজ্ঞানিক অন্বেষা অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো কেবল-যে একই ধরনের শত্রুদের সম্মুখীন হয় তা-ই নয়। যে-উপাদান নিয়ে অর্থশাস্ত্রকে কাজ করতে হয় তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতিই শত্রু হিসেবে মুক্তমন বৈজ্ঞানিক অন্বেষার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে এনে হাজির করে দেয় মানব-হৃদয়ের সবচেয়ে হিংস্র, নীচ ও বিদ্বেষ-ভরা প্রবৃত্তিগুলিকে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিহিংসার দেবীগুলিকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ইংলন্ডের সরকারের পৃষ্ঠপোষিত গির্জা (৬) তার সর্ববিধির ৩৯টি ধারার মধ্যে ৩৮টি ধারার ওপর আক্রমণকেই অপেক্ষাকৃত সহজে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত তার আয়ের ১/৩৯ ভাগের ওপর আক্রমণের চেয়ে। বর্তমানে প্রচলিত ঐতিহ্যমূলক সম্পত্তিগত সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনার তুলনায় খোদ নিরীশ্বরবাদও culpa levis* বলে গণ্য। তৎসত্ত্বেও অগ্রগতির চিহ্ন অভ্রান্তরূপে স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত 'ব্লু বুক'টির উল্লেখ করছি আমি (৭)। এটি হল 'Correspondence with Her Majesty's Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trades Unions'। এইসব চিঠিপত্রে ইংরেজ রাণীর বিদেশস্থ রাষ্ট্রদূতেরা একেবারে সরাসরি এই ভাষাতেই জানিয়েছেন যে জার্মানিতে, ফ্রান্সে, সংক্ষেপে বলতে গেলে ইউরোপ মহাদেশের সকল সভ্য রাষ্ট্রেই, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে ইংলন্ডের মতোই মূলগত এক পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

---

* হালকা অপরাধ। — সম্পাঃ

আবার ওই একই সময়ে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি মিঃ ওয়েড জনসভায় ঘোষণা করেছেন যে ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপের পরে পংজি এবং ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কগুলির বেলায় মূলগত এক পরিবর্তন একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। এ-সবই হল নতুন কালের সঙ্কেত, রক্তবর্ণ রাজপোশাক বা যাজকের কালো আলখাল্লা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না এদের। অবশ্য এ-সবের অর্থ এই নয় যে আগামীকালই কিছু একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। এগুলি কেবল দেখিয়ে দিচ্ছে যে খোদ শাসক-শ্রেণীগুলির মধ্যেই এই বিপদাশঙ্কা জেগে উঠছে যে বর্তমান সমাজ দৃঢ়বদ্ধ কোনো স্ফটিকখণ্ড নয়, তা এক পরিবর্তনশীল জীবদেহ এবং তার মধ্যে নিয়ত ঘটে চলেছে পরিবর্তন।

আমার এই রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হবে পংজির সংবহন-প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় বই) এবং মোটামুটিভাবে পংজিতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রূপসমূহ (তৃতীয় বই) এবং তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে (চতুর্থ বই) অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির ইতিহাস।

বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার ভিত্তিতে গঠিত প্রতিটি মতামতকেই আমি স্বাগত জানাই। আর তথাকথিত জনমতের অন্ধ-সংস্কার, যাকে আমি কোনোদিন রেয়াত করে চলি নি, তার সম্বন্ধে যেমন আগে তেমনই এখনও আমার বক্তব্য হল মহান ফ্লোরেন্সবাসীর এই কথাকটিই:

'Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!*

কার্ল মার্ক্স

লণ্ডন, ২৫ জুলাই, ১৮৬৭

প্রথম প্রকাশিত হয় বইয়ে:
K. Marx. 'Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie'. Erster Band, Hamburg, 1867

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯০ সালের চতুর্থ জার্মান সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী এঙ্গেলসের সম্পাদনা

* 'চলে যাও নিজ পথে, লোকে নিন্দা করে তো করুক!' দান্তে, 'দি ডিভাইন কমেডি', 'পুর্গাতোরিও', পঞ্চম সর্গ।।— সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৭২ সালের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের পরিশিষ্ট

এই দ্বিতীয় সংস্করণটিতে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে প্রথম সংস্করণের পাঠকদের সে-সম্বন্ধে অবগত করিয়ে আমাকে এই আলোচনা শুরু করতে-হচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠক লক্ষ্য না-করে পারবেন না যে আলোচ্য এই বইখানির বিষয় বিন্যাস অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ। সর্বত্রই অতিরিক্ত মন্তব্যগুলিকে দ্বিতীয় সংস্করণের বিশেষ মন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূল পাঠের ক্ষেত্রে আলোচিত নিচের বিষয়গুলিতে সংযোজন-পরিবর্তন ইত্যাদি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে প্রতিটি ধরনের বিনিময়-মূল্যকে প্রকাশ করা হয় যে-সমস্ত গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে সেগুলির বিশ্লেষণ থেকে মূল্যের উৎপত্তি-নির্ণয়ের কাজটি অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক রীতি-পদ্ধতি অনুসরণের মধ্যে দিয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে; এইরকম এ-বইয়ের প্রথম সংস্করণে মূল্যের সারবস্তু এবং সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের সাহায্যে মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণের মধ্যেকার যে-সম্পর্কের ব্যাপারটি উল্লিখিত হয়েছিল পরোক্ষভাবে, এই সংস্করণে সেই সম্পর্কের ওপর জোর দেয়া হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। এছাড়া আগের সংস্করণের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অংশটি ('মূল্যের বাস্তব রূপ') সম্পূর্ণতই এখানে সংশোধিত হয়েছে। এটি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আর কিছুর জন্যে না-হলেও অন্তত প্রথম সংস্করণে এই বিষয়টির দু'বার করে ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে। (প্রসঙ্গত বলি, এই বিষয়টির দু'বার করে এ-ধরনের ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল আমার হানোভার-বাসী বন্ধু ডঃ ল. কুগেলমানের পরামর্শক্রমে। ১৮৬৭ সালের

বসন্তকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঠিক তখনই সেখানে ওই প্রথম সংস্করণের প্রুফশিটগুলি হামবুর্গের ছাপাখানা থেকে গিয়ে পৌঁছয়, আর ডঃ কুগেলমান আমাকে তখন বোঝান যে অধিকাংশ পাঠকের কাছে ব্যাপারটি আরও বোধগম্য করে তোলার জন্যে মূল্যের বাস্তব রূপের আরও স্পষ্ট শিক্ষামূলক একটি ব্যাখ্যা সংযোজিত করা দরকার।) অতঃপর প্রথম অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশও — 'পণ্যসামগ্রী-সম্পর্কিত বস্তুরতি, ইত্যাদি' — বহুপরিমাণে বদলানো হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশটিরও ('মূল্যের পরিমাপ') সতর্ক সংশোধন সাধিত হয়েছে, কেননা প্রথম সংস্করণে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বেশ কিছুটা অবহেলাভরেই — পাঠককে বলা হয়েছে 'Zur Kritik der politischen Oekonomie' বইটির ১৮৫৯ সালের বার্লিন-সংস্করণে যে-ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা দেখে নিতে। সপ্তম অধ্যায়, বিশেষ করে তার দ্বিতীয় অংশটি বহুপরিমাণেই পুনর্লিখিত হয়েছে।

এছাড়া মূল পাঠের অন্য সমস্ত আংশিক পরিবর্তনসাধন নিয়ে আলোচনা করাটা এখানে অর্থহীন হবে। কেননা প্রায়শই সে-সমস্ত নিছক লিখনশৈলী-সংক্রান্ত পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। গোটা বই জুড়ে এরকম পরিবর্তনের সংখ্যা বড় কম নয়। তৎসত্ত্বেও প্যারিসে প্রকাশিতব্য এ-বইয়ের ফরাসি তর্জমাখানি পড়তে গিয়ে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে মূল জার্মান বইখানির বেশ কয়েকটি অংশ বলতে গেলে আগাগোড়াই ঢেলে সাজা দরকার, অপর কয়েকটি অংশের পক্ষে দরকার কিছুটা বড় রকমের লিখনশৈলীগত সম্পাদনাসাধন এবং এছাড়া আরও কয়েকটি অংশের পক্ষে দরকার জায়গায়-জায়গায় অনবধানজনিত ত্রুটিবিচ্যুতির মনোযোগী সংশোধন। কিন্তু তখন এ-কাজের জন্যে হাতে যথেষ্ট সময় ছিল না। কারণ, অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকার সময় কেবলমাত্র ১৮৭১ সালের শরৎকালেই আমি জানতে পারলাম যে সংস্করণটি পুরো বিক্রি হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে।

জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক মহলগুলিতে 'পংজি' বইখানি এত দ্রুত যে-প্রশংসা কুড়িয়েছে তা-ই আমি আমার কাজের সবসেরা পুরস্কার বলে মনে করি। ভিয়েনার জনেক কারখানা-মালিক হের মেয়ার অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে যিনি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরই অংশীদার — তিনিও ফ্রাঙ্কো-জার্মান

যুদ্ধের (৮) সময় একখানি পুস্তিকা (৯) প্রকাশ করে তাতে সঠিকভাবেই বলেছেন যে তত্ত্বব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে-বিপুল ক্ষমতা একদা জার্মানদের উত্তরাধিকারসূত্রে-প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে মনে করা হোত তা প্রায় সম্পূর্ণতই জার্মানির তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে থেকে লোপ পেয়ে গেছে, অথচ বিপরীতপক্ষে জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই বিশেষ ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন।

বর্তমান মুহূর্তে জার্মানিতে অর্থশাস্ত্র এক বিদেশী বিজ্ঞানশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুস্টাভ ফন গ্যুলিখ তাঁর 'বাণিজ্য, শিল্প, ইত্যাদির ঐতিহাসিক বিবরণ'* নামের গ্রন্থে, বিশেষ করে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথম দুটি খণ্ডে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন জার্মানিতে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশকে ও ফলত সেদেশে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের গতি-প্রকৃতিকে ব্যাহত করেছে কোন ধরনের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। সুতরাং যে-মাটিতে অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে তারই অভাব দেখা দিয়েছে সেখানে। এরই ফলে এই 'বিজ্ঞান'কে আমদানি করতে হয়েছে একেবারে তৈরি মাল হিসেবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে, আর এই শাস্ত্রের জার্মান অধ্যাপকেরা থেকে গেছেন স্কুলের ছাত্র হয়ে। ফলত তাঁদের হাতে পড়ে বিদেশের বাস্তবতার এই তত্ত্বগত প্রকাশ পরিণত হয়েছে বদ্ধমূল, অনড় কতগুলি ধ্যানধারণার সমষ্টিতে, আর এগুলির ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়ে থাকেন তাঁদের চারপাশের ছোটখাট ব্যাবসার জগতের ধ্যানধারণা ও পরিভাষা অনুযায়ী। অর্থাৎ, তাঁরা আগাগোড়াই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। পুরোপুরি যা চেপে রাখা যায় না বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে এমন একটা অক্ষমতা-বোধ এবং সত্যিসত্যিই তাঁদের পক্ষে পরক এমন একটি বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হওয়ায় তাঁরা যে বিবেক-দংশন অনুভব করেন তা ঢেকে রাখতে খানিকটা প্রয়াস পান তাঁরা হয় সাহিত্য ও ইতিহাস-সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যের ফুলঝুরি ছুটিয়ে আর নয়তো তথাকথিত 'কামেরাল' (জার্মান আইনসভা কিংবা প্রশাসকদের একদা-প্রবর্তিত বাণিজ্য-অভিমুখ অর্থনৈতিক নীতিসমূহ-সংক্রান্ত — অনু.) বিজ্ঞানসমূহ থেকে ধার-করা একান্ত পরক নীতিগুলির ভেজাল মিশিয়ে, ভাসাভাসা জ্ঞানের খিচুড়ি

* 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus', & c., von Gustav von Gülich. 5 vols, Jena. 1830-45..

বানিয়ে। আর জার্মান আমলাতন্ত্রের পদপ্রার্থী অসহায় উমেদারদের এই যন্ত্রণাভোগের নরক পার হয়ে যেতে হয়।

১৮৪৮ সাল থেকে পংজিতন্ত্রী উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে জার্মানিতে এবং বর্তমানে তা ফটকাবাজি ও জুয়াচুরিতে পুরোপুরি জাঁকিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের পেশাদার অর্থনীতিবিদদের পক্ষে ভাগ্য এখনও প্রসন্ন নয়। অর্থশাস্ত্র নিয়ে সরাসরি আলোচনা করার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন যখন তাঁরা, তখন জার্মানিতে আধুনিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। আর যখন সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল তখন তা গড়ে উঠল এমন ঘটনাচক্রে যা বুর্জোয়া জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে সেই পরিস্থিতির সত্যিকার ও পক্ষপাতহীন পর্যালোচনা অসম্ভব করে তুলল। যেক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ওই বুর্জোয়া সমাজ-জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকছে, অর্থাৎ যেক্ষেত্রে পংজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সাময়িক একটি ঐতিহাসিক পর্যায় হিসেবে না-দেখে তাকে দেখা হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনের একেবারে চূড়ান্ত এক ব্যবস্থা হিসেবে, সেক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম হয় প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকছে আর নয়তো তা আত্মপ্রকাশ করছে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার আকারে — ততক্ষণ, একমাত্র ততক্ষণই ওই অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে সমর্থ।

যেমন, ইংলণ্ডের কথা ধরা যাক। ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্র হল সেই যুগের বিজ্ঞান যখন সেদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম অ-বিকশিত অবস্থায় ছিল। ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের শেষ মহৎ প্রতিনিধি রিকার্ডো শেষপর্যন্ত তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানের সূচনা-বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেন শ্রেণী-স্বার্থসমূহের পরস্পর-বিরোধকে, মজুরি ও মুনাফা, মুনাফা ও জমির খাজনার মধ্যেকার পরস্পর-বিরোধকে, এই পরস্পর-বিরোধকে সরল মনে প্রকৃতিদত্ত একটি সামাজিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়ে। কিন্তু এই সূচনার সমকালেই বুর্জোয়া অর্থনীতির বিজ্ঞান সেই সীমায় পেঁছে গিয়েছিল, যে-সীমা অতিক্রমের সাধ্য ছিল না তার। রিকার্ডোর জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওই বিজ্ঞানের সমালোচনা শুরু হয় সিসমন্দির* রচনা দিয়ে।

* আমার 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', বার্লিন, ১৮৫৯'এর সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

এর পরবর্তী পর্যায়, ১৮২০ থেকে ১৮৩০ সাল, ইংলণ্ডে স্মরণযোগ্য অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে। ওই সময়টা আবার রিকার্ডোর তত্ত্বের অতি-সরলীকরণ ও প্রসারণ এবং সেইসঙ্গে প্রাচীন ধারার সঙ্গে ওই তত্ত্বের প্রতিযোগিতা চলার জন্যেও স্মর্তব্য। এ-নিয়ে চমৎকার সব দ্বন্দ্বযুদ্ধও চলে তখন। এ-ব্যাপারে তখন কী কাণ্ড ঘটেছিল মূল ইউরোপ ভূখণ্ডে সাধারণভাবে তার সামান্যই জানা আছে, কেননা ওইসব তর্কবিতর্কের প্রায় সবটুকুই ছড়িয়ে আছে পত্র-পত্রিকা, সাময়িক সাহিত্য ও পুস্তিকায় খুচরো প্রবন্ধের আকারে। যদিও রিকার্ডোর তত্ত্ব, অবশ্য কোনো-কোনো বিরল ক্ষেত্রে, তখনই বুর্জোয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগছিল, তবু এইসব তর্কবিতর্কের পক্ষপাতিত্বশূন্য চরিত্রের ব্যাখ্যা মেলে সে-সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। একদিকে তখন আধুনিক শিল্প নিজেই তার শৈশবাবস্থা থেকে সদ্য উত্তীর্ণ হচ্ছিল — এর প্রমাণ মেলে এই ঘটনাটি থেকে যে ১৮২৫ সালে সংকটের আবির্ভাবের সঙ্গে সেই প্রথম ঘটল শিল্পের আধুনিক জীবনের পর্যায়ক্রমিক চক্রের সূচনা। অন্যদিকে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামকে পেছনে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল তখন — রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে বিভিন্ন গভর্নমেণ্ট ও 'পবিত্র মৈত্রীজোট'-এর (১০) চারপাশে জড়-হওয়া সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী ও সরকারগুলি এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনসমষ্টির মধ্যে বিরোধের কারণে; আর অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্প-পুঁজি ও সামন্ততান্ত্রিক ভূ-সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে বিবাদের কারণে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এই শেষোক্ত বিবাদ ফ্রান্সে ছোট ও বড় ভূ-সম্পত্তির স্বার্থের মধ্যেকার বিরোধের কারণে তখন গুপ্ত অবস্থায় ছিল আর ইংলণ্ডে তা প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইন-পাশের পরে (১১)। ওই সময়কার ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্র-সম্পর্কিত রচনাদি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ফ্রান্সে ডঃ কেনে-র মৃত্যুর পর ঝোড়ো অগ্রগতির কথা, তবে 'সাঁ মার্তাঁর গ্রীষ্ম' যেভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় বসন্তকালের কথা মাত্র সেইভাবে। অতঃপর ১৮৩০ সালে এল সেই নির্ধারক সংকট।

ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিমধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। ফলে অতঃপর ওই দুটি দেশে যেমন কার্যক্ষেত্রে তেমনই তত্ত্বগতভাবেও শ্রেণী-

সংগ্রাম ক্রমশ বেশি-বেশি খোলাখুলি ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছিল ও বিপজ্জনক আকার ধরছিল। বিজ্ঞানসম্মত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্ত্যেষ্টির ঘণ্টা বাজিয়ে দিল তা। অতঃপর প্রশ্নটি আর এইখানে সীমাবদ্ধ রইল না যে অমুক বা তমুক উপপাদ্যটি ঠিক কিনা, তখন প্রশ্ন দাঁড়িয়ে গেল, উপপাদ্য যা-ই হোক তা পুঁজির পক্ষে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর, উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী অথবা অসুবিধাজনক, রাজনৈতিক দিক থেকে বিপজ্জনক অথবা বিপজ্জনক নয় কিনা, তার। স্বার্থলেশহীন তত্ত্বানুসন্ধানীর জায়গায় এবার দেখা দিল ভাড়াটে পেশাদার মল্লযোদ্ধার দল, খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থান নিল কৈফিয়তদাতার বিবেক-দংশন ও দুষ্ট মতলব। তবু, এমনকি শিল্পপতিদ্বয় কব্‌ডেন ও ব্রাইট-পরিচালিত শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী লীগের প্রচারিত জবরদস্তিমূলক যে-পুস্তিকাগুলি বিশ্বদুনিয়া ছেয়ে ফেলছিল সেগুলিরও বৈজ্ঞানিক না-হলেও ঐতিহাসিক কিছুটা মূল্য আছে ভূস্বামী অভিজাতদের বিরুদ্ধে সেগুলির যুক্তিতর্ক খাড়া করার চেষ্টার কারণে। কিন্তু তারপর স্যর রবার্ট পীল-প্রবর্তিত অবাধ বাণিজ্য-সম্পর্কিত আইন অতি-সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রকে তার ওই শেষ নখদন্ত থেকেও বঞ্চিত করল।

১৮৪৮ সালের ইউরোপ-মহাদেশীয় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইংলণ্ডেও। যে-সমস্ত মানুষ তখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অন্বেষায় কিছু-পরিমাণে সামর্থ্যের অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করছিল এবং শাসক শ্রেণীগুলির মোসাহেব ও নিছক কুতার্কিক ছাড়া আরও বড়কিছু বলে নিজেদের প্রমাণ করার বাসনা ছিল যাদের, তারা চেষ্টা করল পুঁজির অনুগত অর্থশাস্ত্রকে প্রলেতারিয়েতের যে-সমস্ত দাবিদাওয়া আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। অতএব দেখা দিল একধরনের অগভীর এক সমন্বয়সাধনের তত্ত্ব, যার সবসেরা প্রতিনিধি হলেন জন স্ট্যুয়ার্ট মিল। এই তত্ত্ব হল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের দেউলিয়াপনার আত্মঘোষণা। এ-সম্বন্ধে মহৎ রুশ পণ্ডিত ও সমালোচক ন. চের্নিশেভস্কি তাঁর 'মিল-এর ব্যাখ্যাত অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা' বইটিতে গভীর মননের আলোকসম্পাত করেছেন।

ফলত, জার্মানিতে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতি পূর্ণ-পরিণত অবস্থায়

পৌঁছয় যখন, ফ্রান্সে ও ইংলন্ডে শ্রেণীসমূহের প্রচন্ড সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ওই পদ্ধতির শত্রুভাবাপন্ন চরিত্রটি তার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং, তদুপরি, ইতিমধ্যে জার্মান প্রলেতারিয়েত জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ শ্রেণী-সচেতনার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। ফলে অবশেষে ঠিক যে-মুহূর্তে অর্থশাস্ত্রের এক বুর্জোয়া বিজ্ঞান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল জার্মানিতে, বাস্তব কারণে তখনই তা অসম্ভব হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকেরা ভাগ হয়ে গেলেন দুটি গোষ্ঠীতে। এর মধ্যে বিচক্ষণ, কেজো, ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন একটি গোষ্ঠী ভিড় জমাল অতি-সরলীকৃত অর্থনীতির সবচেয়ে অগভীর — ও সেই কারণে সবচেয়ে উপযুক্ত — প্রতিনিধি বাস্তিয়ার নেতৃত্বে; আর তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাপক-জনোচিত মর্যাদাবোধে গর্বিত অপর গোষ্ঠীর লোকজন একেবারেই খাপ খাওয়ানো যায় না এমন সমস্ত ব্যাপারকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত জন স্টুয়ার্ট মিলকে অনুসরণ করলেন। ফলে যেমন বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের ধ্রুপদী আমলে তেমনই তার অবক্ষয়ের যুগেও জার্মানরা রয়ে গেলেন নিছক ইশ্‌কুলের ছাত্র হয়ে, অনুকারক ও অনুসারক হিসেবে, বড়-বড় বিদেশী পাইকারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিযুক্ত ছোট-ছোট খুচরো কারবারী ও ফেরিওয়ালার ভূমিকায়।

অতএব জার্মান সমাজের অদ্ভুত ধরনের ঐতিহাসিক বিকাশ সেদেশে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সব রকমের মৌল গবেষণার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, তবে তাই বলে ওই অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা কিন্তু বন্ধ হয় নি। এই সমালোচনা যেক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীর মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করেছে সেক্ষেত্রে এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র সেই শ্রেণীটির, ইতিহাসে যার সুনির্দিষ্ট কর্তব্য হল পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন এবং সর্বপ্রকার শ্রেণীর চরম বিলোপসাধন। সেই বিশেষ শ্রেণী হল প্রলেতারিয়েত।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রবক্তারা প্রথম দিকে চেষ্টা করে বেমালুম চুপ করে থেকে 'পুঁজি'-কে খুন করার, আমার পূর্ববর্তী বইগুলিকে যেভাবে তারা খুন করেছিল ঠিক সেইভাবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে আজকের পরিস্থিতিতে তাদের সেই পুরনো কৌশল আর কাজে লাগছে না, তখন আমার বইখানিকে সমালোচনা করার ভড়ং দেখিয়ে 'বুর্জোয়া

মনকে ঘুম পাড়ানোর' ব্যবস্থাপত্র বাতলাল। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সংবাদপত্রে তারা সম্মুখীন হল নিজেদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের (*Volksstaat* (১২) পত্রিকায় ইয়োসেফ ডিট্‌স্‌গেনের প্রবন্ধগুলি দেখুন), যাদের কাছে (আজও পর্যন্ত) তাদের জবাব দেয়া বাকি আছে।*

১৮৭২ সালের বসন্তকালে পিটার্সবুর্গে 'পঁুজি'র চমৎকার একখানি রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের ৩ হাজার কপি ইতিমধ্যেই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। এর আগে ১৮৭১ সালেই কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ন. জিবের তাঁর 'ডেভিড রিকার্ডোর মূল্য ও পঁুজি-সম্পর্কিত তত্ত্ব' নামের বইয়ে মূল্য, অর্থ ও পঁুজি-সম্পর্কিত আমার তত্ত্বটিকে মূল বক্তব্যের বিচারে স্মিথ ও রিকার্ডোর তত্ত্বগুলির প্রয়োজনীয় পরিণাম বলে উল্লেখ করেন। এই চমৎকার বইখানি পড়ার সময় যে-কোনো পশ্চিম ইউরোপীয়কে যে-ব্যাপারটি বিস্মিত না-করে পারে না তা হল বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক অবস্থানগুলি বোঝার ব্যাপারে গ্রন্থকারের সুস্থিত ও দৃঢ় ধারণাশক্তি।

'পঁুজি' বইয়ে যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে খুব অল্প লোকেই যে তা

---

* জার্মান অতি-সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রের মিষ্টভাষী আধো-আধো বুলি-বলিয়ে প্রবক্তারা আমার বইয়ের রচনাশৈলীতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। 'পঁুজি' বইটির রচনার সাহিত্যগত ত্রুটিবিচ্যুতি আমি নিজে যত তীব্রভাবে অনুভব করেছি এতখানি অনুভব করা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবু উপরোক্ত ওই সমস্ত ভদ্রলোক ও তাদের পাঠকদের উপকার ও উপভোগের জন্যে এ-প্রসঙ্গে আমি একখানি ইংরেজি ও একখানি রুশদেশী সংবাদপত্রের দুটি উল্লেখের কথা বলতে চাই। আমার মতামত সম্পর্কে সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন ইংরেজি *Saturday Review* (১৩) পত্রিকা আমার বইয়ের প্রথম সংস্করণটির প্রকাশনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছে: 'বিষয়টির উপস্থাপনা এমনই যে তা একেবারে নীরস অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকেও এক ধরনের নিজস্ব আকর্ষণে মণ্ডিত করেছে।' আর 'সান-পিতেরবুর্গস্কিয়ে ভিয়েদমোস্তি' (১৪) তার ২০ এপ্রিল, ১৮৭২, সংখ্যায় লিখছে: 'একটি কি দুটি বিশেষ অংশ ব্যতিক্রম হিসেবে বাদ দিলে সাধারণভাবে বিষয়টির উপস্থাপনা সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা, স্বচ্ছতা এবং আলোচ্য বিষয়ের বৈজ্ঞানিক জটিলতা সত্ত্বেও অসামান্য প্রাণবন্ত গুণের বিচারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই দিক থেকে গ্রন্থকার কোনো অংশেই... অধিকাংশ জার্মান পণ্ডিতের মতো নন... যাঁরা এমন এক নীরস ও দুর্বোধ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে থাকেন যে তার ঘায়ে সাধারণ নশ্বর মানুষের মাথা চৌচির হবার উপক্রম হয়।'

বুঝেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই পদ্ধতি সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী নানা ধ্যানধারণার প্রকাশ থেকে।

যেমন, প্যারিসের *Revue Positiviste* (১৫) আমাকে তিরস্কার করেছে এই বলে যে একদিকে আমি অর্থশাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করেছি অধিবিদ্যার বিচারের ধরনে, আবার অন্যদিকে (ভাবুন একবার!) ভবিষ্যতের ভোজনালয়গুলির জন্যে রন্ধনপ্রণালী (সে কি কোঁতীয় প্রণালীর একটি?) না বাতলে আমি কিনা নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি বাস্তব ঘটনাবলীর নিছক সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে। পূর্বোক্ত ওই অধিবিদ্যা-সংক্রান্ত অভিযোগের জবাবে অধ্যাপক জিবেরের বক্তব্য হল এই:

'আসল তত্ত্ব নিয়ে বইটিতে যেখানে আলোচনা রয়েছে সেখানে মার্কসের পদ্ধতি সমগ্র ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের ধারার অবরোহী পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়, আর ওই ধারার বৈশিষ্ট্য এই যে তার দুর্বলতা ও সবলতাগুলি সবসেরা তাত্ত্বিক অর্থশাস্ত্রীদের সাধারণ একটি ধর্ম।' (১৬)

মরিস ব্লক (তাঁর লেখা 'Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne. Extrait du 'Journal des Économistes', Juillet et Août 1872' দেখুন) আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে আমার লেখা নাকি বিশ্লেষণধর্মী এবং বলছেন:

'এই বইখানি শ্রীযুক্ত মার্কসকে সবচেয়ে বিশিষ্ট বিশ্লেষণধর্মী মননশক্তির অধিকারীদের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করেছে।'

জার্মান পত্র-পত্রিকাগুলি অবশ্য 'হেগেলীয় কূটতর্কের অবতারণা' বলে হৈ-হল্লা জুড়েছে। সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের 'ভেস্ত্নিক ইয়েভ্রোপি' পত্রিকা (১৭) 'পুঁজি' বইটির শুধু উপস্থাপনার পদ্ধতি নিয়েই লেখা একটি প্রবন্ধে (১৮৭২ সালের মে-সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪২৭ থেকে ৪৩৬)* বলেছে যে আমার তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতি কঠোরভাবে বাস্তববাদসম্মত, তবে দুঃখের কথা এই যে আমার বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার পদ্ধতি জার্মান দ্বন্দ্বতত্ত্বভিত্তিক। পত্রিকাটি বলছে:

---

* ই. ই. কাউফমান লিখিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ এটি।—সম্পাঃ

'প্রথম দৃষ্টিতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার বাহ্য রূপের ওপর ভিত্তি করে বিচার করতে বসলে বলতে হয় যে মার্কস হলেন ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যেও সবচেয়ে ভাববাদী এবং তা সর্বদাই 'জার্মান' — অর্থাৎ কথাটির খারাপ — অর্থে। অথচ তথ্যের বিচারে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমালোচনার ব্যাপারে, তিনি তাঁর সকল পূর্বসূরীর চেয়ে বহুগুণে বেশি বাস্তববাদী। কোনো অর্থেই তাঁকে ভাববাদী বলা যায় না।'

এই প্রবন্ধ-লেখকের সমালোচনার প্রত্যুত্তর সবচেয়ে ভালোভাবে দেয়া যায় তাঁর নিজেরই প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে। রুশ ভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধটি যাঁদের পক্ষে পড়া সম্ভব নয় সেরকম কিছু-কিছু পাঠকের সুবিধার্থে আমি এখানে প্রবন্ধটির সেই অংশগুলি উদ্ধৃত করছি।

১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত আমার 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (বার্লিন, ১৮৫৯, পৃষ্ঠা ৪-৭)* বইটির মুখবন্ধ-অংশে যেখানে আমি আমার অবলম্বিত পদ্ধতির বস্তুবাদী ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি সেখান থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে প্রবন্ধ-লেখক বলছেন:

'একটিমাত্র বিষয় মার্কসের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল তিনি যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত সেই ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপারসমূহের নিয়ন্ত্রক নিয়মটি খুঁজে বের করা। এবং সুনির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক যুগপর্বে যেক্ষেত্রে ওই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহের সুনির্দিষ্ট একেকটি মূর্তরূপ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সেই ব্যাপারসমূহকে যা পরিচালনা করে একমাত্র সেই নিয়মটিই যে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়; তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্বের ব্যাপার হল ওই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহের অবিরাম পরিবর্তনের, তাদের বিকাশের — অর্থাৎ একটি মূর্তরূপ থেকে অপর একটি মূর্তরূপে, একটি পর্যায়ের সম্পর্কসূত্রসমূহ থেকে অপর একটি পর্যায়ের সম্পর্কসূত্রসমূহে উত্তরণের নিয়ম। এই নিয়মটি আবিষ্কারের পর তিনি বিশদভাবে অনুসন্ধান করেছেন সামাজিক জীবনে যে-সমস্ত ফলাফলের মধ্যে দিয়ে নিয়মটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেগুলি। ফলত, মার্কস কেবলমাত্র মনোযোগ দিয়েছেন একটি ব্যাপারে: তা হল, কড়াকড়িভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে সামাজিক সম্পর্কের ধারাবাহিক নির্ধারিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা এবং যতদূর-সম্ভব নিরপেক্ষভাবে সেই তথ্যগুলির প্রতিষ্ঠা করা মৌল সূচনা-বিন্দু হিসেবে যে-সমস্ত তথ্য তাঁর কাজে লেগেছে। এ-উদ্দেশ্যে যদি তিনি এটা প্রমাণ করেন তাহলেই যথেষ্ট হয় যে ব্যাপারসমূহের বর্তমান ব্যবস্থা এবং অপর একটি ব্যবস্থা যাতে ওই প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটি অবশ্যম্ভাবীরূপে উত্তীর্ণ

* বর্তমান সংস্করণের চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪৩ দেখুন। — সম্পাঃ

হবে — একই সঙ্গে এই দুটিরই প্রয়োজনীয়তা; আর মানুষ এ-ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক বা না-করুক, এ-ব্যাপারে তারা সচেতন হোক বা না-হোক, সব সত্ত্বেও এটা ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতাকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেছেন মার্কস, যা নাকি পরিচালিত হয় এমন সব নিয়ম-অনুসারে যে-নিয়মগুলি শুধু-যে মানবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি-নিরপেক্ষ তাই নয়, বরং উলটো — সেগুলিই নির্ধারণ করে মানুষের ইচ্ছা, চেতনা আর বুদ্ধিবৃত্তিকে।... সভ্যতার ইতিহাসে মানব-চৈতন্যের উপাদানটি যদি এতই পরনির্ভরশীল ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে এটা স্বতই স্পষ্ট যে সভ্যতার ইতিহাস যার বিষয়বস্তু এমন সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসেবে যে-কোনো ধরনের সচেতনা অথবা ওই সচেতনার যে-কোনো ফলাফল গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে-কোনো ব্যাপারের চেয়ে কম। এর অর্থ, মানুষের ধ্যানধারণা নয়, বস্তুগত ব্যাপারস্যাপারই একমাত্র ওই তত্ত্বানুসন্ধানের সূচনা-বিন্দু হিসেবে কাজ করতে পারে। এমন একটি অনুসন্ধান-কার্যকে নিবদ্ধ থাকতে হবে একটি তথ্যের সঙ্গে মানবিক ধ্যানধারণার নয়, বরং অপর একটি তথ্যের মুখোমুখি সংঘর্ষ ও প্রতিতুলনার ব্যাপারে। এই অনুসন্ধানের কাজে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে উপরোক্ত ওই দুটি তথ্যকেই যতদূর-সম্ভব নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে আসলে ওই দুটি তথ্যই, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে, একটি ক্রমবিবর্তনের ধারায় গতিবেগের ভিন্ন-ভিন্ন উৎস মাত্র। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল পরম্পর্যের ধারাটির কঠোর বিশ্লেষণ, যে-সমস্ত অনুক্রম ও গ্রন্থনার মধ্যে দিয়ে এমন একটি ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের উপস্থাপনা প্রকাশ পায় সেগুলির কঠোর পর্যালোচনা। কিন্তু কেউ হয়তো বলবেন, অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ নিয়মগুলিকে বর্তমানে অথবা অতীতকালে যখনই প্রয়োগ করা হোক-না কেন সেগুলি সর্বদাই তো এক ও অভিন্ন থাকবে। মার্কস কিন্তু এরকম মত সরাসরি প্রত্যাখান করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এ-ধরনের বিমূর্ত নিয়মাবলীর অস্তিত্ব নেই।... বরং উলটো। তাঁর মতে, প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগপর্বের আছে নিজস্ব নিয়মকানুন।... যখনই কোনো সমাজ তার বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটি অতিক্রম করে একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে অপর একটি নির্দিষ্ট স্তরে উত্তীর্ণ হতে থাকে, তখনই তা অপরাপর নিয়মকানুনের অধীন হতে শুরু করে। এক কথায়, অর্থনৈতিক জীবন আমাদের এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন করে যা জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সদৃশ। প্রাক্তন অর্থনীতিবিদরা যখন অর্থনীতির নিয়মকানুনকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নিয়মকানুনের সঙ্গে তুলনা করেন তখন অর্থনীতির নিয়মকানুনের প্রকৃতিকে ভুল বোঝেন তাঁরা। সামাজিক ব্যাপারস্যাপারের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে সমাজদেহগুলি উদ্ভিদ ও জীবজন্তুদের মতোই মূলগতভাবে একে অপরের থেকে পৃথক। শুধু তা-ই নয়। এক এবং অভিন্ন একটি ব্যাপারও সমগ্রভাবে ওই সমস্ত সমাজদেহের ভিন্ন-ভিন্ন কাঠামো,

তাদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সংগঠনগুলির মধ্যেকার ভিন্নতা, এই সমস্ত সংগঠন যেসব পরিস্থিতিতে কাজ করে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য, ইত্যাদির ফলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নানা নিয়মকানুনের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি-সম্পর্কিত নিয়মটি যে সকল যুগে ও সকল জায়গায় এক, এই তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যান করেন মার্কস। এর বিপরীতে তিনি বলেন যে সমাজ-বিকাশের প্রতিটি স্তরের নিজস্ব জনসংখ্যাবৃদ্ধি-সম্পর্কিত নিয়ম আছে।... উৎপাদন-শক্তির বিকাশের মাত্রায় তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতিসমূহ এবং ওই পরিস্থিতিসমূহের নিয়ন্ত্রক আইনকানুনেও তারতম্য ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঁজির প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি অনুসরণ ও তা ব্যাখ্যার কাজটি হাতে নিয়ে মার্কস যা করেছেন তা হল কড়াকড়িভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি কেবলমাত্র সূত্রবদ্ধ করে চলেছেন সেই লক্ষ্যটিই যেটি অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি যথাযথ অনুসন্ধানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।... এমন এক অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক মূল্য নিহিত একটি নির্দিষ্ট সমাজদেহের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, বিকাশ ও তার মৃত্যু এবং অপর একটি উন্নততর সমাজদেহের প্রথমোক্ত ওই সমাজদেহের স্থান অধিকার করার ব্যাপারগুলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যে বিশেষ নিয়মকানুনগুলি সেগুলির উদ্ঘাটনে। আর সত্যি কথা বলতে কি, মার্কসের এই বইখানি ঠিক সেই মূল্যেরই অধিকারী।'

কিন্তু এই প্রবন্ধ-লেখক আমার আসল পদ্ধতি বলে এমনতরো লক্ষণীয় ও (সেই পদ্ধতি আমার নিজস্ব ধরনে প্রয়োগ সম্বন্ধে) উদারভাবে যা পরিবেশন করছেন তা আসলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ছাড়া আর কী?

অবশ্য উপস্থাপনার পদ্ধতিকে চেহারার দিক থেকে অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে পৃথক হতেই হবে। অনুসন্ধানের সময় আত্মসাৎ করতে হবে বিশদভাবে নির্দিষ্ট উপাদানটিকে, এই উপাদানের বিকাশের বিভিন্ন ধরনকে বিশ্লেষণ করতে হবে, এই ধরনগুলির মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ সংযোগসূত্রকে বের করতে হবে খুঁজে-পেতে। একমাত্র এই কাজটি চুকলে পর তবেই সত্যিকার গতিবেগকে পর্যাপ্তভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হবে। আর এই কাজটি সফলভাবে করতে পারলে, আলোচ্য বিষয়ের জীবনটিকে আয়নায় প্রতিফলনের মতো করে একেবারে আদর্শ-অনুযায়ী উপস্থাপিত করতে পারলে, তবে মনে হতে পারে যে আমাদের সামনে অবরোহী পদ্ধতি-অনুযায়ী নির্মাণের নিছক একটি কাঠামো দেখতে পাচ্ছি।

আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি কেবল-যে হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে পৃথক তা-ই নয়, একেবারে সরাসরি তার বিপরীতও। হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী, মানব-

মস্তিষ্কের জীবন-প্রক্রিয়াকে, অর্থাৎ মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়াকে, 'ধ্যানধারণা' নাম দিয়ে তাকে এমনকি রূপান্তরিত করা হয়েছে অনন্যনির্ভর স্বাধীন একটি বিষয়ে; এ-তত্ত্বে 'ধ্যানধারণা'ই হল বস্তু-জগতের সৃষ্টিকর্তা, আর বস্তু-জগৎ 'ধ্যানধারণা'র বাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর আকারমাত্র। কিন্তু আমার কাছে এর বিপরীতে ধ্যানধারণা মানুষের মনে প্রতিফলিত ও চিন্তার অবয়বে রূপান্তরিত বস্তু-জগৎ ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই অতীন্দ্রিয় দিকটির আমি সমালোচনা করি। তখনও এই তত্ত্বটি ছিল ফ্যাশনদুরস্ত। কিন্তু পরে যখন আমি 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডটি লেখার কাজে ব্যস্ত তখন, সংস্কৃতিমান জার্মানিতে এখন যারা লম্বা-লম্বা কথা আওড়াচ্ছে সেই খামখেয়ালী, উদ্ধত ও মাঝারিদরের 'এপিগোনদের'* (১৮), শখ হল হেগেলের প্রতি সেইরকম আচরণ করার লেসিং-এর আমলে দুঃসাহসী মোজেস মেণ্ডেলসন যেমন আচরণ করেছিলেন স্পিনোজার প্রতি — অর্থাৎ, তাঁকে 'মৃত' বলে গণ্য করা। সে-কারণে নিজেকে আমি ওই বিপুল শক্তিধর চিন্তাবিদের শিষ্য বলে খোলাখুলি ঘোষণা করেছি এবং এমনকি এখানে-সেখানে, যেমন মূল্যের তত্ত্ব-সম্পর্কিত অধ্যায়ে, হেগেলের নিজস্ব বাক্ভঙ্গি ব্যবহারের নকলিয়ানার খেলা করেছি পর্যন্ত। হেগেলের হাতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়তায় মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তা কোনোপ্রকারেই তাঁর পক্ষে পূর্ণাঙ্গরূপে ও সচেতনভাবে ওই তত্ত্বের সাধারণ কার্যকর রূপের প্রথম উপস্থাপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তবে তিনি এই তত্ত্বটিকে এর মাথা নিচের দিকে করে দাঁড় করিয়েছেন এইমাত্র। কিন্তু যদি এর অতীন্দ্রিয়বাদী খোলসের ভেতরকার যুক্তিবাদী শাঁসটুকুকে আবিষ্কার করা যায় তাহলে একে আবার মাথা ওপর দিক করে খাড়াভাবে দাঁড় করানো সম্ভব।

অতীন্দ্রিয়বাদের আকারে দ্বন্দ্বতত্ত্ব জার্মানিতে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ লোকের ধারণা হয় যে তত্ত্বটি বুঝি সমাজের চলতি অবস্থাকে মর্যাদা ও মহিমা দান করছে। তবে এর যুক্তিবাদী আকারে বুর্জোয়াকুল ও তার অন্ধ তাত্ত্বিক অধ্যাপকদের কাছে এ-তত্ত্ব আবার কলঙ্কজনক ও ঘৃণ্য বলে গণ্য,

* এপিগোন — পরবর্তী ও অপেক্ষাকৃত কম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পুরুষ। — অনু.

কারণ তাতে যেমন সমাজের চলতি অবস্থা ইত্যাদির উপলব্ধি ও তার অস্ত্যর্থক স্বীকৃতি অঙ্গীভূত, তেমনই ওই একই সঙ্গে ওই অবস্থাদির নিরাকরণ ও তার অবশ্যম্ভাবী অবসানের স্বীকৃতিও বিধৃত; কারণ এ-তত্ত্ব ঐতিহাসিক দিক থেকে বিকশিত প্রতিটি সমাজদেহকে যেন তা প্রবহমান গতির মধ্যে আছে বলে গণ্য করে এবং সে-কারণে তার অস্থায়ী প্রকৃতিকে তার ক্ষণিক অস্তিত্বের চেয়ে কম করে হিসাবের মধ্যে ধরে না; কারণ এ-তত্ত্ব কোনোকিছুকে এর ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয় না এবং মূলত এটি একটি সমালোচনামূলক ও বিপ্লবী তত্ত্ব।

পুঁজিতন্ত্রী সমাজের গতিপথে নিহিত পরস্পর-বিরোধগুলি বাস্তববাদী বুর্জোয়ার মনে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে ছাপ ফেলে পর্যায়ক্রমিক চক্রের পরিবর্তনগুলি দিয়ে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে দিয়েই আধুনিক শিল্পের জীবন কাটে এবং সেগুলির শীর্ষদেশে থাকে বিশ্বজনীন সংকট। এই সংকট ফের একবার ঘনিয়ে উঠছে, যদিও এখনও পর্যন্ত এটি আছে একেবারে প্রাথমিক স্তরে; আর যথাসময়ে এর কর্মক্ষেত্রের বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তি ও ক্রিয়াকলাপের তীব্রতা দিয়ে এই সংকট এমনকি নবোদ্ভূত, পবিত্র প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যের ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা ভুঁইফোড়দের মগজে পর্যন্ত দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রলয়বাদ্য বাজিয়ে দেবে।

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৩

প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত
হয় বইয়ে: K. Marx.
'Das Kapital. Kritik
der politischen Oekonomie'.
Erster Band. Zweite
verbesserte Auflage
Hamburg, 1872

প্রবন্ধটি প্রকাশিত
হয়েছে ১৮৯০ সালের
চতুর্থ জার্মান সংস্করণের
পাঠ অনুযায়ী

এঙ্গেলসের সম্পাদনা

কার্ল মার্ক্স

পুঁজি

চতুর্বিংশ অধ্যায়

তথাকথিত আদিম সঞ্চয়

১। আদিম সঞ্চয়ের রহস্য

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি অর্থ কীভাবে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, পুঁজির সাহায্যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় কীভাবে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে তৈরি হয় আরও পুঁজি। আবার পুঁজির সঞ্চয় পূর্বাহ্নেই ধরে নেয় উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্ভাবনা, উদ্বৃত্ত মূল্য ধরে নেয় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের উপস্থিতি এবং পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পূর্বাহ্নেই ধরে নেয় পণ্য-উৎপাদনকারীদের হাতে প্রচুর পরিমাণ পুঁজি ও শ্রমশক্তির অস্তিত্ব। অতএব এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি দুষ্টচক্রের নিয়ত-আবর্তন বলে মনে হয়, যা থেকে আমরা প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারি একমাত্র পুঁজিতন্ত্রী সঞ্চয় শুরু হওয়ার পূর্বে এক আদিম সঞ্চয়ের (আডাম স্মিথের ভাষায় 'previous accumulation'এর) অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়ে। এই আদিম সঞ্চয় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির ফল নয়, তার সূচনার শর্তমাত্র।

অর্থশাস্ত্রে এই আদিম সঞ্চয়ের ভূমিকা প্রায় ধর্মশাস্ত্রে-বর্ণিত আদি পাপের মতোই। আদম আপেল খাওয়ার ফলে মানবজাতি পাপে পতিত হয়। আদিকালের ওই উপাখ্যানের ধাঁচেই এখন চলতিকালের এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে সুদূর অতীতে পৃথিবীতে ছিল দু'ধরনের লোক: এক ধরনের লোক ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, এবং সবচেয়ে বেশি করে যা উল্লেখ্য তা হল, এরা ছিল মিতব্যয়ী; অপর দিকে অন্য এক-ধরনের লোক ছিল, যারা ছিল অলস বদমায়েশ, অর্থসম্পদ উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিত যারা এবং বিশেষ করে হৈ-হল্লা ও স্ফূর্তি করে অর্থের অপচয় ঘটাত যারা। ধর্মশাস্ত্রে-বর্ণিত আদি পাপের উপাখ্যান থেকে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারি

কীভাবে অভিশপ্ত মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার মুখের গ্রাস যোগাড় করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু অর্থনৈতিক আদি পাপের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারছি যে এমন কিছু লোক আছে যাদের পক্ষে কোনোমতেই অপরিহার্য নয় এটা। তবে একথা থাক, এতে কিছু এসে-যায় না। আসলে এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে উপরোক্ত প্রথম ধরনের লোক সম্পদ সঞ্চয় করল এবং শেষোক্ত ধরনের লোকের অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তাদের নিজেদের গায়ের চামড়া ছাড়া বিক্রি করার মতো আর-কিছু রইল না। আর এই আদি পাপ থেকেই শুরু হল মানুষের বিপুল এক সংখ্যাধিকের দারিদ্র্য, যে-বিপুল সংখ্যক মানুষ সব রকমের পরিশ্রমে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একমাত্র নিজেকে ছাড়া বিক্রি করার মতো আর কোনো বস্তুর মালিক নয়; অপরদিকে গড়ে উঠল অল্পকিছু লোকের বিপুল ঐশ্বর্য, এই সমস্ত লোক দীর্ঘকাল ধরে কাজ করা বন্ধ করে দিলেও এদের এই ঐশ্বর্যের পরিমাণ বেড়ে চলল অনবরত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সপক্ষে এই ধরনের আজগবি বালভাষণ দিনের-পর-দিন শোনানো হচ্ছে আমাদের। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, একদা যাঁরা অমন spirituel* ছিলেন সেই ফরাসি জনসাধারণের কাছে মঁসিয়ে তিয়ের রীতিমতো কূটনীতিবিদের গাম্ভীর্য নিয়ে এই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করার মতো দুঃসাহস রাখেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে সম্পত্তির প্রশ্নটি ওঠে সেই মুহূর্তে সকল যুগের এবং সমাজ-বিকাশের সকল স্তরের পক্ষে একমাত্র উপযোগী মানসিক আহার হিসেবে শিশুপাঠ্য এই তত্ত্বকথাটি ঘোষণা করা হয় উচ্চকণ্ঠে। অথচ বাস্তব ইতিহাসে আগ্রাসন, দাসত্ব কায়েম, দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, সংক্ষেপে বলতে গেলে বলপ্রয়োগই যে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ এ তো কুখ্যাত সত্য। অনাদি কাল থেকেই অর্থশাস্ত্রের সূক্ষ্ম, সুরুচিপূর্ণ বিবরণীগুলিতে রাখালিয়া নির্দোষ সারল্যের সুরটি প্রধান স্থান নিয়ে আছে। এইসব বর্ষ-বিবরণীর সমকালীন বছরটিকে অবশ্যই সর্বদা বাদ দিয়ে চিরকাল বলা হয়ে আসছে যে সম্পদ-সঞ্চয়ের একমাত্র উপায় হল অধিকার ও 'শ্রম'। অথচ সত্যি বলতে কি, আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি আর যা-ই হোক মোটেই তা রাখালিয়া নির্দোষ সারল্যের নিদর্শন নয়।

---

* মার্জিত রুচি, শোভনতা, অথবা সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। — সম্পাঃ

আপনা থেকে অর্থ এবং পণ্যসমূহ যতখানি উৎপাদনের উপায় এবং জীবনধারণের উপায় তার থেকে বেশি করে সেগুলিকে পুঁজি হিসেবে গণ্য করা চলে না। আসলে সেগুলি পুঁজিতে রূপান্তরিত হবার জন্যে অপেক্ষমান। কিন্তু এই রূপান্তরণ-প্রক্রিয়া সম্ভব হয়ে উঠতে পারে একমাত্র বিশেষ কিছু-কিছু পরিস্থিতিতে যার ভিত্তি হয় এই ঘটনাটি — অর্থাৎ, রীতিমতো বিভিন্ন দুটি ধরনের পণ্যের অধিকারী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় ও পরস্পর-সংস্পর্শে আসে। এদের মধ্যে একপক্ষ হল অর্থ, উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারণের উপায়ের মালিক, যারা তাদের মালিকানাধীন মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে উৎসুক হয়ে ওঠে অন্য লোকের শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে; এছাড়া অন্যপক্ষ হল স্বাধীন শ্রমিককুল, যারা নিজ-নিজ শ্রমশক্তি ও ফলত শ্রমের বিক্রেতা। এই শ্রমিকেরা হল দুই অর্থেই স্বাধীন, কেননা একদিকে যেমন তারা ক্রীতদাস, মুচলেকাবদ্ধ দাস ইত্যাদির মতো উৎপাদনের উপায়ের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয় না, তেমনই ভূমিস্বত্বভোগী কৃষকদের মতো উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানাও থাকে না তাদের হাতে। ফলত তারা হয় উৎপাদনের যে-কোনো রকমের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন এবং এই সমস্ত উপায়-সম্পর্কিত দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত। পণ্যসমূহ বিক্রির বাজারের এই দ্বি-মেরুবর্তিতায় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের মূলগত শর্তগুলি নিহিত। সর্বপ্রকার সম্পত্তি, যাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে শ্রমিকেরা তাদের শ্রমকে কাজে লাগাতে পারে, তেমন সবকিছু থেকে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাই হল পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার একটি পূর্বশর্ত। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন যে-মুহূর্তে একবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই মুহূর্ত থেকে তা যে এই বিচ্ছিন্নতাকে কেবল বজায় রেখে চলতে থাকে তা-ই নয়, ক্রমাগত ব্যাপক হারে তা বাড়িয়েও চলে। অতএব যে-প্রক্রিয়া পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করে দেয় তা শ্রমিকের কাছ থেকে তার উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ছিনিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্যকিছু হতে পারে না। এ হল সেই প্রক্রিয়া যা একদিকে জীবনধারণের উপায় ও সামাজিক উৎপাদনের উপায়কে রূপান্তরিত করে পুঁজিতে, অন্যদিকে সাক্ষাৎ উৎপাদনকারীদের পরিণত করে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে। অতএব তথাকথিত আদিম সঞ্চয় উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার এক ঐতিহাসিক

প্রক্রিয়া ভিন্ন অপর কিছু নয়। এই সঞ্চয়কে 'আদিম' বলা চলে এইজন্যে যে এ হয়ে দাঁড়ায় পংজির এবং তার আনুষঙ্গিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রাগৈতিহাসিক একটি স্তর।

পংজিতন্ত্রী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উপরোক্ত পরবর্তী সমাজ-কাঠামোর ভাঙনের ফলে মুক্তি পেয়েছে পূর্ববর্তী কাঠামোর উপাদানগুলি।

সাক্ষাৎ উৎপাদক বা শ্রমিক একমাত্র জমির সঙ্গে সংযুক্তি থেকে ছাড়া পাওয়ার এবং অন্যের ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব অথবা মুচলেকাবদ্ধ দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই নিজের একটা বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করতে পারে। যেখানেই বাজার পাওয়া যায় সেখানেই নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়ার অধিকারী শ্রমশক্তির স্বাধীন বিক্রেতা বনে যেতে হলে শ্রমিকের পক্ষে অবশ্যই এছাড়া দরকার পড়ে গিল্ডের শাসন, শিষ্য অথবা শিক্ষানবিসদের সম্পর্কে তাদের তৈরি নিয়মকানুন এবং শ্রম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তাদের অন্যান্য বাধা-নিষেধগুলির হাত এড়িয়ে যাওয়া। ফলত, যে-ঐতিহাসিক গতির ফলে উৎপাদনকারীরা মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে পরিণত হয় তা একদিক থেকে ভূমিদাসত্ব ও গিল্ডগুলির শাসন-শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তির সহায় বলে মনে হতে পারে, আর আমাদের বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তাদের কাছে একমাত্র স্বীকৃত সত্য হল ইতিহাসের এই দিকটিই। কিন্তু এর অপর একটি দিকও আছে। তা হল এই যে ওই সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দাস এর ফলে আত্মবিক্রয়কারীতে পরিণত হয় একমাত্র তাদের নিজ-নিজ উৎপাদনের সকল উপায় এবং পূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক বিধি-বন্দোবস্তের ফলে লব্ধ অস্তিত্বরক্ষার সকল প্রকারের নিশ্চয়তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ায়। আর এই ব্যাপারের — সাক্ষাৎ উৎপাদনকারীদের দখলচ্যুতি ও উচ্ছেদের -- ইতিহাস মানব-সমাজের ইতিবৃত্তে লেখা আছে রক্তের ও আগুনের অক্ষরে।

শিল্পের পংজিপতি বা আজকের নতুন অধীশ্বরদের কেবল-যে কারুশিল্প-গিল্ডগুলির পরিচালকদের একদা স্থানচ্যুত করতে হয়েছিল তাই নয়, ঐশ্বর্যের উৎসগুলির অধিপতি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদেরও স্থানচ্যুত করতে হয়েছিল তাদের। এই দিক থেকে পংজিপতিদের সামাজিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিত্ব ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘৃণ্য

নানা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং গিল্ডসমূহ ও উৎপাদনের স্বাধীন বিকাশ ও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবাধ স্বাধীনতার ওপর তারা যে-বিধিনিষেধের শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিল সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত সংগ্রামের ফলাফল বলে মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু শিল্পের বীরব্রতীরা শস্ত্রপাণি বীরব্রতীদের কৌশলে স্থানচ্যুত করতে সমর্থ হয়েছিল কেবলমাত্র যে-সমস্ত ঘটনার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা নিজেরাই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই সমস্ত ঘটনাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে। একদা জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত রোমান ক্রীতদাস যে-উপায় অবলম্বন করে তার পৃষ্ঠপোষকের প্রভুতে পরিণত হয়েছিল, শিল্পের এই বীরব্রতীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক ততখানিই ঘৃণ্য উপায় আশ্রয় করে।

ঘটনা-বিকাশের যে-সূচনাবিন্দু একদা মজুরিনির্ভর-শ্রমিক ও সেইসঙ্গে পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল তা হল শ্রমিকের বশ্যতাস্বীকার। এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল এই বশ্যতাস্বীকারের ধরন পরিবর্তনে, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পুঁজিতন্ত্রী শোষণে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে। এই প্রক্রিয়ার বাস্তব পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে হলে আমাদের খুব বেশি পেছনে তাকানোর দরকার নেই। যদিও পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের প্রথম সূচনার নিদর্শনগুলির সাক্ষাৎ আমরা পাই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কিছু-কিছু শহরে, বিক্ষিপ্তভাবে, সেই সুদূর ১৪শ কিংবা ১৫শ শতকেই, তবু সঠিকভাবে বলতে গেলে পুঁজিতন্ত্রী যুগ শুরু হয় ১৬শ শতকে। আর তখন যেখানেই এই যুগের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানেই দেখা গেছে ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ ঘটে গেছে অনেক আগে এবং মধ্যযুগের উন্নতির সর্বোচ্চ নিদর্শন সার্বভৌম শহরগুলির অস্তিত্বেও ঘুণ ধরে গেছে অনেক আগে থেকেই।

আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের ইতিহাসে যে-সমস্ত বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে কাজ করেছে তা-ই গণ্য হয়েছে যুগ-সৃষ্টিকারী হিসেবে। তবে সবচেয়ে বেশি করে স্মরণ করা হয়ে থাকে সেই মুহূর্তগুলিকে যখন বিপুল সংখ্যক মানুষকে অকস্মাৎ, বলপ্রয়োগে তাদের জীবনধারণের উপায়াদি থেকে উপড়ে নিয়ে শ্রমের বাজারে মুক্ত ও 'অসংসক্ত' প্রলেতারিয়ান হিসেবে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। কৃষককে জমি থেকে উৎখাত ও দখলচ্যুত করাই হল এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির ভিত্তি। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বে-দখল করার এই

ইতিহাস বিভিন্ন ধরনে রূপ-পরিগ্রহ করেছে এবং ভিন্ন-ভিন্ন ক্রমপর্যায়ের দ্বারা অনুসরণ করে ও বিভিন্ন যুগপর্যায়ে তা এই প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন স্তর পার হয়েছে। আমরা যে-দেশটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছি একমাত্র সেই ইংলন্ডেই এই প্রক্রিয়াটি তার ধ্রুপদী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।*

২। জমি থেকে কৃষিজীবী জনসংখ্যার উচ্ছেদসাধন

ইংলন্ডে ভূমিদাস-প্রথা কার্যত লোপ পেয়েছিল ১৪শ শতকের শেষ চতুর্থাংশে। জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অংশ** তখন এবং ১৫শ

---

* পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন যে-দেশে সবচেয়ে আগে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেই ইতালিতে ভূমিদাস-প্রথার অবলোপও ঘটেছিল অন্যান্য দেশের চেয়ে আগে। ওদেশে ভূমিদাস মুক্তি পেয়েছিল জমিতে তার ভোগদখলি-স্বত্বের অধিকার অর্জনের আগেই। ফলত দাসত্ব থেকে তার এই মুক্তি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পরিণত করে স্বাধীন প্রলেতারিয়ানে এবং তদুপরি সে তার নতুন প্রভুকে তার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে দেখে, প্রায় সব ক্ষেত্রে রোমান আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, শহরগুলিতে। কিন্তু ১৫শ শতকের (১৯) শেষাশেষি বিশ্ব-বাজারের বিপ্লব যখন উত্তর ইতালির বাণিজ্যিক প্রাধান্যকে নষ্ট করে দিল, তখন আবার বিপরীত মুখে শুরু হল চলা। শহরগুলি থেকে শ্রমিকেরা তখন দলবদ্ধভাবে বিতাড়িত হল গ্রামাঞ্চলে এবং এর ফলে অচিন্তিতপূর্ব এক আবেগের তাড়নায় বাগান করার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল এক 'petite culture' (ছোটখাট ছিমছাম সংস্কৃতি)।

** 'ছোট-ছোট জোতজমির মালিক যারা নিজের হাতে জমি চাষ করত এবং অল্পস্বল্প আইনগত অধিকার ভোগ করত... তারা বর্তমানের চেয়ে জাতিটির অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ছিল। ওই যুগের সবসেরা পরিসংখ্যান-রচয়িতাদের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, ১ লক্ষ ৬০ হাজারের কম হবে না এমন জোতজমির মালিক, পরিবারবর্গ সহ যারা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশের বেশিই ছিল, তারা জীবিকানির্বাহ করত ছোট-ছোট লাখেরাজ জোতজমি থেকে। এই সমস্ত ছোট জোতমালিকের গড়পড়তা আয়... ছিল হিসাব-অনুযায়ী বছরে ৬০ থেকে ৭০ পাউন্ড। তখনই হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে যত লোক অন্যের জমি চাষ করে তাদের চেয়ে যে-সমস্ত কৃষক নিজের জমি চাষ করে তাদের সংখ্যা বেশি।' (Macaulay, 'History of England'. 10th ed., London, 1854, I, pp. 333, 334.) এমনকি ১৭শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশেও ইংলন্ডের চার-পঞ্চমাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী (উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে, পৃঃ ৪১৩)। আমি বিশেষ করে মেকলের লেখা

শতকে আরও অধিক সংখ্যায় গঠিত ছিল জমির মালিক মুক্ত কৃষকদের নিয়ে। ভূ-সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নানা সামন্ততান্ত্রিক স্বত্বস্বামিত্বের সংজ্ঞার আড়ালে যতই চাপা থাকুক-না কেন, এ-ব্যাপারটি ছিল সত্যি। অপেক্ষাকৃত বড়-বড় জমিদারের তালুকে তার আগেকার আমলের ভূমিদাস পুরনো তত্ত্বাবধায়কদের জায়গায় নিযুক্ত হচ্ছিল তখন মুক্ত কৃষকরা। কৃষিতে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের একটি অংশ ছিল কৃষক, এই কৃষকরা বড়-বড় তালুকে গতরে খেটে তাদের অবসর-সময়টুকু কাজে লাগাত। এছাড়া উপরোক্ত শ্রমিকদের অপর অংশটি ছিল অপেক্ষাকৃত ও অন্যানিরপেক্ষ উভয় দিক থেকেই সংখ্যায় সামান্য, এরা ছিল মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের স্বনির্ভর এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শেষোক্ত শ্রমিকরা আবার কার্যত ওই একই সঙ্গে জোতমালিক কৃষকও ছিল, কেননা গতরে খাটার জন্যে মজুরি পাওয়া ছাড়াও ৪ একর কিংবা তারও বেশি আবাদী জমি সহ বসবাসের জন্যে কুঁড়েও পেত তারা। তাছাড়া অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে তারাও এজমালি জমি ভোগদখলের অধিকার পেত, ওই জমিতে গোরু-ভেড়া বা শুয়োর চরাবার অধিকার, এজমালি জমির অন্তর্ভুক্ত জঙ্গল থেকে কাঠ কাটার ও জ্বালানির জন্যে কাঠ ও পীট সংগ্রহের অধিকার, ইত্যাদি পেত তারা।* ইউরোপের সকল দেশেই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যথাসম্ভব সবচেয়ে বেশিসংখ্যক অধীনস্থ সামন্ত-স্বত্বভোগীদের মধ্যে জমির বিলিবণ্টন। সার্বভৌম রাজার মতো সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদেরও শক্তিসামর্থ্য নির্ভর করত তাদের খাজনার পরিমাণ দিয়ে নয়,

---

থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি, কারণ ইতিহাসের রীতিমাফিক বিকৃতিসাধক হিসেবে তিনি এ-ধরনের তথ্যের গুরুত্ব যথাসম্ভব খাটো করে দেখাতে অভ্যস্ত।

* একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এমনকি ভূমিদাসরাও কেবল-যে তাদের গৃহসংলগ্ন জমির টুকরোর মালিক (প্রায়শই সেজন্যে খাজনা দিতে বাধ্য থাকলেও ওইসব জমির মালিক) ছিল তা-ই নয়, এজমালি জমির সহ-মালিকও ছিল তারা। 'কৃষক—(দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের অধীনে, সাইলেসিয়ায়) ভূমিদাস।' তৎসত্ত্বেও এই সমস্ত ভূমিদাস এজমালি জমিতে অধিকার ভোগ করত। 'এ পর্যন্ত এজমালি জমি বিভক্ত করার জন্যে সাইলেসিয়াবাসীদের টেনে আনা সম্ভব হয় নি, আবার সেইসঙ্গে নেইমার্ক অঞ্চলে এমন একটি গ্রাম পর্যন্ত নেই যেখানে সফলভাবে জমির এই বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয় নি।' (Mirabeau. 'De la Monarchie Prussienne', Londres, 1788, t. II, pp. 125, 126.)

তাদের অধীনস্থ প্রজাদের সংখ্যা দিয়ে, আর এই শেষোক্ত সংখ্যা আবার নির্ভর করত কৃষক-জোতমালিকদের সংখ্যার ওপর।* অতএব যদিও নর্মান-বিজয়ের পরে (২০) ইংলন্ডের জমিজায়গা বিলি হয়ে গিয়েছিল ব্যারনদের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জমিদারিতে এবং প্রায়শই এই সমস্ত জমিদারির একেকটির অন্তর্ভুক্ত ছিল ৯০০টির মতো পুরনো দিনের অ্যাংলো-স্যাক্সন জমিদারদের তালুক, তবু গোটা দেশ জুড়েই ছড়িয়ে ছিল ছোট-ছোট কৃষক-জোত আর একমাত্র সেগুলির ফাঁকে-ফাঁকে এখানে-ওখানে ছিল বড়-বড় জমিদারের তালুকগুলি। দেশের ভূমি-ব্যবস্থার এই অবস্থা আর এর সঙ্গে ১৫শ শতকের যা ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেই শহরগুলির সমৃদ্ধি জনসাধারণের ঐশ্বর্যের কারক হয়েছিল, চ্যান্সেলর ফর্টেস্ক্যু যার অমন জাঁকালো বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'Laudibus legum Angliae' বইয়ে। তবে এই ঐশ্বর্যের পুঁজিতন্ত্রী ঐশ্বর্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয় যে-বিপ্লব থেকে তার প্রস্তাবনা-অংশ অভিনীত হয় ১৫শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ ও ১৬শ শতকের প্রথম দশক জুড়ে। ওই সময়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন পোষ্য ব্যক্তিবর্গের দলকে-দল বরখাস্ত হওয়ার ফলে শ্রমের বাজারে এসে আছড়ে পড়ল বেশ একটা বড় সংখ্যার মুক্ত প্রলেতারিয়ানরা। এই উপরোক্ত সামন্ততান্ত্রিক পোষ্যদের সম্পর্কে স্যার জেমস স্টুয়ার্ট যথার্থই বলেছেন যে তারা 'অনর্থক ঘরবাড়ি ও প্রাসাদগুলিতে উপছে পড়েছিল সর্বত্রই' (২১)। নিজেই যা ছিল বুর্জোয়া বিকাশের ফসল সেই রাজশক্তি যদিও স্বৈরতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামে ওই পোষ্যবর্গের দলগুলিকে সবলে ভেঙে দেয়ার ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল, তবু এটা কোনোক্রমেই এ-ব্যাপারে একমাত্র নির্ধারক কারণ ছিল না। দেশের রাজা ও পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বড়-বড় সামন্ত-ভূস্বামী জমি থেকে গায়ের জোরে কৃষককুলকে উৎখাত করে

---

* ভূ-সম্পত্তির বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন ও দেশের বিকশিত ছোটখাট ছিমছাম সংস্কৃতি সহ জাপান ইউরোপীয় মধ্যযুগের অনেক বেশি-পরিমাণে সত্যিকার পরিচয়বাহী আমাদের সব ক'খানা ইতিহাস-গ্রন্থের চেয়ে, কেননা এই ইতিহাসের বইগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রে বুর্জোয়া অন্ধ-সংস্কারবশে লিখিত। মধ্যযুগকে মূল্যস্বরূপ বলি দিয়ে 'উদারনীতিক' সাজাটা ভারি সুবিধাজনক কিনা, তাই।

ও এজমালি জমিগুলি আত্মসাৎ করে তুলনারহিত বৃহত্তর সংখ্যক প্রলেতারিয়ান সৃষ্টি করেছিল তখন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জমিতে এই কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ছিল সামন্ত-ভূস্বামীদের সমান। ফ্লেমিশ পশমী-বস্ত্রের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ইংলন্ডে পশমের দাম সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের জমি থেকে এই উৎখাতের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেয়েছিল ভূস্বামীরা। বড়-বড় সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পুরনো দিনের অভিজাতকুল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর নতুন অভিজাতকুল ছিল তার সমকালের যোগ্য প্রতিনিধি, তার কাছে অর্থই ছিল সকল শক্তির আদিশক্তি। তাই আবাদী জমিকে মেষচারণক্ষেত্রে পরিণত করাই ছিল এই নতুন অভিজাতকুলের রণধ্বনি। হ্যারিসন তাঁর 'Description of England. Prefixed to Holinshed's Chronicles' গ্রন্থে বর্ণনা করছেন কীভাবে ছোট-ছোট কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদের ফলে দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে। তিনি বলছেন, 'আমাদের প্রতাপশালী অবৈধ দখলকারীদের পরোয়া কিসের?' এইভাবে কৃষকদের আবাসস্থল ও কৃষি-মজুরদের কুটিরগুলি ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হল কিংবা পোড়োবাড়িতে পরিণত হতে দেয়া হল।

হ্যারিসন বলছেন, 'প্রতিটি মৌজার পুরনো দলিলপত্র যদি সন্ধান করিয়া দেখা যায়... তাহা হইলে অবিলম্বে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে কিছু-কিছু মৌজায় সতেরো, আঠারো, বা বিশখানি করিয়া বাড়ির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে... প্রতীয়মান হইবে যে ইংলন্ডে বর্তমানে যেরূপ উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটিয়াছে এরূপ আর কখনও ঘটে নাই... দেখা যাইবে যে বৃহৎ নগরী ও ক্ষুদ্র শহরগুলি হয় সম্পূর্ণত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে আর নয়তো আকারে এক-চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও এখানে-ওখানে এক-আধটি শহরের আকার সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকিতে পারে; যে-শহরগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া মেষচারণের উদ্দেশ্যে সমভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে সেগুলিতে বর্তমানে ভূস্বামীবৃন্দের বাসগৃহ ব্যতীত আর কিছু দণ্ডায়মান নাই... প্রায় ইহাই বলিতে পারা যায়।'

পুরনো দিনের এই ধরনের ইতিবৃত্তকারদের অভিযোগগুলি যদিও সর্বত্রই অতিরঞ্জন ছাড়া কিছু নয়, তবু উৎপাদনের তৎকালীন অবস্থায় এই বিপ্লব সমকালবর্তীদের মনে কতখানি রেখাপাত করেছিল তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন মেলে এগুলির মধ্যে। চ্যান্সেলর ফর্টেস্কু ও টমাস মোর-এর

রচনাদির মধ্যে তুলনা করলে ১৫শ ও ১৬শ শতকের মধ্যে বিপুল পার্থক্যটি ধরা পড়ে। থর্নটন যথার্থই বলেছেন যে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী স্বর্ণযুগ থেকে লৌহযুগে উত্তরণ ছাড়াই সমাজের তলানি হিসেবে গড়ে ওঠে।

এই বিপ্লব দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল দেশের আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ তখনও পর্যন্ত সভ্যতার সেই তুঙ্গে ওঠে নি, যেখানে 'জাতীয় সম্পদ' (অর্থাৎ, পুঁজির সংগঠন এবং ব্যাপক জনসমষ্টির বেপরোয়া শোষণ ও সর্বস্বাপহরণ) সকল রাষ্ট্রশাসন-কার্যের ultima Thule (শেষকথা) বলে গণ্য। সপ্তম হেন্রি-সম্বন্ধীয় ইতিহাস-গ্রন্থে বেকন বলছেন:

'ওই সময়ে (১৪৮৯ সালে) আগের চেয়ে আরও ঘনঘন ঘেরাওয়ের কাজ চলতে থাকে, যার ফলে আবাদী জমিকে (জনসাধারণ ও পরিবারগুলির সাহায্য ছাড়া যাতে সার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় না) পরিণত করা হয় মেষচারণক্ষেত্রে, কয়েকজন মাত্র রাখাল ঘোড়ায় চড়ে যেখানে কাজ চালিয়ে দিতে পারে; এবং বাৎসরিক স্বত্ব, জীবন-স্বত্ব ও ইচ্ছাকালিক স্বত্বে (বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকের যা ছিল জীবনধারণের উপায়) বন্দোবস্ত-করা প্রজাস্বত্বের জমিগুলিকে পরিণত করা হয় খাসতালুকে। এর ফলে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ক্ষয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং (ফলত) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় শহর, গির্জা, খাজনা, ইত্যাদি...। এই অস্বস্তিকর অবস্থার প্রতিকারের ব্যাপারে রাজার এবং পার্লামেন্টের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রশংসনীয়ভাবে... ঘেরাও-করা জনশূন্য মৌজাগুলি ও জনশূন্য চারণভূমিগুলির দখল গ্রহণের বিরুদ্ধে পন্থা অবলম্বন করেন তাঁরা।'

সপ্তম হেন্রির প্রবর্তিত ১৪৮৯ সালের একটি আইনের ১৯ নং ধারায় গৃহসংলগ্ন অন্ততপক্ষে ২০ একর করে জমি আছে এমন সকল কৃষকের বাড়ি ভেঙে ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়। অষ্টম হেন্রির রাজত্বের ২৫ম বর্ষে প্রবর্তিত একটি আইনের ওই একই নিষেধাজ্ঞার পুনর্নবায়ন সাধিত হয়। অন্যান্য বহু আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই আইনে বলা হয় যে অল্পকিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে বহু খামার-জমি ও বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু, বিশেষ করে ভেড়া, যার ফলে জমির খাজনা বহুগুণে বেড়ে গেছে এবং চাষের অধীন জমির পরিমাণ গেছে কমে, গির্জা এবং বাড়িগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের ও পরিবারবর্গের জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অতএব এই আইনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত খামার-বাড়িগুলিকে পুনর্নির্মিত করতে হবে, ফসলের

জমি ও পশুচারণক্ষেত্রের আয়তনের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি অনুপাত রক্ষা করে চলতে হবে, ইত্যাদি। ১৫৩৩ সালে জারি-করা অপর একটি আইনে বলা হয়েছে যে কিছু-কিছু গৃহপালিত পশুর মালিক ২৪ হাজার পর্যন্ত ভেড়া পুষেছেন, কিন্তু এই গৃহপালিত ভেড়ার সংখ্যা ঊর্ধ্বপক্ষে ২ হাজারের বেশি হলে চলবে না।* সপ্তম হেন্‌রির রাজত্বকালের পরে ১৫০ বছর ধরে ছোট খামারী ও কৃষকদের জমি থেকে এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং বহুতরো আইনপ্রণয়ন একই রকম ব্যর্থ হল। এই সবকিছুর অকার্যকরতার রহস্য নিজে না-বুঝেই আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন বেকন।

'Essays, Civil and Moral' গ্রন্থের ২৯-সংখ্যক নিবন্ধে বেকন বলছেন, 'খামার ও কৃষকদের বাস্তুভিটাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট মান-অনুযায়ী বিন্যস্ত করার ব্যাপারে রাজা সপ্তম হেনরির কর্মকৌশল ছিল যেমন অনবদ্য তেমনই প্রশংসনীয়; অর্থাৎ, ওই বাস্তুভিটাগুলির সঙ্গে তিনি এমন পরিমাণ জমি যুক্ত করে দিয়েছিলেন যার ফলে প্রতিটি প্রজা স্বস্তিকর স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবনধারণ করতে পারত, তাকে কোনো হীন শর্তাদির অধীন হতে হোত না এবং লাঙল যাতে জমির মালিকদের হাতে থাকে ও নিছক ভাড়াটিয়া লোকের হস্তগত না হয় তারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।'**

---

* 'ইউটোপিয়া' নামের গ্রন্থে টমাস মোর লিখছেন যে ইংলণ্ডে 'আপনাদের মেষগুলি যাহারা নাকি পূর্বে এত শান্তশিষ্ট ছিল ও এত স্বল্প আহার গ্রহণ করিত, এখন শুনা যাইতেছে যে তাহারা এমন বিষম পেটুক ও এতই দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে যে খোদ মানুষগুলিকেই ধরিয়া ধরিয়া তাহারা চিবাইয়া খাইতেছে ও পানীয়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতেছে।' ('Utopia', transl. Robinson, ed. Arber, London, 1869, p. 41.)

** স্বাধীন ও সম্পন্ন কৃষক-সম্প্রদায় এবং ভালোদরের পদাতিক সেনাদলের মধ্যে সম্পর্ক যে কতখানি ঘনিষ্ঠ তা দেখিয়েছেন বেকন। তিনি বলছেন, 'রাজ্যের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও ধরনধারণের সঙ্গে আশ্চর্যরকম সম্পর্কিত এই ব্যাপারটি; অর্থাৎ এমন সমস্ত খামারের অস্তিত্ব বজায় রাখা দরকার যেগুলির মান কৃষকদের দারিদ্র্যদশা থেকে মুক্ত রাখা ও সুস্থ-সবল দেহে বেঁচে থাকার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে এবং যা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত অধিকাংশ জমি ক্ষুদ্র কৃষক অথবা মধ্য-অবস্থার মানুষের দখলে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যাপারটিকে কার্যত বিধিবদ্ধ করবে, যাতে এই মধ্যবর্তীদের অবস্থা ভদ্রলোক-সম্প্রদায় এবং কুটিরবাসী ও দরিদ্র কৃষকের মাঝামাঝি থাকে।... কারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশ্নে সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষজনের মধ্যে এই সাধারণ মতটি পরিপুষ্ট হতে দেখা গেছে যে... যে-কোনো সেনাবাহিনীর শক্তির প্রধান উৎস হল পদাতিক সৈন্যদল। এবং ভালোদরের পদাতিক-বাহিনী গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পড়ে এমন সমস্ত লোকের, যারা লালিত

অন্যপক্ষে পংজিতন্ত্রী ব্যবস্থা যা চাইছিল তা হল, জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশের অধঃপতিত ও গোলামের মতো আজ্ঞাধীন অবস্থা, তাদের বেতনভুক জীবে এবং তাদের শ্রমের উপকরণকে পংজিতে রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তরকরণের পর্যায়ে আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষও চেষ্টা করে চলেছিল যাতে কৃষিতে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের কুটিরের সংলগ্ন ৪ একর করে জমি বহাল থাকে এবং তা কুটিরে ভাড়াটে-অতিথি বসানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে, প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে, ফ্রন্ট মিল-এর রোজার ক্রোকারকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল ফ্রন্ট মিল-এর তালুকের মধ্যে চিরস্থায়ী স্বত্বসাপেক্ষ ৪ একর সংলগ্ন জমি ছাড়াই একটি কুটির নির্মাণ করায়। এমনকি আরও পরে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে, প্রথম চার্লসের রাজত্বকালেই একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত করা হয় পুরনো দিনের আইনগুলিকে, বিশেষ করে গৃহসংলগ্ন ৪ একর জমি-সংক্রান্ত আইনটিকে, কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে। এমনকি ক্রমওয়েলের আমলেও গৃহসংলগ্ন ৪ একর জমি না-থাকলে লন্ডনের ৪ মাইলের মধ্যে কোনো বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি এই সেদিনও, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও, কোনো কৃষি-মজুরের জন্যে নির্দিষ্ট কুটিরের সংলগ্ন এক কিংবা দুই একর জমি না থাকলে ঊর্ধ্বতন ভূস্বামীর বিরুদ্ধে

হয়েছে যো-হুকুম দাসমনোভাব ও অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং বেশকিছু পরিমাণে স্বাধীন ও স্বচ্ছল পরিবেশে। অতএব যদি কোনো রাষ্ট্র প্রধানত অভিজাত ও ভদ্রমণ্ডলীর মুখ চেয়ে চলে এবং কৃষক ও হলকর্ষক-সম্প্রদায় যদি ওই প্রথমোক্তদের নিছক আজ্ঞাবহ ও শ্রমিক কিংবা নিছক কুটিরবাসী (যারা মাথা গোঁজার আশ্রয়প্রাপ্ত ভিক্ষুক ছাড়া অন্য কিছু নয়) হিসাবেই থেকে যায়, তাহলে আমরা হয়তো ভালোদরের অশ্বারোহী-বাহিনী পেতে পারি, কিন্তু ভালোদরের স্থায়ী পদাতিক-বাহিনী কখনোই পাব না।... এই ব্যাপারটিই ঘটতে দেখা গেছে ফ্রান্সে এবং ইতালিতে এবং বিদেশের অপর কিছু-কিছু অংশে, যেখানে কার্যত আছে শুধু হয় অভিজাত নয় তো কৃষক-সম্প্রদায়... আর তা এমন একটি পর্যায়ে পেঁছেছে যে ওই সমস্ত দেশ তাদের পদাতিক-বাহিনী গড়ার জন্যে সুইজারল্যান্ডবাসী বা ওই ধরনের ভিনদেশী ভাড়াটিয়া লোকজনকে নিযুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে, ফলত অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে ওই সমস্ত জাতির লোকসংখ্যা প্রচুর হলেও তাদের নিজস্ব সৈন্য বলতে বিশেষ কিছু নেই।' ('The Reign of Henry VII etc. Verbatim Reprint from Kennet's England, ed. 1719'. London, 1870, p. 308.)

রীতিমতো অভিযোগ দায়ের করা হোত। বর্তমানে অবশ্য কোনো কৃষি-মজুর যদি গৃহসংলগ্ন ছোট্ট একটুকরো বাগান-জমি পায় কিংবা যদি কুটির থেকে অনতিদূরে এক একরেরও ভগ্নাংশ খানিকটা জমি ভাড়া নিতে পারে তাহলে তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ডঃ হান্টার বলছেন, 'জমিদার ও খামারী কৃষকরা এখানে পাশাপাশি কাজ করে থাকে। এখন যদি কৃষক-কুটিরের সঙ্গে কয়েক একর করে জমি জুড়ে দেয়া হয় তাহলে মজুররা বড় বেশি স্বাধীন হয়ে উঠবে।*

বলপ্রয়োগে সাধারণ মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়াটি ষোড়শ শতকে রিফর্মেশন (ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন) (২২) থেকে নতুন করে ভয়াবহরকম অনুপ্রেরণা পেল। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ব্যাপকভাবে গির্জার সম্পত্তি লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়েও অনুপ্রেরণা পেল এই প্রক্রিয়া। রিফর্মেশনের সময়ে ক্যাথলিক গির্জার ধর্মসংস্থাটি ইংলন্ডের জমিজায়গার এক বিপুল অংশের সামন্ততান্ত্রিক মালিক ছিল। ওই সংস্থার ধর্মীয় মঠ ইত্যাদিকে দমন করার ফলে মঠের বাসিন্দারা নিক্ষিপ্ত হল প্রলেতারিয়েত শ্রেণীতে। গির্জার ভূ-সম্পত্তিগুলির প্রধান একটি অংশ হয় বিতরণ করা হল রাজপরিবারের ভূমিলোলুপ প্রিয়পাত্রদের মধ্যে আর নয়তো নামমাত্র মূল্যে সেগুলি বিক্রি করা হল ফটকাবাজ খামারী ও নাগরিকদের কাছে। এই শেষোক্তরা আবার উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকারপ্রাপ্ত কোর্ফা-প্রজাদের সদলবলে জমি থেকে বিতাড়িত করল এবং তাদের ভিন্ন-ভিন্ন জমিগুলিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করে নিল। গির্জার ব্যয়নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ইত্যাদির একটি অংশ যা নাকি আগে আইনসঙ্গতভাবেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষজনের সম্পত্তি হিসেবে নির্ধারিত ছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হল বিনা

---

* ডঃ হান্টার, 'Public Health. 7th Report 1864', London, 1865, p. 134. 'যে-পরিমাণ জমি (পুরনো দিনের আইনগুলিতে) বিলিব্যবস্থার জন্যে নির্ধারিত করে দেয়া হোত আজকের বিচারে তা শ্রমিকদের পক্ষে অতিরিক্ত বেশি বলেই গণ্য হবে, হয়তো বা মনে করা হবে যে এর ফলে কৃষি-মজুররা ছোট খামারীই বনে যাবে।' (George Roberts. 'The Social History of the People of the Southern Counties of England in Past Centuries'. London. 1856, pp. 184, 185.)

বাকাবায়ে।* সারা ইংলন্ড সফর করে এসে রানী এলিজাবেথ তখন সখেদে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'Pauper ubique jacet' (২৩)। তাঁর রাজত্বের ৪৩শ বছরে ব্রিটিশ জাতি দরিদ্র-প্রতিপালনের জন্যে করের প্রবর্তন করে সরকারিভাবে নিঃস্বতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

'এই আইনটির রচয়িতারা আইন-প্রণয়নের কারণ উল্লেখ করতে লজ্জা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়, কেননা (প্রচলিত প্রথার অন্যথা ঘটিয়ে) এটির সঙ্গে কোনো প্রস্তাবনার অংশ যোগ করা হয় নি।'**

প্রথম চার্লসের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে প্রবর্তিত চতুর্থ আইনে এই দরিদ্র-প্রতিপালনের জন্যে কর-ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়, এবং সত্যি বলতে কি একমাত্র ১৮৩৪ সালেই এই আইনটি নতুন এক কঠোরতর আকার পায়।*** রিফর্মেশনের এই অব্যবহিত ফলাফলগুলি তার সবচেয়ে স্থায়ী

---

* 'গির্জার ব্যয়নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ইত্যাদির একটি অংশ দরিদ্রদের ভোগ করার অধিকার প্রাচীন সংবিধিগুলির ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত।' (J. D. Tuckett. 'A History of the Past and Present State of the Labouring Population'. London, 1846, Vol. II, pp. 804, 805.)

** William Cobbett. 'A History of the Protestant Reformation', § 471.

*** প্রোটেস্ট্যান্ট-ধর্মের 'মর্মবাণী'টি অন্যান্য ব্যাপারে ছাড়াও নিচের এই ঘটনাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে। ইংলন্ডের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু-কিছু ভূস্বামী ও সম্পন্ন খামারী একত্র বসে মাথা ঘামিয়ে এলিজাবেথের আমলের দরিদ্র-সম্পর্কিত আইনটির যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দশটি প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করে। অতঃপর সেই প্রশ্নগুলি তারা মতামতের জন্যে উপস্থাপিত করে সে-যুগের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ (পরে প্রথম জেমসের আমলে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত) সার্জেন্ট স্নিগ-এর সামনে। ৯-সংখ্যক প্রশ্ন — 'যাজক-পল্লীর অপেক্ষাকৃত ধনী কিছু খামারী একটি বেশ কৌশলপূর্ণ ফন্দি বের করেছে যার সাহায্যে এই আইনটি (এলিজাবেথের রাজত্বের ৪৩শ বর্ষে প্রবর্তিত আইন) কার্যকর করার ব্যাপারে যতকিছু ঝামেলা এড়ানো যেতে পারে। তারা প্রস্তাব করেছে যে আমরা যাজক-পল্লীতে একটি জেলখানা খাড়া করব, তারপর প্রতিবেশী পল্লীগুলিকে জানিয়ে দেব যে সেই পল্লীগুলির যে-সমস্ত ব্যক্তি এই যাজক-পল্লীর গরিবদের তাদের খামারের কাজে লাগাতে চায় তারা একটি নির্দিষ্ট দিনে বন্ধ লেফাফায় করে তাদের

প্রস্তাবগুলি পেশ করে আমাদের হেফাজত থেকে ওই গরিবদের ভাড়া নেয়ার নিম্নতম একটি গ্রহণযোগ্য দর জানাক এবং এ-ও জানাক যে ওই উপরিলিখিত জেলখানায় নেই এমন যে-কোনো ব্যক্তিকে কাজে নিতে অস্বীকার করার অধিকার তাদের আছে। এই পরিকল্পনা যারা পেশ করেছে তারা মনে করে যে তাদের আশপাশের জেলাগুলিতে এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা নিজেরা পরিশ্রম করতে চায় না এবং যাদের এত অর্থবল বা ঋণ সংগ্রহের যোগ্যতা নেই যে যা দিয়ে তারা খামারের ইজারা নেবে বা জাহাজ ভাড়া করবে যাতে বিনাশ্রমে জীবিকানির্বাহ করতে সমর্থ হয় তারা। এই সমস্ত লোক আলোচ্য যাজক-পল্লীর পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক শর্তে প্রস্তাব পেশ করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। এই সমস্ত ঠিকাদারের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় যদি কোনো গরিবমানুষ মারা পড়ে, তাহলে তার পাপ অর্শাবে তত্ত্বাবধায়ক ঠিকাদারকেই, কেননা আলোচ্য যাজক-পল্লীটি গরিবদের প্রতি তার যথাকর্তব্য তৎপূর্বেই সমাধা করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। তবে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে এই ধরনের বিচক্ষণ ব্যবস্থা-অবলম্বন বর্তমান আইনের (এলিজাবেথের আমলের ৪৩শ বর্ষে প্রবর্তিত আইন) সমর্থন পাবে না। আপনাকে অবশ্য জানাতে পারি যে এই জেলার এবং এর সংলগ্ন অন্যান্য জেলার লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তিভোগীরা সাগ্রহে মিলিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিদের এইমর্মে নির্দেশ দিতে রাজি হয়ে যাবে যে তারা যেন এমন একটি আইনপাশের প্রস্তাব দেয় যে-আইনবলে যাজক-পল্লীর অধিকার জন্মাবে গরিবদের হাজতে আটক করে রাখার ও তাদের দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপারে যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার এবং এইমর্মে ঘোষণা করে দেয়ার যে যদি কোনো গরিব মানুষ এইভাবে হাজতে আটক থাকতে ও কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে সে কোনোরকম ত্রাণ বা সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবে না। আশা করা যায় যে এই ব্যাপারটি সম্ভব হলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা আর ত্রাণ চাইতে পারবে না এবং যাজক-পল্লীগুলির অবনতির আর কারণ হবে না।' (R. Blakey. 'The History of Political Literature from the Earliest Times'. London, 1855, v. II, pp. 84. 85.) স্কটল্যান্ডে ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ ঘটে ইংলন্ডের থেকে কয়েক শতাব্দীর পরে। এমনকি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দেও সালতুনের ফ্লেচর স্কটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, 'হিসাব করে দেখা গেছে যে স্কটল্যান্ডে ভিক্ষুকের সংখ্যা ২ লক্ষের কম হবে না। এর একমাত্র প্রতিকার নীতিগতভাবে প্রজাতন্ত্রী হিসেবে আমি যা নির্দেশ করতে পারি, তা হল, পুরনো ভূমিদাস-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, যারা নিজেদের জীবনধারনের ব্যবস্থা করতে অপারগ এমন সকলকেই ক্রীতদাসে পরিণত করা।' ইডেন তাঁর 'The State of the Poor' (London, 1797. Book 1, ch. 1. pp. 60, 61) গ্রন্থে লিখছেন, 'কৃষক-প্রজাস্বত্ব হ্রাস পাওয়ার সময়টিই মনে হয় দরিদ্রদের উৎপত্তির যুগ বলে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হতে পারে। হস্তশিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যই আমাদের জাতীয় দরিদ্রদের পিতামাতা।' আমাদের 'নীতিগতভাবে প্রজাতন্ত্রী' স্কচটির মতো ইডেনও

ফলাফল-যে ছিল তা নয়। গির্জার সম্পত্তি তৎকালীন ভূ-সম্পত্তির ঐতিহ্যগত পরিবেশে ধর্মীয় প্রাকার হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেই প্রাকারটিরই পতন ঘটায় উপরোক্ত ওই পরিবেশ বজায় থাকা আর সম্ভব ছিল না।*

এমনকি সপ্তদশ শতকের শেষ দশকেও ক্ষুদ্র কৃষককুল বা স্বাধীন কৃষকদের সেই সম্প্রদায়টি খামারীদের সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যায় ছিল বেশি। ক্রমওয়েলের ক্ষমতার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল তারা, এবং এমনকি মেকলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও মাতাল ভূস্বামী ও তাদের ভৃত্যবর্গ এবং প্রভুদের পরিত্যক্ত উপপত্নীদের বিয়ে করতে বাধ্য হোত যারা সেই গ্রাম্য যাজকদের চেয়ে ওই কৃষকরা ছিল উন্নত শ্রেণীর। ১৭৫০ সাল নাগাদ এই ক্ষুদ্র কৃষক-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যায়**, আর বিলুপ্ত হয়ে যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের মধ্যে খেত-মজুরদের এজমালি জমির শেষ চিহ্নটুকুও। এখানে আমরা এই কৃষি-

---

ভুল করেছেন একটি ব্যাপারে। তা হল, কৃষক-প্রজাস্বত্ব লোপ করার কারণে নয়, কৃষি-মজুরের ভূ-সম্পত্তির বিলোপসাধনই তার প্রলেতারিয়ান ও পরিশেষে নিঃস্ব বনে যাওয়ার কারণ। ফ্রান্সে, যেখানে জমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল অন্য ধরনে, সেখানকার ১৫৬৬ সালের ম্যুলাঁসের নির্দেশনামা ও ১৬৫৬ সালের অনুশাসন ইংলন্ডের দরিদ্র-সম্পর্কিত আইনসমূহের অনুরূপ।

* অধ্যাপক রজার্স যদিও আগে প্রোটেস্টান্ট গোঁড়ামির লালনক্ষেত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তবু তিনি 'কৃষির ইতিহাস' গ্রন্থের মুখবন্ধে জোর দিয়েছেন রিফর্মেশনের ফলে সংঘটিত ব্যাপ্ত জনসংখ্যার নিঃস্ব অবস্থায় অধঃপতিত হওয়ার এই ব্যাপারটির ওপর।

** 'A Letter to Sir T. C. Bunbury, Brt.: On the High Price of Provisions.' By a Suffolk Gentleman. Ipswich, 1795, p. 4 এমনকি বৃহদাকার খামারের সপক্ষে অমন-যে অতি-উৎসাহী প্রবক্তা, 'Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions and the Size of Farms etc.' London, 1773, p. 139 শীর্ষক গ্রন্থের সেই লেখক বলছেন, 'আমার সবচেয়ে বেশি আক্ষেপ এই যে আমাদের ক্ষুদ্র কৃষককুল, সেই সম্প্রদায়ের মানুষ যারা এই জাতির স্বাধীনতাকে সত্যিসত্যিই একদিন ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছিল, তারা বিনষ্ট হয়ে গেছে। এটা দেখেও আমি দুঃখিত যে একচেটিয়া আগ্রাসপ্রবণ ভূস্বামীদের কবলিত ওই কৃষকদের জমিগুলি এখন ছোট-ছোট খামারীকে ইজারা দেয়া হয়েছে আর এই খামারীরা এমন শর্তে সেগুলির ইজারা পেয়েছে যাতে তারা পরিণত হয়ে গেছে যে-কোনো দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত ব্যাপারে তাদের ডাক পড়লে হুজুরে হাজির হতে প্রস্তুত প্রায় যো-হুকুম প্রজায়।'

বিপ্লবের বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণগুলি একপাশে সরিয়ে রাখছি, আমরা শুধু আলোচনা করছি এ-ব্যাপারে বলপ্রয়োগে যে-উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়েছিল সেগুলি নিয়ে।

স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশের পুনঃক্ষমতাপ্রাপ্তির পর (২৪) ভূস্বামীবৃন্দ আইনসম্মত উপায় অবলম্বনেই পরস্ব আত্মসাৎ করার কাজটি চালিয়ে যায়, আর ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে সর্বত্র এই কাজটি চলে কোনোরকম আইনগত আনুষ্ঠানিকতার তোয়াক্কা না-রেখেই। জমিতে সামন্ততান্ত্রিক ভোগদখলের শর্তাবলীর অবলোপ ঘটায় ওই ভূস্বামীবৃন্দ রাষ্ট্রের কাছে এই ভোগদখলজনিত দায়দায়িত্বের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে এবং রাষ্ট্রকে এর 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে যোগায় তারা কৃষককুল ও বাকি ব্যাপ্ত জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়-করা কর দিয়ে; যে-সমস্ত তালুকে আগে তাদের কেবলমাত্র সামন্ততান্ত্রিক স্বত্ব ছিল সেগুলিতে নিজেদের স্বার্থে এখন তারা কায়েম করে আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারাদি, এবং পরিশেষে প্রবর্তন করায় বসতি-সম্পর্কিত সেই সমস্ত আইনের খুঁটিনাটির বিবরণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে যেগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে ব্রিটিশ খেত-মজুরদের ওপর সেগুলির প্রভাবের ফলাফল ছিল একেবারে সেইরকম রুশ কৃষককুলের ওপর যে-ফলাফল দেখা গিয়েছিল তাতার বরিস গদুনোভের রাজকীয় অনুশাসন জারি করার পরে (২৫)।

'Glorious Revolution' (গৌরবময় বিপ্লব) (২৬) অরেঞ্জের উইলিয়ম সহ উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকারী ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করল।* এরা নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটাল ব্যাপক হারে রাষ্ট্রীয় জমিজায়গা চুরির মধ্যে দিয়ে; এই ধরনের চুরি এর আগে যে ঘটত না তা নয়, তবে তা

---

* এই বুর্জোয়া নায়কের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে নিচের ঘটনাটিও উল্লেখ্য: '১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে আয়র্ল্যান্ডে লেডি অর্কনেকে বিপুল পরিমাণ ভূমিদান রাজার অনুরাগের এবং ওই মহিলার প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি প্রকাশ্য নিদর্শন . . . লেডি অর্কনে-র অমায়িক সেবাযত্ন foeda labiorum ministeria (বা প্রেমের নোংরামিভরা সেবাযত্ন)-এর একটি ফল বলে মনে করা হয়।' (ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত স্লোন এর পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ, সংখ্যা—৪২২৪। পাণ্ডুলিপিটির শিরনাম: 'The Character and Behaviour of King William, Sunderland etc. as represented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon etc.' বইখানি আজব নানা ঘটনার বর্ণনায় পূর্ণ।)

ঘটত অপেক্ষাকৃত পরিমিতভাবে, রয়ে-সয়ে। এই সমস্ত তালুক বিতরণ করা হতে লাগল, বিক্রি করা হতে লাগল হাস্যকররকম স্বল্পমূল্যে, কিংবা এমনকি সরাসরি দখল করে নিয়ে ব্যক্তিগত তালুকগুলির সঙ্গে জুড়ে নেয়া হল।* আর এই সবকিছুই হল আইনগত শিষ্টাচার মেনে চলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছাড়াই। এইভাবে জুয়াচুরির সাহায্যে আত্মসাৎ-করা রাজকীয় জমিজায়গা ও সেইসঙ্গে দস্যুবৃত্তির ফলে সংগৃহীত গির্জার মালিকানাধীন তালুকগুলিই (রিপাবলিকান বিপ্লবের ফলে এই শেষোক্ত তালুকগুলির মধ্যে যেগুলি ফের হস্তচ্যুত হয় নি সেগুলিই) আজকের দিনের ব্রিটিশ সংখ্যাল্পের শাসনাধীন সামন্ত-প্রভুদের জমিদারির ভিত্তি।** বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা জমি আত্মসাতের এই ক্রিয়াকলাপের সমর্থক ছিল এই কারণে যে তারা মনে করত অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে এটি জমি নিয়ে স্বাধীন বাণিজ্যের পথ মুক্ত করবে, বড়-বড় খামার গড়ে উঠবে ও সেখানে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা প্রসারণের সুবিধা ঘটবে এবং এর ফলে তাদের হাতের কাছে জুটে যাবে অধিক পরিমাণে মুক্ত কৃষি-প্রলেতারিয়ানদের সরবরাহ। তাছাড়া, এইভাবে গড়ে-ওঠা নতুন জমিদার-অভিজাত সম্প্রদায় ছিল নতুন-গজানো ব্যাংক-মালিকতন্ত্রের, এই নবোদ্ভূত ফিনান্স-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এবং তৎকালে সংরক্ষণমূলক শুল্কসমূহের ওপর নির্ভরশীল বড়-বড় হস্তশিল্প-কারখানা-মালিকদের স্বাভাবিক মিত্র। ইংরেজ বুর্জোয়ারা তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সুইডিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মতোই অতখানি বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছিল; তবে ওই শেষোক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি ছিল বিপরীত, সুইডিশ বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক

---

* 'আংশিকভাবে বিক্রয় ও আংশিকভাবে ভূমিদানের মারফত রাজকীয় মহালগুলির বে-আইনী হস্তান্তর ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি কলংকজনক অধ্যায়... সমগ্র জাতির সঙ্গে এটি এক বিরাট জুয়াচুরির ব্যাপার।' (F. W. Newman. 'Lectures on Political Economy'. London, 1851, pp. 129, 130.) [কীভাবে ইংলণ্ডের বর্তমান বৃহৎ ভূস্বামীবৃন্দ তাদের সম্পত্তির অধিকারী হল সে-সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্যে N. H. Evans. 'Our old Nobility. By Noblesse Oblige'. London, 1879 বইখানি দেখুন। — ফ. এঙ্গেলস]

** উদাহরণস্বরূপ, বেডফোর্ডের ডিউক-বংশ, যার একটি প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত হলেন 'উদারনীতির মন্দাঘোড়া' লর্ড জন রাসেল, সে-সম্পর্কিত এ. বার্কের পুস্তিকাটি পড়ুন।

ক্ষেত্রে তাদের মিত্র কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সুইডেনের রাজাদের সাহায্য করেছিল বলপ্রয়োগে রাজকীয় জমিজায়গা সংখ্যাল্প অধিকারভোগীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ায়। এটা সেখানে ঘটেছিল ১৬০৪ সাল থেকে এবং পরে রাজা দশম কার্ল ও একাদশ কার্লের রাজত্বকালে।

ওপরে যার আলোচনা করা হল সেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সাধারণের এজমালি সম্পত্তি ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় টিকে-থাকা এক প্রাচীন টিউটনিক প্রথা। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি সাধারণভাবে আবাদী জমিকে মেষচারণক্ষেত্রে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে এই এজমালি সম্পত্তিকে বলপ্রয়োগে আত্মসাৎ করার কাজটা শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের শেষাশেষি ও তা চলে ষোড়শ শতকেও। তবে ওই সময়ে এই প্রক্রিয়াটিকে বলবৎ করা হচ্ছিল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের সাহায্যে এবং এর বিরুদ্ধে দেশের আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষ দেড় শো বছর ধরে বৃথাই লড়াই করে যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকে এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল এই দিক থেকে যে ততদিনে দেশের আইনকানুনই বদলে হয়ে দাঁড়িয়েছিল জনসাধারণের জমি চুরির হাতিয়ার, যদিও বড়-বড় খামারী তাদের নিজ-নিজ ছোটখাট স্বাধীন ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করে চলেছিল ওইসঙ্গে।* এই ডাকাতির সংসদীয় চেহারাটা প্রকাশ পাচ্ছিল তখন 'Bills for Inclosures of Commons' থেকে; অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, সেই সমস্ত ডিক্রি যেগুলির সাহায্যে জনসাধারণের এজমালি জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে জমিদাররা নিজেদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে নিচ্ছিল এবং জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ-

---

* 'খামারীরা কুটিরবাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে নিজেদের ও শিশুদের বাদ দিয়ে অপর কোনো জীবন্ত প্রাণীকে কুটিরে রাখা। এর অজুহাত এই যে যদি তারা কোনো জীবজন্তু কিংবা হাঁস-মুরগি পোষে তাহলে সেগুলির খাদ্য সংগ্রহের জন্যে কুটিরবাসীরা খামারীদের গোলা থেকে ফসল চুরি করবে। খামারীরা আরও বলে থাকে যে কুটিরবাসীদের দরিদ্র অবস্থায় ফেলে রাখ, তাহলে তারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমার বিশ্বাস, আসল ঘটনা হল এই যে খামারীরা সাধারণের এজমালি জমিগুলির মালিকানার সম্পূর্ণ অধিকার নিজেরা আত্মসাৎ করে নিয়েছে।' ('A Political Inquiry into the Consequences of Enclosing Waste Lands', London, 1785, p.75.)

সম্পর্কিত ভিত্তিসমূহ, ইত্যাদি থেকে। সার এফ. এম. ইডেন শঠতাপূর্ণ বিশেষ ওকালতি ফলিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এজমালি সম্পত্তিগুলি আসলে হল গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের স্থান নিয়েছে যারা সেই বড়-বড় জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া কিছু নয়, আবার নিজেই তিনি নিজের এই শঠ যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন যখন তিনি দাবি জানিয়েছেন 'এজমালি জমিগুলি ঘেরাওয়ের জন্যে পার্লামেণ্ট থেকে একটি সাধারণ আইন' প্রণয়নের (অর্থাৎ, স্বীকার করেছেন এজমালি জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে সংসদীয় প্রবল হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা) এবং তদুপরি আইনসভার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন জমির অধিকার-হারানো দরিদ্রদের ক্ষতিপূরণদানের ব্যবস্থা করার।*

একদিকে যেমন স্বাধীন ক্ষুদ্র কৃষকের স্থান অধিকার করেছিল ইচ্ছানুসারে-বসানো প্রজারা, অর্থাৎ বার্ষিক ইজারাদানের ভিত্তিতে বসানো ও জমিদারের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল হীন আজ্ঞাধীন ইতরশ্রেণীর ছোট খামারীরা, তেমনই অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি চুরির পরেই সাধারণের এজমালি জমির ওপর নিয়মমাফিক ডাকাতি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল সেই সমস্ত বড় খামারকে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তুলতে অষ্টাদশ শতকে যেগুলিকে বলা হোত অর্থকরী খামার** অথবা বাণিজ্য-খামার*** এবং কৃষিজীবী জনসাধারণকে 'মুক্ত করে' দিতে পণ্যোৎপাদন শিল্পের জন্যে প্রলেতারিয়ান হিসেবে।

তবে অষ্টাদশ শতকে ঊনবিংশ শতকের মতো জাতীয় সম্পদ ও জনসাধারণের দারিদ্র্যের মধ্যে অভিন্নতা অতখানি পুরোপুরি স্বীকৃতি পায় নি। সে-কারণে প্রথমোক্ত শতকের অর্থনীতি-বিষয়ক সাহিত্যে 'এজমালি জমির ঘেরাও' নিয়ে অমন প্রবল তর্কবিতর্কের অবতারণা দেখা যায়। আমার

* ইডেন-লিখিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত বইখানির মুখবন্ধ দেখুন।

** 'অর্থকরী খামার'। ('Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn'. By a Person in Business. London, 1767, pp. 19, 20.)

*** 'বাণিজ্য-খামার'। ('An Enquiry into the Causes of the Present High Price of Provisions'. London, 1767, p. 111, Note.) রচয়িতার ছদ্মনামে প্রকাশিত এই চমৎকার গবেষণা-কর্মটি রেভারেণ্ড নাথানিয়েল ফরস্টারের পরিশ্রমের ফল।

হাতে এ-সম্পর্কিত যে-লিখিত উপাদানগুলি আছে তা থেকে আমি এমন অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা ওই যুগের ঘটনাবলীর ওপর জোরালো আলোকসম্পাত করবে।

এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে লিখছেন, 'হার্টফোর্ডশায়ারের কয়েকটি যাজক-পল্লী জুড়ে গড়পড়তা ৫০ থেকে ১৫০ একর জমিবিশিষ্ট ২৪টি খামার ভেঙেচুরে গড়ে উঠেছে তিনটি বড় খামার।'* 'নরদামটনশায়ার ও লেস্টারশায়ারে এজমালি জমি ঘেরাও করে নেয়ার ব্যাপারটা রীতিমতো বিপুল হারে ঘটেছে এবং এই ঘেরাওয়ের ফলে গড়ে-ওঠা নতুন জমিদারিগুলিকে পরিণত করা হয়েছে মেষচারণ-ক্ষেত্রে। এর ফলে বহু জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় আগে যেখানে চাষবাস হোত ১,৫০০ একর জমিতে, এখন সেখানে বছরে ৫০ একর জমিতেও আবাদ হয় না। এ-সমস্ত জায়গায় এককালের বসতবাড়ি, গোলাঘর, আস্তাবল, ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ' প্রাক্তন অধিবাসীদের বসতির একমাত্র চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। 'ঘেরাওয়ের আগে কিছু-কিছু গ্রামে যেখানে শ'খানেক বাড়ি ছিল ও তাতে শ'খানেক পরিবার বসবাস করত... সেখানে এখন বসতবাড়ি ও পরিবারের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে আট থেকে দশের মতো।... বেশির ভাগ যাজক-পল্লীতে, যেখানে মাত্র ১৫ থেকে ২০ বছর আগে এজমালি জমিগুলি ঘেরাও করা হয়েছে, সেখানে জোতজমির মালিকের সংখ্যা এজমালি জমিগুলি ঘেরাওহীন বা মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় যত ছিল বর্তমানে তার তুলনায় বহুগুণে হ্রাস পেয়ে সামান্য কয়েকজনে দাঁড়িয়েছে। আগে যে-সমস্ত জমিজায়গা ২০ বা ৩০ জন খামারী, সমসংখ্যক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চাষী-প্রজা ও জমির মালিকের হস্তগত ছিল, এখন সেই পরিমাণ জমি সুদ্ধ প্রকাণ্ড একেকটি ঘেরাও-করা জমিদারি ৪ বা ৫ জন ধনী মেষপালকের দখলে থাকাটা মোটেই কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। উপরোক্ত ওই সমস্ত খামারী, চাষী-প্রজা, ইত্যাদি তাদের পরিবারবর্গ এবং প্রধানত তাদের জমিতে কাজকর্মে নিযুক্ত ও ভরণপোষণ-প্রাপ্ত অন্যান্য বহু পরিবার সহ এইভাবে তাদের জীবিকার সংস্থান থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হয়েছে।'**

কেবলমাত্র পতিত জমিই নয়, প্রায়শই যে-সমস্ত জমি হয় যৌথভাবে আবাদ করা হচ্ছিল আর নয়তো গ্রামীণ সমাজকে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা খাজনা দিয়ে ভোগদখল করা হচ্ছিল সে-সবও ঘেরাওয়ের অজুহাত দেখিয়ে প্রতিবেশী জমিদাররা দখল করে নিয়েছিল।

---

* Thomas Wright, 'A short Address to the Public on the Monopoly of Large Farms', 1779, pp. 2, 3.

** Rev. Addington. 'Inquiry into the Reasons for or against Inclosing Open Fields'. London, 1772, pp. 37-43, passim.

'এখানে আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে-সমস্ত মাঠঘাট ও খেতগুলি ঘেরাও করে নেয়ার আগেই চাষের অধীন হয়ে ছিল সেগুলির ঘেরাও-ব্যবস্থা। ঘেরাও-ব্যবস্থার সপক্ষে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এই সমস্ত ক্ষীয়মাণ গ্রাম বড় খামারগুলির একচেটিয়া আধিপত্য বাড়িয়ে দিয়েছে, খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং গ্রামগুলিকে জনশূন্য করে তুলেছে।... এমনকি অনাবাদী জমিগুলি ঘেরাও করে নেয়াতেও (যে-ব্যাপারটি এখন চলছে) গরিবরা আরও দুর্দশায় পড়েছে, কেননা এতেও তারা জীবনধারণের একটি পন্থা থেকে বঞ্চিত হয়েছে আর এর ফলে একমাত্র ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ফেঁপে-ফুলে-ওঠা খামারগুলি আরও বড় হয়ে চলেছে।'* ডঃ প্রাইস বলছেন, 'যখন এই জমি অল্প কয়েকজন বড় খামারীর কব্জায় হয় তখন তার ফলাফল অবশ্যম্ভাবীরূপে দাঁড়ায় এই যে ছোট-ছোট খামারী (এদের প্রাইস এর আগে আখ্যাত করেছেন 'বহুসংখ্যক ছোট জোতজমির মালিক ও চাষী-প্রজা' বলে, 'যারা নিজেদের ও নিজ-নিজ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করে তাদের অধিকৃত জমির ফসল দিয়ে, এজমালি জমিতে প্রতিপালন-করা ভেড়া এবং হাঁস-মুরগি, শুয়োর, ইত্যাদির মাংস খেয়ে ও বিক্রি করে, এবং ফলত এদের জীবনধারণের উপায়-উপকরণ কেনার প্রয়োজন পড়ে সামান্যই') 'পরিণত হয়ে যায় এমন একদল মানুষে যারা তাদের জীবিকানির্বাহ করে অন্যের জন্যে কাজ করে এবং তাদের যা-কিছু দরকার তার জন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করার।... এ-কারণে সম্ভবত আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে, কেননা পরিশ্রম করার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক চাপও থাকবে বেশি।... শহর এবং হস্তশিল্প-কারখানার সংখ্যাও বাড়বে, কেননা আরও বেশিসংখ্যায় মানুষ সেদিকে ছুটবে মাথাগোঁজার আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে। এইভাবেই খামারগুলি আত্মসাৎ করার প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রসর হয়ে থাকে। আর আমাদের এই রাজ্যে বহু বছর ধরে এই প্রক্রিয়াটি ঠিক এই নিয়মেই বাস্তবে কাজ করে চলেছে।'**

জমি ঘেরাও করার ফলাফলকে তিনি সংহতভাবে প্রকাশ করেছেন এই বলে:

'মোটের ওপর সমাজের নিচুতলার মানুষের অবস্থা প্রায় সকল দিক থেকেই বদলেছে, তা খারাপ হয়েছে সর্বদিক থেকেই। ছোট-ছোট জোতের মালিক থেকে তারা পরিণত

---

* Dr. R. Price. 'Observations on Reversionary Payments', 6 ed. By W. Morgan. London, 1803, v. II, p. 155. ফর্স্টার, অ্যাডিংটন, কেন্ট, প্রাইস এবং জেমস অ্যান্ডারসনের রচিত গ্রন্থাদি পড়া দরকার এবং সেগুলির পাঠের সঙ্গে তুলনা করা দরকার হীন স্তাবক ম্যাককুলখের 'The Literature of Political Economy'. London, 1845 বিষয়ক তালিকাবদ্ধ বিবরণীতে তাঁর দুঃখদায়ক বকবকানির সঙ্গে।

** প্রাইস, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১৪৭।

হয়েছে এখন দিনমজুর ও ভাড়াটে কর্মীতে; আবার সেইসঙ্গে এই শেষোক্ত অবস্থায় পড়ে তাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'*

বস্তুত এজমালি জমিগুলি আত্মসাৎ করার ফলে ও তার সঙ্গে কৃষিতে বিপ্লব ঘটায় তা খেত-মজুরদের অবস্থার ওপর এমন তীব্র আঘাত হানে যে এমনকি ইডেনের মতেও ১৭৬৫ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে তাদের মজুরি সর্বনিম্ন স্তরের নিচেও নেমে যায় এবং এই ঘাটতি পূরণ করতে হয় সরকারি দরিদ্র-ত্রাণ আইনের

* প্রাইস, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১৫৯। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় প্রাচীন রোমের কথা। 'ধনীরা অবিভক্ত জমির অধিকাংশের মালিকানা পেয়ে গিয়েছিল। ওই কালের অবস্থাদির ওপর আস্থা ছিল তাদের, তারা মনে করছিল যে ওই সমস্ত জমির মালিকানা তাদের কাছ থেকে ফের ফিরিয়ে নেয়া হবে না, তাই তাদের জমিজায়গার আশেপাশে দরিদ্রদের মালিকানাধীন আরও কিছু-কিছু টুকরো জমি ওইসব জমির মালিকদের মৌন সম্মতিক্রমে তারা কিনে নিল এবং আরও কিছু জমি অধিকার করে নিল বলপ্রয়োগে। ফলে ওই ধনীরা টুকরো-টুকরো জমির পরিবর্তে ব্যাপক ও বিস্তৃত একেকটি ভূখণ্ড নিয়ে চাষবাস শুরু করে দিল। অতঃপর তারা কৃষিতে ও পশুপালনের কাজে নিযুক্ত করল ক্রীতদাসদের, কেননা দাসত্বমুক্ত স্বাধীন নাগরিকদের এসব কাজে নিযুক্ত করলে তাদের কৃষি-শ্রমিকের কাজ থেকে সামরিক বাহিনীর কাজে নিয়ে নেয়ার ভয় ছিল। ক্রীতদাসদের মালিক হওয়ায় ধনীদের লাভ হল বিপুল, কেননা সামরিক বাহিনীতে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ ছিল বলে ক্রীতদাসদের সন্তান-প্রজননে কোনো বাধা ছিল না, সন্তান-সন্ততি হোতও তাদের প্রচুর সংখ্যায়। এইভাবে প্রতিপত্তিশালী লোকেরা সকল সম্পদ নিজেদের মধ্যে আহরণ করে নিয়েছিল এবং তাদের সকল জমিজায়গা কিলবিল করত ক্রীতদাসে। অপরদিকে সাধারণ ইতালীয়র মধ্যে জনসংখ্যা অনবরত কমে আসছিল, দারিদ্র্য, করভার ও সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তারা। এমনকি যখন দেশে শান্তি থাকত তখনও তাদের সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হোত, কেননা ধনীরাই ছিল দেশের সকল জমিজায়গার মালিক এবং জমিতে চাষের জন্যে তারা মুক্ত নাগরিকদের বদলে ক্রীতদাসদেরই নিযুক্ত করত।' (Appian. 'Römische Bürgerkriege', I, 7.) এই অনুচ্ছেদে লিসিনাসের কৃষি-আইন (২৭) প্রস্তাবনার আগেকার সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর এই কাজ, যা রোমান জনসাধারণের ধ্বংসকে এত অধিক পরিমাণে ত্বরান্বিত করেছিল, তা-ই আবার ছিল প্রধান উপায় যার সাহায্যে কসাইখানায় অবলম্বিত ব্যবস্থার অনুরূপ উপায়ে শার্লামেন মুক্ত জার্মান কৃষকদের পরিণত করেছিলেন ভূমিদাস ও মুচলেকাবদ্ধ দাসে।

সাহায্য নিয়ে। ইডেন বলছেন, 'খেত-মজুরদের মজুরি জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক চাহিদা মেটানোর চেয়ে পরিমাণে বেশি ছিল না।'

এখন শোনা যাক জমি-ঘেরাওয়ের নীতির জনৈক সমর্থক ও ডঃ প্রাইসের প্রতিপক্ষের একজনের এ-বিষয়ে কী বলার আছে।

'খোলা, ঘেরাওমুক্ত খেতখামারে মানুষজনকে পরিশ্রমের অপচয় ঘটাতে দেখা যাচ্ছে না বলেই গ্রামগুলির জনশূন্যতাকে এ-ব্যাপারের ফলাফল আখ্যা দেয়া উচিত হবে না।... অন্যের হয়ে কাজ করতে বাধ্য থাকবে এমন একদল মানুষে ছোট-ছোট খামারীকে পরিবর্তিত করলে যদি বেশি পরিমাণে শ্রমের উৎপত্তি ঘটে, তাহলে সেটা এমন একটা সুবিধা যা জাতির' (অবশ্য, বলা বাহুল্য, ওই 'পরিবর্তিত' মানুষেরা এই 'জাতি'র অন্তর্ভুক্ত নয়) 'কাম্য হওয়া উচিত।... একেকটি খামারে তাদের শ্রম যৌথভাবে নিয়োজিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প-কারখানাগুলির জন্যেও তাদের একটা উদ্বৃত্ত অংশ থেকে যাবে এবং এই উপায়ে হস্তশিল্প-কারখানার — জাতির এই স্বর্ণখনিগুলির — সংখ্যা শস্য-উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।'*

আবার যে-মুহূর্তে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিস্থাপনের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সবচেয়ে নির্লজ্জভাবে 'সম্পত্তির ব্যাপারে পবিত্র অধিকার'লঙ্ঘনের এবং ব্যক্তি-মানুষের বিরুদ্ধে স্থূলতম হিংস্রতা প্রদর্শনের, তখনই অর্থশাস্ত্রীর নির্বিকল্প সমাধির ভাবটি প্রকাশ করছেন লোকহিতৈষী এবং তদুপরি আবার রক্ষণশীল 'টোরি' স্যার এফ এম. ইডেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ-তৃতীয়াংশ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকে বলপ্রয়োগে জমি থেকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে চুরি-বাটপাড়ি, ঘোর দৌরাত্ম্য ও জনসাধারণের দুঃখকষ্টের যে একটানা পালা চলেছিল তা থেকে এই ভদ্রলোক নিছক এই স্বস্তিকর সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন:

---

* [J. Arbuthnot.] 'An Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions etc.', pp. 124, 129. আবার ফলাফলের দিক থেকে একই ব্যাপার প্রকাশ পেলেও বিপরীত মনোভাবাপন্ন অন্য লেখকের রচনায় বলা হয়েছে: 'শ্রমজীবী মানুষজনকে তাদের আস্তানা কুটিরগুলি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এবং কাজের সন্ধানে তারা শহরগুলিতে আসতে বাধ্য হচ্ছে; তবে এর ফলে পাওয়া যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় একটি উদ্বৃত্ত উৎপাদ এবং এইভাবে পুঁজির বাড়বৃদ্ধি ঘটছে।' [R. B. Seeley.] 'The Perils of the Nation', 2nd ed., London, 1843, p. XIV.)

'আবাদী জমি ও চারণক্ষেত্রের মধ্যে একটি উপযুক্ত অনুপাত অর্জন করার দরকার ছিল। গোটা চতুর্দশ শতক ও পঞ্চদশ শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে প্রতি এক একর চারণক্ষেত্রের অনুপাতে দেশে ছিল দুই, তিন, এমনকি চার একর পর্যন্ত আবাদী জমি। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই অনুপাতটি বদলে দাঁড়াল প্রতি দুই একর চারণক্ষেত্র-পিছু দুই একর ও পরে এক একর আবাদী জমি। অবশেষে শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত অনুপাতটিতে এসে পেঁছিনো গেল, আর তা হল প্রতি তিন একর চারণক্ষেত্র-পিছু এক একর আবাদী জমি।'

অবশ্য কৃষক ও এজমালি ভূ-সম্পত্তির মধ্যে একদিন-যে কোনো একটি যোগসূত্র ছিল ঊনবিংশ শতকে পেঁাছে তার স্মৃতিও গেল হারিয়ে। আরও সম্প্রতিকালের কথা তো বাদই দিলাম, ১৮০১ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে কৃষিজীবী জনসাধারণের কাছ থেকে যে-৩৫ লক্ষ ১১ হাজার ৭৭০ একর এজমালি জমি অপহরণ করা হল ও সংসদীয় ফন্দি-ফিকিরের সাহায্যে জমিদাররাই তা উপহার দিল জমিদারদের তার জন্যে ওই বঞ্চিত কৃষিজীবীরা কি একটি পয়সাও ক্ষতিপূরণস্বরূপ পেয়েছে?

কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে পাইকারি হারে উচ্ছেদের শেষ পর্বটি হল, যাকে বলা হয় 'Clearing of Estates' ('তালুকগুলিকে সাফ করা', অর্থাৎ তালুকগুলি থেকে জনসাধারণকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করা)। এর আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডে যে-সমস্ত উচ্ছেদের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে-সবের শেষ পরিণতি ছিল এই 'তালুক-সাফ'এ। আগের একটি অধ্যায়ে আধুনিক জীবনের পরিস্থিতির যে-চিত্র দেয়া হয়েছে তা থেকে আমরা দেখেছি যে যেখানে বিতাড়িত করার মতো মুক্ত কৃষক আর অবশিষ্ট নেই সেখানেই শুরু হয়েছে কুটিরগুলিকে 'সাফ করা'র কাজ; যাতে খেত-মজুররা যে-জমি চাষ করছে সেখানে এমনকি নিজস্ব আশ্রয়স্থলটুকুও গড়ার মতো জায়গা না-পায়। তবে 'তালুক-সাফ' বলতে সত্যিসত্যিই ও যথাযথভাবে কী বোঝায় তা আমরা জানতে পারি একমাত্র আধুনিক প্রেমোপাখ্যানের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট দেশ স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্যাঞ্চলে। সেখানে এই 'তালুক-সাফ'এর প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য হল এর সুসংবদ্ধ প্রকৃতি, এক ধাক্কায় এটিকে কার্যকর করার ব্যাপারে আয়োজনের বিপুলতা (আয়র্ল্যাণ্ডে জমিদাররা একসঙ্গে বেশ কয়েকখানি করে গ্রাম 'সাফ করা' পর্যন্ত এগিয়েছে, আর স্কটল্যাণ্ডে জার্মানির সামন্ত-রাজাদের

রাজ্যের সমান আয়তনের বড়-বড় ভূখণ্ড জুড়ে এ-কাজ চলেছে), এবং পরিশেষে তছরুপ-করা জমিগুলি যে-বিশেষ ধরনের সম্পত্তি আখ্যা দিয়ে দখল করে রাখা হয়েছে তার বিশেষত্ব।

স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের কেল্টরা সংগঠিত ছিল উপজাতি-গোষ্ঠীতে এবং এরকম একেকটি গোষ্ঠী যে-জমিতে বসতিস্থাপন করত সেই জমির মালিক হোত তা। গোষ্ঠীটির প্রতিনিধি বা প্রধান অথবা 'গোষ্ঠীপতি' হত ওই ভূ-সম্পত্তির নামেমাত্র মালিক, যেমন সকল জাতীয় ভূ-সম্পত্তির নামেমাত্র মালিক ইংলন্ডের রানী। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট যখন এই 'গোষ্ঠীপতিদের' মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও স্কটল্যান্ডের সমভূমিতে তাদের অনবরত হানা দেয়ার ব্যাপারগুলি দমন করতে সক্ষম হলেন তখনও কিন্তু 'গোষ্ঠীপতি'রা তাদের বহুকালের ডাকাতি-ব্যবসা ত্যাগ করল না কোনোমতেই, তারা কেবল ব্যবসার ধরনটা বদলাল মাত্র। নিজেদেরই কর্তৃত্ববলে তারা তাদের নামেমাত্র বা আনুষ্ঠানিক অধিকারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে পরিণত করল, এবং এর ফলে যখন তারা নিজেদেরই গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হল তখন মনস্থ করল খোলাখুলি বলপ্রয়োগে তাদের বিতাড়িত করতে। অধ্যাপক নিউম্যানের ভাষায়, 'ইংলন্ডের রাজা যদি দাবি করেন যে তাঁর প্রজাবর্গকে তাড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবেন তাহলে সেটা যেমন হয় এ-ও তেমনই।'* রাজসিংহাসনের দাবিদারের (২৮) অনুগামীদের শেষবার অভ্যুত্থানের পর স্কটল্যান্ডে সেই-যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল তার প্রথমদিককার স্তরগুলি অনুধাবন করা যেতে পারে স্যর জেমস স্টুয়ার্ট** ও জেমস

* F. W. Newman. 'Lectures on Political Economy'. London, 1851, p. 132.

** স্টুয়ার্ট বলছেন: 'যদি আপনারা এই সমস্ত জমির খাজনাকে' (তিনি ভ্রান্তিবশত এই অর্থনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'টাক্স্ম্যান'দের (২৯) দেয় গোষ্ঠী-প্রধানদের নজরানাকেও) 'জমির আয়তনের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে এই খাজনা খুবই সামান্য বলে মনে হবে। তবে যদি এর সঙ্গে তুলনা করেন প্রতিটি খামারে যতজন করে লোককে অন্ন যোগাতে হয় তার, তাহলে দেখতে পাবেন একটি উৎকৃষ্ট ও উর্বর সমভূমি-প্রদেশে একই মূল্যের একটি তালুকে যত লোক প্রতিপালিত হয় সম্ভবত তার দশগুণ লোক প্রতিপালিত হয় স্কটল্যান্ডের পার্বত্যঅঞ্চলের একটি তালুকে।' (James Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'. London, 1767, v. I, ch. XVI, p. 104.)

অ্যান্ডারসনের* রচনাদি থেকে। অষ্টাদশ শতকে পলায়নপর গেইলদের (৩০) ধরে ফেলার পর তাদের দেশত্যাগ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল এই যে বলপ্রয়োগে তাদের গ্লাসগোয় ও অন্যান্য শিল্প-শহরে চালান করা।** উনবিংশ শতকে অবলম্বিত এই পদ্ধতির*** একটি উদাহরণ হিসেবে

---

* James Anderson. 'Observations on the Means of Exciting a Spirit of National Industry etc.', Edinburgh, 1777.

** ১৮৬০ সালে বলপ্রয়োগে জমি থেকে উচ্ছেদ-করা মানুষদের মিথ্যা অজুহাতে কানাডায় চালান করে দেয়া হয়। এদের মধ্যে কিছু লোক পালিয়ে যায় পাহাড়-অঞ্চলে ও আশপাশের দ্বীপগুলিতে। সেখানেও তাদের তাড়া করে পুলিশ-বাহিনী। পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পর তারা ফের পালিয়ে যায়।

*** অ্যাডাম স্মিথের রচনাবলীর ভাষ্যকার বুকানন ১৮১৪ সালে লিখছেন: 'স্কটল্যান্ডের পার্বত্যাঞ্চলে সম্পত্তি-সম্পর্কিত প্রাচীন ব্যবস্থা প্রতিদিন একটু-একটু করে ধ্বংস করা হচ্ছে।... জমিদার উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বীকৃত প্রজার' (এখানে ভ্রান্তিবশত এই আখ্যাটি দেয়া হয়েছে) 'কথা চিন্তা না-করে সবচেয়ে উঁচু দর হাঁকছে যে তাকেই জমি দিচ্ছে আর এই শেষোক্ত লোকটি জমির উন্নতিসাধনে মনোযোগী হলে সঙ্গে সঙ্গেই সে চাষবাসের নতুন রীতির প্রবর্তন করছে। আগে যেখানে ছোট-ছোট কৃষক-প্রজা ও খেত-মজুরে তালুকগুলি ভরে থাকত, সেখানে এখন জমির উৎপাদনের সমান অনুপাতে লোকের বসতি গড়ে উঠতে লাগল, তবে উন্নত ধরনের চাষের এই নতুন ব্যবস্থা ও বর্ধিত খাজনার আওতায় সম্ভাব্য সবচেয়ে কম খরচে পাওয়া যেতে লাগল সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি ফসল; এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে অপ্রয়োজনীয় লোকজনকে স্থানান্তরিত করায় তালুকগুলিতে লোকসংখ্যা কমে গেল — জমি থেকে কত লোক প্রতিপালিত হতে পারে সে হিসেবে নয়, কত লোককে জমিতে কাজ দেয়া যেতে পারে সেই হিসাবে নির্ধারিত হল লোকসংখ্যা। জমির অধিকারচ্যুত প্রজারা হয় জীবিকার সন্ধান করতে পারে আশপাশের শহরগুলিতে,... ইত্যাদি। (David Buchanan. 'Observations on, etc. A. Smith's Wealth of Nations'. Edinburgh, 1814, v. IV, p. 144.) 'স্কটল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত অমাত্যরা যেখানে-সেখানে বেড়া তুলে দিয়ে কৃষি-পরিবারগুলিকে জমির দখলচ্যুত করেছিল এবং গ্রামগুলির ও গ্রামের বাসিন্দাদের প্রতি তেমনই আচরণ করেছিল বন্য জীবজন্তুর উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রেড ইন্ডিয়ানরা জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল গুহাগুলির যে-অবস্থা করে থাকে।... মানুষকে এখন বিনিময় করা হচ্ছে এক-টুকরো ভেড়ার চামড়া কিংবা ভেড়ার একটা লাশের সঙ্গে, — না, তার চেয়েও শস্তায় বিকোচ্ছে মানুষ।... তা-ই বা বলি কেন? মোগলরা চীনের উত্তরের প্রদেশগুলিতে বলপূর্বক প্রবেশ করেছিল যখন তখন তাদের পরিষদে তারা এইমর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল যে স্থানীয় অধিবাসীদের

সাদারল্যান্ডের ডাচেসের 'তালুক-সাফ'-এর কথা বললেই যথেষ্ট হবে এখানে। অর্থশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা এই মহিলাটি জমিদারির শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে স্থির করলেন তিনি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই বাতলাবেন এবং তাঁর শাসনাধীন গোটা অঞ্চলকে পরিণত করবেন মেষচারণ-ক্ষেত্রে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই একজাতীয় প্রক্রিয়া এর আগেই প্রয়োগের ফলে ওই তল্লাটের জনসংখ্যা তখনই কমে ১৫ হাজারে দাঁড়িয়েছিল)। ফলে ১৮১৪ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ওই ১৫ হাজার বাসিন্দা বা প্রায় ৩ হাজার পরিবারকে তাড়িয়ে ফেরা হল ও একেবারে নির্মূল করে দেয়া হল। ভেঙেচুরে পুড়িয়ে দেয়া হল ওই বাসিন্দাদের সব ক'খানি গ্রাম এবং তাদের মালিকানাধীন সকল জমি পরিণত করা হল চারণক্ষেত্রে। ব্রিটিশ সৈন্যরা এই উচ্ছেদকে কার্যকর করে তুলল, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে হাতাহাতি-মারামারি পর্যন্ত করল তারা। এক বৃদ্ধা তার কুটির ছেড়ে নড়তে অস্বীকার করায় কুটিরে আগুন দিয়ে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। এইভাবে ওই ভদ্রমহোদয়া আত্মসাৎ করে নিলেন ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমি, যা নাকি অনাদি কাল থেকে ছিল উপজাতি-গোষ্ঠীটির সম্পত্তি। এর পরিবর্তে বহিষ্কৃত অধিবাসীদের জন্যে তিনি বরাদ্দ করে দিলেন সমুদ্রের ধারে আনুমানিক ৬ হাজার একরের মতো জমি — পরিবার-পিছু ২ একর হিসেবে। ওই ৬ হাজার একর জমি তার আগে পর্যন্ত পতিত জমি হিসেবে পড়ে ছিল, এই নতুন মালিকদেরও তা থেকে কোনো আয় হল না। উদারহৃদয়া ডাচেস বস্তুত এতদূর পর্যন্ত দাক্ষিণ্য দেখালেন যে তিনি এই পতিত জমিগুলি একর-পিছু গড়পড়তা ২ শিলিং ৬ পেন্স খাজনায় চাষ করতে দিলেন সেই উপজাতি-গোষ্ঠীর লোকজনকেই যারা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী তাঁর পূর্বপুরুষের জন্যে রক্ত দিয়ে এসেছে। এইভাবে চৌর্যবৃত্তির সাহায্যে লব্ধ উপজাতিটির মালিকানাধীন পুরোটা জমি মহামান্যা ডাচেস অতঃপর বাঁটোয়ারা করে দিলেন ২৯টি বড়-বড় মেষ-প্রজন খামারে,

---

২তা করা হোক ও গোটা অঞ্চলকে পরিণত করা হোক পশুচারণ-ক্ষেত্রে। ওই প্রস্তাবটিকেই তাদের নিজেদের দেশে, নিজেদের দেশবাসীর বিরুদ্ধে কাজে পরিণত করেছে পার্বত্য-অঞ্চলের বহু ভূস্বামী।' (George Ensor, 'An Inquiry concerning the Population of Nations'. London, 1818, pp. 215, 216.)

আর প্রতিটি খামারের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত রইল একটি করে পরিবার। এগুলির বেশিরভাগই ছিল ইংলন্ড থেকে আমদানি-করা খামার-ভৃত্যদের পরিবার। ১৮২৫ সালের মধ্যেই আগেকার সেই ১৫ হাজার গেইল-বাসিন্দার জায়গা নিয়েছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার ভেড়া। সমুদ্রের ধারে আছড়ে ফেলে-দেয়া আদিবাসীদের অবশিষ্টাংশ তখন চেষ্টা করছিল মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করতে। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল উভচর এবং জনেক ইংরেজ লেখকের ভাষায় বাস করছিল অর্ধেক ডাঙায় ও অর্ধেক জলে, অধিকন্তু মাত্র অর্ধেকটা করে উভয় স্থলে।*

তবে উপজাতি-গোষ্ঠীর 'গোষ্ঠীপতিদের' প্রতি বীর গেইলদের রোমান্টিক ও পার্বত্য জীবন-সঞ্জাত পরম ভক্তির জন্যে তাদের আরও কঠোর-কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। তাদের ধরা মাছের আঁষটে গন্ধ যথারীতি ওই গোষ্ঠীপতিদের নাকে গিয়ে পেঁছিল। এতেও মুনাফার গন্ধ পেয়ে গোষ্ঠীপতিরা সমুদ্রতীর ইজারা দিয়ে দিল লন্ডনের বড়-বড় মৎস্য-ব্যবসায়ীকে। আর দ্বিতীয় বারের মতো গেইলরা আবার তাড়া খেয়ে বিতাড়িত হল।**

---

* যখন সাদারল্যান্ডের বর্তমান ডাচেস লন্ডনে খুব ঘটা করে 'টম-কাকার কুটির' গ্রন্থটির লেখিকা শ্রীমতী বীচর-স্টোকে পান-ভোজনে আপ্যায়িত করে আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রতি দরদ দেখানোর প্রয়াস পেলেন (প্রসঙ্গত বলি, ডাচেস-মহোদয়া ও তাঁর সমধর্মী অভিজাতবর্গ এই দরদ দেখানোর ব্যাপারটি কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই ভুলে বসেছিলেন এবং সে-সময়ে প্রতিটি 'অভিজাত' ইংরেজ-হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল ক্রীতদাস-মালিকদের প্রতিই দরদে পূর্ণ হয়ে), তখন *New-York Tribune* পত্রিকায় আমি সাদারল্যান্ড-পরিবারের ক্রীতদাসদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করেছিলাম (৩১)। (আংশিকভাবে আমার এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেছেন কেরি তাঁর 'The Slave Trade', Philadelphia, 1853, pp. 203, 204 বইটিতে। আমার এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় একটি স্কটিশ সংবাদপত্রে এবং তার ফলে ওই সংবাদপত্র ও সাদারল্যান্ড-পরিবারের পারিষদবর্গের মধ্যে বেশ-একটু তর্কাতর্কিও হয়।

** এই মাছের ব্যবসা সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে মিঃ ডেভিড আর্কার্টের 'Portfolio, New Series' বইটিতে। — নাসাউ ডব্লু. সিনিয়র

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেষচারণ-ক্ষেত্রের একটা অংশ পরিণত হল হরিণ-পালনের অভয়ারণ্যে। প্রত্যেকেরই জানা আছে যে ইংলণ্ডে সত্যিকার অরণ্য বলতে কিছু নেই। বড়লোকদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে পোষা হরিণগুলি লণ্ডনের পুরসভার সম্মানিত সদস্যদের মতোই গোলগাল ও নিছক বিনীত গৃহপালিত জীব ছাড়া কিছু নয়। তাই স্কটল্যাণ্ড হল গিয়ে এই 'অভিজাত শৌখিনতা'র শেষ আশ্রয়।

১৮৪৮ সালে সোমার্স লিখছেন, 'পার্বত্য-অঞ্চলে নতুন-নতুন অরণ্য গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো। এধারে, গেইক নদীর এপারে আপনি পাবেন গ্লেনফেশি-র নতুন অরণ্য, আর গেইক-এর ওপারে পাবেন আর্ডভেরিকি-র নতুন অরণ্য। ওই একই সরলরেখা-বরাবর আপনি পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক মাউণ্ট — সম্প্রতি গড়ে-তোলা বিশাল এক পতিত ভূখণ্ড। পূব থেকে পশ্চিমে — অ্যাবার্ডিনের আশপাশের এলাকা থেকে ওবান-এর পাহাড়-সারির দিকে যেতে এখন আপনি পেয়ে যাবেন বহু অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন সারি। এছাড়া পার্বত্য-অঞ্চলের অন্যান্য তল্লাটে আছে লখ আর্কেইগ, গ্লেনগ্যারি, গ্লেনমরিস্টন, ইত্যাদি নতুন-নতুন অরণ্য। 'গ্লেন' বা নদীর সংকীর্ণ উপত্যকাগুলি এককালে ছিল ছোট-ছোট খামারী-কৃষকদের সম্প্রদায়গত আবাসভূমি, পরে সেগুলিতে প্রবর্তন করা হল মেষচারণের; প্রথমোক্তদের সেইসব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হল আরও বন্ধুর ও অনুর্বর জমিতে জীবনধারণের উপায়সন্ধানে। এখন আবার ভেড়ার জায়গা নিচ্ছে হরিণের পাল, আর এগুলি ফের একবার জমি থেকে উচ্ছেদ করছে ছোট-ছোট প্রজাস্বত্বভোগী কৃষককে — যাদের অবশ্যই হটিয়ে দেয়া হবে আরও বেশি বন্ধুর, পর্বতসংকুল জমিতে, ফেলে দেয়া হবে আরও নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে। হরিণ-পালনের অভয়ারণ্য* এবং মানুষ কখনোই পাশাপাশি সহ-অবস্থান করতে পারে না, এদের একজন-না-একজনকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলে, শতাব্দীর গত চতুর্থাংশে যেমনটা হয়েছে তেমনই আগামী চতুর্থাংশেও অরণ্যগুলি বেড়ে চলুক সংখ্যায় ও আয়তনে আর গেইলরা উৎসন্ন হয়ে যাক তাদের বাসভূমি থেকে।... পার্বত্য-অঞ্চলের ভূস্বামীদের মধ্যে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ

তাঁর (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) বইতে 'সাদারল্যাণ্ড জেলায় অবলম্বিত ব্যবস্থাদি'কে আখ্যা দিয়েছেন 'মানুষের স্মরণকালে সবচেয়ে হিতকর তালুক-সাফগুলির একটি' বলে। 'Journals, Conversations and Essay relating to Ireland'. London, 1868.

* স্কটল্যাণ্ডের হরিণ-পালনের অরণ্যগুলিতে কিন্তু একটিও গাছ নেই। ন্যাড়া পাহাড়গুলো থেকে ভেড়াদের তাড়িয়ে বের করে নিয়ে গিয়ে সেখানে হরিণদের তাড়িয়ে এনে সেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে হরিণ-পালন অরণ্য। সেখানে এমনকি কাঠের জন্যেও গাছ পোঁতা ও সত্যিকার জঙ্গল গড়ে তোলার আবাদও হয় না।

কিছু-কিছু লোকের পক্ষে ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপার... কারও-কারও কাছে শিকারের প্রলোভন এটা... আবার অপেক্ষাকৃত বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন অপর অনেকের কাছে একমাত্র মুনাফার দিকে চেয়ে হরিণ নিয়ে ব্যবসা ছাড়া এটা আর কিছু নয়। কারণ এটা একটা ঘটনা যে একটা পর্বতশ্রেণীকে 'অরণ্য' হিসেবে গড়ে তুললে বহুক্ষেত্রেই তা ভূস্বামীর পক্ষে বেশি লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়, ওই পাহাড়-অঞ্চলকে মেষচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত করার চেয়ে।... যে-শিকারি হরিণ-পালনের অরণ্য ইজারা নিতে চায় ইজারা-বাবদ খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একমাত্র নিজের পকেটের অবস্থা ছাড়া আর কোনো সীমাই সে মানে না।... পার্বত্য-অঞ্চলের মানুষের ওপর দুঃখদুর্দশার যে-বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা নর্মান-রাজাদের অনুসৃত নীতির ফলে সৃষ্ট দুঃখকষ্টের চেয়ে কোনো অংশে কম কঠোর কিনা সন্দেহ। হরিণগুলির জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বিশাল-বিশাল সব এলাকা আর মানুষদের ক্রমশ তাড়িয়ে নিয়ে ঠেসে পুরে দেয়া হচ্ছে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর বৃত্তের পরিধিতে।... জনসাধারণের একটার-পর-একটা স্বাধীনতাকে সবলে কেড়ে নেয়া হয়েছে।... অত্যাচার-উৎপীড়নের মাত্রা বেড়ে চলেছে প্রতিদিন।... জনসাধারণকে জমি থেকে উৎখাত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়া, তালুক-সাফ করার কাজটা ভূস্বামীরা করে চলেছে পূর্ব-নির্ধারিত নীতি হিসেবে, কৃষি-ব্যবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা কাজ হিসেবে, ঠিক যেমন করে আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় পতিত জমিজায়গা থেকে গাছপালা ও ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে ফেলা হয়। আর এই সমগ্র কাজটা চলেছে নিঃশব্দে, ব্যবসাদার-সুলভ সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে, ইত্যাদি।'*

---

* Robert Somers. 'Letters from the Highlands; or the Famine of 1847'. London, 1848, pp. 12-28 passim. এই চিঠিগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল *Times* পত্রিকায়। ইংরেজ অর্থশাস্ত্রীরা অবশ্য ১৮৪৭ সালের গেইল-অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন অঞ্চলটিতে জনসংখ্যার আধিক্যকে। ব্যাপারটা যা-ই হোক, বলা হয়েছে যে জনসাধারণ নাকি 'তাদের খাদ্য-সরবরাহের ওপর অতিরিক্ত চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল'। 'তালুক-সাফ'এর ব্যাপারটা, অথবা জার্মানিতে যাকে বলা হয় 'Bauernlegen', তা বিশেষ করে জার্মানিতে সাধিত হয় ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের (৩২) পরে, এবং এর ফলে এমনকি এর অনেক পরে ১৭৯০ সালেও — স্যাক্সনি রাজ্যে কয়েকটি কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে। এ-ব্যাপারটা ঘটতে দেখা যায় বিশেষ করে পূর্ব-জার্মানিতে। প্রায় সকল প্রুশীয় প্রদেশেই দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ সেই প্রথম কৃষকদের সম্পত্তির অধিকারকে বলবৎ করলেন। সাইলেসিয়া জয় করার পর তিনি ভূস্বামীদের বাধ্য করলেন কৃষকদের কুঁড়েগুলি ও গোলাবাড়ি, ইত্যাদি নতুন করে নির্মাণ করে দিতে এবং কৃষকদের চাষের ঘোড়া ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যোগাতে। কারণ তাঁর সেনাবাহিনীতে সৈন্যের যোগান ও রাজকোষ পূর্ণ করার জন্যে করদাতা গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া বাকি সবকিছুর, ফ্রিডরিখের অর্থ-ব্যবস্থা এবং জগাখিচুড়ি স্বৈরাচার, আমলাতন্ত্র ও

সামন্ততান্ত্রিক শাসনের আওতায় কৃষকরা কেমন আনন্দে জীবন কাটাত তার বর্ণনা পাওয়া যাবে ফ্রিড্রিখের গুণমুগ্ধ মিরাবো-র রচনার নিচের উদ্ধৃতি থেকে: 'উত্তর জার্মানির কৃষকদের অন্যতম প্রধান সম্পত্তি হল শণ। কিন্তু মানবজাতির অসুখের জন্যে এ হল শুধু চরম নিঃস্বতার কিছুটা প্রতিকারের উপায়, সচ্ছলতার উৎস নয়। প্রত্যক্ষ কর, বেগার খাটুনি, নানা ধরনের বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের ফলে চাষী দরিদ্র হয়, তাছাড়া সে যা-কিছু ক্রয় করে সেই সবকিছুর জন্যে পরোক্ষ কর দেয়... এবং সর্বোপরি বিপদ এই যে সে তার মালপত্র নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী যে-কোনো জায়গায় আর দামে বিক্রি করতে পারে না; যে বণিক উপযুক্ত দামে জিনিসপত্র বিক্রি করতে প্রস্তুত সেই বণিকের কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাষী কিনতে পারে না। এই পরিস্থিতির ফলে ক্রমে-ক্রমে চাষী দরিদ্র হয়ে পড়ছে, তাছাড়া সুতো না-কাটলে সে প্রত্যক্ষ কর যোগাতেও অক্ষম হচ্ছে। সুতো কাটা তার পক্ষে এক প্রয়োজনীয় সহায়, তাতে তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকরচাকরানিকে ও তার নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো সম্ভব। এই সহায় সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক জীবন তাদের! গ্রীষ্মকালে জমিচাষ ও ফসল তোলার কাজে সে সশ্রম দণ্ডভোগীর মতো কাজ করে, সন্ধে ৯টায় যায় ঘুমোতে এবং ঘুম থেকে ওঠে রাত ২টোয়। শীতকালে একটু বেশি বিশ্রাম করে তার শক্তি-সামর্থ্যের পুনরুজ্জীবন দরকার হয়ে পড়ে, কিন্তু যদি সে কর দেওয়ার জন্যে তার উৎপন্ন ফসল ইত্যাদির একাংশ বিক্রি করে, তাহলে খাদ্য ও শস্যবীজের উপযোগী শস্যের অনটন ঘটবে তার। এই অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে সে সুতো কাটতে বাধ্য হয়... বাধ্য হয় খুবই বেশি উৎসাহ নিয়ে সুতো কাটতে। তাই শীতকালে চাষী ঘুমোতে যায় রাত বারোটা বা একটায় এবং ওঠে ভোরবেলায় পাঁচটা বা ছ'টায়, কিংবা ঘুমোতে যায় সন্ধে ন'টায় এবং ওঠে রাত দু'টোয়। এমনিভাবে চলে তার সারাটা জীবন, একমাত্র রবিবার বাদে।... এই অতিরিক্ত জাগরণ, অনিদ্রা এবং অত্যধিক পরিশ্রমে কৃষকের শরীর দুর্বল হয়ে যায়; সে-কারণে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে নরনারী খুবই অল্প বয়সে বৃদ্ধ হয়।' (মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২ ও তার পরবর্তী অংশ।)

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রদত্ত পাদটীকা। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ ওপরে উল্লিখিত রবার্ট সোমার্সের গ্রন্থটি প্রকাশের ১৮ বছর পরে, অধ্যাপক লেওন লেভি রাজকীয় শিল্প-সমিতির (৩৩) এক সভায় মেষচারণ-ক্ষেত্রগুলিকে হরিণ-পালন অরণ্যে রূপান্তরকরণ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি স্কটিশ পার্বত্য-অঞ্চল বিধ্বস্তকরণের অগ্রগতির বর্ণনা দেন। অন্যান্য নানা কথার সঙ্গে তিনি বলেন: 'তালুকগুলিকে জনশূন্য করা ও সেগুলিকে মেষচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত করা ছিল নিখরচায় ভালোরকম আয় করার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক কয়েকটি উপায়।... আবার মেষচারণ-ক্ষেত্রের জায়গায় হরিণ-পালন অরণ্য

গির্জার সম্পত্তি-লুণ্ঠন, রাষ্ট্রীয় তালুকগুলির প্রতারণাপূর্ণ হস্তান্তর, সাধারণের এজমালি জমিগুলির ওপর ডাকাতি, সামন্ত-ভূস্বামীদের ও

গড়ে তোলা পার্বত্য-অঞ্চলে ছিল পরিবর্তন-সাধনের একটি সাধারণ ধরন। জমিদারেরা একদিন যেমন তাদের তালুক থেকে মানুষজনকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, তেমনই এখন বহিষ্কার করে দিল ভেড়ার পালকে এবং স্বাগত জানাল নতুন প্রজাদের — বন্য পশুপালকে ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পক্ষিকুলকে।... এখন যে-কেউ ফর্‌ফার্‌শায়ারে আর্ল-অব-ডালহৌসির তালুকগুলি থেকে পায়ে হেঁটে জন ও'গ্রোট্‌সের তালুকে যেতে পারেন একবারের জন্যেও অরণ্যভূমি ছেড়ে বাইরে না-বেরিয়েই।... এই সমস্ত বনের অনেকগুলিতেই শেয়াল, বনবেড়াল, মার্‌টেন, খট্টাশ এবং পাহাড়ি খরগোশ অজস্র দেখা যায়; তদুপরি মেঠো খরগোশ, কাঠবিড়ালী ও ইঁদুরও সম্প্রতি দেখা দিয়েছে গ্রামাঞ্চলে। এইভাবে বিশাল-বিশাল ভূখণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিবরণীতে যার মধ্যে অনেকখানি এলাকাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় সমৃদ্ধ ও বিপুলায়তন চারণক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সকল প্রকার চাষ-আবাদ ও উন্নতিসাধন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে এবং পুরোপুরি নিয়োজিত হয়েছে বছরের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প একটুখানি সময়ের জন্যে মুষ্টিমেয় জন-কয়েক মানুষের শিকার-খেলার প্রয়োজনে।'

লণ্ডনের *Economist* (৩৪) পত্রিকার ১৮৬৬ সালের ২ জুনের সংখ্যায় বলা হয়েছে, 'একটি স্কচ পত্রিকায় গত সপ্তাহের সংবাদের তালিকার মধ্যে আমরা পড়লাম: 'সাদারল্যাণ্ড জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মেষপালন-খামারকে এ-বছর বর্তমান ইজারার মেয়াদ শেষ হলে বছরে ১,২০০ পাউণ্ড খাজনায় ফের ইজারা নেয়ার একটি প্রস্তাব সম্প্রতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু জানা গেল যে খামারটিকে এখন পরিণত করা হবে একটি হরিণ-পালন অরণ্যে।' এখানে আমরা সামন্ততন্ত্রের আধুনিক সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি... প্রবৃত্তিগুলি অনেকখানি সেই একই রকম প্রক্রিয়ায় কাজ করছে যেমন সেগুলি কাজ করেছিল নর্মান বিজেতা-বীর... যখন ৩৬খানি গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছিলেন 'নতুন অরণ্য' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।... বিশ লক্ষ একর জমি... এইভাবে পুরোপুরি অনাবাদী পড়ে রইল, অথচ তার মধ্যে রয়ে গেছে স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে উর্বর আবাদগুলির কয়েকটি। টিল্‌ট্‌ নদী-উপত্যকার স্বাভাবিক ঘাস হচ্ছে পার্থ্‌-জেলার মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর পশুখাদ্য। বেন আল্‌ডারের হরিণ-পালন অরণ্য প্রশস্ত বাডেনখ-জেলার গোটা তল্লাটের মধ্যে ছিল অতুলনীয় রকমের সেরা চারণভূমি; ব্ল্যাক মাউণ্ট অরণ্যের একটা অংশ গোটা স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে কালোমুখ ভেড়ার পক্ষে ছিল সবচেয়ে উপযোগী সেরা চারণক্ষেত্র। স্কটল্যাণ্ডে নিছক শিকার ও আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে কী পরিমাণ জমিজায়গা-যে পতিত করে ফেলা হয়েছে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে এই তথ্যটি থেকে যে উপরোক্ত জমির আয়তন গোটা পার্থ্‌-জেলার আয়তনের চেয়ে বেশি। বেন অ্যাল্‌ডারের প্রাকৃতিক

উপজাতি-গোষ্ঠীগর্নলির সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, এবং সংঘবদ্ধ বেপরোয়া ভীতি-প্রদর্শনের মারফত উপরোক্ত ওই সমস্ত সম্পত্তিকে আধর্নিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রর্পান্তরিত করা — এই সবই ছিল আদিম সঞ্চয় সংগ্রহের কয়েকটি কাল্পনিক সর্খ-সারল্যেভরা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগর্নলির সাহায্যেই জমিজায়গা জয় করে নেয়া হয়েছিল পর্নজিতন্ত্রী কৃষি-ব্যবস্থার বিকাশের জন্যে, জমিকে এগর্নল পরিণত করেছিল পর্নজির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে এবং শহরের শিল্প-কারখানাগর্নলির জন্যে সরবরাহ করেছিল প্রয়োজনীয় 'স্বাধীন' ও আইনের রক্ষণাবেক্ষণ-বঞ্চিত প্রলেতারিয়েত।

৩। পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে জমির দখলচ্যুতদের বির্নদ্ধে রক্তক্ষয়ী আইনসমূহ। পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে মজর্নিবর্নদ্ধি-রোধ

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন মজর্নিভোগী ইত্যাদি পোষ্যদের দলকে-দল ভেঙে দেয়া এবং জমি থেকে জনসাধারণকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করার ফলে সৃষ্ট তথাকথিত 'স্বাধীন' প্রলেতারিয়েত যত দ্রুত বহির্বিশ্বে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল সদ্য-জায়মান হস্তশিল্প-কারখানাগর্নলির পক্ষে ততখানি দ্রুত তাদের কাজে লাগিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। অপরদিকে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি থেকে আচমকা উৎপাটিত পর্বোক্ত ওই জনসমষ্টির পক্ষেও সম্ভব ছিল না নতুন পরিস্থিতির রীতিনীতির সঙ্গে সহসা নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়াও। ফলে, অংশত মানসিক প্রবণতার কারণে এবং বিপর্ল সংখ্যাধিকের ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রের টানাপড়েনেও সদলবলে তারা পরিণত হল ভিক্ষর্ক, ডাকাত ও

সম্পদের হিসাব দিলে কিছর্টা ধারণা হতে পারে জায়গাটা বলপ্রয়োগে জনশর্ন্য করে দেয়ায় কতখানি ক্ষতি হয়েছে। ওই জমিতে ১৫ হাজার ভেড়া চরানোর কাজ চলতে পারত এবং যেহেতু ওই অরণ্যভূমি স্কটল্যান্ডের প্রাচীন বনভূমির এক-ত্রিংশাংশের বেশি নয়... অতএব তাকে কাজে লাগানো যেতে পারত, ইত্যাদি ইত্যাদি।... ওই সমগ্র অরণ্যভূমি এমনিভাবে রয়ে গেছে সম্পর্ণত নিষ্ফলা, বন্ধ্যা হয়ে।... গোটা তল্লাটটিকে উত্তর সাগরের জলের তলায় তলিয়ে দেয়া একই ব্যাপার ছিল।... আইনসভার উচিত মানর্ষের-তৈরি এই ধরনের ঊষর, জনশর্ন্য জায়গা বা মরর্ভূমির প্রসার দৃঢ় হস্তক্ষেপে বন্ধ করা।'

ভবঘুরেতে। একারণেই পঞ্চদশ শতকের শেষে ও গোটা ষোড়শ শতক জুড়ে সারা পশ্চিম ইউরোপে আমরা দেখতে পাই ভবঘুরে-বৃত্তির বিরুদ্ধে জারি-করা রক্তক্ষয়ী নানা আইনের ছড়াছড়ি। বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বপুরুষ বাধ্যতামূলকভাবে ভবঘুরে ও নিঃস্বতে রূপান্তরিত হওয়ায় এইভাবে তারা দমনপীড়নের সম্মুখীন হল। আইনের চোখে তারা গণ্য হল 'স্বেচ্ছা'-অপরাধী হিসেবে এবং আইন-ব্যবস্থা ধরেই নিল যে সবকিছু নির্ভর করছে যে-পুরনো অবস্থার আর অস্তিত্ব ছিল না সেই অবস্থার আওতায় কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে ওই জনসমষ্টির শুভেচ্ছার ওপর।

ইংলণ্ডে এই আইন-প্রণয়নের কাজ শুরু হয় রাজা সপ্তম হেন্‌রির আমলে :

রাজা অষ্টম হেন্‌রির আমলে ১৫৩০ সালের আইনে বলা হল : যে-সমস্ত ভিক্ষুক বৃদ্ধ ও কর্মক্ষম নয় তারা ভিক্ষাজীবী হিসেবে লাইসেন্স পাবে। অপরপক্ষে শক্তসমর্থ ভবঘুরেদের কপালে জুটবে বেত্রাঘাত ও কারাদণ্ড। এই শেষোক্তদের ঘোড়ায়-টানা গাড়ির পেছনে বেঁধে যতক্ষণ-না তাদের পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে ততক্ষণ বেত মেরে যাওয়া হবে, তারপর তাদের এইমর্মে শপথ করতে হবে যে তারা নিজ-নিজ জন্মস্থানে ফিরে যাবে অথবা গত তিন বছর যেখানে ছিল ফিরে সেখানে যাবে এবং 'নিজেদের কোনো-না-কোনো কাজে' লাগাবে। কী নিষ্ঠুর পরিহাসই-না এটা! অষ্টম হেন্‌রির রাজত্বের ২৭শ বর্ষের আইনে আগেকার সংবিধির পুনরুক্তি করা হয়েছে বটে, তবে নতুন-নতুন ধারা যোগ করে আইনটিকে আরও বলশালীও করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে ভবঘুরে-বৃত্তির দায়ে কেউ দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হলে তার ওপর বেত্রদণ্ডের পুনরাবৃত্তি হবে এবং একটা কানের অর্ধেকটা কেটে ফেলা হবে। তবে তৃতীয়বার এই একই অপরাধের জন্যে অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে, তাকে ঘাগী অপরাধী ও সমাজ-স্বার্থের শত্রু আখ্যা দিয়ে।

রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আমলে ১৫৪৭ সালে, অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে, জারি-করা সংবিধিতে বলা হয়েছে যে কেউ যদি কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে যে-ব্যক্তি কর্মবিমুখ অলস বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তারই কাছে অপরাধীকে ক্রীতদাস হিসেবে দণ্ডভোগ

খাবার হিসেবে দাস-মালিক তার ক্রীতদাসকে খেতে দেবে শুধু রুটি, জল, পাতলা ঝোল আর যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করবে তেমন ঝড়তিপড়তি মাংসের টুকরোটাকরা। কাজটা যতই জঘন্য হোক-না কেন দাস-মালিকের অধিকার থাকবে শেকলে দিয়ে বেঁধে ও বেত মেরে ক্রীতদাসকে দিয়ে তা জবরদস্তি করানোর। ক্রীতদাস যদি একপক্ষ-কাল কাজে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সারা জীবনের মতো সে পরিণত হবে ক্রীতদাসে এবং তার কপালে কিংবা গালে ইংরেজি 'S'-অক্ষরটি (ইংরেজি 'slave' (দাস) শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দেয়া হবে; যদি পরপর তিনবার সে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে 'দুর্বৃত্ত' আখ্যা দিয়ে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। মালিক তাকে বিক্রি ও দান করতে পারবে, ক্রীতদাস হিসেবে অন্যের কাছে ভাড়া খাটাতেও পারবে, সে হবে অপর যে-কোনো অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা গবাদি পশুর সমান। ক্রীতদাসেরা যদি দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে কোনোরকম গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করে, তাহলেও তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের কাজ হল, দাসের পলায়ন সম্বন্ধে কোনো খবর পেলে তাড়া করে শয়তানগুলোকে গ্রেপ্তার করা। এমন যদি দেখা যায় যে কোনো ভবঘুরে পরপর তিনদিন কাজকর্ম না-করে কুঁড়েমি করছে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করে তার জন্মস্থানে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তার বুকে জ্বলন্ত লাল লোহার ছেঁকা দিয়ে ইংরেজি 'V'- অক্ষরটি (ইংরেজি 'vagabond' (ভবঘুরে) শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দিয়ে তাকে শেকলে বেঁধে রাস্তার কাজে কিংবা অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হবে। ভবঘুরেটি যদি তার জন্মস্থানের মিথ্যে পরিচয় দেয়, তাহলে তার উল্লেখ-করা জায়গাটির যাবজ্জীবন ক্রীতদাসে পরিণত হবে সে, দাসত্ব করবে সে সেখানকার অধিবাসীদের অথবা সেখানকার পুরসভার এবং তার গায়ে 'S'-অক্ষরটি দেগে দেয়া হবে। এই ভবঘুরেদের সন্তানসন্ততিকে নিজেদের অধীন করে নেয়ার ও শিক্ষানবিশ হিসেবে তাদের কাজে লাগানোর অধিকার থাকছে সকল মানুষের, ছেলেদের ২৪ বছর ও মেয়েদের ২০ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের এইভাবে অধীনে রাখতে পারে সকলেই। যদি তারা পালিয়ে যায় তাহলে তাদের ধরে এনে ওই বয়স না হওয়া পর্যন্ত মালিকদের দাস করে রাখতে হবে তাদের, আর মালিকরা ইচ্ছে করলে তাদের শেকলে বেঁধে রাখতে কিংবা

বেত মারতে পারবে, ইত্যাদি। প্রতিটি দাস-মালিক তার ক্রীতদাসের গলায়, দুই বাহুতে অথবা দুই পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখতে পারবে, যা দিয়ে তাকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও নিশ্চিতভাবে চিনে নেয়া যাবে।* এই সংবিধির শেষাংশে বলা হয়েছে যে কোনো একটি জায়গা বা কিছু-কিছু লোক কিছু-সংখ্যক দরিদ্রকে কাজে নিযুক্ত করতে পারে, যদি তারা ওই দরিদ্রদের খাদ্য-পানীয় দিতে ও তাদের জন্যে কাজ খুঁজে দিতে ইচ্ছুক থাকে। যাজক-পল্লীগুলিতে এই ধরনের ক্রীতদাস পোষণের প্রথা ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতকেও বেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এই দাসেরা পরিচিত ছিল 'roundsmen' (ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়-সম্পর্কিত ফরমায়েশ সংগ্রাহক) নামে।

১৫৭২ সালে প্রবর্তিত রানী এলিজাবেথের আইন-অনুযায়ী ১৪ বছরের বেশি বয়সের লাইসেন্সবিহীন ভিক্ষুকদের প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত করার এবং তাদের বাঁ-কানে দাগা দিয়ে দেয়ার নিয়ম ছিল, যদি-না কেউ তাদের অন্ততপক্ষে দু'বছরের জন্যে কাজে নিযুক্ত করার দায়িত্ব নিত। ভিক্ষাবৃত্তির এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে এবং ভিক্ষুকদের বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হোত, তবে এক্ষেত্রেও কেউ তাদের দু'বছরের জন্যে কাজে নিযুক্ত করতে রাজি হলে দণ্ডাদেশ মকুব করা হোত। কিন্তু তৃতীয়বার ফের এ-ধরনের অপরাধ করলে ভিক্ষুকদের দুর্বৃত্ত বলে গণ্য করে বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না-দেখিয়ে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হোত। এই ধরনের তৎকালীন অপরাপর সংবিধি হল, এলিজাবেথের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে জারি করা আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায় ও ১৫৯৭ সালের অপর একটি আইন।**

---

* ১৭৭০ সালে প্রকাশিত 'বাণিজ্য, ইত্যাদি বিষয়ক নিবন্ধাবলী'র লেখক বলছেন, 'রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে মনে হয় ইংরেজ জাতি বস্তুতই আন্তরিকভাবে হস্তশিল্প-কারখানার বিস্তারে উৎসাহ দিতে ও দরিদ্রদের কারখানার কাজে নিযুক্ত করতে শুরু করেছিল। এটি আমরা জানতে পারি একটি বিশেষ উল্লেখ্য সংবিধি থেকে, যা শুরু হয়েছে এইভাবে: 'যে সকল ভবঘুরেকে দেগে দেয়া হবে', ইত্যাদি ইত্যাদি। ('An Essay on Trade and Commerce'. London, 1770, p. 5.)

** টমাস মোর তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে বলছেন: 'অতএব লোলুপ ও তৃপ্তিহীন আগ্রাসক এবং স্বদেশের অভিশাপস্বরূপ সেই ব্যক্তি মনে-মনে দুষ্টবুদ্ধি আঁটিয়া একটিমাত্র

বেড়া কিংবা ক্ষুদ্র বৃক্ষসারির সাহায্যে বহু সহস্র একর জমি ঘিরিয়া লইবার পর কৃষকেরা তাহাদের নিজস্ব এলাকা হইতে বহিষ্কৃত হইল, অথবা হয় ফাঁকি ও জুয়াচুরি নয়তো সহিংস উৎপীড়নের সাহায্যে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হইল, অথবা অন্যায় আচরণ ও ক্ষতিসাধনের দ্বারা তাহাদিগকে এতই উত্যক্ত করিয়া তোলা হইল যে তাহারা সবকিছু বেচিয়া দিতে বাধ্য হইল: অতএব যে-কোনো উপায়ে, ছলে-বলে যেমন করিয়াই হউক, বিতাড়িত করা হইল সেই দরিদ্র, নিরীহ, হতভাগ্য মানুষগুলিকে, সেই পুরুষ, স্ত্রীলোক, স্বামী, স্ত্রী, অনাথ শিশু, বিধবা, শিশুসন্তান-ক্রোড়ে ক্রন্দনরতা মাতার দলকে এবং তৈজসপত্রের বিচারে সামান্য হইলেও জনসংখ্যার বিচারে যাহা প্রাচুর্যে পূর্ণ (কেননা কৃষক-পরিবারে বহুসংখ্যক কাজের লোকের প্রয়োজন হয় বলিয়া) সেই অগণিত পরিবারকে। তাহাদের চির-পরিচিত, অভ্যস্ত ঘর-সংসার ও পরিবেশ ছাড়িয়া তাহারা উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটিয়া চলিল, এমনকি বিশ্রাম করিবার, মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকুও পাইল না কোথাও। তাহাদের ঘর-গৃহস্থালির ব্যবহার্য সামগ্রী সমুদায়, আর্থিক মূল্যের বিচারে যৎসামান্য হইলেও যেগুলি অবশ্যই বিক্রয়যোগ্য, দ্রুত ও আকস্মিকভাবে গৃহ হইতে বিতাড়িত হওয়ায় সেগুলি তাহারা বলিতে গেলে বিনামূল্যেই বিকাইয়া দিতে বাধ্য হইল। আর যখন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের সেই স্বল্প সঞ্চয় বা 'ব্যাঙের আধুলি' নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তাহারা চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত আর কী-ই বা অবলম্বন করিতে পারিত এবং তাহার পর ন্যায্যত (হা ঈশ্বর!) ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া পড়া অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া তাহাদের ভাগ্যে আর কী-ই বা ছিল? ইহার পরও ভবঘুরে বলিয়া তাহাদের নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে, কারণ তাহারা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং কোনো কাজ করিতেছিল না: যদিও তাহারা কর্মের সন্ধানে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তবু কেহই তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিত না।' এই সমস্ত অসহায় পলাতক, যারা দায়ে পড়ে চুরি করতে বাধ্য হত বলে টমাস মোর উল্লেখ করছেন, অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে এদের মধ্যে '৭২ হাজার বড় ও ছিঁচকে চোরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।' (Holinshed. 'Description of England', v. I, p. 186.) রানী এলিজাবেথের সময়ে 'দুর্বৃত্তদিগকে ক্ষিপ্রগতিতে একত্র বাঁধিয়া রাখা হইত এবং তখন সাধারণত এমন একটি বৎসরও কাটিত না যে-বৎসরের মধ্যে তিন অথবা চারিশত ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে গলাধঃকরণ করিয়া না-ফেলিত।' (Strype. 'Annals of the Reformation and Establishment of Religion and other Various Occurrences in the Church of England during Queen Elisabeth's Happy Reign', 2nd ed., 1725, v. II.) ওই একই স্ট্রাইপের বিবরণ-অনুযায়ী সমারসেটশায়ারে এক বছরের মধ্যে ৪০ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়, ৩৫ জন দস্যুর শরীরে দাগা দেয়া হয়, ৩৭ জনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং ১৮৩ জনকে ছেড়ে

প্রথম জেমসের আমল: যে-কোনো লোককে অযথা ঘুরে বেড়াতে ও ভিক্ষা করতে দেখা যাবে তাকেই বদমায়েশ ও ভবঘুরে বলে ঘোষণা করা হবে। স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের এ-ব্যাপারে সরকারিভাবে অধিকার দেয়া হয়েছে যে Petty Sessions- এর (৩৫) অনুষ্ঠান করে তাঁরা এই সমস্ত অপরাধীকে প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ড দিতে পারবেন এবং প্রথম অপরাধের জন্যে অপরাধীদের ৬ মাসের ও দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্যে ২ বছরের কারাদণ্ড-বিধান করতে পারবেন। কারাদণ্ড ভোগের সময়ে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকরা যেমন প্রয়োজন বোধ করবেন সেই অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিদের যতবার ও যত ঘনঘন খুশি বেত্রদণ্ডের বিধানও দিতে পারবেন।... সংশোধনের অসাধ্য ও বিপজ্জনক বদমায়েশদের বাঁ-কাঁধে 'R'- অক্ষরটি (ইংরেজি 'Rogue' শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দিতে হবে এবং কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করতে হবে তাদের। আর যদি ফের তাদের ভিক্ষা করতে দেখা যায় তাহলে কোনোরকম দয়াদাক্ষিণ্য না-দেখিয়ে প্রাণদণ্ড দিতে হবে তাদের। অষ্টাদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত এই সমস্ত সংবিধি আইনসম্মতভাবে কার্যকর ছিল। এগুলি বাতিল হয়ে যায় একমাত্র রানী অ্যান-এর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে জারি করা আইনের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের ধারাবলে।

এই একই ধরনের আইনকানুন চালু ছিল ফ্রান্সেও। সেখানে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয় ভবঘুরেদের (কাজ-পালানেদের) রাজত্ব। এমনকি রাজা ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালের সূচনাতেও (১৭৭৭ সালের ১৩ জুলাইয়ের বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী) ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান যে-কোনো লোকের জীবনধারণের সুনির্দিষ্ট উপায় না-থাকলে ও লোকটির বিশেষ কোনো পেশা না-থাকলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হোত পালতোলা প্রাচীন রণতরীতে দাঁড় বাওয়ার কাজে।

দেয়া হয় 'সংশোধনের অসাধ্য ভবঘুরে' আখ্যা দিয়ে। তৎসত্ত্বেও তাঁর মতে এই বিপুল-সংখ্যক বন্দী আসল অপরাধীর এমনকি এক-পঞ্চমাংশেরও কম ছিল। এটা নাকি সম্ভব হয়েছিল স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের কাজে অবহেলা ও জনসাধারণের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ফলেই। এই দিক থেকে ইংলন্ডের অপরাপর জেলার অবস্থা নাকি সমারসেটশায়ারের চেয়ে ভালো ছিল না, বরং কিছু-কিছু জেলার অবস্থা ছিল নাকি আরও খারাপ।

এই একই ধরনের ছিল নেদার্ল্যান্ডসের জন্যে প্রবর্তিত রাজা পঞ্চম কার্লের সংবিধি (১৫৩৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রবর্তিত), হল্যান্ডের খন্ডরাজ্য ও শহরগ্নলির প্রথম অন্নশাসন (১৬১৪ সালের ১৯ মার্চ তারিখে প্রবর্তিত), সংয্নক্ত প্রদেশসমূহের 'প্লাকাত' (সংবিধি) (১৬৪৯ সালের ২৫ জ্নন তারিখে প্রবর্তিত), ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে ওই কৃষিজীবী জনসাধারণকে প্রথমে জমি থেকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করে ও বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করে পরিণত করা হল ভবঘ্নরেতে, তারপর কিম্ভূতরকমের ভয়ঙ্কর সব আইনের সাহায্যে বেত্রাঘাত, দেহে চিহ্ন দেগে দেয়া, দৈহিক যন্ত্রণাদান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তাদের অভ্যস্ত করানো হল মজ্নরি-প্রথার পক্ষে প্রয়োজনীয় আদবকায়দায়।

সমাজের একটি মের্নতে শ্রমের শর্তগ্নলিকে পঁ্জির আকারে সংহত একটি প্নঞ্জের র্নপদান এবং অপর মের্নতে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের অন্য কিছ্নই বিক্রি করার নেই সেই জনসমষ্টিকে প্নঞ্জীভূত করাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। ওই জনসমষ্টি যে স্বেচ্ছায় স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে সেটাও যথেষ্ট নয়। পঁ্জিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার অগ্রগতি এমন এক শ্রমিক শ্রেণী গড়ে তুলছে যা শিক্ষা, ঐতিহ্য ও অভ্যাসের বশে ওই উৎপাদন-পদ্ধতির শর্তগ্নলিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম বলে গণ্য করছে। পঁ্জিতন্ত্রী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সংগঠন একবার প্নর্ণ-বিকশিত হয়ে উঠলে সকল বাধাকে চ্নর্ণ করে দেয় তা। অনবরত গজিয়ে-ওঠা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা শ্রমিক-সরবরাহ ও তার চাহিদার নিয়মটিকে এবং এর ফলে মজ্নরিকে পঁ্জির চাহিদার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এমন একটি এড়ানোর অসাধ্য বাঁধা-পথে আটকে রেখে দেয়। অর্থনৈতিক পরস্পর-সম্পর্কের একটি একঘেয়ে বাধ্যবাধকতা কায়েম করে তোলে পঁ্জিপতির কাছে শ্রমিকদের আন্নগত্য। অর্থনৈতিক শর্তাদির বাইরে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ অবশ্যই এখনও কাজে লাগানো হয়, তবে তা ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র বিরল কিছ্ন-কিছ্ন ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে চলতি প্রথা-অন্নযায়ী অবশ্য শ্রমিককে 'উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মসম্নহ'-এর হাতে, অর্থাৎ পঁ্জির ওপর তার নির্ভরশীলতার কাছে, ছেড়ে রাখা যেতে পারে, যে-নির্ভরশীলতার স্নত্রপাত ও তার চিরস্থায়িত্বের নিশ্চয়তাবিধান করছে আবার উৎপাদনের নিজস্ব শর্তাবলী।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক জন্মলগ্নে কিন্তু অবস্থা ছিল অন্যরকম। বুর্জোয়া শ্রেণী তার উদ্ভবের সময় রাষ্ট্রশক্তির কাছে দাবি করেছে ও ওই শক্তিকে ব্যবহার করেছে মজুরি-'নিয়ন্ত্রণ' করার কাজে, অর্থাৎ মজুরিকে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনের পক্ষে উপযোগী সীমার মধ্যে সবলে আটকে রাখতে, শ্রম-দিনের দৈর্ঘ্য বাড়াতে এবং স্বয়ং শ্রমিককে পরনির্ভরতার স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে। এটি হল তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত।

চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে যার উৎপত্তি ঘটে এবং ওই শতকে ও তার পরবর্তী শতকে যা গড়ে ওঠে সেই মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের শ্রেণী ছিল সমগ্র জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র এবং তার ওই অবস্থানে ওই শ্রেণীটি সুরক্ষিত ছিল গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন কৃষক জোতমালিক-সম্প্রদায় ও শহরের পেশাভিত্তিক সমবায় সঙ্ঘগুলির সাহায্যে। গ্রামে ও শহরে মালিক ও শ্রমজীবী কর্মী সামাজিক দিক থেকে ঘনিষ্ঠ ছিল। পুঁজির কাছে শ্রমের আনুগত্য ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক, অর্থাৎ খোদ উৎপাদন-পদ্ধতিরই তখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো পুঁজিতন্ত্রী চরিত্র ছিল না। 'বদ্ধ' পুঁজির চেয়ে পরিমাণে বহুগুণ বেশি হোত তখন 'চল' পুঁজি। অতএব পুঁজির প্রতিটি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মজুরিনির্ভর শ্রমের চাহিদা দ্রুতভাবে বেড়ে গেল, অথচ মজুরিনির্ভর শ্রমের যোগান বাড়তে লাগল ধীরে-ধীরে। জাতীয় উৎপাদের একটা বড় অংশ পরে বদলে পুঁজির সঞ্চয়ের একটি তহবিলে পরিণত হল, আর এর আগেই তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের তহবিলের।

মজুরিনির্ভর শ্রম-সম্পর্কিত আইনকানুনের (প্রথম থেকেই এই সমস্ত আইনকানুনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের শোষণ করা এবং যতই ক্রমশ নতুন-নতুন আইন তৈরি হতে লাগল শ্রমিকদের প্রতি সেগুলির বৈরী-মনোভাবে কোনোদিনই কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না)* সূচনা হয় ইংলণ্ডে, ১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দে, রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের প্রবর্তিত শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধির মধ্যে দিয়ে। ১৩৫০ সালে ফ্রান্সে রাজা জাঁ-এর নামে প্রচারিত বিশেষ ক্ষমতাবলে

* 'যখনই আমাদের আইনসভা থেকে চেষ্টা হয়েছে মালিক ও তাদের শ্রমিক-

প্রদত্ত নির্দেশের সঙ্গে উপরোক্ত ওই সংবিধি খাপ খেয়ে যায়। এইভাবে ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে প্রবর্তিত আইনকানুন সমান্তরাল রেখায় চলতে থাকে এবং সেগুলির মর্মকথাও অভিন্ন হতে দেখা যায়। শ্রমিক-বিষয়ক এই সমস্ত সংবিধির লক্ষ্য যেখানে শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রসারণের ব্যাপারে নিবদ্ধ সেই দিকটি নিয়ে ফের আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না, কেননা এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এর আগেই (দশম পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অংশ দ্রষ্টব্য)।

চতুর্দশ শতকের উপরোক্ত শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধিটি ইংলন্ডের কমন্স-সভার জরুরী আগ্রহাতিশয্যে গৃহীত হয়।

জনেক টোরি-দলভুক্ত সদস্য সরলভাবে বলে ফেলেছেন: 'আগে গরিবরা এত চড়া মজুরি দাবি করছিল যে তার ফলে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আর এখন তাদের মজুরি এতই কম যে তার ফলে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে সমানভাবে, হয়তো আরও বেশি করেই। তবে এই বিপদ দেখা দিয়েছে অন্য দিক থেকে।'*

আইনের বলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্যে এবং ফুরনের কাজ ও দিনমজুরির জন্যে মজুরিদানের একটি নির্দিষ্ট রীতি স্থির করে দেয়া হয়। বলা হয় যে খেত-মজুররা বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে ঠিকা কাজে নিযুক্ত হবে এবং শহরের শ্রমিকরা নিযুক্ত হবে 'খোলা বাজারে' দরাদরির মধ্যে দিয়ে। এই আইনে বিধিবদ্ধ মজুরির চেয়ে বেশি মজুরি দেয়া নিষিদ্ধ ছিল, আইনভঙ্গ করলে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল, তবে বেশি মজুরি দেয়ার চেয়ে তা নিলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল আরও কঠোর। [রানী এলিজাবেথের আমলে শিক্ষানবিশ-সংক্রান্ত সংবিধির ১৮ ও ১৯-সংখ্যক ধারা দুটিতেও এমন ব্যবস্থা ছিল। যথা, যে বেশি মজুরি দেবে তার জন্যে ব্যবস্থা দশদিনের

কর্মীদের মধ্যে নানা মতপার্থক্যকে নিয়ন্ত্রণ করার, তখনই দেখা গেছে যে আইনসভার পরামর্শদাতারা সবাই মালিকপক্ষ,' বলছেন আ. স্মিথ (৩৬)। আর লেঙ্গে বলছেন, 'মালিকানা হল আইনকানুনের সারমর্ম' (৩৭)।

* [J. B. Byles.] 'Sophisms of Free Trade'. By a Barrister. London, 1850, p. 206. বিদ্বেষ-ভরা কণ্ঠে তিনি আরও শুধিয়েছেন: 'নিয়োগকর্তার সপক্ষে হস্তক্ষেপের জন্যে আমরা তো যথেষ্টই প্রস্তুত থেকেছি, তা এখন কি শ্রমিকের সপক্ষে কিছুই করা যেতে পারে না?'

কয়েদ-খাটা, কিন্তু যে ওই মজুরি নেবে তার জন্যে নির্দিষ্ট একুশদিনের কয়েদ।] ১৩৬০ সালের এক সংবিধিতে এই শাস্তিদানের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয় এবং মালিকদের ক্ষমতা দেয়া হয় আইনসম্মত মজুরির হারের ভিত্তিতে বলপ্রয়োগে শ্রম আদায় করার। যে-সমস্ত জোট, চুক্তি, শপথ, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রাজমিস্ত্রি ও ছুতোরমিস্ত্রিরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকত, সে-সবই তখন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। চতুর্দশ শতক থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়াটাকে গণ্য করে আসা হয়েছে জঘন্য অপরাধ হিসেবে, একমাত্র ওই ১৮২৫ সালেই সংঘগুলির বিরুদ্ধে আইনসমূহ (৩৮) নাকচ হয়ে যায়। ১৩৪৯ সালের শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধি ও তার পরবর্তী সংবিধিসমূহের মর্মকথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ব্যাপারটি মনে রাখলে যে রাষ্ট্র সর্বদা মজুরির সর্বোচ্চমাত্রাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, কোনো কারণেই তার নিম্নতম মাত্রা নয়।

আমরা জানি যে ষোড়শ শতকে শ্রমিকদের অবস্থা বহুগুণে খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থের দিক থেকে তখন মজুরির পরিমাণ বেড়েছিল বটে, কিন্তু অর্থের মূল্যহ্রাস ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পণ্যদ্রব্যের দর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে-পরিমাণে সে-পরিমাণে নয়। ফলে বাস্তবে মজুরি হ্রাসই পেয়েছিল। তৎসত্ত্বেও নিচুহারে মজুরি বেঁধে রাখার আইনকানুন কার্যকর রয়ে গেল, আর কার্যকর রইল 'যাদের চাকরিতে নিয়োগ করতে কেউ রাজি নয়' তাদের কানের অংশ কেটে নেয়া ও গায়ে দাগা দিয়ে দেয়ার রীতিপ্রথা। এলিজাবেথের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে জারি করা শিক্ষানবিশ-সংক্রান্ত সংবিধির তৃতীয় ধারা অনুযায়ী স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয় কিছু-কিছু ক্ষেত্রে মজুরি বেঁধে দেয়ার এবং বছরের এক‌েকটা সময় ও পণ্যদ্রব্যের দর অনুযায়ী তার হেরফের ঘটানোর। রাজা প্রথম জেমস শ্রমিক-সম্পর্কিত এই আইনকানুনের পরিধি বিস্তৃত করে তাঁতি, সুতা-কাটনি ও সম্ভাব্য সকল স্তরের শ্রমজীবীকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।* রাজা দ্বিতীয় জর্জ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে জারি করা আইনগুলির পরিধি বিস্তৃত করে হস্তশিল্প-কারখানাগুলিকেও তার আওতায় আনেন।

* রাজা প্রথম জেমসের আমলের দ্বিতীয় বর্ষে জারি করা সংবিধির ষষ্ঠ অধ্যায়

হস্তশিল্প-কারখানার যুগেই পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতি এমন যথেষ্ট পরিমাণে সবল হয়ে উঠেছিল যে তা মজুরির হারের আইনসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমনই অবাস্তব করে তুলেছিল; তবু শাসক শ্রেণীগুলি পাছে দরকার পড়ে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে পুরনো অস্ত্রাগারে মজুত হাতিয়ারসমূহ হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। তাই দেখি, রাজা দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে জারি করা সংবিধিতে লন্ডন ও তার

থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু-কিছু বস্ত্র-প্রস্তুতকারক স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকের পদাধিকার-বলে তাদের নিজেদের তাঁতশালে কর্মীদের মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারি হার নির্ণয়ের দায়িত্ব নিজে থেকেই গ্রহণ করেছে। জার্মানিতে, বিশেষ করে ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে, মজুরির হার নিচু পর্যায়ে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত সংবিধিগুলি প্রচলিত ছিল সাধারণভাবেই। 'জনবসতি-মুক্ত জেলাগুলিতে গৃহভৃত্য ও জনমজুরের অভাব জমির মালিকদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল গ্রামবাসীকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল অবিবাহিত, একক কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোককে তাদের ঘর ভাড়া দিতে। বলা হয়েছিল এই ধরনের কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক গ্রামে এলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে সে-সম্বন্ধে খবর দিতে এবং তারা যদি গৃহভৃত্য হতে রাজি না-হয় তাহলে এমনকি অন্য কোনো কাজে তারা নিযুক্ত থাকলেও — যেমন, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কৃষকদের হয়ে জমিতে বীজবোনা, অথবা এমনকি শস্য-কেনাবেচার কাজে রত থাকলেও — জেলখানায় পোরা হবে তাদের।' ('Kaiserliche Privilegien und Sanctionen für Schlesien', 1, 125.) গোটা একটা শতাব্দী জুড়ে ছোট-ছোট জার্মান রাজ্যের রাজাদের হুকুমনামাগুলিতে বারে-বারে এই তিক্ত আক্ষেপ উচ্চারিত হতে দেখা যায় যে দুষ্টবুদ্ধি ও উদ্ধত ইতর জনসাধারণ কিছুতেই নিজেদের মন্দভাগ্যকে মেনে নিতে রাজি নয়, কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট নয় আইনসম্মত মজুরি পেয়ে। ওই সমস্ত হুকুমনামায় জমির মালিকদের জনে-জনে নিষেধ করা হয়েছে রাষ্ট্র শ্রমিকদের মজুরির যে-হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার চেয়ে বেশি মজুরি দিতে। তবু, তাসত্ত্বেও, ওই সময়কার, বিশেষ করে যুদ্ধের পরে কোনো-কোনো সময়ে, কর্মনিয়োগের শর্তাদি ওর ১০০ বছর পরেকার অবস্থার চেয়ে ভালোই ছিল। যেমন, সাইলেসিয়ার খামার-ভৃত্যরা ১৬৫২ সালে সপ্তাহে দু'বার করে মাংস খেতে পেত, অথচ এমনকি আমাদের বর্তমান শতকেও এমন অনেক জেলা আছে যেখানে ওই খামার-ভৃত্যরা বছরে মাত্র বার-তিনেক মাংস খেতে পায়। তদুপরি, যুদ্ধের পরে মজুরির হারও ছিল পরবর্তী শতকের চেয়ে বেশি।' (G. Freytag. ['Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes'. Leipzig, 1862, S. 35, 36.])

পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঠিকা দরজিদের দৈনিক ২ শিলিং ৭·৫ পেন্সের চেয়ে বেশি হারে মজুরি দেয়া নিষিদ্ধ করা হচ্ছে; জাতীয় শোকপালনের বিশেষ-বিশেষ সময় কেবল ছিল এর ব্যতিক্রম। তাই দেখি, তৃতীয় জর্জের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে জারি করা সংবিধির ৬৮-সংখ্যক অধ্যায়ে রেশমবস্ত্র-বয়ন-শিল্পীদের মজুরির হার নির্ধারণের ভার দেয়া হচ্ছে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের হাতে। তাই দেখি, মজুরির হার নির্ধারণের ব্যাপারে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের নির্দেশ কৃষি-বহির্ভূত শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য কিনা তা স্থির করার জন্যে ১৭৯৬ সালে উচ্চতর আদালতগুলির পক্ষ থেকে দু'বার রায় দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে। তাই দেখি, ১৭৯৯ সালে পার্লামেন্টের একটি আইন নির্দেশ দিচ্ছে যে স্কচ খনি-শ্রমিকদের মজুরির হার তখনও নিয়ন্ত্রিত হবে রানী এলিজাবেথের আমলের একটি সংবিধি এবং ১৬৬১ ও ১৬৭১ সালে প্রবর্তিত দুটি স্কচ আইনের ধারা-অনুযায়ী। অথচ ইতিমধ্যে সময় ও পরিবেশ যে কী সম্পূর্ণত বদলে গিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ইংলন্ডের কমন্স-সভায় সংঘটিত অশ্রুতপূর্ব এক ঘটনায়। ওই সভায়, যেখানে তার আগের ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মজুরির সর্বোচ্চ হার (যার চেয়ে বেশি হারে মজুরিবৃদ্ধি একেবারেই অনুচিত বলে গণ্য) নির্ধারণ-সম্পর্কিত আইনকানুন প্রবর্তিত হয়ে আসছিল, সেখানে ১৭৯৬ সালে হুইটব্রেড প্রস্তাব করে বসলেন খেত-মজুরদের জন্যে আইনসম্মত সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণের। পিট এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তবে স্বীকার করলেন যে 'গরিবদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়'। পরিশেষে ১৮১৩ সালে মজুরির হার নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত আইনগুলি বাতিল করা হল। আইনগুলি অবশ্য ইতিমধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিম্ভুত এক ব্যতিক্রমবিশেষ, কারণ বাস্তবে পুঁজিপতি তার কারখানা নিয়ন্ত্রণ করছিল নিজের-তৈরি আইনকানুনের বলে এবং দারিদ্র-সাহায্য তহবিল থেকে ভরতুকি দিয়ে খেত-মজুরদের মজুরি অপরিহার্য ন্যূনতম হারে বেঁধে রাখতে সক্ষম হচ্ছিল। তবে মালিক-কর্মীর মধ্যে চুক্তি, ছাঁটাই করা বা কাজ ছাড়ার নোটিশ দেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে শ্রমিক-সম্পর্কিত সংবিধিগুলির সংশ্লিষ্ট শর্তাদি আজও পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষমতায় বহাল আছে, যা নাকি চুক্তিভঙ্গকারী মালিকের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র দেওয়ানি মামলা রুজু করারই

অনুমতি দেয়, অথচ বিপরীতপক্ষে চুক্তিভঙ্গকারী শ্রমিক-কর্মীর বিরুদ্ধে অনুমতি দেয় ফৌজদারি মামলা রুজু করার।

প্রলেতারিয়েতের মারমুখী আচরণের মুখোমুখি হওয়াতে সঙ্ঘগুলির বিরুদ্ধে জারি করা বর্বর আইনকানুনের অবসান ঘটে ১৮২৫ সালে। তবে, এর অবসান ঘটে আংশিকভাবেই। পুরনো সংবিধির কিছু-কিছু আহামরি টুকরোটাকরা অন্তর্ধান করে একমাত্র ১৮৫৯ সালে। আর তারপর, অবশেষে ১৮৭১ সালের ২৯ জুনের পার্লামেণ্টারি আইনে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আইনসম্মত স্বীকৃতি দিয়ে এই শ্রেণীর আইনকানুনের শেষ আভাসটুকু দূর করার একটা ভান করা হয়। তবে ওই একই তারিখে প্রবর্তিত অপর এক পার্লামেণ্টারি আইনের বলে (সহিংস আচরণ, ভীতি-প্রদর্শন ও দৈহিক উৎপীড়ন-সম্পর্কিত ফৌজদারি আইন সংশোধন-বিষয়ক আইনের সাহায্যে) বস্তুতপক্ষে পুরনো ব্যাপারটিকেই নতুন চেহারা দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেয়া হল। পার্লামেণ্টারি এই মারপ্যাঁচের সাহায্যে ধর্মঘট বা 'লক-আউট'-এর সময়ে শ্রমিকরা যে-সমস্ত আইনগত উপায় অবলম্বন করতে পারত সেগুলিকে সর্বসাধারণের প্রচলিত আইনের আওতা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হল এবং তা অন্তর্ভুক্ত করা হল বিশেষ ধরনের ফৌজদারি দন্ডবিধির, আর এইসব ধারার ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্শাল স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারক হিসেবে সেই মালিকদেরই ওপর। এর দু'বছর আগে ওই একই কমন্স-সভায় সেই এক মিঃ গ্লাডস্টোন তাঁর সুপরিচিত স্পষ্টবক্তার ধরনে একটি প্রস্তাব পেশ করেন শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিশেষ ফৌজদারি আইন অবলোপের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই প্রস্তাবটিকে কখনোই সংসদে দ্বিতীয়বার পাঠের বেশি এগোতে দেয়া হয় নি এবং এইভাবে ব্যাপারটা নিয়ে টানাহেঁচড়ায় কালক্ষেপ করার পর অবশেষে 'মহান উদারনীতিক পার্টি' যে-প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল টোরিদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে তারই বিরুদ্ধে যাবার মতো সাহস সঞ্চয় করে। শুধু তা-ই নয়, এই বিশ্বাসঘাতকতায়ও সন্তুষ্ট না-হয়ে 'মহান উদারনীতিক পার্টি' শাসক শ্রেণীগুলির সেবায় সদাই তৎপর ইংরেজ বিচারকদের অনুমতি দেয় ফের একবার 'ষড়্যন্ত্র'-এর (৩৯) বিরুদ্ধে সেই পুরনো আইনগুলিকে কবর খুঁড়ে বের করতে এবং শ্রমিকদের মৈত্রীজোটগুলির বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও কেবলমাত্র জনসাধারণের চাপে পড়েই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত আইনকানুন ত্যাগ করেছে, এবং তা করেছে নিজে ৫০০ বছর ধরে নির্লজ্জ স্বার্থপরের মতো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের এক স্থায়ী ট্রেড ইউনিয়নের চেহারা নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকার পর।

বিপ্লবের একেবারে প্রথম ঝড়ের দাপটের মধ্যেই ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের সদ্য-অর্জিত সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার কেড়ে নিতে সাহস করে। ১৭৯১ সালের ১৪ জুনের হুকুমনামা অনুসারে তারা ঘোষণা করে শ্রমিকদের সকল রকমের মৈত্রীজোট 'স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার-সম্পর্কিত সনদের বিরোধী কার্যকলাপ' এবং তা শাস্তিযোগ্যও। এর শাস্তি হল, ৫শো লিভ্র জরিমানা এবং তার সঙ্গে এক বছরের জন্যে একজন সক্রিয় নাগরিককে তার অধিকারাদি থেকে বঞ্চিত করা। রাষ্ট্রিক জবরদস্তির হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে পুঁজি এবং শ্রমিকের মধ্যেকার সংগ্রামকে পুঁজির পক্ষে স্বস্তিকর সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে উপরোক্ত ওই আইন* সকল বিপ্লব ও রাজবংশগুলির উত্থানপতন সত্ত্বেও এই সেদিন পর্যন্তও টিকে ছিল। এমনকি ফরাসি বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাসের সরকারও (৪০) এর গায়ে হাত দেয় নি। একেবারে সম্প্রতি ফৌজদারি দণ্ডবিধি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এই আইনটিকে। এই বুর্জোয়া 'ক্যুদেতা'র সপক্ষে যে-অজুহাত দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক আর কিছুই নয়। শাপেলিয়ে বলছেন, 'ধরেই নেয়া

---

* এই আইনের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে: 'একই সম্পত্তি বা একই পেশার ব্যক্তিদের সবধরনের সঙ্ঘ গঠনের অস্বীকৃতি ফরাসি সংবিধানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি বলে যে-কোনো অজুহাতে এবং যে-কোনো রূপে ওই সংঘগুলির পুনঃস্থাপন নিষেধ'। চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে: 'যদি একই পেশা, শিল্পকলা বা হস্তশিল্পের অনুগামী নাগরিকরা এইমর্মে স্থির করে কিংবা এমন একটা বোঝাপড়ায় আসে যার উদ্দেশ্য হল একসঙ্গে মিলে চুক্তি অমান্য করা বা তাদের শিল্পগত কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত কাজ দিয়ে শুধু নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে উপকার করতে রাজি হওয়া তাহলে উপরোক্ত ষড়যন্ত্র ও বোঝাপড়া... সংবিধানবিরোধী এবং স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার-ঘোষণার বিরোধী বলে মনে করা দরকার, ইত্যাদি', অর্থাৎ, শ্রমিক-বিষয়ক পুরনো সংবিধিগুলিতে যেমন এখানেও তেমনই গুরুতর দুর্বৃত্তির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। ('Révolutions de Paris'. Paris, 1791, III, p. 523.)

গেল না-হয় যে মজুরির হার এখন যা আছে তার চেয়ে সামান্য কিছুটা বেশি হওয়া দরকার, ... যে মজুরি পাচ্ছে তার পক্ষে মজুরি এতটা বেশি হওয়া দরকার যাতে সে জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবের দরুন একান্ত পরনির্ভরতার অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, মুক্তি পেতে পারে সেই পরনির্ভরতা থেকে যা নাকি প্রায় ক্রীতদাসত্বেরই সমতুল।' তবু কিন্তু নিজেদের স্বার্থ ও ভালোমন্দ সম্বন্ধে কোনোরকম বোধে শ্রমিকদের উত্তীর্ণ হতে দেয়া, কিংবা একযোগে সক্রিয় হতে দেয়া এবং এই উপায়ে তাদের 'সেই একান্ত পরনির্ভরতা ... যা নাকি প্রায় ক্রীতদাসত্বেরই সমতুল' তার বোঝা হালকা করতে দেয়া একেবারেই উচিত হবে না, কেননা সত্যি বলতে কি এমন কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা ক্ষুন্ন করবে 'তাদের প্রাক্তন প্রভু বা বর্তমান শিল্পপতি নিয়োগকর্তাদের স্বাধীনতাকে'। তাছাড়া পুর-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাক্তন প্রভুদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ-ধরনের মৈত্রীজোট গঠনের অর্থই নাকি—(কল্পনা করুন তো কী!)—ফরাসি সংবিধানের বিধি অনুযায়ী বিলুপ্ত সেই পুর-প্রতিষ্ঠানগুলিরই পুনরুদ্ধার ছাড়া কিছু নয়।*

৪। পুঁজিতন্ত্রী খামারীর উৎপত্তি

এ-পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি আইনের রক্ষণাবেক্ষণ-বঞ্চিত প্রলেতারিয়ানদের একটি শ্রেণী বলপ্রয়োগে সৃষ্টি করার কাহিনী, রক্তক্ষয়ী আইনশৃংখলার পেষণে ওই প্রলেতারিয়ানদের মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে পরিণত করার কথা এবং শ্রমিক-শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে পুলিশ নিয়োগ করার মতো রাষ্ট্রের লজ্জাকর ক্রিয়াকলাপের বিবরণ নিয়ে। অতঃপর প্রশ্ন থেকে যায়: একেবারে গোড়ায় পুঁজিপতিরা এল কোথা থেকে? কেননা কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদের ফলে সরাসরি যা সৃষ্টি হয় তা বড়-বড় ভূস্বামী ছাড়া অন্যকিছু নয়। তবে খামারীর উৎপত্তির কথা বলতে গেলে আমরা সে-ব্যাপারের আলোচনায় অনায়াসেই নামতে পারি, কারণ এটি এমন একটি মন্থর

* Buchez et Roux. 'Historie Parlementaire', t. X, pp. 193-195 passim.

প্রক্রিয়া যার ক্রমবিকাশ ঘটেছে বহু শতাব্দী ধরে। ভূমিদাসরা এবং সেইসঙ্গে ছোট-ছোট জোতজমির স্বাধীন মালিকরা জমি ভোগদখল করত একেবারে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের দখলিস্বত্ব অনুযায়ী, কাজেই তারা মুক্তি পেয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে।

ইংলন্ডে খামারীর প্রথম প্রকাশ ঘটে ভূস্বামীর নিযুক্ত-করা জমিদারির bailiff বা তত্ত্বাবধায়ক রূপে, এই তত্ত্বাবধায়ক নিজেই ছিল তখন ভূমিদাস। তার পদমর্যাদা ছিল প্রাচীনকালের রোমান villicus- এর সমান, তবে তার কর্মক্ষেত্র ছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ভূমিদাস তত্ত্বাবধায়কের স্থান নিয়েছে খামারী প্রজা, আর এই খামারীকে ভূস্বামী সরবরাহ করেছে বীজ, ঘোড়া ইত্যাদি পশু ও চাষের যন্ত্রপাতি। এই খামারীর অবস্থা তখন সাধারণ কৃষকের চেয়ে বড়-একটা তফাত ছিল না। কেবল সে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে মজুরিনির্ভর খেত-মজুরের শ্রম শোষণ করত এইমাত্র। অল্পদিনের মধ্যে এই খামারী বনে যায় 'métayer', বা আধা-খামারী। সে কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য পুঁজির একটা অংশ যোগাতে থাকে আর ভূস্বামী যোগাতে থাকে বাকি অংশ। জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা নিজেদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বাঁটোয়ারা করে নিতে থাকে। তবে ইংলন্ডে ইজারার এই প্রথা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যায় এবং এর জায়গায় উৎপত্তি ঘটে পুরোদস্তুর খামারীর, যে মজুরিনির্ভর খেত-মজুর নিযুক্ত করে নিজের পুঁজিই খাটাতে থাকে এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদের একটা অংশ, তা সে অর্থে কিংবা ফসলে যা-ই হোক-না কেন, জমির খাজনা হিসেবে দিতে থাকে ওপরওয়ালা ভূস্বামীকে।

তবে যতদিন—অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে—স্বাধীন কৃষক এবং নিজের জমিতে ও মজুরির বিনিময়ে অপরের জমিতেও কর্মরত খেত-মজুর নিজেদের গতরের বিনিময়ে সম্পদ আহরণে নিরত থেকেছে, ততদিন খামারীর ও তার উৎপাদন-ক্ষেত্রের অবস্থা আর্থিক বিচারে থেকেছে একই রকম মাঝারি স্তরে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে যে কৃষি-বিপ্লবের সূচনা ঘটে এবং যা প্রায় গোটা ষোড়শ শতক ধরে বিবর্ধিত হয় (ওই শতকের শেষ কয়েক দশক কেবল বাদ দিয়ে) তা ওই পূর্বোক্ত খামারীকে যেমন দ্রুত ধনী করে তোলে

তেমনই দ্রুত তা দরিদ্র করে তোলে সমগ্র কৃষিজীবী জনসাধারণকে।* এজমালি জমিগুলি আত্মসাৎ করায় ওই খামারীর পক্ষে বলতে গেলে প্রায় নিখরচায় সম্ভব হয় ঘোড়া, গোরু, ইত্যাদি পশুর পাল বহুগুণে বাড়িয়ে তোলা, আবার এই গবাদি পশুর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জমিচাষের জন্যে আরও অধিক পরিমাণে সারের যোগানও পেয়ে যায় সে।

এর সঙ্গে ষোড়শ শতকে আবার যুক্ত হয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওই সময়ে খামার ইজারা দেয়ার চুক্তি করা হোত দীর্ঘমেয়াদী হারে, প্রায়ই ৯৯ বছরের জন্যে। আর ওই সময়েই সোনা-রুপো ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর দাম ক্রমশ পড়ে যেতে থাকে এবং ফলত পড়ে যায় মুদ্রার মূল্যও, আর খামারীদের ধুলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে ওঠে। এর আগে অন্যান্য যে-সমস্ত ব্যাপারের কথা আলোচিত হয়েছে তা ছাড়াও এর ফলে মজুরির হার গেল পড়ে। খেত-মজুরদের প্রাপ্য এই মজুরির একটা অংশ তখন যুক্ত হল খামারের লাভের অঙ্কের সঙ্গে। শস্য, পশম, মাংস, এক কথায় সকল কৃষিজাত উৎপাদের অনবরত দরবৃদ্ধির ফলে খামারীর তরফ থেকে বিনা প্রয়াসেই তার মুদ্রার পুঁজি ফুলেফেঁপে উঠল, অপরদিকে জমির ইজারাবাবদ যে-খাজনা সে ওপরওয়ালা ভূস্বামীকে দিত তার মূল্য (আগেকার মুদ্রার ভিত্তিতে হিসাব করা হোত বলে) বাস্তবে হ্রাস পেল।** এইভাবে খামারীরা তাদের ভাড়াটে

* হ্যারিসন তাঁর 'Description of England' শীর্ষক বইয়ে বলছেন, 'যদি-বা ঘটনাচক্রে চারি পাউণ্ডের পুরনো খাজনার হারকে বৃদ্ধি করিয়া চল্লিশ পাউণ্ডে পরিণত করা হয় এবং তাহার ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার মুখে ওই খাজনা পঞ্চাশ অথবা এক শত পাউণ্ডে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ছয় বা সাত বৎসরের বকেয়া খাজনা তাহার কাছে বাকি পড়িয়া না-থাকিলে খামারী তাহার লাভ অতি যৎসামান্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে।'

** ষোড়শ শতকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর মুদ্রার মূল্যহ্রাসের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে 'A Compendious or Briefe Examination of Certayne Ordinary Complaints of Divers of our Countrymen in these our Dayes'. By W. S., Gentleman (London, 1581). শীর্ষক বইখানি দেখুন। কথোপকথনের ঢঙে লিখিত এই বইখানি স্বয়ং শেক্সপিয়রের রচনা বলে দীর্ঘদিন লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এমনকি ১৭৫১ সালেও বইখানি ছাপা হয়েছিল তাঁর নামে। আসলে এ-বইয়ের লেখক ছিলেন উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড। বইটির এক জায়গায় মধ্যযুগীয় 'নাইট' বা বীরব্রতী যুক্তি দেখাচ্ছেন এই বলে:

মজুর ও ওপরওয়ালা ভূস্বামী উভয় তরফের ক্ষতির বিনিময়ে নিজেরা ধনী হয়ে উঠল। অতএব এতে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না যখন দেখি ষোড়শ শতকের শেষাশেষি ইংলন্ডে 'পুঁজিতন্ত্রী খামারীর' এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যে-শ্রেণীটিকে তখনকার অবস্থার বিচারে ধনীই বলা চলে।*

নাইট: 'ওহে পড়শী কৃষক, ওহে বস্ত্র-ব্যবসায়ী কারুশিল্পী এবং তুমি পিপা-নির্মাতা গৃহস্থ, তোমরা অপরাপর কারিগরদের সহিত বেশ ভালোভাবেই আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ। কারণ সকল দ্রব্যসামগ্রীর দর পূর্বাপেক্ষা যেমত বৃদ্ধি পাইয়াছে সেমত তোমরাও তোমাদিগের নির্মিত দ্রব্যাদির এবং তোমাদিগের শ্রমের দরবৃদ্ধি ঘটাইয়া তাহা বিক্রয় করিতেছ। কিন্তু আমাদিগের বিক্রয় করিবার মতো এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমাদিগের নিকট চড়া দামে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমাদিশকে যাহা ক্রয় করিতেই হইবে সেই সকল দ্রব্যের দরের সমতারক্ষা করিতে পারি।' অন্য এক জায়গায় 'নাইট' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছেন: 'আচ্ছা, বলুন তো মহাশয়, আপনি যাহাদের কথা বলিতেছেন তাহারা কোন স্তরের ব্যক্তি? এবং প্রথমত, তাহারাই-বা কাহারা যাহাদের কোনোপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে না বলিয়া আপনি মনে করেন?' **ডাক্তার:** 'আমি সেই সমুদায় ব্যক্তির কথাই বলিতেছি যাহারা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা একহাটে চড়া দামে কেনে ও অতঃপর বিক্রয় করে অপর হাটে।' **নাইট:** 'আচ্ছা, ইহা দ্বারা লাভবান হইবে এমন অপর কোন স্তরের ব্যক্তিদের কথা বলিতেছিলেন যেন?' **ডাক্তার:** 'কেন? হা ঈশ্বর! আমি তাহাদের কথাই বলিতেছিলাম যাহারা পুরনো খাজনায় নিজ-নিজ তত্ত্বাবধানে (চাষাবাদের অধীনে) খামারসমূহ ইজারা লইয়াছে। ইহারা খাজনা দেয় পুরনো হারে আর বিক্রয় করে নূতন হারে — অর্থাৎ, ইহারা জমির জন্যে খাজনা দেয় অতীব সামান্য অর্থ, আর জমি হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য বিক্রয় করে চড়া দরে।' **নাইট:** 'আচ্ছা, অপর কোন স্তরের লোকের কথা আপনি বলিতেছিলেন ইহার ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গের মুনাফার মাত্রার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে?' **ডাক্তার:** 'ইঁহারা হইলেন সকল অভিজাত, ভদ্রলোক এবং অপরাপর সকলে যাঁহারা প্রাণধারণ করিয়া থাকেন কার্পণ্যসহকারে বণ্টিত খাজনা বা ভাতা সম্বল করিয়া, অথবা যাঁহারা জমি নিজ তত্ত্বাবধানে (চাষবাসের অধীনে) রাখেন না, অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের কারবারে লিপ্ত নহেন।'

* ফ্রান্সে régisseur, মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ভূ-সম্পত্তিগুলির যতসব বেতনভুক্ত পরিচালক, দেওয়ান, সামন্তভূস্বামীদের তরফ থেকে যতসব আদায়-উসুলকারী লোকজন ছিল, কিছুকালের মধ্যেই তারা বনে গেল একেকটি কর্তাব্যক্তি এবং জবরদস্তি আদায়, প্রতারণা, ইত্যাদির সাহায্যে স্রেফ জালিয়াতি করেই পুঁজিপতি বনে গেল তারা।

৫। শিল্পে কৃষি-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া। শিল্প-পঁুজির জন্যে অভ্যন্তরীণ বাজার-সৃষ্টি

কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ ও এলাকা থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়াটি থেকে-থেকে হলেও ফিরে-ফিরে বারবার তা সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে কীভাবে শহরের কলকারখানাগুলি যৌথ সমবায়-সংস্থাগুলির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছিন্ন ও সেগুলির দ্বারা অ-নিয়ন্ত্রিত প্রলেতারিয়ানদের এক বিপুল জনসংখ্যার যোগান পেয়ে গেল তা আমরা দেখেছি। এটা ছিল এমনই একটা সৌভাগ্যসূচক ঘটনা যা দেখে সেকালের অন্যা. অ্যান্ডারসন (এঁকে পরবর্তী জেমস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না) তাঁর 'বাণিজ্যের ইতিহাস' (৪১) শীর্ষক বইয়ে ব্যাপারটিকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করেছেন। আদিম সঞ্চয়ের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে আমাদের আরও অল্প-একটু আলোচনা করা দরকার। জোফ্রেয় স্যাঁ হিল্যার যেভাবে মহাকাশের একটা জায়গায় মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জের তনুভবনের

পূর্বোক্ত এই সমস্ত régisseur- এর মধ্যে কেউ-কেউ অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। যেমন, 'দিশোঁ শহরে বুর্গোঁ-এর ডিউক ও কাউন্ট মহাশয়ের কাছে প্রভুর তরফে হিসাবের এই বিবরণ পেশ করছে জাক দ্য তোরেস, বেসাঁসোঁনে প্রাসাদরক্ষকদের নাইট; ১৩৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১৩৬০ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপরোক্ত প্রাসাদের শাসিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্য খাজনা সংক্রান্ত বিবরণী। (Alexis Monteil, 'Traité des Matériaux Manuscrits ets.' p. 234, 235).

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেমন করে সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যগ দালালের কপালে লাভের সিংহভাগ জুটে যাওয়াটা ওরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে মূলধন-বিনিয়োগকারী, শেয়ার-বাজারের ফাটকাবাজ, ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা মেরে দিচ্ছে দুধের সরটুকু; আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনজীবী মক্কেল ঠকিয়ে নাস্তানাবুদ করছে; রাজনীতিতে ভোটদাতাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি, সার্বভৌম রাজার চেয়ে বেশি মন্ত্রীমশাই; আর ধর্মক্ষেত্রে খোদ ঈশ্বরকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন 'মধ্যস্থ' অবতার, আবার অবতারকেও পেছনে ঠেলে দিয়ে 'মহৎ মেষপালক' খ্রীস্ট ও তাঁর 'মেষপাল'-এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই মধ্যগ দালাল — অর্থাৎ পাদ্রি-পুরোহিতকুল। যেমন ইংলন্ডে তেমনই ফ্রান্সেও বড়-বড় সামন্ততান্ত্রিক ভূখণ্ড বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য ছোট-ছোট বাস্তুভিটেয়, তবে

ফলে অপর একটি জায়গায় ওই বস্তুপুঞ্জের ঘনীভবনের ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন* সেইভাবে স্বাধীন স্ব-নির্ভর কৃষকদের সংখ্যাহ্রাস ঘটানোর ফলে খেতখামারের জনবিরলতা কেবল-যে শহরে শ্রমশিল্পের প্রলেতারিয়েতের ভিড় বাড়িয়ে তুলল তা-ই নয়। জমিতে হলচাষীর সংখ্যাহ্রাস সত্ত্বেও দেখা গেল যে আগেও যেমন ছিল পরেও তেমনই জমিতে একই পরিমাণ কিংবা আরও বেশি ফলন হতে লাগল, কেননা ভূ-সম্পত্তির পরিবেশে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল উন্নত ধরনের চাষের পদ্ধতি, অধিকতর পারস্পরিক সহযোগিতা, উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পরিশেষে এর ফলে কৃষিতে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের আগের চেয়ে আরও তীব্রভাবে-যে খাটানো হতে লাগল তা-ই নয়,** ওই শ্রমিকরা যে-সমস্ত ছোট-ছোট খেতে নিজেদের জন্যে কাজ করতে পারত সেগুলির সংখ্যাও ক্রমে আসতে লাগল ক্রমশ। অতএব কৃষিজীবী জনসাধারণের একটি অংশকে মুক্ত করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনধারণের প্রাক্তন উপায়াদিও গেল মুক্ত হয়ে। আর সেই উপায়াদি এখন রূপান্তরিত হয়ে গেল 'চল'-পুঁজির বস্তুগত

তা ঘটেছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তুলনার অতীত এমন বহুগুণে বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। চতুর্দশ শতকের মধ্যে ফ্রান্সে গড়ে উঠল খামার বা 'terrier' (ঘেরাও-করা জমি)-গুলি। এই সমস্ত খামারের সংখ্যা অতঃপর অনবরত বেড়ে চলল এবং এক লক্ষের সীমা ছাড়িয়ে গেল বহুদূর। খামারগুলির তরফ থেকে জমির খাজনা দেয়া হোত মুদ্রায় কিংবা ফসলে, সেগুলির উৎপাদের ১/১২ অংশ থেকে ১/৫ অংশের হিসাবে। এই সমস্ত খামার জমিজায়গার দাম ও পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে অথবা রাজসরকারে কাজের পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত জায়গির নামে, তবে এগুলির মধ্যে বহু খামারই ছিল মাত্র কয়েক একর করে জমির সমষ্টি। অথচ এই সমস্ত খামারের মালিকদের কিছু-পরিমাণে আইনগত নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল তাদের জমিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের ওপর। এই আইনগত অধিকার ছিল আবার চারটি স্তরে বিন্যস্ত। পরপীড়ক এইসব ক্ষুদে শাসকের অধীনে কৃষিজীবী জনসাধারণ যে কতখানি উৎপীড়িত হত তা সহজেই অনুমেয়। মঁতেই বলছেন, একদা ফ্রান্সে ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার বিচারপতি, আর আজ সে-জায়গায় স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকরা সহ ৪ হাজার বিচার-সভাতেই দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে।

* 'Notions de Philosophie Naturelle'. Paris, 1838. বইটি দ্রষ্টব্য।

** আলোচ্য এই বিষয়টির ওপর স্যর জেমস স্টুয়ার্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন (৪২)।

উপাদানসমূহে। জমি থেকে উৎখাত-হওয়া ও ইতস্তত ভেসে-বেড়ানো কৃষকদের অবস্থা দাঁড়াল এই যে অতঃপর তাদের নিজেদের মূল্য মজুরির আকারে তাদের নতুন প্রভু শিল্পের পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ক্রয় করা ছাড়া উপায়ান্তর রইল না। আর যা পূর্বোক্ত জীবনধারণের উপায়াদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, তাই-ই প্রযোজ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষির ওপর নির্ভরশীল শিল্প-কারখানার কাঁচামালের ক্ষেত্রেও। এই কাঁচামাল রূপান্তরিত হল 'বদ্ধ'-পুঁজির একটি উপাদানে।

যেমন, একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, ওয়েস্টফালিয়ার কৃষকদের একটি অংশ যারা সকলেই আগে, রাজা দ্বিতীয় ফ্রিড্‌রিখের আমলে, শণের সুতো কাটত তারা বলপ্রয়োগের ফলে জমি থেকে উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত হল, আর তাদের অপর যে-অংশটি গ্রামে রয়ে গেল তারা পরিণত হল বড় বড় খামারীর অধীন দিনমজুরে। আবার সেইসঙ্গে গজিয়ে উঠল শণ থেকে সুতো কাটার ও কাপড় বোনার বড়-বড় প্রতিষ্ঠান আর সেইসব প্রতিষ্ঠানে ওই সময়ে তথাকথিত 'ছাড়া-পাওয়া' প্রাক্তন কৃষকেরা কাজ করতে লাগল মজুরির ভিত্তিতে। শণের তন্তুর চেহারা কিন্তু এতে এতটুকুও বদলাল না। তার একটি তন্তুতেও পরিবর্তন ঘটল না বটে, তবে তার দেহে সঞ্চারিত হল নতুন এক সামাজিক সত্তা। শণ এখন হয়ে দাঁড়াল তাঁত-কারখানার মালিকের 'বদ্ধ'-পুঁজির একটা অংশ। আগে যা ছিল কিছু-সংখ্যক ছোট উৎপাদনকারীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়—যে-উৎপাদনকারীরা নিজেরা শণের চাষ করত এবং নিজ-নিজ পরিবারের সাহায্যে খুচরো হারে তা থেকে সুতো কাটত—তা এখন কেন্দ্রীভূত হল এমন একজনমাত্র পুঁজিপতির হাতে যে অন্যদের নিযুক্ত করল তার হয়ে শণের সুতো কাটতে ও কাপড় বুনতে। শণের সুতো কাটায় ইতিপূর্বে যে-অতিরিক্ত শ্রম খরচ হোত তা উঠে আসত কৃষক-পরিবারগুলির অতিরিক্ত আয়ে, কিংবা রাজা দ্বিতীয় ফ্রিড্‌রিখের আমলে হয়তো-বা প্রাশিয়ার রাজার জন্যে দেয় অতিরিক্ত করে। কিন্তু অতঃপর সেই অতিরিক্ত পরিশ্রম উসুল হতে লাগল অল্প জনকয়েক পুঁজিপতির মুনাফা হিসেবে। সুতো কাটার তকলি ও কাপড় বোনার তাঁতযন্ত্র, আগে যা নাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল গোটা দেশ জুড়ে, এখন সেগুলি ভিড় জমাল অল্প কয়েকটি প্রকাণ্ড শ্রমিক-ব্যারাকে, শ্রমিক আর কাঁচামালের ভিড়ে

স্তূপীকৃত হয়ে। আর ওই তক্‌লি, তাঁতযন্ত্র আর কাঁচামাল এখন সুতো-কাটুনি আর তাঁতিদের স্বনির্ভর অস্তিত্বরক্ষার উপায়াদি থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেল তাদেরই ওপর হুকুমজারি করার ও তাদের থেকে মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম বা বেগার-খাটুনি শুষে নেয়ার উপায়াদিতে।* আজকের দিনের বড়-বড় কারখানা ও খামারের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনেই হয় না যে সেগুলির উৎপত্তি হয়েছে বহু ছোট উৎপাদন-কেন্দ্রকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করার ফলে এবং সেগুলি গড়ে উঠেছে বহু ছোট স্বাধীন উৎপাদনকারীকে জমি ও বাস্তুচ্যুত করে। তাসত্ত্বেও জনসাধারণের স্বজ্ঞাকে দোষারোপ করা যায় না। কেননা বিপ্লবের সিংহ বলে কথিত মিরাবো-র সময়েও বড়-বড় হস্তশিল্প-কারখানাকে বলা হোত 'একত্রীভূত কারখানা' বা মিলিয়ে-মিশিয়ে এক-করে-তোলা ওয়র্কশপ, যেমন অনেক খেত এক-করে-তোলার কথা বলে থাকি আমরা।

মিরাবো বলছেন: 'আমরা কেবলমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আসছি সেই বড়-বড় কারখানার দিকে, যেখানে শ'য়ে-শ'য়ে লোক কাজ করছে একজন পরিচালকের অধীনে এবং যে-কারখানাগুলিকে সচরাচর বলা হয়ে থাকে 'একত্রীভূত হস্তশিল্প-কারখানা'। কিন্তু যেখানে আরও বেশি, বিপুল-সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে চলেছে, প্রত্যেকে পৃথকভাবে ও নিজের উপকারার্থে, সেগুলিকে আমরা বিবেচনার মধ্যে ধরি না বললেই হয়। প্রথমোক্ত কারখানাগুলি থেকে এগুলি সীমাহীন দূরত্বের ব্যাপার। এটা কিন্তু আমাদের একটা মস্ত ভুল, কেননা এই শেষোক্ত ব্যাপারগুলিই একমাত্র জাতীয় উন্নতির সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ সোপান।... বড়-বড় কারখানা (বা 'একত্রীভূত কারখানা') একজন বা দু'জন নিয়োগকর্তা কারখানা-মালিককে বিস্ময়কররকমে ধনী করে তুলবে, কিন্তু সেখানকার শ্রমিকরা হয়ে থাকবে কেবলমাত্র ঠিকমজুর, বেতন পাবে মোটামুটিরকম আর কারখানাটির বাড়বাড়ন্তের কোনো ভাগই পাবে না তারা। অথচ, বিপরীতপক্ষে, কোনো একটি বিযুক্ত কারখানায় (বা 'পৃথক কারখানা'য়) কেউই ধনী হয়ে উঠতে পারবে না বটে, তবে বহু শ্রমিকই

---

* পুঁজিপতি বলছে: 'আমার সেবা করার মর্যাদা আমি তোমাদের দিই এই শর্তে: এ পর্যন্ত তোমাদের সামান্য যা-কিছু আছে, তোমাদের পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়ার জন্যে সেই সবকিছু তোমরা আমাকে দেবে।' (J. J. Rousseau, 'Discours sur l'Économie Politique'.)

আরামে থাকতে পারবে; মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী যে সে জমাতে পারবে সামান্য একটু মূলধন, সংসারে শিশুর জন্মের প্রয়োজনে বাঁচাতে পারবে অল্প-একটু অর্থ, সম্ভাব্য অসুখবিসুখের জন্যে, নিজেদের শখসাধ মেটাতে ও ঘর-গৃহস্থালির জিনিসপত্র কিনতে কাজে লাগাতে পারবে সেই বাড়তি অর্থ। এর ফলে সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে, কেননা তারা দেখবে যে সৎ আচরণ করা ও কর্মঠ হওয়া মূলত তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতিবিধানেরই সহায়ক, মজুরির সেই সামান্য একটু বৃদ্ধির মাত্র সহায়ক নয় — যে-মজুরিবৃদ্ধি কোনোরকমেই ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং যার ফলাফল হল একমাত্র মানুষকে আরও সামান্য একটু ভালোভাবে, ও তা কেবলমাত্র দৈনন্দিন ভিত্তিতেই, জীবনযাপনে সাহায্য করা।... অপরপক্ষে বড়-বড় যতসব ওয়র্কশপ, কিছু-কিছু লোকের ব্যক্তিগত প্রকল্পগুলি, নিছক মুনাফা অর্জনের জন্যে কাজ করিয়ে শ্রমিকদের প্রতিদিন মজুরি দেয় যারা, তারা ওই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে বটে, তবে তারা কখনোই গভর্নমেন্টগুলির মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য হতে পারে না। একমাত্র বিচ্ছিন্ন ওয়র্কশপগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোট-ছোট জোতজমির চাষের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় স্বাধীন প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।'*

কৃষিজীবী জনসাধারণের একটি অংশকে চাষের জমি ও বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদের ফলে কেবল-যে শিল্প-পুঁজির পক্ষে অনুকূল শ্রমিককুল, তাদের জীবিকার উপায়াদি ও শ্রমের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের স্রোত মুক্তি পেল তা-ই নয়, এর ফলে গড়ে উঠল অভ্যন্তরীণ বাজারও।

বস্তুত, যে-ঘটনাবলী ছোট-ছোট কৃষককে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে ও তাদের জীবিকার উপায়াদি ও শ্রমের উপায়াদি পুঁজির বৈষয়িক উপাদানে রূপান্তরিত করেছিল তা ওই একই সঙ্গে গড়ে তুলেছিল পুঁজির প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারও। ইতিপূর্বে একেকটি কৃষক-পরিবার নিজেরাই উৎপাদন করত তাদের জীবনধারণের উপায়াদি ও কৃষিজাত কাঁচামাল এবং এর

---

* মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০ থেকে ১০৯, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্থানে-স্থানে। মিরাবো যে পৃথক-পৃথক ওয়র্কশপকে 'সম্মিলিত' ওয়র্কশপগুলির চেয়ে আর্থিক দিক থেকে বেশি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত ও বেশি উৎপাদনক্ষম বলে মনে করেছেন এবং শেষোক্ত কারখানাগুলিকে গণ্য করেছেন গভর্নমেন্টের উৎসাহপুষ্ট নিছক কৃত্রিম ও বহিরাগত উদ্ভট ব্যাপার বলে, তার ব্যাখ্যা মেলে তৎকালীন ইউরোপ-ভূখণ্ডগত অধিকাংশ হস্তশিল্প-কারখানার অবস্থা থেকে।

বেশির ভাগটাই তারা নিজেরা ভোগ করত। সেই কাঁচামাল ও জীবনধারণের উপায়াদি অতঃপর হয়ে দাঁড়াল পণ্য; বড়-বড় খামারী এখন তা বিক্রি করতে লাগল ও তার বাজার খুঁজে পেল হস্তশিল্প-কারখানাগুলিতে। সুতী ও ক্ষৌমবস্ত্র এবং মোটা পশমী কাপড়—যেগুলির কাঁচামাল আগে প্রতিটি কৃষক-পরিবারের নাগালের মধ্যে ছিল ও যা থেকে কৃষক-সমাজ সুতো কাটত ও নিজের ব্যবহার্য পোশাক-আশাক বুনে নিত—তা এখন পরিণত হল ব্যাপক হারে উৎপাদনের সামগ্রীতে আর দেশের জেলাগুলি পরিণত হল ওই পণ্যদ্রব্যের বাজারে। এর আগে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন কারুশিল্পীরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে কর্মরত দেশের চতুর্দিকে ছড়ানো-ছিটনো অসংখ্য ছোট-ছোট খরিদ্দারের মধ্যে যে-ক্রেতার সন্ধান পেত তারা এখন শিল্প-পুঁজির দৌলতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল প্রকাণ্ড এক বাজারে।* এইভাবে স্বয়ংভর কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদসাধন ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কুটির-শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন ও কৃষির মধ্যে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটিও চলেছিল সমান তালে। আর একমাত্র গ্রাম্য কুটির-শিল্পের এই ধ্বংসসাধনের ফলেই পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে যা প্রয়োজনীয় একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার সেই পরিমাণে ব্যাপক ও অবিচল হতে পারে।

তবু যথাযথভাবে যাকে হস্তশিল্পোৎপাদনের যুগ বলা যেতে পারে তা এই রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়াকে মূলগতভাবে ও সম্পূর্ণত সফল করে তুলতে সমর্থ হয় না। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে যথাযথভাবে যাকে বলা চলে

---

* ‘কুড়ি পাউন্ড পশম যখন অলক্ষ্যে কোনো একটি শ্রমিক-পরিবারের অন্য কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তার নিজস্ব পরিশ্রমের ফলে তৈরি পরিবারটির পোশাক-পরিচ্ছদে পরিণত হয় তখন সেদিকে কারও নজর থাকে না; কিন্তু ওই পরিমাণ পশম যখন বাজারে আমদানি হয়, তারপর ফ্যাকটরিতে যায়, আর তারপর আসে দোকানদারের হাতে, তখনই এক বিপুল বাণিজ্যিক লেনদেনের কারবার শুরু হয়ে যায় আর নামমাত্র পুঁজি তার বিশগুণ মূল্যের অর্থের সঙ্গে যায় জড়িয়ে।... এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষিত হতে হয় ফ্যাকটরির হতভাগ্য জনসমষ্টি, পরোপজীবী দোকানদার-শ্রেণী ও এক কাল্পনিক বাণিজ্যিক, মুদ্রা-সংক্রান্ত ও আর্থিক ব্যবস্থা সমর্থনের জন্যে।’ ডেভিড আর্কার্ট, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১২০।

হস্তশিল্প-কারখানার ব্যবস্থা তা কেবলমাত্র আংশিকভাবেই জয় করে নিতে সমর্থ জাতীয় উৎপাদনের রাজ্যপাটকে এবং তা সর্বদাই চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে নির্ভর করে শহরের কারুশিল্প ও গ্রামাঞ্চলের কুটির-শিল্পের সহায়তার ওপর। যদিও বা তা এই শেষোক্ত গ্রাম্য হস্তশিল্প ও শহরের কারুশিল্পকে কোনো এক ধরনে, শিল্পের কোনো এক নির্দিষ্ট শাখায় ও নির্দিষ্ট জায়গায় ধ্বংস করেও ফেলে, তবু অন্যত্র আবার এগুলির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়, কেননা বিশেষ একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত কাঁচামাল প্রস্তুত করে তোলার জন্যে এগুলির প্রয়োজন হয় তার। অতএব হস্তশিল্প-ব্যবস্থা তৈরি করে ছোট-ছোট খামারীদের নতুন একটি শ্রেণী, যে-শ্রেণীর মানুষেরা চাষবাসকে আনুষঙ্গিক একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে শিল্পোৎপাদনের শ্রমকে, আর এই শ্রমের ফসল তারা হয় সরাসরি আর নয়তো ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে শিল্পপতি মালিকদের কাছে বিক্রি করে থাকে। বিশেষ এক ঘটনার এটি প্রধান না হলেও এমন একটি কারণ যা ইংলন্ডের ইতিহাসের ছাত্রকে প্রথম দৃষ্টিতে বিভ্রান্ত করে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে কিছুকাল পর-পর মাঝে-মাঝে একেকটি বিরতির সময় বাদ দিয়ে তিনি অনবরত গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতান্ত্রিক খামারের অনুপ্রবেশ ও কৃষককুলের ক্রমবর্ধমান বিনষ্টির ব্যাপারে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হতে থাকেন। আবার অপরদিকে তিনি এই কৃষককুলকে ফিরে-ফিরে আবির্ভূত হতে দেখেন, তবে তা ক্রমশই কম-কম সংখ্যায় ও সর্বদাই অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায়।* এর প্রধান কারণ হল এই যে ইংলন্ড পর্যায়ক্রমে যুগে-যুগে কখনও দেখা দিয়েছে প্রধানত শস্য-উৎপাদক হিসেবে, আবার কখনও-বা প্রধানত খামারপালিত পশু-প্রজনক হিসেবে, আর এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত উৎপাদনের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। একমাত্র আধুনিক শিল্পই পরিশেষে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার স্থায়ী ভিত্তিটি যুগিয়ে দিয়েছে, কৃষিজীবী জনসংখ্যার বিপুল এক সংখ্যাধিক অংশকে মূলগতভাবে

---

* ক্রমওয়েলের আমল ছিল একমাত্র এর ব্যতিক্রম। যতদিন এই প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল ততদিন সকল স্তরের সমগ্র বৃটিশ জনসাধারণ টিউডর-রাজবংশের আমলে যে-দুর্দশায় তারা অধঃপতিত হয়েছিল তা থেকে উন্নতির সোপান বেয়ে উঠতে সমর্থ হয়।

পঁুজি থেকে উদ্বৃত্ত সুদ নেয়ার ফলে... আর এটাও বড় কম আশ্চর্য নয় যে ইউরোপের সকল আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষই চেষ্টা করেছেন এই ব্যাপারটিকে সংবিধির সাহায্যে, অর্থাৎ তেজারতি কারবারের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত সংবিধির সাহায্যে, রোধ করতে।... দেশের সকল সম্পদের ওপর পঁুজিপতির এই আধিপত্য সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে আমূল একটা পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন আইন অথবা ধারাবাহিক আইনসমূহের সাহায্যে কার্যকর হল এই ব্যাপারটি?*

লেখকের অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত ছিল যে বিপ্লব কখনও আইনের বলে সমাধা হয় না।

মহাজনী কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সৃষ্ট আর্থিক পঁুজিকে শিল্প-পঁুজিতে পরিণত করার ব্যাপারটির প্রতিরোধ করা হয় গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সংবিধান ও শহরগুলিতে 'গিল্ড'-সংস্থাগুলির মধ্যে।** সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবলোপ, গ্রামবাসী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ ও আংশিকভাবে বাস্তুভিটে থেকে বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি অবশ্য দূর হয়ে গেল। নতুন হস্তশিল্প-কারখানাগুলি স্থায়ীভাবে জাঁকিয়ে বসল সমুদ্র-বন্দরগুলিতে, অথবা দেশের অভ্যন্তরে কিছু-কিছু জায়গায়, পুরনো পুর-সভাগুলি ও সেগুলির 'গিল্ড'এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এরই ফলে ইংলন্ডে এই সমস্ত নতুন শিশু-শিল্প লালনাগারগুলির বিরুদ্ধে পুর-সভা-নিয়ন্ত্রিত শহরগুলির তীব্র, তিক্ত সংগ্রাম চলে।

আমেরিকায় সোনা ও রুপোর আবিষ্কার, সেখানকার আদি অধিবাসীদের সদলবলে উন্মূলন, দাসত্বে ও খনিগুলিতে তাদের কবরস্থ করে রাখা, ইস্ট ইণ্ডিজ-এ বিজয়-অভিযানের ও সে-অঞ্চলটি লুণ্ঠনের সূচনা, আফ্রিকাকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কালো-চামড়ার মানুষের শিকারক্ষেত্রে পরিণত করা, ইত্যাদি ব্যাপার পঁুজিতান্ত্রিক উৎপাদনের কালপর্বের রক্তিমাভ নব-

---

* 'The Natural and Artificial Right of Property Contrasted', London, 1832, pp. 98, 99. বেনামা এই বইখানির লেখক হলেন টি. হজ্‌স্কিন।

** এমনকি এই সেদিন, ১৭৯৪ সালেও লীড্‌সের ছোট-ছোট বস্ত্র-বয়নকারী পার্লামেন্টে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এইমর্মে এক দরখাস্ত পেশ করে যে ব্যবসায়ীদের বড় আকারে শিল্প-উৎপাদক বনে যাওয়া নিষিদ্ধ করে একটি আইন প্রণয়ন করা হোক। (Dr. Aikin, 'Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester', London, 1795.)

প্রভাতের সূচনা ঘটাল। এই সমস্ত কাব্যিক, সুখময় ব্যাপারস্যাপারই হল আদিম সঞ্চয়ের গতিবেগের প্রধান উৎস। এরই পিছু-পিছু বেধে গেল গোটা ভূগোলজোড়া রণক্ষেত্রে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক যুদ্ধ। এর সূচনা ঘটল স্পেন থেকে নেদার্ল্যান্ডসের পৃথক হওয়ার মধ্যে দিয়ে (৪৩), বিশাল বিস্তৃতি পেল এ ইংলন্ডের জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধে (৪৪) এবং এখনও এই যুদ্ধ চলেছে চীনের বিরুদ্ধে অহিফেন-যুদ্ধগুলির মধ্যে দিয়ে (৪৫), ইত্যাদি।

আদিম সঞ্চয়ের গতিবেগের বিভিন্ন চিহ্ন এখন কমবেশি কালানুক্রমিক পর্যায়ে দৃশ্যমান সর্বত্র—বিশেষ করে স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে। ইংলন্ডে সপ্তদশ শতকের শেষে তা রূপ নিয়েছে একটি সুসংবদ্ধ সম্মিলনের, যেমন তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে উপনিবেশগুলি, জাতীয় ঋণসম্ভার, কর ধার্য করার এক আধুনিক পদ্ধতি ও জাতীয় বাণিজ্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। এই ব্যাপারগুলি অংশত নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল, যেমন ধরুন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ওপর। তবে এই সবকটি ব্যাপারই সমাজের কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত শক্তিকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে, নিয়োগ করে থাকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটিকে 'হটহাউস'এ চাষের পদ্ধতিতে দ্রুততর ও এই উত্তরণের কালকে হ্রস্বতর করে তোলার উদ্দেশ্যে। নতুন সমাজের গর্ভধারিণী প্রতিটি পুরনো সমাজের ধাত্রী হল বলপ্রয়োগ। বলপ্রয়োগ নিজেই এক অর্থনৈতিক শক্তির দ্যোতক।

খ্রীস্টিয়ান ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ চর্চার দাবিদার ডব্লু. হাউইট খ্রীস্টিয়ানদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য-প্রসঙ্গে বলছেন:

তথাকথিত খ্রীস্টিয়ানকুল বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল জুড়ে এবং যে-জাতকেই তারা পদানত করতে সমর্থ হয়েছে তাদের ওপর যে-ধরনের আচরণ ও বেপরোয়া দৌরাত্ম্য চালিয়েছে তার তুলনা মেলে না পৃথিবীতে অপর কোনো যুগের অপর কোনো মানবকুলের বর্বরতা ও দৌরাত্ম্য, তা সে বর্বরতা যতই হিংস্র, যতই স্বতঃস্ফূর্ত এবং দয়ামায়া ও লাজলজ্জা সম্পর্কে যতই বেপরোয়া হোক-না কেন।*

---

* William Howitt. 'Colonization and Christianity. A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in all their

হল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে সপ্তদশ শতকে হল্যান্ডই ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মাথা)—'হল বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ-প্রদান, গণহত্যা ও নীচতার সবচেয়ে অবিশ্বাস্য পারস্পরিক সম্পর্কের একটি নিদর্শন।'* জাভা দ্বীপের জন্যে ক্রীতদাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসকদের মানুষচুরির ব্যবস্থার চেয়ে এ-ব্যাপারে বেশি বৈশিষ্ট্যসূচক আর কিছু হতে পারে না। মানুষ-চোরদের এ-উদ্দেশ্যে বিশেষরকম প্রশিক্ষণ দেয়া হোত। এই ব্যবসায়ে চোর, দোভাষী আর বিক্রেতা ছিল প্রধান-প্রধান পক্ষ, স্থানীয় ছোট-ছোট রাজা ছিল এ-ব্যাপারে প্রধান মানুষবিক্রেতা। তরুণ ছেলেদের চুরি করার পর সেলিবিস দ্বীপে তাদের মাটির নিচের অন্ধকার ও গোপন কয়েদখানায় আটক রাখা হোত, ক্রীতদাসবাহিত জাহাজগুলিতে পাঠানোর জন্যে যতদিন-না তৈরি হোত তারা। এ-সম্পর্কে একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে:

'যেমন, উদাহরণস্বরূপ, মাকাসারের মতো এই একটি শহরই গোপন কয়েদখানায় পূর্ণ আর সেগুলির একটির চেয়ে অপরটি আবার আরও বীভৎস, ভয়ংকর; তার পরিবারবর্গের কাছ থেকে সবলে বিচ্ছিন্ন-করা, লোভ ও অত্যাচারের শিকার শৃঙ্খলবদ্ধ হতভাগ্যদের দিয়ে সেই কয়েদখানাগুলি ঠাসা।'

মালাক্কা-দ্বীপ দখলের উদ্দেশ্যে ওলন্দাজরা সেখানকার পোর্তুগিজ শাসককে ঘুসের লোভ দেখায়। ফলে ১৬৪১ সালে ওই শাসক তাদের শহর-প্রবেশের অনুমতি দেয়। কিন্তু শহরে ঢুকেই ওলন্দাজরা দ্রুত ওই শাসকের আবাসস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে হত্যা করে, শাসকের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যস্বরূপ ২১,৮৭৫ পাউন্ড তাকে দেয়া থেকে 'বিরত' থাকার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। এইভাবে ওলন্দাজরা যেখানেই পা দিয়েছে সেখানেই

Colonies'. London, 1838, p. 9. ক্রীতদাসদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে তথ্যের ভালো একটি সংগ্রহ পাওয়া যাবে: Charles Comte. 'Traité de Législation', 3ème éd. Bruxelles. 1837. এই বই প্রত্যেকের খুঁটিয়ে পড়া দরকার এটা বোঝার জন্যে যে বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই পেরেছে সেখানেই পৃথিবীর ছাঁচ নিজের চরিত্রানুগ করে ঢেলে সাজার জন্যে বাধাবন্ধহীন ভাবে নিজেকে ও শ্রমিককে নিয়ে কী কাণ্ডটাই-না করেছে।

* Thomas Stamford Raffles, late Lieut. Gov. of that island. 'The History of Java'. London, 1817 [v. II, p. CXC-CXCI, পরিশিষ্ট]।

পেছনে রেখে গেছে সর্বব্যাপী ধ্বংসস্তূপ ও জনহীন শূন্যতা। জাভার একটি প্রদেশ বাঞ্জুওয়াঙ্গিতে ১৭৫০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৮০ হাজারেরও বেশি আর ১৮১১ সালে সেখানে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৮ হাজারে। মধুর বাণিজ্যের এই হল ফল!

একথা সুবিদিত যে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানি (৪৬) ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা ছাড়াও সেখানকার চায়ের ব্যবসাতেও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছিল। সেইসঙ্গে হস্তগত করেছিল তারা সাধারণভাবে চীনের বাণিজ্য এবং ইউরোপ ও প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাও। তবে ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী ও দ্বীপগুলির মধ্যেকার বাণিজ্য এবং সেইসঙ্গে সেদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ওই কম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। লবণ, আফিম, পান ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ঐশ্বর্যের অফুরন্ত খনি। উপরোক্ত কম্পানির কর্মচারিরা এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের দর বেঁধে দিত নিজেরাই এবং খুশিমতো হতভাগা ভারতীয়দের পণ্যদ্রব্যাদি লুটে নিত। এই বে-সরকারি জুয়াচুরির কারবারে অংশীদার ছিলেন ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং। তাঁর প্রিয়পাত্ররা এমন সব শর্তে ব্যবসায়ের ঠিকাদারি পেত, যার ফলে অপরসায়নবিদদের চেয়েও ধূর্ত তারা ধূলিমুঠিকে সোনামুঠি বানিয়ে নিত। ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি গজিয়ে উঠল বহু লোকের ঐশ্বর্যের পাহাড়; দাদন বাবদ এক শিলিং খরচা ছাড়াই আদিম সঞ্চয় পুঞ্জীভূত হতে লাগল। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারের মামলায় উদ্‌ঘাটিত হল এমনই সব ঘটনার ছড়াছড়ি। যেমন, একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আফিম-চাষের অঞ্চল থেকে বহু দূরবর্তী ভারতের একটি এলাকায় সরকারি কাজ উপলক্ষে যাত্রার প্রাক্কালে সালিভান নামে জনেক ব্যক্তিকে আফিম-ক্রয়ের একখানি চুক্তিপত্র দেয়া হয়। সালিভান ৪০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ওই চুক্তিপত্রখানি বিক্রি করে বিন নামে অপর এক ব্যক্তিকে; বিন আবার ওইদিনই সেখানি বিক্রি করে ৬০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে, আর শেষপর্যন্ত যে-ব্যক্তি ওই চুক্তিপত্রটি কেনে ও চুক্তিমতো কাজটি নিষ্পন্ন করে সে জানায় যে সবকিছু খরচখরচা বাদ দিয়েও সে প্রচুর লাভ করেছে। ওই সময়ে পার্লামেন্টের সামনে পেশ-করা একখানি দলিল থেকে দেখা যায়

যে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানি ও তার কর্মচারিরা মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড উপহার হিসেবে পেয়েছে ভারতীয়দের কাছ থেকে। ১৭৬৯-১৭৭০ সালের মধ্যে ইংরেজরা ভারতে উৎপন্ন সব চাল কিনে নিয়ে ও অসম্ভব চড়া দামে ছাড়া তা বিক্রি করতে গররাজি হয়ে সেদেশে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে সাংঘাতিক এক দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি (ভারতে এই দুর্ভিক্ষ ভারতীয় সন ১১৭৬'এর অথবা সাধারণভাবে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে কুখ্যাত। — অনু.)।*

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (বা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। — অনু.)-এর মতো শুধুমাত্র রপ্তানি বাণিজ্যের জন্যে নির্ধারিত আবাদী বাগানের উপনিবেশগুলির এবং মেক্সিকো ও ইস্ট ইন্ডিজের মতো লুটপাটের লীলাক্ষেত্র সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশগুলির আদি বাসিন্দাদের প্রতি ব্যবহার ছিল স্বভাবতই অমানুষিক ও ভয়াবহ। তবে যথাযথভাবে যাদের বলা চলত উপনিবেশই, এমনকি সে-সব জায়গাতেও আদিম সঞ্চয়ের খ্রীস্টিয়ান চরিত্র আত্মপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হয় নি। ১৭০৩ সালে প্রোটেস্টান্ট-ধর্মের নীতিবাগীশ ধ্বজাধারী নিউ ইংলন্ড অঞ্চলের 'পিউরিটান'রা তাদের আইনসভার নানা ডিক্রি অনুযায়ী প্রতিটি রেড ইন্ডিয়ানের মুণ্ড ও প্রতিটি বন্দী লাল চামড়ার লোকের জন্যে ৪০ পাউন্ড করে পুরস্কার বরাদ্দ করে। ১৭২০ সালে ওই মুণ্ডপিছু পুরস্কারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ পাউন্ড করে। ম্যাসাচুসেট্স-উপসাগরের ঘটনার পরে রেড ইন্ডিয়ানদের একটি বিশেষ উপজাতি-গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয় এইমর্মে: যথা, ১২ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষের মুণ্ডপিছু ১০০ পাউন্ড (নতুন মুদ্রায়), পুরুষ বন্দীপিছু ১০৫ পাউন্ড, স্ত্রীলোক ও শিশু বন্দীপিছু ৫৫ পাউন্ড এবং স্ত্রীলোক ও শিশুর মুণ্ডপিছু ৫০ পাউন্ড। আবার এর কয়েক দশক পরে ধর্মপ্রাণ 'পিউরিটান' এই নতুন বসতি-স্থাপনকারীদের সন্তানসন্ততিরা ইতিমধ্যে রাজদ্রোহী হয়ে ওঠায় ব্রিটিশ

* ১৮৬৬ সালে শুধুমাত্র ওড়িশা প্রদেশেই ১০ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় মারা যায় অনাহারে। তৎসত্ত্বেও বুভুক্ষু জনসাধারণের কাছে জীবনধারণের উপযোগী প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে-দামে বিক্রি করা হয় তা দিয়ে ভারতীয় রাজকোষ পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা চলে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতেও ভোলে না। ইংরেজদের উস্কানিতে আর টাকা খেয়ে লাল চামড়ার লোকেরা এবার ওই বসতকারীদেরই রেড ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ-কুঠারের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই মানুষ-মৃগয়া আর মুণ্ডশিকারকে ঘোষণা করে 'ঈশ্বর ও প্রকৃতিদত্ত পড়ে-পাওয়া সুযোগসুবিধা' বলে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা 'হটহাউস'-এর কৃষি-ব্যবস্থার মতো পাকিয়ে তুলল বাণিজ্য আর নৌ-চলাচলকে। পুঁজির কেন্দ্রীভবনের কাজে শক্তিশালী চালক-শক্তি ছিল লুথারের 'একচেটিয়া বণিক-সমিতি'গুলি। উঠতি হস্তশিল্পগুলির জন্যে উপনিবেশসমূহ বিক্রির বাজার নিশ্চিত করে তুলল এবং এইসব বাজারের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব নিশ্চিত করল ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়কে। অপ্রচ্ছন্ন লুটপাট, দাসত্ব আরোপ ও খুনখারাপির ফলে যে-ঐশ্বর্য ইউরোপের বাইরে হস্তগত হল তা চালান হয়ে এল ইউরোপের নানা দেশে আর পরিণত হল পুঁজিতে। হল্যাণ্ডই প্রথম তার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে পূর্ণবিকশিত করে তোলে এবং ১৬৪৮ সালের মধ্যেই দেশটি তার বাণিজ্যিক গৌরবের চূড়া স্পর্শ করে।

'দেশটি ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়ার বাণিজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মধ্যেকার ব্যাপক ব্যবসায়ের প্রায় একচেটিয়া অধিকারী। সে-দেশের মাছের খামার, জাহাজ চলাচল ও হস্তশিল্প-কারখানাগুলি সংখ্যায় ও উৎকর্ষে ছাড়িয়ে গিয়েছিল অপর সকল দেশকেই। প্রজাতন্ত্রটির মোট পুঁজির পরিমাণ সম্ভবত ইউরোপের বাকি সকল দেশের মিলিত পুঁজির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল' (৪৭)।

তবে গ্যুলিখ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে ১৬৪৮ সাল নাগাদ হল্যাণ্ডের জনসাধারণ বাকি ইউরোপের মিলিত জনসাধারণের চেয়েও ছিল অত্যধিক খাটুনিতে বেশি জর্জরিত, বেশি দরিদ্র ও অধিক নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত।

আজকের দিনে শিল্পগত প্রাধান্যই বাণিজ্যগত প্রাধান্যের পরিচায়ক। কিন্তু যথাযথ হস্তশিল্প-কারখানার যুগে ব্যাপারটির ছিল উলটো। তখন বাণিজ্যিক প্রাধান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জনের সহায়ক ছিল। এ-কারণেই সে-সময়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পালন করেছে অমন এক প্রভাবশালী ভূমিকা।

এই ব্যবস্থা ছিল সেই 'অভিনব দেবতা' যে ইউরোপের প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে পূজাবেদীতে গালে গাল ঠেকিয়ে বসে ছিল, আর তারপর এক শুভদিনে এক ধাক্কায়, একটি লাথির ঘায়ে সে বাকি সবাইকে নিক্ষেপ করেছিল আবর্জনাস্তূপে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই উদ্বৃত্ত মূল্যকে করে তুলল মানবসমাজের অর্জনীয় একটিমাত্র ও পরম লক্ষ্য ও পরিণতির দিগন্ত।

সেই সুদূর মধ্যযুগে জেনোয়া ও ভেনিসে যার উৎপত্তির উৎসের সন্ধান পাই আমরা সেই সামাজিক ক্রেডিট বা রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ব্যবস্থা ব্যাপক হারে হস্তশিল্প-কারখানাগুলির যুগে সাধারণভাবে ইউরোপের প্রধান ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল। সমুদ্রপথের বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক যুদ্ধাদি সহ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল এই প্রথাকে দ্রুত পাকিয়ে তোলার ক্ষেত্রস্বরূপ। এইভাবে এই প্রথা প্রথম শিকড় গাড়ল হল্যান্ডে। রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ, অর্থাৎ স্বৈরশাসিত, সংবিধানসম্মত অথবা প্রজাতন্ত্রী যে-ধরনের রাষ্ট্রই হোক-না কেন তার বিচ্ছিন্নতা, পুঁজিতান্ত্রিক যুগের ওপর নিজস্ব মোহরছাপ অঙ্কিত করে দিল। তথাকথিত জাতীয় সম্পদের একমাত্র যে-অংশ সত্যিসত্যিই আধুনিক জাতিসমূহের যৌথ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা হল তাদের এই রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ।* এর ফলেই, এর প্রয়োজনীয় ফলাফল হিসেবেই, এই আধুনিক তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটেছে যে কোনো জাতি যত গভীরভাবে ঋণে ডুবে থাকে ততই সে ধনী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় ক্রেডিট এইভাবে হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজির 'ধর্মবিশ্বাস' স্বরূপ। আর এই রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ সম্পর্কে আস্থার অভাব ক্রমশ স্থান নিয়েছে আগেকার কালের সেই ঈশ্বরনিন্দার সমতুল্য হয়ে আর তা প্রায়শই ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আদিম সঞ্চয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী অন্যতম চালক-শক্তি। কেননা ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডের একবারমাত্র আস্ফালনে তা অনুৎপাদী অর্থকে ডিম পাড়ার ক্ষমতা দিয়ে তাকে পরিণত করল পুঁজিতে, নিজেকে শিল্পে অথবা এমনকি তেজারতি কারবারে নিযুক্ত

---

* উইলিয়ম কবেট মন্তব্য করেছেন যে ইংলন্ডে সকল জনপ্রতিষ্ঠানই 'রাজকীয়' বিশেষণে ভূষিত; তবে এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ 'রাষ্ট্রীয়' ঋণ-সংগ্রহের ব্যাপারটি অবশ্য রয়ে গেছে।

করার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা কষ্টটুকু ও ঝুঁকিটুকুও নেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না-করেই। রাষ্ট্রের ঋণদাতারা আসলে কিছুই দিয়ে দেয় না, কেননা যে-অর্থ তারা ঋণ হিসেবে দেয় তা রূপান্তরিত হয় সহজে বিনিময়যোগ্য রাষ্ট্রীয় মুচলেকা পত্রে এবং সেগুলি তাদের হাতে নগদ মুদ্রার মতোই কার্যকর থেকে যায়। কিন্তু এইভাবে একশ্রেণীর অলস বার্ষিক বৃত্তিপ্রাপক তৈরি করা ও পুঁজি-বিনিয়োগকারীদের বা গভর্নমেণ্ট ও জাতির মধ্যবর্তী দালালদের হাতের কাছে তৈরি সম্পদের যোগান দেয়া ছাড়াও, এবং সেইসঙ্গে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ঋণের একটা মোটা অংশ আকাশ-থেকে-পড়া পুঁজি হিসেবে যাদের সেবায় লাগে সেই ইজারাদার খামারী, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিগত শিল্পোৎপাদকদের বাদ দিয়েও, রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে নানা জয়েণ্ট-স্টক কম্পানির, বহুবিচিত্র ধরনের বিনিময়যোগ্য ফলাফলযুক্ত কজে-কারবারের এবং স্টক-এক্সচেঞ্জ কারবারের — অর্থাৎ এক কথায়, স্টক-এক্সচেঞ্জের জুয়াখেলার ও আধুনিক ব্যাঙ্ক-মালিক চক্রের।

জাতীয় নানা খেতাবে ভূষিত বড়-বড় ব্যাঙ্ক তাদের জন্মলগ্নে ছিল ব্যক্তিগত ফাটকাবাজদের সংঘমাত্র। এই সংঘগুলি অবস্থান করত গভর্নমেণ্টগুলির পাশাপাশি এবং নানারকম সুযোগসুবিধে পাওয়ার দৌলতে রাষ্ট্রকে অর্থ ঋণ দেয়ার অবস্থায় ছিল তারা। ফলত, রাষ্ট্রীয় ঋণের ক্রমাগত সঞ্চয়বৃদ্ধির অব্যর্থ পরিমাপ ওই সমস্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ক্রমান্বয় বংশবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ওই সমস্ত ব্যাঙ্কের পূর্ণবিকাশ ঘটেছে ১৬৯৪ সালে ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা থেকে। প্রতিষ্ঠার পর ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ড গভর্নমেন্টকে নিজস্ব অর্থ ঋণ দিতে শুরু করল ৮ শতাংশ সুদের হারে, সেইসঙ্গে পার্লামেন্টের কাছ থেকে তা ক্ষমতা পেল ওই একই পুঁজি ব্যাঙ্কনোটের আকারে জনসাধারণকে ফের ঋণ হিসেবে দিয়ে তা থেকে দু'পয়সা কামাতে। ব্যাঙ্কটিকে অধিকার দেয়া হল হুণ্ডি থেকে বাট্টার অংশ কেটে নেয়া, বিভিন্ন পণ্য ক্রয়বাবদ অগ্রিম দেয়া এবং সোনা-রুপো ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু কেনার কাজে ওই ব্যাঙ্কনোটগুলি ব্যবহার করার। এর অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে ব্যাঙ্কের নিজের কর্জকরা এই অর্থ রাষ্ট্রকে দেয় ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ডের ঋণদানের অর্থ হয়ে দাঁড়াল এবং রাষ্ট্রের তরফে তা রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদবাবদ পরিশোধ করা হতে লাগল। এক হাতে যা দিতে

লাগল ব্যাঙ্ক কেবল-যে অন্য হাতে তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে নিতে লাগল এটাও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হল না, এমনকি অর্থ ফেরত পেয়ে চলা সত্ত্বেও আগাম-বাবদ-দেয়া শেষ শিলিংটি ফেরত পাওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক রয়ে গেল জাতির চিরস্থায়ী উত্তমর্ণ হিসেবে। ক্রমশ অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাংক হয়ে দাঁড়াল দেশের মূল্যবান ধাতুর সমগ্র সঞ্চয়ের আধার এবং সকল বাণিজ্যিক ব্যাপারে ঋণদানের ভরকেন্দ্র। অকস্মাৎ এই ব্যাংক-মালিকচক্র, পুঁজিলগ্নীকারী, বাণিজ্যে বা সরকারি লগ্নীপত্রে অর্থ-বিনিয়োগকারী, দালাল, শেয়ার-বাজারের দালাল, ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব এদের সমকালীনদের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানা যায় ওই সময়কার নানা রচনা, যেমন বোলিংব্রোকের রচনা থেকে।*

রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঋণদান-ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটল। অমুক বা তমুক জাতির আদিম সঞ্চয়ের একটি উৎসকে প্রায়শই আড়াল করে রেখেছে এই ব্যবস্থাটি। ভেনিসীয় চৌর্যবৃত্তির প্রথার শয়তানি হল্যান্ডের পুঁজি-সম্পর্কিত ঐশ্বর্যের গোপন ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা ভেনিস তার অবক্ষয়ের যুগে মোটা-মোটা অর্থ ঋণ দিয়েছিল হল্যান্ডকে। হল্যান্ড ও ইংলন্ডের মধ্যেও ব্যাপারটা ঘটেছিল একই রকম। অষ্টাদশ শতকের সূচনা নাগাদ হল্যান্ডের হস্তশিল্প-কারখানাভিত্তিক উৎপাদন বহু পরিমাণে পেছনে পড়ে গিয়েছিল। প্রধানত বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক জাতির ভূমিকা হল্যান্ডের তখন আর ছিল না। এ-কারণে ১৭০১ থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত হল্যান্ডের ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান একটি ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিদেশকে, বিশেষ করে সে-দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলন্ডকে, ঋণ হিসেবে দেয়া। এই একই ব্যাপার বর্তমানে চলেছে ইংলন্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। আজকের দিনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে-বিপুল পরিমাণ পুঁজি উৎপত্তির পরিচয়-পত্র ছাড়াই দেখা দিচ্ছে তা গতকাল ছিল ইংলন্ডে, পুঁজিতে পরিণত শিশুদের রক্ত হিসেবে।

জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়ী রাজস্ব রাষ্ট্রীয় ঋণবাবদ দেয়

* 'যদি আমাদের কালে ইউরোপ তাতারে পরিপূর্ণ হোত তাহলে আমাদের মধ্যে পুঁজিলগ্নিকারীর তাৎপর্য কী তা তাদের বোঝানো হয়ে দাঁড়াত খুবই কঠিন।' (Montesquieu, 'Esprit des loix', éd. Londres, 1769, t. IV, p. 33.)

বাৎসরিক সুদ ইত্যাদি পুষিয়ে নিতে বাধ্য থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় ঋণ যেমন তার নির্ভর খুঁজে পেল জন রাজস্বের মধ্যে, তেমনই আধুনিক কর-নির্ধারণ ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পূরকস্বরূপ। এই সমস্ত সরকারি ঋণগ্রহণের ফলে করদাতারা সঙ্গে সঙ্গে তা টের না-পেলেও গভর্নমেণ্ট তার অতিরিক্ত নানা খরচখরচা মেটাতে পারছে বটে, তবে এর ফলেই আবার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে কর বৃদ্ধি করার। অন্যদিকে আবার একটার-পর-একটা নতুন-নতুন ঋণের বোঝা ঘাড়ে চেপে যাওয়ায় গভর্নমেণ্ট যেমন কর বৃদ্ধি করে চলেছে, তেমনই নতুন-নতুন অতিরিক্ত খরচখরচা মেটানোর জন্যে গভর্নমেণ্ট সর্বদাই নতুন-নতুন ঋণ গ্রহণ করতেও বাধ্য হচ্ছে। জীবনধারণের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপর কর-নির্ধারণ (ফলে ওই সকল দ্রব্যের দরবৃদ্ধি) যে রাজস্ব-সংক্রান্ত আধুনিক নীতির অক্ষদণ্ড, তার মধ্যেই এইভাবে স্বয়ংক্রিয় ক্রমবৃদ্ধির বীজ নিহিত থাকে। অতিরিক্ত করভার-বৃদ্ধি তাই বিশেষ কোনো ঘটনা নয়, বরং তা একটি নীতিই বলা চলে। তাই দেখা যায় হল্যান্ডে, যেখানে এই ব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল, সেখানে মহান দেশপ্রেমিক ডে উইট তাঁর 'সুভাষিতাবলী'তে (৪৮) মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের বশ্যবাধ্য, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ও শ্রমভারে অতিরিক্ত জর্জরিত করে রাখার পক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করে এর গুণগানে মুখর হচ্ছেন। মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের অবস্থার ওপর এই ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিয়ে এখানে অবশ্য আমরা ততটা মাথা ঘামাচ্ছি না, যতটা বিবেচনা করতে চাইছি এর ফলে সংঘটিত কৃষক, কারুশিল্পী এবং এক কথায় পেটি বুর্জোয়ার সকল স্তরের মানুষের বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ নিয়ে। এ-ব্যাপারে এমনকি বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যেও দ্বিমত দেখা যায় না। উচ্ছেদের ব্যাপারে এর ফলপ্রসূতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এ-ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গের একটি সংরক্ষণ-ব্যবস্থার দৌলতে।

রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ও তার সঙ্গে সুসমঞ্জস রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থা সম্পদের পুঁজিতে পরিণতকরণ ও জনসাধারণের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বড় একটি ভূমিকা পালন করায় কবেট, ডাব্‌ল্‌ডে ও অন্যান্য বহু লেখক ভ্রান্তিবশত রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ও রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যেই আধুনিক জাতিসমূহের দুঃখদুর্দশার মৌল কারণের সন্ধান করে ফিরেছেন।

শিল্পোৎপাদনকারীদের উৎপাদন, স্বাধীন শ্রমিকদের নিঃস্বকরণ, জাতীয় উৎপাদনের ও জীবনধারণের উপায়-উপকরণকে পুঁজিতে পরিণতকরণ এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে উত্তরণকে বলপ্রয়োগে সংক্ষিপ্তকরণের ব্যাপারে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল একটি কৃত্রিম উপায়। এই আবিষ্কারটির একচেটিয়া অধিকারভোগের জন্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি একে অপরকে ছিঁড়ে টুকরোটুকরো করে দেয়, এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদকদের সেবায় একবার নিযুক্ত হবার পর এই উদ্দেশ্যসাধনে কেবল-যে তারা পরোক্ষভাবে সংরক্ষণমূলক শুল্কাদি কায়েম করে ও প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানি-বাণিজ্যে বিশেষ সুযোগসুবিধাদি দিয়ে তাদের নিজ-নিজ জাতিকেই এর অধীন করল তা-ই নয়, বলপ্রয়োগে তাদের অধীনস্থ দেশগুলির সকল শিল্পকেই নির্মূল করল তারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আয়র্ল্যান্ডের পশমী বস্ত্রশিল্পকে ঠিক এইভাবেই নির্মূল করেছিল ইংলন্ড। ইউরোপ মহাদেশে কলবেরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াটিকে অনেক সরল করে তোলা হয়েছিল। এখানে আদিম শিল্প-পুঁজির আংশিক যোগান পাওয়া গিয়েছিল সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই।

মিরাবো সচিৎকার বলছেন, 'আরে, সাত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের আগে (৪৯) স্যাক্সনির হস্তশিল্প-কারখানা-ব্যবস্থার মাহাত্ম্যের কারণ খুঁজতে অতদূরে যাওয়ার দরকার কী? রাজাদের গৃহীত ১৮ কোটি-সংখ্যক ঋণের দিকে একবার তাকালেই তো হয়!'*

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, রাজকরের গুরুভার, সংরক্ষণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক যুদ্ধ, ইত্যাদি সত্যিকার হস্তশিল্প-কারখানার উৎপাদনের যুগের এই সমস্ত ফলাফল বিরাট আকার ধারণ করে আধুনিক শিল্পের শৈশবাবস্থাতেই। শেষোক্ত ওই ব্যাপারটির জন্ম সূচিত হয় শিশুদের এক বিপুল নিধনযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে। রাজকীয় নৌ-বহরের মতোই ফ্যাক্টরিগুলির জন্যেও তখন কর্মী-সংগ্রহ করা হয় আড়কাঠিবাহিনীর সাহায্যে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে তাঁর নিজের কাল, অষ্টাদশ শতকের শেষপর্যন্ত, জমি থেকে কৃষিজীবী জনসাধারণের উচ্ছেদের ভয়াবহতা সম্বন্ধে স্যর এফ. এম. ইডেন যেমন নির্বিকার, যতখানি আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে তিনি

* মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১।

খুশি হয়ে বলতে পারেন যে ওই প্রক্রিয়াটি পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং 'আবাদী জমি ও মেষচারণ-ক্ষেত্রের মধ্যে যথাযথ অনুপাত' সৃষ্টির ব্যাপারে 'অপরিহার্য' একটি প্রক্রিয়া; ততখানি অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি অবশ্য দিতে পারেন নি হস্তশিল্প-কারখানাভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শোষণকে ফ্যাক্টরি-সংশ্লিষ্ট শোষণে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে এবং পুঁজি ও শ্রমশক্তির মধ্যে 'খাঁটি সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠায় শিশুচুরি ও শিশু-দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলছেন:

'এ-ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভবত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য যে কোনো কারখানায় সফলভাবে কাজ পরিচালনা করতে হলে দরিদ্র শিশুদের সন্ধানে কৃষকদের কুটিরগুলি ও দরিদ্রবসতিগুলি তন্নতন্ন করে চুঁড়ে দেখা প্রয়োজন কিনা? ওই শিশুদের পালাক্রমে রাত্রের বেশির ভাগ সময় কাজে নিযুক্ত করা এবং যে-বিশ্রামটুকু সকল মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে তো বটেই, বিশেষ অপরিহার্য তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত কিনা? উচিত কিনা বিভিন্ন বয়স ও স্বভাবের বেশকিছু-সংখ্যক ছেলেমেয়েকে একত্র জমায়েত করে রাখা যাতে অসৎ সংসর্গের ছোঁয়াচে ভ্রষ্টাচার ও লাম্পট্যের প্রাদুর্ভাব না-ঘটে পারে না? এতে কি ব্যক্তিগত ও জাতীয় সুখসৌষ্ঠবের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে?'*

ফিলডেন বলছেন, 'ডার্বিশায়ার, নটিংহ্যামশায়ার এবং বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ারের জেলাগুলিতে জলের তোড়ে চালক-চক্রগুলি ঘোরাতে সমর্থ এমন সমস্ত নদীর ধারে নির্মিত বড়-বড় ফ্যাক্টরিসমূহে নতুন-আবিষ্কৃত নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছিল। এ-কারণে এই সমস্ত কাজের জায়গায় আচমকা প্রয়োজন হয়ে পড়ল হাজার-হাজার শ্রমিকের, অথচ জায়গাগুলো ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ার তখনও পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্পবসতিপূর্ণ ও বন্ধ্যা অঞ্চল ছিল বলে তার পক্ষে খুবই বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ল কর্মী-জনগণের। ছোট-ছোট শিশুর কচি-কচি হাতের চটপটে কর্মতৎপর আঙুলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি করে দেখা দিয়েছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন, বার্মিংহাম ও অন্যান্য জায়গার নানা যাজকপল্লীর দরিদ্র-বসতিগুলি থেকে **শিক্ষানবিশ** সংগ্রহ করাটা রীতিমতো একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেল। ৭ বছর থেকে ১৩ বা ১৪ বছর বয়সী হাজার-হাজার এইসব খুদে, দুর্ভাগা জীবদের পাঠিয়ে দেয়া হল দেশের উত্তরাঞ্চলে। মালিকই তার শিক্ষানবিশদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে এবং ফ্যাক্টরির কাছাকাছি এক 'শিক্ষানবিশ-আলয়ে' তাদের থাকতে দেবে এই ছিল রীতি। শিশুদের কাজের তদারক করার জন্যে

---

* ইডেন, উদ্ধৃত রচনা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭২১।

উপদর্শকেরা নিযুক্ত হত। এদের স্বার্থ ছিল শিশুদের যতদূর-সম্ভব বেশি খাটিয়ে নেয়া, কারণ যে-পরিমাণ কাজ তারা আদায় করতে পারত সেই অনুপাতে বেতন পেত তারা। বলা বাহুল্য, এর পরিণামে ছিল নিষ্ঠুরতা।... অনেকগুলি শিল্প-কারখানা অঞ্চলে, তবে আমার আশঙ্কা এই যে আমি যে-জেলার (ল্যাঙ্কাশায়ার) অধিবাসী বিশেষ করে সেই জেলায়, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুরতার চর্চা চলেছিল সেই নির্দোষ ও বন্ধুহীন অসহায় জীবগুলির ওপর — যাদের এইভাবে সঁপে দেয়া হয়েছিল কারখানা-মালিকদের হেফাজতে। অতিরিক্তরকম খাটিয়ে ছেলেমেয়েগুলিকে হয়রান করে একেবারে মৃত্যুর কিনারায় এনে ফেলা হয়েছিল... সবচেয়ে নিদারুণ মার্জিত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে তাদের বেত মারা, শিকলে বেঁধে রাখা ও উৎপীড়ন করা হোত।... বহুক্ষেত্রেই তাদের নিরম্বু উপবাস করিয়ে রেখে বেত মেরে কাজ করানো হোত এবং... এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে... এমন অবস্থায় এনে ফেলা হোত তাদের যাতে তারা আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়।... এইভাবে সৌন্দর্যে অনুপম ডার্বিশায়ার, নটিংহ্যামশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের রোমাণ্টিক উপত্যকাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে হয়ে উঠেছিল উৎপীড়নের ও বহুক্ষেত্রে নরহত্যারও নিরানন্দ নির্জন কারখানার তুল্য। এতে কারখানা-মালিকদের মুনাফা জুটেছিল প্রচুর, কিন্তু এতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাক, তাদের লালসা গেল আরও বেড়ে; আর তাই কারখানা-মালিকরা এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করল যার ফলে মনে হয় তাদের মুনাফা-লোটার পথ যে শুধু প্রশস্ত ও নিশ্চিত হল তা-ই নয়, তা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারা চালু করল যাকে বলা হয় 'রাতের কাজ'এর পদ্ধতি, অর্থাৎ একদল ছেলেপিলেকে সারাদিন ধরে খাটিয়ে ক্লান্ত করে ফেলে তারা আরেক দল ছেলেপিলেকে কারখানায় ঢোকাত সারা রাত ধরে কাজ করানোর জন্যে। রাতের শিশু-মজুরের দল যে-বিছানা সবে ছেড়ে এসেছে দিনের শিশু-মজুরের দল তখন গিয়ে শুত সেই বিছানায়, আবার সকালবেলায় তাদের পালা এলে দিনের মজুরের দল যে-বিছানা ছেড়ে আসত সেই বিছানায় গিয়ে শুত রাতের মজুরের দল। বিছানাগুলো কখনও মানুষের দেহের উত্তাপ ভুলে ঠাণ্ডা হবার সময় পায় না — এটাই হল ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রচলিত ঐতিহ্য।'*

---

* John Fielden. 'The Curse of the Factory System', London, 1836, pp. 5, 6. ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থার এরও পূর্ববর্তী কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কথা জানার জন্যে দেখুন ডঃ আইকিনের (১৭৯৫ সাল) গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১৯, এবং Gisborne. 'Inquiry into the Duties of Men', 1795. Vol. II. স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে দেশের ফ্যাক্টরিগুলিকে যখন গ্রামাঞ্চলের ঝর্নার ধার থেকে শহরগুলির মাঝখানে সরিয়ে আনা হল, তখন উদ্বৃত্ত মূল্যের 'মিতাচারী' উৎপাদকরা ফ্যাক্টরির কাজে শিশু-শ্রমিকদের পেয়ে গেল একেবারে হাতের কাছেই, দরিদ্র-বসতিগুলিতে ক্রীতদাসের সন্ধানে ছুটতে হল না আর তাদের। ১৮১৫ সালে স্যার আর. পীল ('বাকপটু মন্ত্রী'র

হস্তশিল্পভিত্তিক বড় আকারের উৎপাদনের যুগে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় জনমত লজ্জা ও বিবেক-দংশনের অবশেষটুকুও হারিয়ে বসল। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয় গড়ে তোলার উপায় হিসেবে যে-কোনো জঘন্য অসৎ কাজ তাদের সহায়ক হলেও নির্লজ্জভাবে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল ইউরোপীয় জাতিগুলি। উদাহরণস্বরূপ মহদাশয় অ্যা. অ্যান্ডারসনের কলাকৌশলবর্জিত সরল বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত-সংক্রান্ত বইখানি পড়ুন। এ-বইয়ে বগল বাজিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-পরিচালনকৌশলের পরাকাষ্ঠা বলে জাহির করা হয়েছে ইউট্রেখ্‌টে যুদ্ধ শান্তির ব্যাপারটিকে। এই শান্তিস্থাপনের ফলে আসিয়েন্তো চুক্তি (৫০) অনুযায়ী ইংলন্ড স্পেনদেশীয়দের কাছ থেকে আদায় করে নেয় নিগ্রো দাস-ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগসুবিধা। এর আগে পর্যন্ত এই ব্যবসায় পরিচালিত হোত কেবলমাত্র আফ্রিকা ও ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আফ্রিকা ও স্প্যানিশ আমেরিকার মধ্যে। ওই চুক্তির বলে ইংলন্ড ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ আমেরিকাকে বছরে ৪.৮০০ জন করে নিগ্রো-দাস সরবরাহের অধিকার লাভ করে। এই সঙ্গে আলোচ্য চুক্তিটি ব্রিটিশ চোরাচালানি

বারো) যখন শিশুদের সংরক্ষণ-সম্পর্কিত আইনের প্রস্তাবিত খসড়াটি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করেন তখন 'বুলিয়ান (ধাতুখণ্ডের বাট) নিয়ন্ত্রণ কমিটির' প্রধান ও রিকার্ডোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রান্সিস হোর্নার কমন্স-সভায় বলেন: 'এটা একটা কুৎসিত ব্যাপার যে কোনো দেউলিয়া ব্যক্তির জিনিসপত্রের মতো এই শিশুদের একটি ক্রীতদাস-দলকে (কথাটা যদি বলতে অনুমতি দেন) বিক্রির জন্যে উপস্থাপিত করা হয় এবং যেন কারও সম্পত্তির অংশ এইভাবে প্রকাশ্যে তা বিজ্ঞাপিত করা হয়। দুবছর আগে 'কিংস বেঞ্চ'এর আদালতে একটা অত্যন্ত বর্বর, নৃশংস ঘটনার শুনানি ওঠে। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে লন্ডনের একটি যাজকপল্লী থেকে জনৈক কারখানা-মালিকের কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে বেচে-দেয়া ওই ধরনের কিছু-সংখ্যক ছেলেকে অপর একজনের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় এবং ওই সময়ে কিছু সদাশয় ব্যক্তি দেখতে পান যে ছেলেগুলি অনাহারে একেবারে দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থায় রয়েছে। একটি (পার্লামেন্টারি) কমিটিতে কাজ করার সময় এর চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি ঘটনা তাঁর গোচরে আসে... তা হল এই যে অল্প কয়েক বছর আগে লন্ডনের একটি যাজকপল্লী ও ল্যাংকাশায়ারের এক কারখানা-মালিকের মধ্যে এইমর্মে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে চুক্তির একটি শর্ত অনুসারে প্রতি ২০ জন সুস্থ ছেলেমেয়ের সঙ্গে কারখানা-মালিককে একজন করে জড়বুদ্ধি শিশুকে নিতে হবে।'

কারবারের ওপরও সরকারি ক্রিয়াকলাপের আবরণ হিসেবে কাজ করে। এই দাস-ব্যবসায়ের ফলে ফুলেফেঁপে ওঠে ঐশ্বর্যসম্ভারে লিভারপুল। আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের এইটিই ছিল লিভারপুলের পদ্ধতি। এমনকি আজকের দিনেও লিভারপুলের 'কৌলীন্য'এর ভিত্তি হল এই দাস-ব্যবসায়ের জয়গাথা। এ-প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত আইকিনের ওপরে-উদ্ধৃত বইখানি (১৭৯৫ সালে প্রকাশিত) দেখুন। সে-বইয়ে বলা হয়েছে যে দাস-ব্যবসায় 'মিলে গিয়েছিল লিভারপুলের বাণিজ্যরীতির যা বৈশিষ্ট্য সেই দুঃসাহসিক অভিযানের মনোভাবের সঙ্গে এবং তা দ্রুত লিভারপুলকে উন্নীত করে তার বর্তমান ঐশ্বর্যের অবস্থায়। এর ফলেই এখানে জাহাজ-চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল পরিমাণে ও নাবিকরাও নিযুক্ত হয়েছে প্রচুর সংখ্যায় এবং তা দেশের কলকারখানাগুলির চাহিদাও মিটিয়েছে বিপুল পরিমাণে' (পৃষ্ঠা ৩৩৯)। দাস-ব্যবসায়ে লিভারপুল ১৭৩০ সালে নিযুক্ত করে ১৫খানা জাহাজ, ১৭৫১ সালে—৫৩, ১৭৬০ সালে—৭৪, ১৭৭০ সালে—৯৬ আর ১৭৯২ সালে তা নিযুক্ত করে ১৩২খানা জাহাজ।

সুতী-বস্ত্রশিল্প যেমন ইংলন্ডে প্রবর্তন ঘটায় শিশু-দাসত্বের তেমনই তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আগেকার কমবেশি পিতৃতান্ত্রিক দাসত্বের এক ধরনের বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটানোয় প্রেরণা যোগায়। সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপের মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের আব্রু-দেয়া দাসত্বের পক্ষে শক্ত পাদপীঠ পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিল নতুন দুনিয়ায় বিশুদ্ধ ও সরল দাসত্ব-প্রতিষ্ঠার।*

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির 'চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়মাবলী' প্রতিষ্ঠার জন্যে, শ্রমিককুল ও শ্রমের অবস্থাদির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে, এক মেরুতে উৎপাদনের ও জীবনধারণের সামাজিক উপায়-উপকরণাদিকে পুঁজিতে ও ভিন্ন মেরুতে জনসাধারণের

* ১৭৯০ সালে ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে ছিল প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু দশজন করে ক্রীতদাস, সেখানকার ফরাসি-অধিকৃত এলাকায় প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু চোদ্দজন করে দাস এবং ওলন্দাজ-অধিকৃত এলাকায় প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু তেইশজন করে ক্রীতদাস।

বিপর্‌ল জনসংখ্যাকে মজর্‌রিনির্ভর-শ্রমিকে, আধর্‌নিক সমাজের সেই কৃত্রিম ফসল 'স্বাধীন শ্রমজীবী দরিদ্র'এ* রর্‌পান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে — 'tantae molis erat' (৫২)। অজিয়ে-র মতে, যদি অর্থ 'এ-দর্‌নিয়ায় জন্ম নিয়ে থাকে তার এক গালে সহজাত রক্তের চিহ্ন নিয়ে'**, তাহলে বলতে

(Henry Brougham. 'An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers'. Edinburgh, 1803, v. II, p. 74.)

* যে-মর্‌হর্‌র্ত থেকে মজর্‌রিনির্ভর-শ্রমিকদের শ্রেণী নজরে পড়ার মতো অবস্থায় এসেছে সেই মর্‌হর্‌র্ত থেকেই ব্রিটিশ আইনের ধারাগর্‌লিতে এই 'শ্রমজীবী দরিদ্র' বাক্যাংশটি পাওয়া গেছে। এই আখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে একদিকে 'নিষ্কর্মা দরিদ্র', ভিক্ষর্‌ক, ইত্যাদি ও অপরদিকে যে-সমস্ত শ্রমিক তাদের শ্রমের নিজস্ব উপায়-উপকরণাদির তখনও পর্যন্ত মালিক থেকে গেছে, অর্থাৎ যে-সমস্ত পালক তখনও পর্যন্ত পালক ছিঁড়ে নেয়া হয় নি, তাদের সঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রমিকদের পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে। সংবিধানের গ্রন্থ থেকে আখ্যাটি পরে গৃহীত হয়েছে অর্থশাস্ত্রের বইতে, এবং কালপেপের, জো. চাইল্ড, ইত্যাদি, মারফত তা হস্তগত হয়েছে অ্যাডাম স্মিথ ও ইডেনের। এর পর যে-কেউ বিচার করতে পারেন 'জঘন্য রাজনৈতিক আবোলতাবোল বর্‌কনি-ব্যবসায়ী' এডমান্ড বার্কের সততার, যখন তিনি 'শ্রমজীবী দরিদ্র' আখ্যাটিকে বলেন 'জঘন্য রাজনৈতিক আবোলতাবোল বর্‌কনি'। ইংরেজ উচ্চবিত্ত-শাসনের বেতনভুক এই তোষামোদ-বিশারদটি ফরাসি বিপ্লবের বিরর্‌দ্ধে সাময়িক চাহিদা অনর্‌যায়ী রোমান্টিক জীবনের প্রশস্তি-কীর্তনীয়ার ভূমিকায় নামেন, আবার আমেরিকান ঝুটঝামেলার শর্‌রর্‌তে উত্তর আমেরিকান উপনিবেশসমর্‌হের কাছ-থেকে-পাওয়া বেতনমাহাত্ম্যে ইংরেজ উচ্চবিত্ত-শাসককুলের বিরর্‌দ্ধে অভিনয় করেন উদারনীতিকের ভূমিকায়; তবে আসলে লোকটি পর্‌রোদস্তুর স্থর্‌লরর্‌চি বর্‌র্জোয়া ছাড়া কিছর্‌ নন। 'বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনকানর্‌ন হল প্রকৃতির নিয়ম, আর তাই তা ঈশ্বরেরই বিধান।' (E. Burke. 'Thoughts and Details on Scarcity', ed. London, 1800, pp. 31, 32.) অতএব এতে আশ্চর্য হবার কিছর্‌ নেই যে ঈশ্বর ও প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনর্‌যায়ী তিনি সর্বদাই সবচেয়ে চড়া দামের বাজারে নিজেকে বিক্রি করেছেন। এই এডমান্ড বার্ক ব্যক্তিটির উদারনীতিক ভেক ধারণের সময়কার ভারি চমৎকার একখানি চিত্র পাওয়া যায় রেভারেন্ড মিঃ টাকারের রচনায়। টাকার ছিলেন পাদরি ও রাজনৈতিক মতের বিচারে একজন টোরি, কিন্তু তা বাদ দিলে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও একজন দক্ষ অর্থশাস্ত্রীও। আজকের দিনে 'বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনকানর্‌ন'এ একান্ত ভক্তের মতো আস্থাশীল সর্বব্যাপী জঘন্য কাপর্‌রর্‌ষতার মর্‌খোমর্‌খি দাঁড়িয়ে আমাদের পরম কর্তব্য হল এহেন বার্কদের (যারা তাদের উত্তরসর্‌রীদের থেকে মাত্র একটি ব্যাপারেই পৃথক, তা হল উচ্চ দক্ষতা) বারে-বারে লোকচক্ষে চিহ্নিত করে দেয়া।

** Marie Augier. 'Du Crédit Public', Paris, 1842.

হয় পুঁজি জন্ম নিয়েছে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রতিটি রোমকূপ থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় ঝরা রক্ত ও পূতিগন্ধ আবর্জনা নিয়ে।*

৭। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়-সংগ্রহের ঐতিহাসিক প্রবণতা

পুঁজির আদিম সঞ্চয়, অর্থাৎ তার ঐতিহাসিক উৎপত্তির পরিণতি ঘটে কিসে? সেটা যদি ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে তাৎক্ষণিক রূপান্তর এবং, অতএব, নিছক আকারগত পরিবর্তন বলে না-ধরি, তাহলে বলতে হয় সেটা হল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উচ্ছেদ, অর্থাৎ মালিকের প্রত্যক্ষ শ্রমনির্ভর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলোচ্ছেদ।

সামাজিক, যৌথ সম্পত্তির বিপরীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি টিকে থাকে সেখানেই একমাত্র যেখানে শ্রমের উপায়-উপকরণ এবং শ্রমের বহিঃস্থ অবস্থাদি ব্যক্তিবিশেষদের অধিকারে থাকে। তবে এই ব্যক্তিবিশেষরা নিজেরা শ্রমিক হওয়া বা না-হওয়ার ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও বিভিন্ন প্রকৃতি নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টিতে যে-অসংখ্য ছোটখাট রকমফের ও

---

* *Quarterly Reviewer* পত্রিকার এক আলোচক বলেছেন যে 'পুঁজি বিক্ষোভ-আলোড়ন ও বিবাদ-বিসংবাদ এড়িয়ে চলে, পুঁজি হল গিয়ে ভীরু। কথাটা খুবই সত্যি, তবে কিনা এটা নেহাতই অর্ধসত্য ছাড়া কিছু নয়। পুঁজি মুনাফার অভাব কিংবা নিতান্ত সামান্য মুনাফাকে পরিহার করে চলে, যেমন কিনা আগে বলা হোত যে প্রকৃতি শূন্যতাকে এড়িয়ে চলে ঘৃণাসহকারে। তবে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা জুটলে তখন কিন্তু পুঁজি দারুণ সাহসী হয়ে ওঠে। ১০ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিত হলে পুঁজি সর্বত্রই খাটতে রাজি; ২০ শতাংশ মুনাফা পুঁজিকে আগ্রহী করে তুলবে নিশ্চিতই; ৫০ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিতভাবে উদ্ধত করে তুলবে পুঁজিকে; ১০০ শতাংশ মুনাফা পুঁজিকে অস্থির করে তুলবে সকল প্রকার মানবিক আইনকানুন পায়ে মাড়িয়ে যেতে; আর ৩০০ শতাংশ মুনাফার সন্ধান পেলে তো কথাই নেই, তখন এমন কোনো অপরাধ নেই যা করতে সে পিছপা হবে, এমন কোনো ঝুঁকি নেই যা সে নিতে ভয় পাবে, এমনকি এর ফলে যদি পুঁজির মালিককে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয় তো তাও স্বীকার। যদি বিক্ষোভ-আলোড়ন ও বিবাদ-বিসংবাদের ফলে মুনাফা জোটে, তাহলে পুঁজি ওই উভয় ব্যাপারকেই খোলাখুলি উস্কানি দেবে। চোরাইচালান ও দাস ব্যবসায় এখানে যা-যা বলা হয়েছে তার সবকিছুকেই পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে।' (T. J. Dunning, 'Trades' Unions and Strikes', London, 1860, pp. 35, 36.)

তারতম্য চোখে পড়ে তা হল এই দুটি চরম অবস্থার মধ্যবর্তী স্তরগুলির পরিচয়সূচক।

শ্রমিকের উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর তার ব্যক্তিগত মালিকানা ছোটখাট কুটির-শিল্পের ভিত্তি, তা সে কুটির-শিল্প কৃষিভিত্তিক, শ্রমবিভাগমূলক শিল্পোৎপাদনভিত্তিক, অথবা এই উভয় ধরনভিত্তিক, যা-ই হোক-না কেন। ছোট কুটির-শিল্প আবার সামাজিক উৎপাদন এবং শ্রমিকের নিজেরই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অবশ্য, বলা বাহুল্য, উৎপাদনের এই ছোটখাট ধরন দাসপ্রথা, ভূমিদাস-প্রথা ও পরনির্ভরতার অন্যান্য প্রথার আমলেও টিকে ছিল। তবে ওই উৎপাদনের প্রথাটি বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার সমগ্র কর্মশক্তির মুক্তি ঘটেছে, যথোপযুক্ত ধ্রুপদী স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে ওই প্রথা, একমাত্র যখন শ্রমিক তার নিজস্ব শ্রমের উপায়কে নিজেই ক্রিয়াশীল করে তুলে ওই উপায়ের ব্যক্তিগত মালিক হয়ে বসেছে। অর্থাৎ, যখন যে-জমি চাষ করছে সেই জমিরই মালিক বনে গেছে কৃষক, ওস্তাদ কারিগর হিসেবে যে-যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে সেই যন্ত্রপাতিরই মালিক হয়েছে কারুশিল্পী।

জমির টুকরোটুকরো ভাগ এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়াদির ছড়ানো-ছিটনো বিক্ষিপ্ত অবস্থাই হল এই ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এই ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি যেমন উৎপাদনের উপরোক্ত উপায়াদির কেন্দ্রীকরণ এড়িয়ে চলে, তেমনই এ এড়িয়ে চলে সমবায়, প্রতিটি পৃথক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমবিভাগ, প্রকৃতির ওপর সমাজের সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উৎপাদনশীল প্রয়োগ এবং সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহের স্বাধীন বিকাশ। এই উৎপাদন-পদ্ধতি কেবলমাত্র সেই উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সেই বিশেষ সমাজের সঙ্গে খাপ খায়, যা নাকি নিজের সংকীর্ণ ও কমবেশি আদিম অবস্থার সীমানার মধ্যে আবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখা হোত তা-ই, যাকে পেকার যথাযথভাবে বলেছেন, 'সর্বজনীন মাঝারি অবস্থাকে আইন করে টিকিয়ে রাখা' (৫২)। বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে এই উৎপাদন-পদ্ধতি তার নিজেরই বিলোপের বস্তুগত উপাদানগুলির জন্ম দেয়। আর সেই মুহূর্তটি থেকে সমাজের বুকে অঙ্কুরিত হয় নতুন-নতুন শক্তি ও নতুন-

নতুন আবেগ, অথচ পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতি সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দমিয়ে রাখে। কাজেই সেই উৎপাদন-পদ্ধতিকে ধ্বংস করা দরকার, আর তাই তা ধ্বংস হয়েছেও। এই উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংসসাধন, উৎপাদনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিক্ষিপ্ত উপায়-উপকরণের সমাজগতভাবে কেন্দ্রীভূত রূপে বিবর্তন, বহুজনের ছোট-ছোট সম্পত্তি অল্প কয়েকজনের বিশাল সম্পত্তিতে রূপান্তরকরণ এবং বিপুল-সংখ্যক মানুষকে জমি থেকে, জীবনধারণের উপায়-উপকরণ থেকে ও শ্রমের উপায়াদি থেকে উচ্ছেদসাধন বিপুল জনসংখ্যার এই ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক সর্বস্বচ্যুতির ব্যাপারটিই হল পুঁজির ইতিহাসের প্রস্তাবনাস্বরূপ। এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বেশকিছু বলপ্রয়োগের পদ্ধতি — তার মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি পুঁজির আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের মতো কেবল সেই যুগান্তকারী পদ্ধতিগুলি নিয়ে। প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের উৎপাদনের উপায়াদি থেকে উচ্ছেদসাধনের এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা হয়েছিল নির্মম বর্বরোচিত উপায়ে এবং সবচেয়ে অসৎ, সবচেয়ে ইতর, হীনতম ও জঘন্যতম স্বার্থপর মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে। স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি — যার ভিত্তি ছিল, বলা যায়, শ্রমের উপায়-উপকরণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন স্বনির্ভর শ্রমজীবী ব্যক্তিবিশেষের একীভূত অবস্থা — তাকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর এ-সম্পত্তির ভিত্তি হচ্ছে অপরাপর মানুষের, অর্থাৎ মজুরিনির্ভর-শ্রমিকের, তথাকথিত মুক্ত শ্রমের শোষণ।*

এই রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়া পুরনো সমাজের আগাপাছতলায় যথেষ্ট পরিমাণে পচন ধরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকরা প্রলেতারিয়ান শ্রেণীতে ও তাদের শ্রমের উপায়-উপকরণ পুঁজিতে পরিণত হওয়ামাত্রই, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের আরও অধিক সামাজিকীকরণ এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়-উপকরণাদির সামাজিকভাবে ব্যবহার ও ফলত যৌথ উপায়ে সে-সবের আরও বেশি করে

---

*'আমরা একেবারেই নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছি... আমরা সব ধরনের শ্রম থেকে সব ধরনের মালিকানাকে পৃথক করতে আগ্রহান্বিত হই।' (Sismondi. 'Nouveaux Principes de l'Economie Politique', t. II [Paris, 1827], p. 434.)

রূপান্তরসাধন এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকদের আরও বেশি করে উচ্ছেদসাধনের প্রক্রিয়া এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। অতঃপর এখন যাকে মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল সে নিজের ভরণপোষণের জন্যে কর্মরত শ্রমিক নয়, সে হল গিয়ে বহু শ্রমিকের শোষণকারী খোদ পুঁজিপতি।

এবার এই উচ্ছেদসাধনের ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হতে লাগল খোদ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত আইনকানুনের নিজস্ব প্রক্রিয়ায়, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে। একেক জন পুঁজিপতি সর্বদাই এইভাবে বহু পুঁজিপতিকে হত্যা করে থাকে। পুঁজির এই কেন্দ্রীভবন, অথবা অল্প কয়েকজন পুঁজিপতির দ্বারা বহু পুঁজিপতি মালিকানার এই উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ক্রমশ ব্যাপক হারে বিকশিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ার সমবায়িক ধরনটি, বিজ্ঞানের সচেতন প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রয়োগ, জমিতে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মানুগ চাষবাস, শ্রমের হাতিয়ারগুলিকে একমাত্র যৌথভাবে ব্যবহারযোগ্য শ্রমের হাতিয়ারে পরিণতকরণ, উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণকে যৌথ সমাজীকৃত শ্রমের সাহায্যে উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে সে-সমস্ত জিনিসের সুমিত প্রয়োগ ও সকল জাতির মানুষকে বিশ্ব-বাজারের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলার প্রক্রিয়াগুলি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্রও। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার যাবতীয় সুযোগসুবিধা যারা গ্রাস করে ও নিজেদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত করে নেয় সেই পুঁজির বড়-বড় মালিকের সংখ্যা অনবরত হ্রাস পেয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে বৃদ্ধি পেয়ে চলে দুঃখদুর্দশা, উৎপীড়ন, দাসত্ব, চরিত্রহানি, শোষণ, ইত্যাদির বিপুল জঞ্জাল; তবে আবার সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পায় শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভও — এই শ্রমিক শ্রেণীর লোকসংখ্যা অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে চলে এবং খোদ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কার্যসূত্রেই এই শ্রেণীটি হয়ে ওঠে শৃঙ্খলাপরায়ণ, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত পুঁজির একাধিপত্য ক্রমে পুঁজির পাশাপাশি ও তার কর্তৃত্বাধীনে গজিয়ে-ওঠা ও বিকশিত-হয়ে-চলা উৎপাদন-পদ্ধতির পক্ষে শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে ওঠে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যখন সেগুলি বেমানান হয়ে

ওঠে তাদের পুঁজিতান্ত্রিক বহিরাবরণের পক্ষে। আর তখন ওই বহিরাবরণ যায় ফেটে চৌচির হয়ে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে ওঠে তখনই। অপরের উচ্ছেদকারীরা নিজেরাই তখন উৎখাত হয়ে যায়।

আত্মসাৎকরণের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতি, যা নাকি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ফল, তা-ই জন্ম দেয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির। এটি হল মালিকের নিজস্ব শ্রমে গড়ে-তোলা পৃথক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন অপ্রতিরোধনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই নিজের নিরাকরণ ডেকে নিয়ে আসে। আর তখন তা হয় নিরাকরণের নিরাকরণ (বা 'নেতির নেতি')। তবে এর ফলে উৎপাদকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-যে ফের প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, কেবল উৎপাদক লাভ করে পুঁজিতান্ত্রিক যুগের অর্জিত সাফল্যাদির ভিত্তিতে, অর্থাৎ জমি ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের সমবায়িক ও যৌথ অধিকারমূলক ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি।

ব্যক্তিবিশেষদের শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ছড়ানো-ছিটনো, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর স্বভাবতই এমন একটি প্রক্রিয়া যা কার্যত সমাজীকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে স্থাপিত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাজীকৃত সম্পত্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া থেকে তুলনাহীনরকম বেশি দীর্ঘ-বিলম্বিত, সহিংস ও কঠিন। ওই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অল্প কয়েকজন আত্মসাৎকারীর হাতে বিপুল-সংখ্যক জনসাধারণ মালিকানা থেকে উৎখাত হয়ে গেছে, আর এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বিপুল জনসমষ্টির হাতে মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে অল্প কয়েকজন আত্মসাৎকারী।*

---

*বুর্জোয়া শ্রেণী যার অনিচ্ছুক কারকস্বরূপ যন্ত্রশিল্পের সেই অগ্রগতি প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমিকদের পূর্ববর্তী বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আমদানি করেছে পরস্পর-সংযোগের ফলে শ্রমিকদের বর্তমান বৈপ্লবিক মিলনের। অতএব আধুনিক শিল্পের বিকাশ বুর্জোয়া শ্রেণী যে-ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও তা আত্মসাতের কাজটি নিষ্পন্ন করে ঠিক সেই ভিত্তিটিই সরিয়ে নিচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী সবচেয়ে বেশি করে যা

প্রথম প্রকাশিত হয় বইয়ে:
K. Marx. 'Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie'. Erster Band. Hamburg, 1867

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস সম্পাদিত ১৮৮৭ সালের ইংরেজি সংস্করণ অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়েছে

উৎপাদন করছে তা হল তার নিজেরই কবর-খনকদের। বুর্জোয়ার পতন ও প্রলেতারিয়েতের বিজয় একই রকম অবশ্যম্ভাবী।... আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখোমুখি যে-কয়েকটি শ্রেণী এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র প্রলেতারিয়েতই হল যথার্থ বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক শিল্পের অগ্রগতির পেষণে বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে যায়, একমাত্র প্রলেতারিয়েতই তার বিশিষ্ট ও অপরিহার্য উৎপাদ হিসেবে টিকে থাকে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি, ছোট-ছোট কারখানার মালিক, দোকানদার, কারুশিল্পী, কৃষক — এরা সবাই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে — মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিভিন্ন ভগ্নাংশ হিসেবে বিলুপ্তির বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশে। সুতরাং এরা বিপ্লবপন্থী নয় রক্ষণশীল; তদুপরি এরা হল প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ এরা ইতিহাসের চাকা পেছনদিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়।' Karl Marx und Friedrich Engels, 'Manifest der Kommunistischen Partei'. London, 1848, pp. 9, 11. (কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', লন্ডন, ১৮৪৮ সাল, পৃষ্ঠা ৯, ১১।)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

Demokratisches Wochenblatt পত্রিকার জন্যে লিখিত কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা (৫৩)

মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ*

১

পৃথিবীতে যতদিন ধরে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের অস্তিত্ব রয়েছে তার মধ্যে আমাদের সামনে এই-যে বইখানি রয়েছে শ্রমিকদের পক্ষে এর চেয়ে বা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বই আর লেখা হয় নি। আমাদের সমগ্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে-অক্ষদণ্ডের ভিত্তিতে আবর্তিত হচ্ছে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার সেই সম্পর্কটি এই প্রথম এ-বইয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হয়েছে, এবং তা হয়েছে একমাত্র কোনো জার্মানের পক্ষেই যা সম্ভব ততখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ ও তীক্ষ্মভাবে। এ ব্যাপারে জনেক ওয়েন, স্যাঁ-সিমোঁ অথবা ফুরিয়ে-এর রচনাবলী যেমন এখন তেমনই তা ভবিষ্যতেও মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই, তবে সেই তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করার ব্যাপারটি বিশেষ করে একজন জার্মানের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল—যেখান থেকে আধুনিক সমাজ-সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্রটিই স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হতে পারে, যেমন করে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় দাঁড়িয়ে একজন পর্যবেক্ষক দেখতে পারে অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়ি এলাকার দৃশ্য।

এখনও পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র আমাদের শিখিয়ে আসছে যে শ্রমই হল সকল সম্পদের উৎস ও সকল মূল্য-নিরূপণের মাপকাঠি, অতএব উৎপাদনকালে একই পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয় হয়েছে এমন দুটি বস্তুর মূল্য

---

* Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, von Karl Marx. Erster Band. Der Produktionsprozeß des Kapitals. Hamburg, O. Meissner, 1867.

একই এবং ওই দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর-বিনিময় চলতে পারে, কেননা গড়পড়তা হিসাবে সমমূল্যের দুটি বস্তুই মাত্র বিনিময়যোগ্য। আবার সেইসঙ্গে অর্থশাস্ত্র আমাদের এ-ও শিক্ষা দেয় যে এক ধরনের জমা-করা শ্রমেরও অস্তিত্ব আছে, যাকে তা আখ্যা দিয়েছে পুঁজি বলে। এই পুঁজির মধ্যে আবার নানা সহায়ক উৎসের অস্তিত্ব থাকায় তা জীবন্ত (কোনো শ্রমিকের) শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে এক শো গুণ কি হাজার গুণ বৃদ্ধি করে থাকে, এবং তার বিনিময়ে দাবি করে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ক্ষতিপূরণ—যাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে মুনাফা বা লাভ। আর আমরা সবাই জানি যে বাস্তবে এই ব্যাপারটি এমন ধরনে ঘটে যাতে জমা-করা মৃত শ্রমের মুনাফা ক্রমশ হয়ে ওঠে পর্বতপ্রমাণ, পুঁজিপতিদের পুঁজির পরিমাণ ক্রমশ বেশি-বেশি ও বিশালাকার হয়ে ওঠে, অথচ অপরদিকে জীবন্ত শ্রমের মজুরি অনবরত কমতে থাকে এবং শুধুমাত্র মজুরির ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে যে-বিপুল-সংখ্যক শ্রমিক তাদের সংখ্যা ও তাদের দারিদ্র্য চলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে। এখন, এই আপাত-বৈপরীত্যের সমাধান কী? পুঁজিপতির পক্ষে মুনাফা জোটে কেমন করে, যদি উৎপন্ন দ্রব্যে যে-পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করছে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে তার পূর্ণ মূল্য পায়? অথচ ব্যাপারটা তো এই রকমই হওয়া উচিত, কেননা একমাত্র সম-পরিমাণ মূল্যের মধ্যেই বিনিময় সম্ভব। অপরদিকে আবার সম-পরিমাণ মূল্যের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হয় কেমন করে, কেমন করে শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য পেতে পারে, যখন বহু অর্থশাস্ত্রীর স্বীকৃতি অনুসারে ওই উৎপন্ন দ্রব্যটি শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়? এ-পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র এই বৈপরীত্যের সম্মুখীন হয়ে অসহায় বোধ করে এসেছে এবং লিখে বা তো-তো করে আউড়ে এসেছে এমন সব বিহ্বল বাক্যাংশ, যা কিছুই প্রকাশ করে না। এমনকি অর্থশাস্ত্রের এর পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রী সমালোচকরাও উপরোক্ত ওই বৈপরীত্যের ব্যাপারটির ওপর জোর দেয়া ছাড়া আর বেশিকিছু করে উঠতে পারেন নি; কেউই এ-সমস্যার কোনো কিনারা করে উঠতে পারেন নি, যতক্ষণ-না শেষপর্যন্ত দেখা দিয়েছেন মার্কস। মার্কসই এখন যে-প্রক্রিয়ার ফলে মুনাফার জন্ম হয় একেবারে তার জন্মস্থান পর্যন্ত প্রক্রিয়াটির অনুধাবন করেছেন এবং এর ফলে জলের মতো স্বচ্ছ করে তুলেছেন সবকিছু।

পর্নজির বিকাশের পথচিহ্ন অনুধাবন করতে গিয়ে মার্কস শুরু করেছেন এই সহজ-সরল ও কুখ্যাতরকমের সুস্পষ্ট ব্যাপারটি দিয়ে যে পর্নজিপতিরা তাদের পর্নজির মূল্য বাড়িয়ে তোলে বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে: অর্থাৎ, তারা নিজেদের অর্থ দিয়ে পণ্যদ্রব্য কেনে ও তারপর সেগুলি বিক্রি করে সেগুলির কেনা-দরের চেয়ে বেশি অর্থে। যেমন ধরুন, একজন পর্নজিপতি তুলো কিনল ১,০০০ টালার* দরে আর তারপর তা বিক্রি করল ১,১০০ টালারে, এইভাবে সে 'উপার্জন' করল ১০০ টালার। মূল পর্নজির ওপর এই-যে অতিরিক্ত ১০০ টালার, একেই মার্কস আখ্যা দিয়েছেন **উদ্বৃত্ত মূল্য**। তাহলে, এই উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস কোথায়? অর্থশাস্ত্রীদের মেনে-নেয়া ধরতাই অনুসারে একমাত্র সম-মূল্যের মধ্যেই বিনিময় চলে, এবং বিমূর্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটি অবশ্যই সঠিক। নিছক তত্ত্ব-অনুযায়ী বাজার থেকে তুলো কেনা ও ফের তা বিক্রি করার ফলে ততটুকুই মাত্র উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যেতে পারে, একটি রুপোর টালার ভাঙিয়ে ৩০টি রুপোর গ্রোশান করে ও ফের সেই খুচরো মুদ্রাগুলির বিনিময়ে একটি রুপোর টালার করে নিলে যতটুকু উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায়। আসলে এ-প্রক্রিয়ায় কারো পক্ষেই বেশি বা কম অর্থবান হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিক্রেতারা আসল মূল্যের চেয়ে বেশি দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলে, অথবা ক্রেতারা আসল মূল্যের চেয়ে কম দরে তা কিনলে উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, কেননা ওই ক্রয়-বিক্রয়কারীরা পালাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতা হয় বলে সবকিছুই ফের ভারসাম্য ফিরে পায়, জমা-খরচ সমান হয়ে দাঁড়ায়। তেমনই ক্রেতা ও বিক্রেতারা পরস্পর পরস্পরকে দরদস্তুরে ঠকালেও উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায় না, কেননা এর ফলে কোনো নতুন অথবা উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় না, কেবল নিয়োজিত পর্নজিই পর্নজিপতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনে ভাগ হয়ে যায় এইমাত্র। পর্নজিপতি পণ্যদ্রব্যসমূহ সেগুলির নির্দিষ্ট মূল্যে কিনে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করা সত্ত্বেও যে-মূল্য সে বিনিয়োগ করে তার চেয়ে বেশি মূল্য সে ফিরে পায়। এটা কেমন করে সম্ভব হয়?

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে পণ্যের বাজারে পর্নজিপতি এমন **একটি পণ্যের** সন্ধান পেয়েছে যার অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য হল এই যে তার

* উনবিংশ শতক পর্যন্ত জার্মানির বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা। — সম্পাঃ

ব্যবহার থেকেই নতুন মূল্যের উৎপত্তি ঘটে, নতুন মূল্য সৃষ্টি হয়, আর এই পণ্যদ্রব্যটি হল **শ্রমশক্তি।**

শ্রমশক্তির মূল্য কী? প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের মূল্যের পরিমাপ করা হয় তার উৎপাদনে কতখানি শ্রম-বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে তা-ই দিয়ে। শ্রমশক্তির অস্তিত্ব থাকে জীবন্ত শ্রমিকের আকারে, আর এই শ্রমিকের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার ও সেইসঙ্গে তার পরিবার-প্রতিপালনের জন্যে দরকার হয় জীবনধারণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপায়-উপকরণাদির। এটাই আবার তার মৃত্যুর পর শ্রমশক্তির ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করে। অতএব উপরোক্ত এই জীবনধারণের উপায়াদি উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ই শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য নিরূপণ করছে। পুঁজিপতি প্রতি সপ্তাহে মজুরির আকারে এই মূল্য দিচ্ছে শ্রমিককে, আর এর বিনিময়ে সে কিনে নিচ্ছে শ্রমিকের এক সপ্তাহের শ্রমের কার্যকরতা। এই পর্যন্ত শ্রমশক্তির মূল্যের ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রী মহোদয়গণ আমাদের সঙ্গে অনেকখানিই একমত হবেন।

ধরা যাক, জনেক পুঁজিপতি তার শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করল। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে শ্রমিকটি ততখানিই শ্রম-বিনিয়োগ করল তার সাপ্তাহিক মজুরি যতখানি শ্রমের তুল্যমূল্য। যদি ধরা যায় যে একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরি তার তিনটি কাজের দিনের তুল্যমূল্য, তাহলে শ্রমিকটি সোমবার থেকে কাজ শুরু করলে বলতে হয় বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ সে পুঁজিপতিকে **তার প্রাপ্য মজুরির পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে।** কিন্তু এরপর কি সে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে? মোটেই নয়। পুঁজিপতি তার **সারা সপ্তাহের** শ্রম কিনে নিয়েছে, তাই শ্রমিককে ওই সপ্তাহের বাকি তিনটি কাজের দিনও কাজ করে যেতে হবে। শ্রমিকটির প্রাপ্য মজুরি পরিশোধের জন্যে যে-সময়টুকু কাজ করা দরকার তার ওপরে তার এই **উদ্বৃত্ত শ্রমই** হল গিয়ে **উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস,** মুনাফার উৎস, পুঁজির নিয়মিত ক্রমবৃদ্ধির উৎস।

শ্রমিক-যে সপ্তাহের তিনদিন মাত্র কাজ করে তার প্রাপ্ত মজুরি পরিশোধ করে দেয় এবং বাকি তিনদিন পুঁজিপতির স্বার্থে বেগার খাটে—এটা একটা খামখেয়াল-মাফিক অনুমানমাত্র এ-কথা বলবেন না। শ্রমিক তার প্রাপ্য মজুরি

পরিশোধ করতে ঠিক-ঠিক তিনদিন সময় নেয়, নাকি দু'দিন অথবা চারদিন সময় নেয়, এ-ব্যাপারটা সত্যি বলতে কী একেবারেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং অবস্থা হিসেবে এই দিন-গুনতির হেরফেরও হয়ে থাকে। এখানে প্রধান ব্যাপার হল এই যে পুঁজিপতি যে-পরিমাণ শ্রমের জন্যে মজুরি দিয়ে থাকে তা ছাড়াও যে-শ্রমের জন্যে সে **মজুরি দেয় নি** তা-ও আদায় করে নেয়। আর এটা কোনো খামখেয়াল-মাফিক অনুমান নয়, কেননা শেষপর্যন্ত যেদিন পুঁজিপতি শ্রমিককে যে-পরিমাণ মজুরি দিয়েছে কেবলমাত্র সেই পরিমাণে শ্রম শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করতে শুরু করবে, সেইদিনই তাকে কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে, কারণ তার সমগ্র মুনাফা শূন্যের অঙ্কে পরিণত হবে সেইদিন।

এইখানেই পূর্বোক্ত সকল বৈপরীত্যের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাচ্ছি আমরা। উদ্বৃত্ত মূল্যের (পুঁজিপতিদের মুনাফা যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ) উৎস এখন একেবারে স্পষ্ট ও স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। শ্রমশক্তির মূল্য মজুরিতে দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তির কাছ থেকে যে-মূল্য আদায় করে নিতে সক্ষম হচ্ছে উপরোক্ত ওই শ্রমশক্তির মজুরিভিত্তিক মূল্য তার তুলনায় বহুগুণে কম, আর এই পার্থক্যটুকুই—এই **মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমই** — পুঁজিপতির, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর, বখরার অংশ। কেননা, এর আগের উদাহরণে তুলো-ব্যবসায়ীর তুলো বেচে যে-মুনাফা করার কথা বলা হয়েছে, যদি বাজারে তুলোর দর না-চড়ে থাকে তাহলে এমনকি সেই মুনাফাও মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমের মূল্য হতে বাধ্য। ব্যবসায়ীটি যখন কোনো সুতীবস্ত্রের কারখানা-মালিকের কাছে তুলো বিক্রি করছে (ওই কারখানা-মালিক অবশ্য পূর্বোক্ত ১০০ টালার মুনাফা ছাড়াও তার কারখানায় উৎপন্ন বস্ত্রের দৌলতে নিজে আরও বহুগুণ মুনাফা লুটবে) তখন বলতে হয় ব্যবসায়ীটি ওই কারখানা-মালিকের সঙ্গে তার কুক্ষিগত মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমের মূল্য ভাগ করে নিচ্ছে। সাধারণভাবে এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমই সমাজের সকল অ-শ্রমজীবী মানুষের ভরণপোষণের জন্যে দায়ী। পুঁজিপতি শ্রেণী যে-রাষ্ট্রীয় ও মিউনিসিপ্যাল কর দিয়ে থাকে এবং ভূস্বামী ইত্যাদি যে-জমির খাজনা দেয় তা দেয়া হয় এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম থেকেই। গোটা

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য এটা মনে করা ভুল হবে যে এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম আত্মসাতের উদ্ভব ঘটেছে একমাত্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়, যেখানে উৎপাদনের কাজ চলে একদিকে পুঁজিপতি ও অপরদিকে মজুরিনির্ভর শ্রমিকদের সাহায্যে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়. সর্বকালেই উৎপীড়িত শ্রেণীকে মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। ক্রীতদাসত্ব যখন শ্রম-সংগঠনের প্রচলিত রীতি ছিল সেই গোটা সুদীর্ঘ কাল জুড়ে ক্রীতদাসদের জীবনধারণের উপায়-উপকরণ হিসেবে তাদের যা পরিশোধ করা হোত তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি শ্রমদান করতে হোত তাদের। ভূমিদাস-প্রথার আমলেও অবস্থা ছিল একই রকম এবং এ-অবস্থা বজায় ছিল একেবারে কৃষকদের বাধ্যতামূলক বেগার খাটার প্রথা বিলোপের সময় পর্যন্ত। তখন কৃষকের নিজস্ব জীবিকা-অর্জনের জন্যে কাজ ও সামন্ত-প্রভুর জন্যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত শ্রমদানের সময়ের মধ্যে কার্যত একটি পার্থক্য রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ এই দ্বিতীয় ধরনের কাজটি তখন করা হোত প্রথম ধরনের কাজ থেকে পৃথকভাবে। এই ধরনটির এখন বদল ঘটেছে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারটির অন্তঃসার থেকে গেছে এখনও এবং তা থেকেও যাবে ততদিন যতদিন 'সমাজের একটি অংশ উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখছে, স্বাধীন হোক বা না-হোক শ্রমিক যতক্ষণ তার নিজের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের সময়ের সঙ্গে অতিরিক্ত কাজের সময় জুড়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে যাতে সে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিকদের জন্যেও ভরণপোষণের উপায়াদি উৎপাদনে সমর্থ হয়' (মার্কস, পৃষ্ঠা ২০২)।*

২

উপরোক্ত প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে পুঁজিপতির কাজে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিক দু'ধরনের শ্রম-বিনিয়োগ করে থাকে: তার শ্রম-সময়ের একটি অংশে পুঁজিপতির দেয়া মজুরি পরিশোধের জন্যে কাজ করে থাকে সে, আর

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ২৩৫। — সম্পাঃ

তার শ্রমের এই অংশটিকে মার্কস আখ্যা দিয়েছেন **আবশ্যিক শ্রম** বলে। কিন্তু এরপরও তাকে কাজ করে যেতে হয় এবং এই অতিরিক্ত কাজের সময়ে পুঁজিপতির স্বার্থে সে উৎপাদন করে **উদ্বৃত্ত মূল্য,** যার একটি প্রধান অংশ হল পুঁজিপতির মুনাফা। শ্রমের এই শেষোক্ত অংশটিকে বলে হয় **উদ্বৃত্ত শ্রম।**

ধরা যাক, একজন শ্রমিক সপ্তাহের তিনদিন কাজ করছে তার মজুরি পরিশোধের জন্যে আর বাকি তিনদিন পুঁজিপতির স্বার্থে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনে। এটাকে অন্যভাবে বিচার করলে বলা যায় যে এর অর্থ হল, কাজের দিন যদি বারো ঘণ্টাব্যাপী হয় তাহলে শ্রমিকটি প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা কাজ করে মজুরি-পরিশোধের জন্যে আর বাকি ছয় ঘণ্টা উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনে। এখন, সপ্তাহে কাজের জন্যে মাত্র ছয়টি দিনই পাওয়া যেতে পারে, কিংবা রবিবারকেও কাজের দিন হিসেবে গণ্য করলে বড় জোর পাওয়া যেতে পারে সাতটি দিন, কিন্তু প্রতিটি কাজের দিন থেকে বের করে নেয়া চলে ছয়, আট, দশ, বারো, পনেরো বা তারও বেশি কাজের ঘণ্টা। শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে তার প্রতিদিনের মজুরির বিনিময়ে একেকটি কাজের দিন বিক্রি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, **শ্রমদিন বলতে কী বোঝায়?** আট ঘণ্টার কাজ, না আঠারো ঘণ্টার?

পুঁজিপতির স্বার্থ হচ্ছে একেকটি শ্রমদিনকে টেনে যথাসম্ভব লম্বা করা। কারণ, শ্রমদিন যত লম্বা হবে তত বেশি তা উৎপাদন করবে উদ্বৃত্ত মূল্য। আবার শ্রমিকও সঠিকভাবে অনুভব করে যে তার মজুরি-পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের ঘণ্টার অতিরিক্ত প্রতিটি কাজের ঘণ্টার ফল অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; অতিরিক্ত এই ঘণ্টাগুলিতে কাজ করার অর্থ যে কী তা সে নিজস্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই টের পায়। ফলে পুঁজিপতি যেমন লড়াই করে তার মুনাফার জন্যে, তেমনই শ্রমিকও লড়াই করে চলে তার স্বাস্থ্যের জন্যে, প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের অবকাশের জন্যে, যাতে কাজ, খাওয়াদাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া অন্যান্য মানবিক ক্রিয়াকলাপে সে রত হতে পারে তার জন্যেও। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে চায় কি চায় না এটা মোটেই ব্যক্তিগতভাবে অমুক বা তমুক পুঁজিপতির সদিচ্ছার

ওপর নির্ভর করে না, কারণ পুঁজিপতিদের মধ্যে পরস্পর-প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে এমনকি সবচেয়ে হিতৈষী সদাশয় ব্যক্তিদেরও বাধ্য করে সমধর্মাদের সঙ্গে হাত মেলাতে এবং কাজের সময়কে টেনে অপরাপর কারখানার সমান করে তোলাটাকেই নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করতে।

শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বেঁধে দেয়ার সংগ্রাম ইতিহাসের মঞ্চে স্বাধীন শ্রমিকদের প্রথম আবির্ভাবের ক্ষণটি থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সমানে চলছে। নানা ধরনের পেশার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঐতিহ্যসিদ্ধ শ্রমদিনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই সেই ঐতিহ্য মেনে চলা হয়। একমাত্র যেখানে দেশের আইন শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বেঁধে দিয়েছে এবং তা পালিত হচ্ছে কিনা সেটা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে সেখানেই সত্যি-সত্যি বলতে পারা যায় যে স্বাভাবিক শ্রমদিনের অস্তিত্ব আছে। এবং এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থা একমাত্র চালু আছে ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি-এলাকাগুলিতেই। এই এলাকায় সকল স্ত্রীলোক এবং তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে সকল কিশোর শ্রমিকের জন্যে দশ ঘণ্টার শ্রমদিন (পাঁচদিন সাড়ে-দশ ঘণ্টার ও শনিবার সাড়ে-সাত ঘণ্টার শ্রমদিন) নির্দিষ্ট আছে, এবং যেহেতু পুরুষ-শ্রমিকরা পূর্বোক্তদের সাহায্য ছাড়া কাজ করতে পারে না তাই তাদের জন্যেও নির্দিষ্ট হয়েছে ওই দশ ঘণ্টার শ্রমদিন। ইংরেজ ফ্যাক্টরি-শ্রমিকদের পক্ষে এই আইন পাশ করানো সম্ভব হয়েছে বছরের-পর-বছর অসীম সহ্যশক্তি প্রদর্শনের ফলে, ফ্যাক্টরি-মালিকদের বিরুদ্ধে একটানা, নাছোড়বান্দা, অনমনীয় লড়াই চালানোর দৌলতে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এবং সঙ্ঘ ও সভা-সমিতি সংগঠনের অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে, এবং সেইসঙ্গে শাসক-শ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদগুলিকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে। এই আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজ শ্রমিকদের রক্ষাকবচস্বরূপ, ক্রমশ এর কার্যকরতা বিস্তৃত হয়েছে শিল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে এবং গত বছর তো এটি **সকল পেশার শিল্পের ক্ষেত্রেই** বিস্তৃত হয়েছে — অন্ততপক্ষে যে-সমস্ত পেশায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের কাজে নিযুক্ত করা হয় সেগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই। আমাদের আলোচ্য বইটিতে ইংলণ্ডে শ্রমদিনের এই আইনগত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে। উত্তর জার্মান রাইখস্টাগেরও পরবর্তী অধিবেশনে ফ্যাক্টরি-সংক্রান্ত আইনকানুন

নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে ফ্যাক্টরির শ্রম-নিয়ন্ত্রণ নিয়েও আলোচনা হবে। আমরা আশা করি যে জার্মান শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কেউই আগে **মার্কসের** লেখা আলোচ্য বইখানি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না-হয়ে উপরোক্ত প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়াটির আলোচনায় নামবেন না। মনে রাখবেন, **এক্ষেত্রে অনেক-কিছু অর্জন করার আছে।** জার্মানিকে শাসক-শ্রেণীগুলির মধ্যেকার ভেদ-বিভেদগুলি ইংলণ্ডের শাসক-শ্রেণীগুলির ওই ভেদ-বিভেদের চেয়ে শ্রমিকদের পক্ষে বেশি অনুকূল, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এত অনুকূল অবস্থা কখনও ছিল না এবং এখনও নেই। এর কারণ আর কিছুই নয়, **সর্বজনীন ভোটাধিকার শাসক-শ্রেণীগুলিকে বাধ্য করছে শ্রমিকদের কাছ থেকে আনুকূল্যের প্রত্যাশী হতে।** এই পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের চার-পাঁচজন প্রতিনিধিই রীতিমতো **একটি শক্তি** হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি অবশ্য তাঁরা জানেন তাঁদের এই বিশেষ অবস্থানকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে, সবচেয়ে বেশি করে যদি তাঁরা জানেন যে আলোচ্য আইনে বিতর্কের বিষয়টি কী,—কেননা এই বিষয়টি বুর্জোয়াদের জানা নেই। আর এ-কাজে মার্কসের এই বই তাঁদের হাতে-হাতে সবকিছু তথ্যের যোগান দিতে সমর্থ।

অতঃপর আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি ভারি চমৎকার পর্যালোচনার আলোচনায় না-থেমে সেগুলির পাশ কাটিয়ে এসে থামছি একেবারে বইখানির শেষ পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে পুঁজির সঞ্চয়-সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেই প্রথম দেখানো হয়েছে যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ যে-পদ্ধতি কার্যকর করে তোলে একদিকে পুঁজিপতিরা ও অপরদিকে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকরা, তা কেবল-যে অনবরত পুঁজিপতির স্বার্থে তার পুঁজি নতুন করে উৎপন্ন করে চলে তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা অনবরত নতুন করে উৎপাদন করে শ্রমিকদের দারিদ্র্যও। এবং এর ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে সব সময়েই একদিকে অস্তিত্ব থাকে সকল জীবিকা, শিল্পোৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কাঁচামাল ও শ্রমের সকল হাতিয়ারের একচেটিয়া মালিক নতুন-নতুন যতসব পুঁজিপতির এবং অপরদিকে অস্তিত্ব থাকে বিপুল-সংখ্যক শ্রমিকের, যারা বাধ্য হয় পূর্বোক্ত ওই পুঁজিপতিদের কাছে এমন

একটা অর্থের বিনিময়ে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে যে-অর্থে সংগৃহীত জীবনধারণের উপায়াদি বড়জোর তাদের কর্মক্ষম অবস্থায় টিকিয়ে রাখার ও কর্মক্ষম প্রলেতারিয়েতের একটি নতুন প্রজন্মের লালনের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু এই পদ্ধতির ফলে পুঁজি কেবল নিছক পুনরুৎপাদিতই হয় না, তা অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে বিপুল থেকে বিপুলতর পরিমাণ হয়ে চলে এবং এর ফলে সম্পত্তিহীন শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তা ক্ষমতাবিস্তার করে। এবং একদিকে পুঁজি যেমন ক্রমশ বেশি-বেশি মাত্রায়, ব্যাপকভাবে নিজের পুনরুৎপাদন করে চলে, তেমনই অপরদিকে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপকহারে ও বেশি-বেশি সংখ্যায় পুনরুৎপাদন করে চলে সম্পত্তিহীন শ্রমিক শ্রেণীরও। '...পুঁজির সঞ্চয় ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজি-সম্পর্কের পুনরুৎপাদন ঘটায়, এক মেরুতে জমে ওঠে বেশি-বেশি সংখ্যায় বা ক্রমশ বড় থেকে বড় পুঁজিপতি এবং অপর মেরুতে জমে ওঠে ক্রমশ বেশি-বেশি মজুরিনির্ভর-শ্রমিক।... **পুঁজির সঞ্চয়-সংগ্রহের অর্থ তাই প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাবৃদ্ধি**' (পৃষ্ঠা ৬০০)।* অবশ্য যন্ত্রপাতির উন্নতি, উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা, ইত্যাদির কারণে যেহেতু একই পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে ক্রমশ কম থেকে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, যেহেতু ক্রমশ নিখুঁত হয়ে-ওঠা এই ব্যবস্থা, অর্থাৎ শ্রমিকদের ক্রমশ বাড়তি ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলার এই ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান পুঁজির পরিমাণের চেয়েও দ্রুত বেড়ে ওঠে, সেইহেতু ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শ্রমিকের কী অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে?—এই শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়ায় শিল্পের অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী, ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ কিংবা মাঝামাঝি হলে এই বাহিনীর শ্রমিকদের মজুরি দেয়া হয় তাদের শ্রমের মূল্যের চেয়ে **কম হারে** এবং কাজে নিয়োগ করা হয় অনিয়মিতভাবে, কিংবা জনসাধারণের দয়ার দানের ওপর ছেড়ে রাখা হয় তাদের, কিন্তু যখন ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষরকম চাঙ্গা হয়ে ওঠে—যেমন, এখন ইংলণ্ডে যে-অবস্থাটা স্পষ্ট প্রতীয়মান—তখন এরাই পুঁজিপতিদের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে **সকল অবস্থাতেই** নিয়মিতভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিরোধ

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ৬১৩-৬১৪।—সম্পাঃ

চূর্ণ করতে ও তাদের মজুরির হার নিচু করে রাখতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই অতিরিক্ত শ্রমিকদের বাহিনী। 'সামাজিক সম্পদ যত বৃদ্ধি পায়... তত বেড়ে চলে আপেক্ষিক এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অথবা শিল্পের এই অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী। কিন্তু সক্রিয় (বা নিয়মিতভাবে নিযুক্ত) শ্রমিক-বাহিনীর অনুপাতে এই সংরক্ষিত বাহিনীর জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, তত বৃদ্ধি পায় সংহত (বা স্থায়ী) অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অথবা শ্রমিকদের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, আর এদের শ্রমের যন্ত্রণার বিপরীত অনুপাতে বেড়ে চলে এদের দুঃখদুর্দশা। পরিশেষে, শ্রমিক শ্রেণীর ভিক্ষাজীবী স্তরগুলি ও শিল্পের অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী যত বহুব্যাপক হয়ে ওঠে, সরকারি নিঃস্বতাও তত বেড়ে ওঠে। **পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের এই-ই হল একান্ত সাধারণ নিয়ম'** (পৃষ্ঠা ৬৩১)।*

কড়াকড়ি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত এই সমস্ত সিদ্ধান্ত (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অর্থশাস্ত্রীরা বিশেষরকম সতর্ক থাকেন এই সমস্ত সিদ্ধান্ত খন্ডনের এমনকি চেষ্টামাত্রও না করার ব্যাপারে) হল আধুনিক, পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান-প্রধান নিয়মের কয়েকটি। কিন্তু এতেই কি পুরো কাহিনী বলা হয়ে গেল? মোটেই না। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলি তীব্রভাবে প্রকট করে তুলেছেন মার্কস, আবার একই রকম জোরালো ও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে এই সমাজ-ব্যবস্থাটির প্রয়োজন ছিল সমাজের উৎপাদনী শক্তিগুলিকে বিকশিত করে তুলে এমন একটা স্তরে উন্নীত করার জন্যে যার ফলে সমাজের **সকল** সদস্যের পক্ষে মানুষের যোগ্য সমান বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে। সমাজের এর পূর্ববর্তী সকল ধরনই উপরোক্ত এই বিকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত বা অতিরিক্ত দরিদ্র অবস্থায় ছিল। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনই প্রথম এই বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উৎপাদনী শক্তিসমূহ সৃষ্টি করে, আবার ওই একই সঙ্গে বিপুল-সংখ্যক ও নিপীড়িত শ্রমিকদের তা সৃষ্টি করে সেই সামাজিক শ্রেণী হিসেবে -- যে-শ্রেণী ক্রমশ বেশি-বেশি বাধ্য হয় ওই সামাজিক সম্পদ

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খন্ড, মস্কো, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ৬৪৪। -- সম্পাঃ

ও উৎপাদনী শক্তিসমূহের মালিকানা ছিনিয়ে নিতে যাতে সেগুলি বর্তমানে একচেটিয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা না হয়ে ব্যবহৃত হতে পারে সমগ্র সমাজের উপকারার্থে।

১৮৬৮ সালের ২ থেকে
১৩ মার্চের মধ্যে
এঙ্গেলসের লেখা

Demokratisches Wochenblatt
পত্রিকার ১২ ও ১৩ সংখ্যায়,
১৮৬৮ সালের ২১ ও ২৮ মার্চ
তারিখে প্রকাশিত

পত্রিকার পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি জার্মান
ভাষায় লিখিত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'পঁুজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে

উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধে মার্কস তাহলে এমন কী বলেছেন যা নতুন কথা? এটা কেমন করে সম্ভব হল যে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধে মার্কসের তত্ত্ব বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো আসল জায়গায় গিয়ে ঘা দিল এবং তা আবার সকল সভ্য দেশেই, আর তাঁর সকল সমাজতন্ত্রী পূর্বসূরীর—এমনকি রডবের্টুস-এরও—তত্ত্বগুলি কোনো চিহ্ন না-রেখে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল?

এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা চলে রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে।

গত শতাব্দীর প্রায় শেষপর্যন্ত ফ্লজিস্টন (প্রদাহ)-সম্পর্কিত তত্ত্বটি-যে সর্বস্বীকৃত ছিল একথা আমরা জানি। এই তত্ত্ব-অনুযায়ী, সকল অগ্নিসংযোগ বা দহনের মূল কথা হল যে-কোনো জ্বলন্ত বস্তু থেকে অপর একটি কল্পিত পদার্থ, একটি পুরোপুরি দাহ্য পদার্থ ফ্লজিস্টনের পৃথকীভবন-প্রক্রিয়া। সেকালে পরিচিত প্রায় সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা হিসেবে এই তত্ত্বটিকে তখন যথেষ্ট বলে মনে করা হোত, যদিও বহুক্ষেত্রেই এটিকে কাজে লাগাতে হোত জোর করেই। অতঃপর ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলে এমন এক ধরনের বায়ু উৎপাদন করলেন 'যা এত বিশুদ্ধ, ফ্লজিস্টন থেকে এত মুক্ত অবস্থায় পেলেন তিনি যে সাধারণ হাওয়াকে তার তুলনায় ভেজাল-মেশানো বলে বোধ হল'। তিনি এর নাম দিলেন ফ্লজিস্টন-মুক্ত বায়ু। তাঁর এই আবিষ্কারের অল্প কিছু পরে সুইডেনে শেলেও একই ধরনের বায়ু আবিষ্কার করলেন এবং আবহাওয়ায় তার উপস্থিতিও লোকসমক্ষে পরীক্ষা করে দেখালেন। তিনি আরও দেখতে পেলেন যে এই বায়ুর মধ্যে কিংবা

এমনিতে সাধারণ হাওয়ার মধ্যে যখনই কোনো বস্তু পোড়ানো হয় তখনই এই বায়ু অন্তর্ধান করে। শেলে তাই এর নাম দিলেন অগ্নিবায়ু।

'এই তথ্যগুলি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে বাতাসের একটি উপাদানের সঙ্গে ফ্লজিস্টনের সংমিশ্রণের ফলে (অর্থাৎ, দহনক্রিয়ার ফলে) যে-যৌগিক পদার্থ বা যোগের উদ্ভব ঘটে তা আগুন অথবা উত্তাপ ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং তা কাচের মধ্যে দিয়ে বহির্গত হয়।'*

প্রিস্টলে ও শেলে আসলে যা উৎপাদন করেছিলেন তা হল অক্সিজেন গ্যাস, কিন্তু এটি-যে কী পদার্থ তা তাঁরা জানতেন না। তাঁরা 'গ্যাসটি আবিষ্কার করা সত্ত্বেও আটকে রইলেন' ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত 'তত্ত্বের ধ্যানধারণার বেড়াজালে।' যা নাকি পরে ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত গোটা ধারণাটিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে বিপ্লব এনেছিল সেই মৌল উপাদানটি তাঁদের হাতে ভবিষ্যৎহীন ও বন্ধ্যা হয়ে রইল। কিন্তু গ্যাসটি আবিষ্কারের পরই প্রিস্টলে তাঁর এই আবিষ্কারের খবর জানিয়েছিলেন প্যারিসে লাভোয়াজিয়ে-কে, আর লাভোয়াজিয়ে এই নতুন তথ্যের ভিত্তিতে তখন পরীক্ষা শুরু করলেন ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত গোটা রসায়নশাস্ত্র নিয়েই। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে এই নতুন ধরনের বায়ু আসলে একটি নতুন রাসায়নিক মৌল উপাদান এবং দহনক্রিয়ার সময়ে যা ঘটে তা হল জ্বলন্ত বস্তুটি থেকে রহস্যময় ফ্লজিস্টনের অন্তর্ধান **নয়,** জ্বলন্ত বস্তুটির সঙ্গে এই নতুন মৌল উপাদানের **সংযোগ।** এইভাবে লাভোয়াজিয়েই প্রথম গোটা রসায়নশাস্ত্রকে তার পায়ের ওপর দাঁড় করালেন, যা নাকি তার আগে দাঁড়িয়ে ছিল উলটোমুখে মাথায় ভর দিয়ে তার ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে। এবং যদিও তিনি প্রথমোক্ত দুই বিজ্ঞানীর সমসময়ে ও তাঁদের থেকে পৃথক ও স্বাধীনভাবে অক্সিজেন উৎপাদনে সমর্থ হন নি (যদিও পরে তিনি তাই-ই দাবি করেছেন), তবু তৎসত্ত্বেও তাঁরা দু'জন নন, লাভোয়াজিয়েই ছিলেন অক্সিজেনের সত্যিকার **আবিষ্কর্তা।** বাকি দু'জন অক্সিজেন নিছক **উৎপাদনই করেছিলেন,** কিন্তু কী-যে তাঁরা উৎপাদন করেছিলেন সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাঁদের ছিল না।

---

* Roscoe und Schorlemmer. 'Ausführliches Lehrbuch der Chemie'. Braunschweig, 1877, I, S. 13, 18.

প্রিস্টলে ও শেলের তুলনায় লাভোয়াজিয়ে-র অবস্থান যা ছিল, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের ব্যাপারে পূর্বসূরীদের তুলনায় মার্কসের অবস্থানও ছিল তা-ই। কোনো শিল্পোৎপাদের মূল্যের যে-অংশকে আমরা এখন উদ্বৃত্ত মূল্য বলে থাকি তার **অস্তিত্ব** মার্কসের বহু পূর্বেই নিরূপিত হয়েছিল। এই শেষোক্ত মূল্যের উপাদান-যে কী, তা-ও কম-বেশি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ইতিপূর্বেই। অর্থাৎ, বলা হয়েছিল যে ওই উপাদান হচ্ছে শ্রমের সেই উৎপাদ, যার জন্যে উৎপাদের আত্মসাৎকারী তার সমান মূল্যের কোনো অর্থ মজুরি হিসেবে দেয় নি। কিন্তু তখন এর বেশি আর কেউ এগোতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী — ধ্রুপদী বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা — বড় জোর অনুসন্ধান করেছিলেন শ্রমের উৎপাদ শ্রমিক ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিকের মধ্যে কী অনুপাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় শুধুমাত্র সেই ব্যাপারটা নিয়ে। এছাড়া অপর গোষ্ঠীটি — অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রীরা — এই বাঁটোয়ারাকে অন্যায় বিবেচনা করে এই অন্যায় দূরীকরণের মনগড়া কাল্পনিক উপায়াদি উদ্ভাবনের চেষ্টায় মেতেছিলেন। আর এই উভয় গোষ্ঠীই বন্দী হয়ে রয়ে গেলেন তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছ-থেকে-পাওয়া অর্থনৈতিক ধ্যানধারণায় বেড়াজালে।

এই পটভূমিতে এগিয়ে এলেন মার্কস। আর তিনি অগ্রসর হলেন তাঁর সকল পূর্বসূরির প্রত্যক্ষ বিরোধী মত পোষণ করে। ওই পূর্বসূরীরা যেখানে **সমাধানের** সন্ধান পেয়েছিলেন সেখানে তিনি সন্ধান পেলেন কেবলমাত্র **সমস্যার**। তিনি দেখলেন যে ফ্লজিস্টন-মুক্ত বায়ুর অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই অগ্নিবায়ুরও, আছে শুধু অক্সিজেন; তিনি বুঝলেন যে ব্যাপারটা এক্ষেত্রে নিছক একটি অর্থনৈতিক ঘটনাকে লক্ষ্য করা ও লিপিবদ্ধ করায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, কিংবা তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না ওই ঘটনার সঙ্গে চিরন্তন ন্যায়বিচার ও সত্যিকার নৈতিকতার সংঘর্ষের পর্যালোচনায়, আসলে ব্যাপারটা হল এমন একটি তথ্যের আবিষ্কার যা গোটা অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই বিপ্লব এনে দিতে বাধ্য এবং যা সকল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মর্মকথার চাবিকাঠি; অবশ্য এটা তাঁর পক্ষেই সত্য, যিনি এই চাবিকাঠি ব্যবহার করতে শিখবেন। এই তথ্যটিকে সূচনা-বিন্দু হিসেবে ধরে মার্কস তাঁর হাতের কাছে লভ্য অর্থশাস্ত্রের গোটা বিন্যাসকেই পরীক্ষা করে দেখলেন, ঠিক

যেমন ভাবে লাভোয়াজিয়ে অক্সিজেনকে সূচনা-বিন্দু হিসেবে ধরে হাতের কাছে লভ্য ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্রের সকল সিদ্ধান্তকে দেখেছিলেন পরীক্ষা করে। উদ্বৃত্ত মূল্য পদার্থটি কী তা জানার জন্যে মার্কসকে প্রথমে জানতে হয়েছে মূল্য পদার্থটি কী। মূল্য-সংক্রান্ত খোদ রিকার্ডো-র তত্ত্বটিকেই এর জন্যে তাঁকে সমালোচনার অধীনে আনতে হয়েছে। এইভাবে মার্কস শ্রম বস্তুটির পর্যালোচনা করেছেন তার মূল্য উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং তিনিই প্রথম দৃঢ়ভাবে এই মতের প্রতিষ্ঠা করলেন যে **কোন ধরনের** শ্রম মূল্য উৎপাদন করে ও কেন ও কীভাবে তা উৎপাদন করে এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মূল্য বস্তুটি আসলে **এই ধরনের** ঘনীভূত শ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। উল্লেখ্য যে মার্কসের আগে রডবের্টুস তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই শেষোক্ত ব্যাপারটি ধরতেই পারেন নি। মার্কস অতঃপর পরীক্ষা করে দেখলেন পণ্যসম্ভারের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি, এবং দেখালেন কীভাবে ও কেমন করে মূল্য-সম্পর্কিত তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দৌলতে পণ্যসম্ভার ও পণ্য-বিনিময় পণ্য ও অর্থের বৈপরীত্যের জন্ম দিতে বাধ্য। এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মার্কসের অর্থ-সংক্রান্ত তত্ত্বটি এ-বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ, ও বর্তমানে খোলাখুলি স্বীকার না-করা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে সর্বজনগৃহীত তত্ত্ব। অর্থের পুঁজিতে রূপান্তরসাধন নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে মার্কস প্রমাণ করলেন যে এই রূপান্তরের ভিত্তি হল শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয়। সাধারণভাবে শ্রমের জায়গায় শ্রমশক্তি, বা তার মূল্য-উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যটিকে বদলে নেয়ার ফলে এক কলমের আঁচড়ে তিনি এমন একটি সমস্যার সমাধান করলেন যে-সমস্যার ডুবোপাহাড়ের ধাক্কায় রিকার্ডীয় মতবাদের জাহাজের ভরাডুবি হয়ে গিয়েছিল। সে-সমস্যা হল, শ্রমের দ্বারা রিকার্ডীয় মূল্য-নিরূপণ সংক্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক বিনিময়ের সামঞ্জস্যবিধানের অসম্ভাব্যতা। 'বদ্ধ' ও 'চল' পুঁজির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার ফলে মার্কসই প্রথম একেবারে খুঁটিনাটির বিশদীকরণ সহ উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার সত্যিকার পথের রূপরেখা নিরূপণে সমর্থ হলেন এবং ফলত সমর্থ হলেন তার ব্যাখ্যা যোগানোতেও। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে তাঁর পূর্বসূরীদের কেউই এ-কাজে সমর্থ হন নি। এইভাবে মার্কস খোদ পুঁজির মধ্যেই এমন এক তারতম্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন যে-

ব্যাপারে তাঁর আগে না-রডবের্টুস না-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা কেউই কোনো কূলকিনারা করে উঠতে পারেন নি। অথচ আলোচ্য এই ব্যাপারটিই সবচেয়ে জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের চাবিকাঠিটি যুগিয়ে দিচ্ছে—ফের একবার যার অত্যন্ত লক্ষণীয় প্রমাণ মিলেছে 'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং আমরা দেখাব যে এর আরও বেশি উল্লেখ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ওই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে। মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যের আরও বিশ্লেষণ করে তার দুটি ধরন আবিষ্কার করেছেন, যথা অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য; এবং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে ওই দুই ধরনের উদ্বৃত্ত মূল্য-যে বিভিন্ন, অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তা দেখিয়েছেন। উদ্বৃত্ত মূল্য নিরূপণের ভিত্তিতে মার্কস বিকশিত করে তুলেছেন মজুরি সম্পর্কে এ-পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি তার মধ্যে এই প্রথম যুক্তিসম্মত একটি তত্ত্ব এবং এই প্রথম তিনি নির্ধারণ করলেন পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের ইতিহাসের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি ও তার ঐতিহাসিক প্রবণতার একটি রূপরেখা।

১৮৮৫ সালের ৫ মে তারিখে
এঙ্গেলস-লিখিত প্রবন্ধ
প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়
গ্রন্থাকারে: K. Marx.
'Das Kapital. Kritik
der politischen Oeconomie'.
Zweiter Band, Herausgegeben
von Friedrich Engels,
Hamburg, 1885.

গ্রন্থের পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি জার্মান
ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস

জেনেভায় অবস্থিত রুশ শাখার কমিটি-সদস্যদের কাছে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদের পত্র (৫৪)

নাগরিকগণ,

গত ২২ মার্চের সভায় সর্বসম্মত ভোটে সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করেছে যে আপনাদের গৃহীত কর্মসূচি ও নিয়মাবলী আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীর সঙ্গে সুসমঞ্জস। ফলে সাধারণ পরিষদ সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের শাখাকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সাধারণ পরিষদে আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে সম্মানজনক কর্মভার আপনাদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি গ্রহণ করছি।

কর্মসূচিটিতে আপনারা বলেছেন:

> '...পোল্যান্ডের নিপীড়ক সাম্রাজ্যিক জোয়াল এমন একটি গতিরোধক যন্ত্রবিশেষ যা উভয় জাতির — যেমন রুশ তেমনই পোলিশ জাতির — রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রে একই রকম বাধার সৃষ্টি করছে।'

সেইসঙ্গে আপনারা একথা বললেও ভুল হোত না যে রাশিয়ার তরফে পোল্যান্ড ধর্ষণের ব্যাপারটা জার্মানিতে, এবং ফলত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশেই, সামরিক শাসনের অস্তিত্বের সত্যিকার হেতু এবং ওই শাসনকে তা অতীব ক্ষতিকর সমর্থন যোগাচ্ছে। অতএব পোল্যান্ডের বন্ধনশৃঙ্খল চূর্ণ করার জন্যে কাজ করতে গিয়ে রুশ সমাজতন্ত্রীরা উপরোক্ত ওই সামরিক শাসন ধ্বংস করারও মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন। ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের সামগ্রিক মুক্তি অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে এই কাজটি একান্ত অপরিহার্য।

কয়েক মাস আগে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে পাঠানো ফ্লেরোভস্কির 'রুশদেশে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' শীর্ষক বইখানি আমি পাই। বইখানি সত্যিই

ইউরোপের চোখ খুলে দিয়েছে। সারা ইউরোপ মহাদেশে এমনকি তথাকথিত বিপ্লবীরা পর্যন্ত **রুশ আশাবাদের** যে-কাল্পনিক ধারণা প্রচার করেছে, নির্মমভাবে তার বিপরীতে যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে বইটি। যদি আমি বলি যে বইখানিতে একটি বা দুটি জায়গায় এমন কিছু-কিছু কথা লেখা হয়েছে যা বিশুদ্ধ তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচককে পুরোপুরি খুশি করতে পারে নি, তাহলেও বইটির মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। এটি হল এক দায়িত্বশীল পর্যবেক্ষক, এক অক্লান্ত কর্মী, এক নিরপেক্ষ সমালোচক, এক মস্ত বড় শিল্পী এবং সবচেয়ে বেশি করে সকল প্রকার উৎপীড়ন-নিপীড়ন সম্পর্কে অসহিষ্ণু ও সকল জাতীয় প্রশংসা অসহ্য করা এবং উৎপাদক শ্রেণীর সকল দুঃখকষ্ট ও সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুল অংশভাক এক ব্যক্তির রচিত একখানি গ্রন্থ।

ফ্লেরোভস্কির এই ধরনের বই এবং আপনাদের শিক্ষক চের্নিশেভ্স্কির বইগুলি রাশিয়াকে যথার্থ মর্যাদার অধিকারী করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে আপনাদের দেশও আমাদের যুগের আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেছে।

ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন সহ
কার্ল মার্কস

লণ্ডন, ২৪ মার্চ, ১৮৭০ সাল

জেনেভা থেকে প্রকাশিত
'নারোদনয়ে দিয়েলো'
পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়,
১৫ এপ্রিল, ১৮৭০ সালে মুদ্রিত

পত্রিকার পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি রুশ
ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস

গোপনীয় চিঠি (৫৫)

(অংশ)

৪) **ইংলণ্ডের জন্যে গঠিত ফেডেরাল পরিষদ থেকে সাধারণ পরিষদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নটি সম্বন্ধে।**

L'Egalité পত্রিকা(৫৬) প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই এই প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের সভায় থেকে-থেকে উত্থাপন করেছেন পরিষদের দু'একজন ইংরেজ সদস্য। কিন্তু সর্বদাই এ-প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

যদিও বৈপ্লবিক **উদ্যোগ** সম্ভবত আসবে ফ্রান্স থেকে, তবু একমাত্র ইংলণ্ডই পারে গুরুতর **অর্থনৈতিক** বিপ্লবের **চালক-দণ্ড** হিসেবে কাজ করতে। এটি হল সেই একমাত্র দেশ যেখানে আর কৃষক বলে কেউ নেই এবং যেখানে ভূ-সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত অল্প কয়েকজনের হাতে। সেই একমাত্র দেশ এটি যেখানে **পুঁজিতান্ত্রিক গঠন,** অর্থাৎ পুঁজিপতি-প্রভুদের অধীনে ব্যাপক হারে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক, কার্যত উৎপাদনের গোটা এলাকাটাই জুড়ে আছে। এটি সেই একমাত্র দেশ **যেখানে জনসাধারণের এক বিপুল সংখ্যাধিক অংশ মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত।** সেই একমাত্র দেশ এটি যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম ও **ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে** শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন একটা নির্দিষ্ট মাত্রার পরিপক্কতা ও সর্বজনীনতা **অর্জন করেছে।** এটি হল সেই একমাত্র দেশ বিশ্ব বাজারের ওপর যার কর্তৃত্বের দরুন এখানকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে-কোনো বিপ্লব সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা গোটা দুনিয়াকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। জমিদারি-ব্যবস্থা ও পুঁজিতন্ত্র যদি ইংলণ্ডে ওই দুটি ব্যবস্থার ধ্রুপদী উদাহরণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় অপরদিকে তাদের **ধ্বংসের বৈষয়িক পরিবেশ** ও সবচেয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে এখানে। এখন, **প্রলেতারীয় বিপ্লবের এই প্রধান চালক-দণ্ডটির হাতলে যখন সরাসরি হাত রাখার মতো চমৎকার অবস্থানে আছে** সাধারণ পরিষদ, তখন সেই চালক-

দণ্ডটি নিছক ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো বোকামি, এমনকি বলতে পারি অপরাধ, আর কী হতে পারে!

সমাজ-বিপ্লব সাধনের পক্ষে সকল প্রয়োজনীয় **বৈষয়িক উপাদান** ইংরেজ-জাতির আছে। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে যার অভাব তা হল, **সামান্যীকরণের মানসিক প্রবণতা ও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা**। একমাত্র সাধারণ পরিষদ তাঁদের এটা যুগিয়ে দিতে পারে, এবং এইভাবে দ্রুতগামী করে তুলতে পারে সত্যিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনকে—এখানে এবং ফলত **সর্বত্রই**। এ-ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে-বিপুল ফল পেয়েছি আমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে শাসক-শ্রেণীগুলির সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী সংবাদপত্রসমূহ, যেমন, *Pall Mall Gazette, Saturday Review, Spectator, Fortnightly Review* (৫৭)। এছাড়া এই কিছুকাল আগেও যাঁরা ইংরেজ শ্রমিকদের নেতৃবৃন্দের ওপর বড়রকমের প্রভাববিস্তার করে ছিলেন সেই **কমন্স-সভা ও লর্ডস-সভার** তথাকথিত র‍্যাডিকাল সদস্যদের কথা তো বাদই দিলাম। এ'রা সবাই মিলে প্রকাশ্যে আমাদের ওপর দোষারোপ করছেন এই বলে যে আমরা নাকি শ্রমিক শ্রেণীর মন বিষিয়ে দিয়েছি ও তাঁদের মধ্যে **ইংরেজসুলভ মেজাজ** দিয়েছি নষ্ট করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে আমরা ঠেলে নিয়ে চলেছি বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের পথে।

সত্যিসত্যিই এই পরিবর্তন সংঘটনের একমাত্র পন্থা হল **আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদ** যেভাবে প্রচারকার্য চালাচ্ছে তা-ই। সাধারণ পরিষদ হিসেবে আমরা এমন সব ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, **ভূমি ও শ্রম-লীগ** (৫৮) প্রতিষ্ঠার মতো) ঘটাতে পারি, যেগুলিকে কার্যকর করে তোলার বিশেষ কায়দার ফলে পরে জনসাধারণের চোখে তা ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলে প্রতীয়মান হবে।

কিন্তু যদি **সাধারণ পরিষদের** বাইরে একটি **ফেডেরাল পরিষদ** গঠন করা হয়, তাহলে তার তৎক্ষণিক ফলাফল কী দাঁড়াবে?

সাধারণ পরিষদ ও **সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের** মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে **ফেডেরাল পরিষদ** সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের অধিকার হারাবে। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিকের **সাধারণ পরিষদ** হারাবে উপরোক্ত ওই **বিপুল**

চালক-দণ্ড চালনার অধিকার। যদি আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ চালানোর পরিবর্তে লোক-দেখানো বকবকানির ভক্ত হতাম, তাহলে হয়তো *L'Egalité*-র প্রশ্নের প্রকাশ্যে জবাব দেয়ার মতো ভুল করেই বসতাম; হয়তো বোঝাতে চেষ্টা করতাম কেন **সাধারণ পরিষদ** 'এমন একগাদা কাজের ঝুটঝামেলা' যেচে ঘাড়ে নিয়েছে!

ইংলন্ডকে অন্যান্য দেশের মধ্যে নিছক যে-কোনো একটি দেশ হিসেবে মোটেই গণ্য করা চলে না। এ-দেশটিকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে **পুঁজির রাজধানী** হিসেবে।

৫) **আয়র্ল্যান্ডের মুক্তির দাবি-বিষয়ে (৫৯) সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব-সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্বন্ধে।**

ইংলন্ড যদি জমিদারি-প্রথা ও ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের দুর্গ-প্রাকার হয়, তাহলে একটিমাত্র জায়গা যেখানে সরকারি ইংলন্ডকে সত্যিকার সজোর আঘাত দেয়া যেতে পারে তা **হল আয়র্ল্যান্ড।**

প্রথম কথা, আয়র্ল্যান্ড হল ব্রিটিশ জমিদারি-প্রথার **দুর্গ-প্রাকার।** আয়র্ল্যান্ডে যদি এই দুর্গের পতন ঘটে তাহলে ইংলন্ডেও তার পতন ঘটবে। তবে আয়র্ল্যান্ডে এটা ঘটানো এক শো গুণ সহজ কাজ, কেননা সেদেশে **অর্থনৈতিক সংগ্রাম একমাত্র ভূ-সম্পত্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত,** কেননা এই সংগ্রাম সেখানে একই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামও বটে, এবং যেহেতু ইংলন্ডের চেয়ে সেখানকার জনসাধারণ আরও বেশি বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ও বিক্ষুব্ধ। আয়র্ল্যান্ডে জমিদারি-প্রথা একমাত্র টিকিয়ে রাখা হয়েছে **ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর** সাহায্যে। যে-মুহূর্তে দুই দেশের মধ্যে বর্তমান **জবরদস্তিমূলক সংযুক্তির** (৬০) অবসান ঘটবে, আয়র্ল্যান্ডে সেই মুহূর্তেই ফেটে পড়বে সমাজ-বিপ্লব, তবে তা ঘটবে সেকেলে অচলিত ধাঁচে। আর এর ফলে ব্রিটিশ জমিদারি-প্রথা কেবল-যে সম্পদ আহরণের বিপুল এক উৎসই হারাবে তা নয়, হারাবে তার **সবচেয়ে বড় নৈতিক শক্তিও,** অর্থাৎ **আয়র্ল্যান্ডের ওপর ইংলন্ডের আধিপত্যের পরিচায়ক শক্তিও।** এর বিপরীতে, আয়র্ল্যান্ডে ইংরেজ জমিদারদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে দেয়ার ফলে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েত খোদ ইংলন্ডেই তাদের ক্ষমতাকে দুর্ভেদ্য করে রাখছে।

দ্বিতীয় কথা, ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণী আয়র্ল্যাণ্ডের দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে কেবল-যে দরিদ্র আয়র্ল্যাণ্ডবাসীদের ইংলণ্ডে **দেশান্তরী হতে বাধ্য করেছে** তা-ই নয়, এর ফলে তারা প্রলেতারিয়েতকেও দুটি বিরোধী শিবিরে ভাগ করে রেখেছে। কেল্‌টিক শ্রমিকের অগ্নিময় বিপ্লবী প্রকৃতি মিশ খায় না অ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রমিকের দৃঢ় অথচ মন্থরগতি চরিত্রের সঙ্গে। ঠিক উল্টো, **ইংলণ্ডের সবকটি বড়-বড় শিল্পকেন্দ্রে আইরিশ** প্রলেতারিয়েত ও ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বিষম শত্রুতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আইরিশ শ্রমিক ব্রিটিশ শ্রমিকের প্রতিযোগী হিসেবে শেষোক্ত শ্রমিকের মজুরি ও **জীবনধারণের মান** নিচু করে রাখছে বলে সাধারণ ইংরেজ শ্রমিক আইরিশ শ্রমিককে ঘৃণার চক্ষে দেখছে। ইংরেজ শ্রমিক জাতিগত ও ধর্মগত বিদ্বেষ পোষণ করছে আইরিশ শ্রমিকের প্রতি। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে **গরিব শাদা-চামড়ার লোকেরা** কালো-চামড়ার ক্রীতদাসদের যে-চোখে দেখে থাকে ইংরেজ শ্রমিকও অনেকটা সেই চোখে দেখে থাকে আইরিশ শ্রমিককে। ইংলণ্ডের প্রলেতারিয়ানদের মধ্যেকার এই পরস্পর-বিরোধ বুর্জোয়া শ্রেণী কৃত্রিমভাবে জীইয়ে রেখেছে ও তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী জানে যে এই বিভেদই হল তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সত্যিকার গোপন রহস্য।

এই শত্রুতা আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপারেও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ষাঁড় ও ভেড়ার পালের তাড়নায় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আয়র্ল্যাণ্ডবাসীরা সুদূর উত্তর আমেরিকাতেও গিয়ে জড় হয়েছে এবং সেখানকার জনসংখ্যার এক বিপুল, ক্রমবর্ধমান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, একমাত্র বদ্ধমূল আবেগ হল ইংলণ্ডের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ। ব্রিটিশ ও আমেরিকান গভর্নমেণ্ট-দুটিও (অথবা যে-সমস্ত শ্রেণীর তারা প্রতিনিধি সেই শ্রেণীগুলি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের মধ্যেকার চাপা লড়াইকে জীইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ওই ঘৃণা-বিদ্বেষে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। আর এইভাবে তারা আটলাণ্টিকের দুই পারের শ্রমিকদের মধ্যে আন্তরিক ও স্থায়ী মৈত্রীজোট স্থাপনে এবং ফলত তাদের মুক্তি অর্জনেও বাধা দিয়ে চলেছে।

তদ্‌পরি, **প্রকাণ্ড এক স্থায়ী সেনাবাহিনী** পোষণের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের একমাত্র অজুহাত হল আয়র্ল্যাণ্ড দখলে রাখা। আর এই সেনাবাহিনীকে, দরকার পড়লে ও আগেও যেমনটি করা হয়েছে সেইভাবে, আয়র্ল্যাণ্ডে তার সামরিক হাতেখড়ি শেষ হবার পর অক্লেশে ব্যবহার করা চলতে পারবে ব্রিটিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। পরিশেষে, প্রাচীন রোমে একদা বিপুল ও বিকটভাবে যে-ব্যাপারটা ঘটেছিল আজকের ইংলণ্ড ঠিক সেই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখছে। আর তা হল, যে-জাতিই অপর জাতির ওপর উৎপীড়ন-নিপীড়ন চালায় সে নিজ বন্ধনশৃঙ্খল রচনা করে নিজেই।

অতএব আইরিশ সমস্যার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি অতি পরিষ্কার। সমিতির প্রথম কর্তব্য হল ইংলণ্ডে সমাজ-বিপ্লবকে উৎসাহ যোগানো। আর এই উদ্দেশ্যসাধনে আয়র্ল্যাণ্ডে প্রচণ্ড এক আঘাত হানা প্রয়োজন।

আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তির দাবি-বিষয়ে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবাদি ভবিষ্যতের অপরাপর প্রস্তাবের ভূমিকামাত্র। এই ভবিষ্যৎ প্রস্তাবগুলিতে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হবে যে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি বাদ দিলেও বর্তমান **জবরদস্তিমূলক সংযুক্তি** (অর্থাৎ, আয়র্ল্যাণ্ডের দাসত্ব)-কে সম্ভব হলে **সমকক্ষ ও স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের মৈত্রীজোটে** এবং প্রয়োজন হলে উভয়ের **সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণে** রূপান্তরিত করা **ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির এক পূর্বশর্তবিশেষ**।

১৮৭০ সালের ২৮ মার্চ
তারিখ নাগাদ রচনা
১৯০২ সালের *Die Neue Zeit*, Bd. 2, পঞ্চদশ
সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

মস্কো থেকে প্রকাশিত
'প্রথম আন্তর্জাতিকের
সাধারণ পরিষদের
১৮৬৮-১৮৭০ সালের
কার্যবিবরণীতে' বিধৃত
'রোমান সুইজারল্যাণ্ডের
ফেডেরাল পরিষদের কাছে
সাধারণ পরিষদের বক্তব্য'
শীর্ষক দলিলের পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন-প্রসঙ্গে

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির লণ্ডন সম্মেলনে ১৮৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সাংবাদিক-লিখিত প্রতিলিপি অনুসারে (৬১)

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা অসম্ভব। রাজনীতি-নিরপেক্ষ সংবাদপত্রও প্রতিদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন হল, কীভাবে এবং কী ধরনের এই রাজনীতিতে যোগ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আমাদের পক্ষে রাজনীতি থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। বর্তমানে বিপুল-সংখ্যক অধিকাংশ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে কাজ করে চলেছে, আর রাজনীতি থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে আমরা সেইসব পার্টির সর্বনাশসাধনে প্রস্তুত নই। জীবন্ত অভিজ্ঞতা, বর্তমান গভর্নমেণ্টগুলির রাজনৈতিক উৎপীড়ন শ্রমিকদের বাধ্য করে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে, তা তারা সেটা চাক বা না-চাক এবং তা রাজনৈতিক অথবা সামাজিক যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনে হোক-না কেন। এই শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার কথা প্রচার করার অর্থই হল তাদের বুর্জোয়া রাজনীতির খপ্পরে ফেলে দেয়া। প্যারিস কমিউন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরদিন সকাল থেকেই প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক আন্দোলন সাধারণ নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে, ফলত রাজনীতি থেকে বিরত থাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারেই অবান্তর।

আমরা শ্রেণীসমূহের বিলোপ ঘটাতে চাই। কিন্তু তা করার উপায় কী? এর একমাত্র উপায় প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এখন প্রত্যেকটি লোক এই সবকিছু মেনে নেয়া সত্ত্বেও আমাদের তবু বলা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে মাথা না-ঘামাতে। রাজনীতি-নিরপেক্ষেরা বলছে তারা নাকি বিপ্লবী, এমনকি বিশেষ উৎকর্ষের জোরেই বিপ্লবী তারা।

অথচ বিপ্লব হল গিয়ে এক সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক কর্ম এবং যারা বিপ্লব চায় তারা ওই বিপ্লবকে সফল করে তোলার উপায়াদিও অবলম্বন না-করতে চেয়ে পারে না, অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন না-চেয়ে পারে না তারা। কেননা এই রাজনৈতিক আন্দোলনই বিপ্লবের জমি তৈরি করে এবং শ্রমিকদের সেই বৈপ্লবিক প্রশিক্ষণ দেয়, যে-প্রশিক্ষণ না-থাকলে যুদ্ধের পরদিন সকালেই শ্রমিকরা ফাভ্‌র ও পিয়াদের হাতে প্রতারিত হতে বাধ্য। আমাদের রাজনীতি হওয়া উচিত শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি। শ্রমিক পার্টিকে কোনো বুর্জোয়া পার্টির লেজুড় হলে চলবে না কখনও। তাকে হতে হবে স্বাধীন ও স্বনির্ভর এবং তার নিজস্ব লক্ষ্য ও নিজস্ব রাজনীতি থাকা দরকার।

রাজনৈতিক স্বাধীনতাসমূহ, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও সঙ্ঘ গঠনের অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা — এগুলি হল আমাদের হাতিয়ার। আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব ও রাজনীতি থেকে বিরত থাকব, যখন অন্য কেউ আমাদের হাত থেকে ওই হাতিয়ারগুলি কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে? বলা হচ্ছে যে আমাদের তরফে রাজনীতির ক্রিয়াকলাপে রত থাকার অর্থ হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থাকে আমাদের মেনে নেয়ার সামিল। আমি বলি, ব্যাপারটা ঠিক উলটো। যতক্ষণ এই বর্তমান ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার যুগিয়ে দিচ্ছে আমাদের হাতে, ততক্ষণ আমাদের পক্ষ থেকে সেগুলিকে ব্যবহার করলে মোটেই এটা বোঝায় না যে আমরা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছি।

The Communist International পত্রিকার ১৯৩৪ সালের ২৯ নং সংখ্যার প্রথম সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত

ফরাসি ভাষার পান্ডুলিপি অনুযায়ী মুদ্রিত

কার্ল মার্ক্স

প্যারিস কমিউনের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবাদি (৬২)

১

'...গত বছরের ১৮ মার্চের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবেত এই সভা ঘোষণা করছে   ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ তারিখে যে-গৌরবময় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তাকে এই সভা গণ্য করছে সেই মহান সমাজ-বিপ্লবের প্রত্যূষা হিসেবে যা মানবজাতিকে চিরকালের মতো শ্রেণীর শাসনের হাত থেকে মুক্তি দেবে।'

২

'...শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা থেকে জাত গোটা ইউরোপ-জুড়ে-ছড়ানো মধ্য-শ্রেণীগুলির অক্ষমতা ও অপরাধ-অনুষ্ঠান পুরনো সমাজের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছে, তা সে-সমাজের শাসনভার রাজতন্ত্রী অথবা প্রজাতন্ত্রী যে-কোনো ধরনের গভর্নমেন্টের হাতেই থাকুক-না কেন।'

৩

'...আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সকল গভর্নমেন্টের জেহাদ ঘোষণা এবং ভার্সাইয়ের খুনীদের (৬৩) ও সেইসঙ্গে তাদের প্রাশিয়ান বিজেতাদের সন্ত্রাসসৃষ্টি প্রমাণ করছে তাদের সাফল্যসমূহের শূন্যগর্ভতা এবং তিয়ের ও

প্রাশিয়ার ভিলহেল্মের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে চূর্ণ-করা বীর অগ্রগামীদের পেছনে সমবেত গোটা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের আক্রমণোদ্যত বাহিনীর উপস্থিতি।'

১৮৭২ সালের ১৩ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে মার্কসের লেখা

১৮৭২ সালের ২৪ মার্চ *La Liberté*-র দ্বাদশ সংখ্যায় এবং ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ *The International Herald*-এর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত

The International Herald-এর পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

কার্ল মার্কস

জমির জাতীয়করণ (৬৪)

ভূ-সম্পত্তিই হল সকল সম্পদের আদি উৎস এবং এটি এমন এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার সমাধানের ওপর নির্ভর করে আছে শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ।

আমি এখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক যতসব আইনজ্ঞ, দর্শনশাস্ত্রী ও অর্থশাস্ত্রীর উপস্থাপিত সকল যুক্তিতর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই না, কেবল প্রথমত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই এই বক্তব্যটিতে যে ওই সমর্থকরা **'স্বাভাবিক অধিকার'**-এর মুখোশের নিচে প্রাণপণে গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন জমি ছিনিয়ে নেয়ার আদিম ঘটনাটিকে। যদি সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে জমি ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা তাদের স্বাভাবিক অধিকারের সামিল হয়ে থাকে, তাহলে সমাজের অধিকাংশের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল কেবলমাত্র যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সংগ্রহ করা যাতে তাদের কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তা ফিরেফিরতি ছিনিয়ে নেয়ার মতো স্বাভাবিক অধিকার তারা অর্জন করতে পারে।

• ইতিহাসের গতিপথে বিজেতারা পশুশক্তির বলে সংগৃহীত তাদের আদি খেতাব, উপাধি ইত্যাদিকে তাদের নিজেদেরই জারি-করা আইনের সাহায্যে এক ধরনের সামাজিক মর্যাদা দেয়াটা বেশ সুবিধাজনক বলে দেখেছে।

অতঃপর এসেছেন দর্শনশাস্ত্রী এবং তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ওই সমস্ত আইনকানুনের মধ্যে নিহিত রয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে মানবজাতির সর্বজনীন সমর্থন। কাজেই যদি জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারটি এমন কোনো সর্বজনীন সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে

তাহলে স্পষ্টতই তা লোপ পাবে যে-মুহূর্তে সমাজের অধিকাংশ মানুষ তার ন্যায্যতা মেনে নিতে অস্বীকৃত হবে।

অবশ্য, ভূ-সম্পত্তিতে তথাকথিত এই 'অধিকার'-এর প্রশ্নটি বাদ দিয়েও আমি জোর করে বলতে চাই যে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীভবন, অর্থাৎ সেই সমস্ত ঘটনা যা পুঁজিতন্ত্রী খামারীকে বাধ্য করে কৃষিতে যৌথভাবে সংগঠিত শ্রমকে নিয়োগ করতে এবং ক্রমশ বেশি-বেশি যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপায়াদি প্রয়োগ করতে—এই সবই ক্রমশ বেশি করে জমির জাতীয়করণকে **'সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয়'** করে তুলবে এবং এর বিরুদ্ধে ভূ-সম্পত্তির অধিকার-সম্পর্কিত হাজার কথাবার্তাও কোনো কাজে লাগবে না। সমাজের অবশ্য-পূরণীয় চাহিদা মিটবেই ও তা মেটাতে হবেই, সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তনাদিও ঘটবে নিজ-নিজ পথ অনুসরণ করে এবং কোথাও দ্রুত কোথাও-বা অপেক্ষাকৃত পরে তাদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় আইনকানুনও তৈরি করে নেবে।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হল দিনে-দিনে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে চলা, আর উৎপাদন-বৃদ্ধির এই জরুরি প্রয়োজন কখনোই মিটতে পারে না যদি আমরা অল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে তাদের খেয়ালখুশি-মাফিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণে কৃষি-উৎপাদনের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত করতে দিই, অথবা তাদের অজ্ঞতাবশত জমির উৎপাদিকা শক্তিকে নিঃশেষ হতে দিই। সকল প্রকার আধুনিক পদ্ধতি, যেমন জমির সেচ ও জলনিকাশী-ব্যবস্থা, বাষ্পীয় লাঙলচালনা, জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ব্যবস্থা, ইত্যাদি ব্যাপকভাবে কৃষিতে ব্যবহৃত হওয়া দরকার। কিন্তু যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আমরা অধিকারী এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামের মতো কৃষিতে ব্যবহার্য যে-কৃৎকৌশল আমাদের আয়ত্তে, তা কখনোই সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় একমাত্র ব্যাপক হারে জমিচাষের বন্দোবস্ত করা ছাড়া।

ব্যাপক হারে জমির চাষ-আবাদ যদি ছোট-ছোট ও টুকরো-টুকরো জমি পৃথকভাবে চাষের চেয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এত উৎকৃষ্টতর ও লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে (এমনকি খোদ কৃষককে যা নিছক ভারবাহী পশুতে পরিণত করে সেই বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থাতেও

যদি এটি সম্ভব হয়ে থাকে), তাহলে ব্যাপক জাতীয় ভিত্তিতে এই জমিচাষের প্রবর্তন করতে পারলে কি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগ্রহ-উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পাবে না?

একদিকে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অপরদিকে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান দরদাম তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে জমির জাতীয়করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার।

ব্যক্তিগত অপব্যবহারের ফলে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন-হ্রাসের মতো ব্যাপার অবশ্যই তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, যখন কৃষিকাজ পরিচালিত হবে জাতির নিয়ন্ত্রণাধীনে ও সমগ্র জাতির উপকারার্থে।

আজ এখানে এই বিশেষ প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক চলার সময়ে যে-সমস্ত নাগরিকের বক্তব্য আমি শুনলাম, তাঁরা সবাই জমির জাতীয়করণ সমর্থন করেছেন বটে তবে এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা।

ফ্রান্সের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতে শুনলাম, কিন্তু **কৃষক-মালিকানার** দেশ ফ্রান্স জমিদারি-প্রথার দেশ ইংলণ্ডের চেয়ে জমির জাতীয়করণ থেকে আরও দূরে অবস্থান করছে। এটা সত্যি যে ফ্রান্সে যার কেনার ক্ষমতা আছে সে-ই জমি পেতে পারে, কিন্তু ঠিক এই সুযোগটি থাকার ফলেই সেখানে জমি টুকরোটুকরো ভূমিখণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে এবং তা চাষ করছে নিজেদের ও নিজ-নিজ পরিবারের মেহনত দিয়ে স্বল্পবিত্ত ও জমির ওপর প্রধানত নির্ভরশীল যতসব কৃষক। এই ধরনের ভূ-সম্পত্তি এবং এ থেকে উদ্ভূত ছোট হারে পৃথক-পৃথক চাষ-ব্যবস্থা যেমন আধুনিক উন্নত কৃষির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার এড়িয়ে চলে তেমনই তা খোদ কৃষককে সামাজিক অগ্রগতির, ও সবচেয়ে বেশি করে জমির জাতীয়করণের, সবচেয়ে পাকাপোক্ত শত্রু করে তোলে। যে-জমিতে আনুপাতিকভাবে স্বল্প আয়ের জন্যে সমগ্র প্রাণশক্তি তাকে নিয়োগ করতে হচ্ছে সেই জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, উৎপাদনের বেশির ভাগ অংশ করের আকারে রাষ্ট্রকে, মামলা-মোকদ্দমার খরচ হিসেবে আইনজীবীদের ও ঋণবাবদ সুদ হিসেবে কুসীদজীবীকে দিতে বাধ্য এবং তার কর্মস্থল সেই

ছোট্ট জমিটুকুর বাইরেকার সকল সামাজিক আন্দোলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ফরাসিদেশের কৃষক তার জমির টুকরোটি ও সেই জমিতে তার নিছক নামেমাত্র মালিকানাটুকু তবু অসম্ভব অন্ধ অনুরাগভরে আঁকড়ে থাকে। আর এইভাবে ফরাসি কৃষকের মধ্যে গড়ে ওঠে শিল্পের শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক মারাত্মক শত্রুতার মনোভাব।

জমির জাতীয়করণের পক্ষে কৃষকের মালিকানার ব্যাপারটি তাই সবচেয়ে বড় বাধা বলে ফ্রান্সের বর্তমান অবস্থায় আমরা এই বিরাট সমস্যাটির সমাধান অবশ্যই সেদেশে খুঁজতে যাব না।

মধ্য-শ্রেণীর কোনো গভর্নমেন্টের অধীনে জমি ছোট-ছোট টুকরোয় ব্যক্তিবিশেষদের কিংবা শ্রমজীবীদের সমিতিগুলির মধ্যে চাষের জন্যে খাজনার ভিত্তিতে বণ্টন করার উদ্দেশ্যে জমির জাতীয়করণ নিষ্পন্ন করলে তা কেবলমাত্র ওই ব্যক্তিবিশেষদের মধ্যেই বেপরোয়া প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে এবং তার ফলে ঘটবে ক্রমবর্ধমান হারে **'খাজনা'** বৃদ্ধি ও তা আবার জমি-আত্মসাৎকারীদের নতুন-নতুন সুযোগ জুটিয়ে দেবে কৃষির উৎপাদকদের শোষণ করার।

১৮৬৮ সালে (৬৫) ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমাদের জনেক বন্ধু* বলেছিলেন:

> 'জমিতে ছোট-ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের রায় অনুসারে অন্ধকার, আর বড়-বড় ভূ-সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকার ন্যায়বিচারের রায়ে। তাহলে এর একমাত্র একটিই বিকল্প থাকছে। তা হল, জমিকে হতেই হবে গ্রামীণ সমিতিসমূহের সম্পত্তি, অথবা সমগ্র জাতির সম্পত্তি। এই সমস্যার সমাধান করবে ভবিষ্যৎ।'

আমি বলব, ব্যাপারটা ঘটবে উল্‌টো। সামাজিক আন্দোলনের পরিণতি ঘটবে এই সিদ্ধান্তে যে একমাত্র স্বয়ং জাতিই সমগ্র জমির মালিক হতে পারে। কেননা জমি সঙ্ঘবদ্ধ খেত-মজুরদের হাতে তুলে দেবার অর্থ দাঁড়াবে সমাজকে বিশেষ একটিমাত্র উৎপাদক-শ্রেণীর হাতে সমর্পণ করা।

জমির জাতীয়করণ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন ঘটাবে, এবং পরিশেষে কি শিল্পের ক্ষেত্রে ও কি গ্রামীণ ক্ষেত্রে

---

* সীজার দ্য পাপ। — সম্পাঃ

উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক রূপটিকে দেবে বাতিল করে। অতঃপর শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণীগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও এ-সমস্ত যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেই অর্থনৈতিক বনিয়াদটিও যাবে লুপ্ত হয়ে। তখন অন্যের শ্রমের খরচে বেঁচে থাকা অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তখন আর খোদ সমাজ থেকে পৃথক কোনো গভর্নমেণ্ট বা রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্ব থাকবে না! কৃষি, খনিশিল্প, পণ্যোৎপাদন—এক কথায়, উৎপাদনের সকল শাখাই তখন ক্রমশ সংগঠিত হবে একেবারে যথাযথ পদ্ধতিতে। **উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের জাতীয় কেন্দ্রীভবন** তখন হয়ে দাঁড়াবে এমন একটি সমাজের জাতীয় ভিত্তি, যে-সমাজ গঠিত হবে যৌথ ও যুক্তিসম্মত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাপৃত স্বাধীন ও সমকক্ষ উৎপাদকদের সম্মিলন নিয়ে। ঊনবিংশ শতকের বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি যে-পথে চলেছে তার জনহিতকর লক্ষ্য হল এই-ই।

১৮৭২ সালের মার্চ-এপ্রিল
মাসে মার্কসের লেখা

১৮৭২ সালের ১৫ জুন
The International Herald
পত্রিকার ১১ নং সংখ্যায়
প্রকাশিত

মূল পাণ্ডুলিপির
সঙ্গে মিলিয়ে
সংবাদপত্রের পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

হেগ-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী থেকে

১৮৭২ সালের ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর (৬৬)

১

নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রস্তাব

(১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত) লণ্ডন সম্মেলনের নবম-সংখ্যক প্রস্তাবের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার-সংবলিত নিম্নোক্ত ধারাটি নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত সপ্তম-সংখ্যক ধারার নিচে স্থান পাবে।

ধারা ৭-এর ক। বিত্তবান শ্রেণীগুলির যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসেবে সক্রিয় হতে পারে একমাত্র তখনই যখন তা বিত্তবান শ্রেণীগুলির গঠিত সকল পুরনো পার্টির প্রতিপক্ষে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পার্টিতে নিজেকে সংগঠিত করে।

একটি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের এই সংগঠিত রূপ সমাজ-বিপ্লবের বিজয় ও তার চরম লক্ষ্য শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তিসাধন নিশ্চিত করার পক্ষে অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই অর্জিত শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিসমূহের মৈত্রীজোটও এই শ্রেণীর হাতে অবশ্যই কাজ করবে তার শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে এই শ্রেণীটির সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে।

জমি ও পুঁজির মালিক-প্রভুরা যেহেতু সর্বদাই তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া-ব্যবস্থাগুলির রক্ষায় ও স্থায়িত্বসাধনে এবং শ্রমের দাসত্ববিধানে তাদের রাজনৈতিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে থাকে, তাই রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলই প্রলেতারিয়েতের মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধারাটি ৫ জনের ভোটের বিরুদ্ধে ২৯ জনের ভোটে গৃহীত হয়; ৮ জন এ-ব্যাপারে ভোটদানে বিরত থাকেন।...

মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় এই নামে: 'Résolutions du congrès général tenu a la Haye du 2 au 7 septembre 1872', Londres, 1872 এবং দুটি সংবাদপত্রে — *La Emancipacion*, ৭২ নং সংখ্যা, ২ নভেম্বর, ১৮৭২ সাল ও *The International Herald*, ৩৭ নং সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭২ সাল

এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে পুস্তিকার পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি ফরাসি ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস

হেগ কংগ্রেস

১৮৭২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে (৬৭) আম্স্টার্ডামে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সাংবাদিক-লিখিত প্রতিবেদন অনুসারে

বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ শতকে রাজারা ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হেগ-এ মিলিত হতেন তাঁদের রাজবংশগুলির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে।

আমরাও চেয়েছিলাম ওইখানেই শ্রমিকের বিচার-সভা বসাতে, এ-ব্যাপারে নানা লোকে নানাভাবে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও। সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল জনবসতির মাঝখানে আমরা চেয়েছিলাম আমাদের এই মহান সমিতির অস্তিত্বের কথা সজোরে ঘোষণা করতে, ঘোষণা করতে তার প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা।

আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা আগে থেকে শুনে লোকে বলেছে যে আমরা নাকি জমি তৈরি করার জন্যে গোপনে দূত পাঠিয়েছি। একথা অবশ্য অস্বীকার করি না যে আমাদের দূতেরা আছে সর্বত্র। তবে তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমাদের অচেনা। হেগ শহরে আমাদের দূতেরা হল সেই সমস্ত শ্রমিক যাদের খাটতে হয় হাড়ভাঙা খাটুনি, ঠিক যেমন আম্স্টার্ডামে দৈনিক ষোল ঘণ্টা করে যাদের কাজ করতে হয় আমাদের দূতেরা হল তাদেরই দলের লোকজন। এরাই হল আমাদের গোপন দূত, এছাড়া আমাদের আর কোনো দূত নেই। আর সকল দেশেই, যেখানেই আমরা গিয়ে দেখা দিই সেখানেই দেখি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে তারা আগ্রহী হয়ে আছে, কেননা অতি দ্রুত তারা বুঝতে পারে যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অবস্থার উন্নতির পথসন্ধান।

হেগ কংগ্রেস তিনটি প্রধান কর্তব্য সম্পাদন করেছে:

এই কংগ্রেস ঘোষণা করেছে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির পক্ষে যে-সমাজ ধসে

পড়ছে সেই পুরনো সমাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সেইসঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। আর আমরা এটা দেখে সুখী যে লন্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবটি এখন থেকে আমাদের নিয়মাবলীর* অন্তর্ভুক্ত হল। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আমাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যে-গোষ্ঠীটি রাজনীতি থেকে শ্রমিকদের বিরত থাকার কথা প্রচার করছিল।

এ-কারণে আমরা এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছি যে উপরোক্ত ওই নীতিগুলি আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বলে আমাদের ধারণা।

শ্রমকে নতুন ধারায় সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিককে একদিন রাজনৈতিক আধিপত্য জয় করে নিতে হবে; তাকে পরাস্ত করতে হবে পুরনো রীতিপ্রথাগুলির সমর্থক পুরনো পলিসিকে, আর এই নীতি কার্যকর না-করার শাস্তি হল পৃথিবীতে তাদের রাজত্বের মুখ কখনও দেখতে-না পাওয়া — নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা ও কর্তব্যকর্মকে অবজ্ঞা করার ফলে ঠিক যেমন শাস্তি পেয়েছিলেন একদা প্রাচীন খ্রীস্টিয়ানরা।

তবে আমরা কিন্তু কখনও এমন কথা বলি নি যে উপরোক্ত ওই লক্ষ্য সর্বদা ও সর্বত্র অর্জন করা যাবে হুবহু একই পদ্ধতিতে।

আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানাদি, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য আমাদের বিবেচনার মধ্যে ধরতেই হবে। একথাও আমরা অস্বীকার করি না যে আমেরিকা, ইংলন্ড ও সেইসঙ্গে আপনাদের প্রতিষ্ঠানাদির কথা আরও ভালো ক'রে জানলে বলতে পারতাম হয়তো হল্যান্ডের মতো দেশেও শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের চরম লক্ষ্য অর্জন করতে পারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের এ-ও স্বীকার করতে হবে যে ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সব দেশেই বলপ্রয়োগ হবে আমাদের বিপ্লবের চালক-দণ্ড; স্বীকার করতেই হবে যে সে-সব দেশে শ্রমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একদিন-না-একদিন আমাদের আশ্রয় নিতে হবে বলপ্রয়োগের।

হেগ কংগ্রেস আমাদের সাধারণ পরিষদের হাতে নতুন-নতুন ও অধিকতর

---

* এই গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন। — সম্পাঃ

ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বস্তুত, এমন একটা সময়ে যখন বিভিন্ন দেশের রাজা বার্লিনে সমবেত হয়েছেন (৬৮) এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অতীত যুগের শক্তিশালী প্রতিনিধিবর্গের ওই সভা অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যখন আমাদের বিরুদ্ধে নতুন-নতুন ও কঠিনতর দমনপীড়নের ব্যবস্থাদি গৃহীত হতে চলেছে ও নির্যাতনের রীতি চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখনই হেগ কংগ্রেস তার সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাদি বৃদ্ধি করা ও যে-সংগ্রাম অদূর-ভবিষ্যতে শুরু হতে চলেছে ও বিচ্ছিন্নতার ফলে এই সংগ্রাম-সম্পর্কিত যে-সমস্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শক্তিহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সেগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা বিজ্ঞজনোচিত ও প্রয়োজনীয় বলে জ্ঞান করেছে। তাছাড়া সাধারণ পরিষদের এই কর্তৃত্ববৃদ্ধিতে একমাত্র আমাদের শত্রুরা ছাড়া আর কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? কিন্তু পরিষদের কি কোনো আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আছে যারা পরিষদের ইচ্ছা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবে? আর সাধারণ পরিষদের এই কর্তৃত্ব কি বিশুদ্ধ নৈতিক কর্তৃত্বই নয় এবং পরিষদ কি তার সকল সিদ্ধান্তই পেশ করে থাকে না সেইসব ফেডারেশনের কাছে, যে-ফেডারেশনগুলির ওপর ওইসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব ন্যস্ত? এই পরিস্থিতিতে রাজারা যদি কখনও পড়েন, যদি তাঁদের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটতন্ত্রের সাহায্যবঞ্চিত হয়ে কখনও এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে নিছক নৈতিক প্রভাব ও কর্তৃত্বের বলে তাঁদের ক্ষমতা বজায় রাখতে হচ্ছে তাহলে কী হবে? তাহলে তাঁরা বিপ্লবের দুর্জয় অগ্রগতির সামনে পরিণত হবেন দুর্বল তালপাতার সেপাইয়ে।

পরিশেষে বলি, হেগ কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের দপ্তর স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছে নিউ ইয়র্কে। বহু লোক, এমনকি আমাদের কিছু-কিছু বন্ধুজনও, এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁরা কি ভুলে যাচ্ছেন যে আমেরিকা ক্রমশ প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের দেশ হয়ে উঠছে, ভুলে যাচ্ছেন যে প্রতি বছর ওই মহাদেশে বাস উঠিয়ে চলে যাচ্ছে পাঁচ লক্ষ করে মানুষ এবং তারা শ্রমজীবী মানুষ, ভুলে যাচ্ছেন কি যে শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্যের ওই ভূমিতে আমাদের আন্তর্জাতিককে শক্ত শিকড় নামাতেই হবে? এছাড়া কংগ্রেসের অপর একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ পরিষদকে অধিকার দেয়া হয়েছে আমাদের সাধারণ স্বার্থসাধনের পক্ষে

প্রয়োজনীয় ও যোগ্য বিবেচনা করলে কিছু-কিছু নতুন লোককে পরিষদের সদস্যদের ভোটে সদস্য নির্বাচন করে নিতে। আশা করা যাক যে পরিষদ যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এমন সমস্ত লোক বেছে নেবে যাঁরা তাঁদের কাজের যোগ্য হবেন এবং ইউরোপে আমাদের সমিতির পতাকা দৃঢ় হাতে বহন করে নিতে সমর্থ হবেন।

নাগরিক বন্ধুগণ, আন্তর্জাতিকের মূল নীতিটির কথা একবার চিন্তা করা যাক। সে নীতি হল সংহতি! এই জীবনদায়িনী নীতিকে দৃঢ় এক ভিত্তিভূমির ওপর, সকল দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই যে-মহান লক্ষ্য আমরা নিজেদের সামনে নির্দিষ্ট করেছি তা অর্জন করতে পারব। বিপ্লব সফল করার জন্যে প্রয়োজন সংহতির, আর এই সংহতির এক মহান উদাহরণ আমাদের জানা আছে—তা হল প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা। প্যারিস কমিউনের যে পতন ঘটেছে তার কারণ, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের এই পরম অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমতালে ওই সময়ে এক ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলন মাথা তোলে নি অন্যান্য দেশকেন্দ্রেও — বার্লিনে, মাদ্রিদে ও অন্যান্য জায়গায়।

আমার নিজের কথা বলতে পারি। সকল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতে এই ফলপ্রসূ সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাব, অবিচলভাবে কাজ করে যাব। আমি মোটেই আন্তর্জাতিক থেকে সরে যাচ্ছি না, যেমন অতীতে আমার সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে তেমনই আমার বাকি জীবনও নিয়োজিত হবে সামাজিক মতাদর্শগুলির বিজয় অর্জনে। আর আপনারা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন যে একদিন এই মতাদর্শগুলি প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-বিজয় সম্ভব করে তুলবে।

রচনাটি প্রকাশিত হয় *La Liberté* পত্রিকার ৩৭ নং সংখ্যায়, ১৮৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে এবং *Der Volksstaat* পত্রিকার ৭৯ নং সংখ্যায়, ১৮৭২ সালের ২ অক্টোবর তারিখে

Der Volksstaat পত্রিকার পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে *La Liberté*-র পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি ফরাসি ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

পত্রাবলী

হ্যানোভারস্থিত ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১১ জুলাই, ১৮৬৮

...*Centralblatt* (৬৯) প্রসঙ্গে বলতে হয়, মূল্য কথাটিতে যদি আদৌ কিছু বোঝা যায় তাহলে আমার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেই হবে, একথা স্বীকার করে লেখকটি কিন্তু সর্বাধিক সম্ভব নতিস্বীকারই করেছে। বেচারা দেখতে পায় নি যে, আমার বই-এ 'মূল্য' (৭০) সম্পর্কে কোনো অধ্যায় যদি নাও থাকত, তাহলেও প্রকৃত সম্পর্কগুলির যে বিশ্লেষণ আমি দিয়েছি তার ভিতরই সত্যকার মূল্য-সম্পর্কের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত। আলোচিত বিষয়টি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকেই আসছে মূল্যের ধারণাটিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নিয়ে এত সব কথার কচ্‌কচি। এমনকি প্রতিটি শিশুও জানে যে, কোনো জাতি যদি, এক বছরের জন্যে নয়, কয়েক সপ্তাহের জন্যেও কাজ করা বন্ধ রাখে, তাহলে সে জাতি অনাহারে মারা পড়ে। সকলেই একথাও জানে যে, বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার মতো এক-একটা উৎপন্নরাশির জন্যে লাগে সমাজের মোট শ্রমের বিভিন্ন এবং পরিমাণগতভাবে নির্ধারিত এক একটা রাশি। এ তো স্বতঃসিদ্ধ যে, নির্দিষ্ট অনুপাতে সামাজিক শ্রম **বণ্টনের** এই **প্রয়োজনকে** সামাজিক উৎপাদনের একটি **বিশেষ রূপের** দ্বারা দূর করা যায় না; বদল হতে পারে কেবল **তার প্রকাশের** রূপটা। কোনো প্রাকৃতিক নিয়মকে বাতিল করা যায় না। এই নিয়মগুলি যে রূপের মধ্যে কাজ করে, সেই **রূপটিই** শুধু ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে। অথচ যে সমাজে ব্যক্তিগত শ্রমোৎপন্নের **ব্যক্তিগত বিনিময়ের** মধ্যে দিয়ে সামাজিক শ্রমের অন্তঃসম্পর্ক অভিব্যক্ত হয়, সেই সামাজিক স্তরে শ্রমের আনুপাতিক বণ্টন কার্যকরী থাকে যে রূপের মধ্যে, সেটা হল ঠিক এই উৎপন্নগুলিরই **বিনিময়-মূল্য।**

মূল্যের নিয়ম **কীভাবে** কাজ করে তাই বোঝানোই হল বিজ্ঞানের কাজ। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে এই নিয়মের বিরোধী এমন সমস্ত ঘটনাকেই কেউ যদি একেবারে গোড়াতেই 'ব্যাখ্যা করতে' চায়, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের **আগে** বিজ্ঞানকে উপস্থিত করতে হবে। রিকার্ডো ঠিক এই ভুলই করেছিলেন -- মূল্য সম্পর্কিত (৭১) তাঁর প্রথম অধ্যায়ে তিনি আমাদের কাছে তখনও সিদ্ধ নয় এমন সমস্ত সম্ভাব্য বর্গগুলিকে **আগেই ধরে নিয়ে** মূল্যের নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

অপরদিকে ব্যাপারটি আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, **তত্ত্বের ইতিহাস** থেকে সুনিশ্চিতভাবেই দেখা যায় যে, মূল্য-সম্পর্কের ধারণা **বরাবরই একই রয়েছে** যদিও কমবেশী স্পষ্ট, কমবেশী মোহবিজড়িত অথবা কমবেশী বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ। যেহেতু চিন্তাপ্রক্রিয়া নিজেই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং নিজেই একটি **প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া**, সেইহেতু সত্যকারের সার্থক চিন্তা সর্বদাই একই থাকবে এবং পরিবর্তিত হবে শুধু ক্রমে ক্রমে বিকাশের পরিপক্কতা অনুসারে, চিন্তা করার দেহাঙ্গটির বিকাশ সমেত। বাকী সবকিছুই অর্থহীন প্রলাপ।

স্থূল অর্থনীতিবিদদের এ সম্পর্কে ক্ষীণতম ধারণাও নেই যে, বাস্তব প্রাত্যহিক বিনিময়-সম্পর্কগুলি সরাসরি মূল্যের পরিমাণের সঙ্গে **সোজাসুজি এক হতে পারে না।** বুর্জোয়া সমাজের আসল ব্যাপারই হচ্ছে ঠিক এই যে, সেখানে আগে থেকে (a priori) উৎপাদনের কোনো সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নেই। যা যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে আবশ্যিক তা শুধু অন্ধভাবে কার্যকর একটা গড় হিসেবেই নিজেকে জাহির করে। আর, স্থূল অর্থনীতিবিদ মনে করেন, তিনি মস্ত বড় আবিষ্কার করছেন, যখন অভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের বিপরীতে গর্বভরে দাবি করেন যে দৃশ্যত ব্যাপার অন্যরূপ। আসলে তাঁর গর্বটা এই যে, তিনি দৃশ্য রূপকে আঁকড়ে থাকেন এবং তাকেই তিনি চরম বলে মনে করেন। তাহলে আদৌ বিজ্ঞানের দরকার কী?

কিন্তু বিষয়টির আর একটি পটভূমিকাও আছে। একবার যদি অন্তঃসম্পর্কটি বুঝতে পারা যায়, তাহলে বিদ্যমান অবস্থার চিরস্থায়ী প্রয়োজন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধসে পড়ার আগেই, তার সমস্ত তত্ত্বগত বিশ্বাস ধসে পড়ে। তাই, এই চিন্তাহীন বিভ্রান্তিকে জীইয়ে রাখা হচ্ছে একান্তভাবেই শাসক-শ্রেণীর

স্বার্থ। অর্থনীতিবিজ্ঞানে একেবারেই চিন্তার কোনো স্থান নেই, এই কথা বলা ছাড়া আর যাদের হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক তুরুপের তাস নেই, সেই সব চাটুকার বাচালদের পয়সা দিয়ে পোষার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

কিন্তু আর না, satis superque (যথেষ্ট হয়েছে)। অন্তত এটুকু দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়াদের এই পুরোহিতরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন: শ্রমিকেরা, এমনকি শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরাও যখন আমার বই* পড়ে বুঝতে পারেন এবং অসুবিধা হয় না, তখন এই **'পণ্ডিত কেরানীরা'** (!) অভিযোগ করছেন যে, আমি তাঁদের বোধশক্তির কাছে অত্যধিক দাবি করছি।...

১৯০১-১৯০২ সালের *Die Neue Zeit* পত্রিকার Bd. 2, ৭ নং সংখ্যায় সংক্ষেপে প্রথম প্রকাশিত হয়; 'ল. কুগেলমান সমীপে মার্কসের চিঠিপত্র' বইয়ে পূর্ণাকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত

* ক. মার্কস, 'পুঁজি'। — সম্পাঃ

নিউ ইয়র্কস্থিত ফ. বল্‌তে সমীপে মার্কস

[লন্ডন,] ২৩ নভেম্বর, ১৮৭১

...সোশ্যালিস্ট বা আধা-সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীগুলির **স্থলে** সংগ্রামের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর একটি সত্যকার সংগঠন গড়াই ছিল **আন্তর্জাতিক** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আদি নিয়মাবলী ও উদ্বোধনী ভাষণের দিকে একবার তাকালেই একথা বোঝা যায়। ওদিকে আবার, ইতিহাসের গতিপথ যদি ইতিমধ্যেই সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদকে চূর্ণ করে না দিত, তাহলে আন্তর্জাতিক নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারত না। সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীবাদ আর সত্যকার শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ চলে সর্বদাই পরস্পরের বিপরীত অনুপাতে। যতদিন শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনের উপযোগী পরিপক্বতা লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের (ঐতিহাসিকভাবে) সার্থকতা থাকে। এই পরিপক্বতা এলেই, **সমস্ত** গোষ্ঠীই মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসে **সর্বত্র** যা ঘটেছে, আন্তর্জাতিকের ইতিহাসের বেলাতেও তার পুনরাবৃত্তি **ঘটল**। অচলিত হয়ে পড়েছে যা তা চায় নবার্জিত রূপের মধ্যে নিজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব।

শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকার আন্দোলন সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকেরই মধ্যে যেসব গোষ্ঠী ও অপেশাদার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারীর দল নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে **সাধারণ পরিষদের অবিরাম সংগ্রামের** ইতিহাসই হচ্ছে আন্তর্জাতিকের ইতিহাস। এই সংগ্রাম চলেছিল **কংগ্রেসগুলিতে**, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী সংগ্রাম চলেছিল বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সাধারণ পরিষদের পৃথক পৃথক বৈঠকের মাধ্যমে।

প্যারিসে প্রুধোঁপন্থীরা (মিউচুয়ালিস্ট) (৭২) সমিতির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিল বলে স্বভাবতই সেখানে প্রথম কয়েক বছর লাগামটা তাদের হাতেই ছিল।

পরে অবশ্য সেখানে তাদের বিপরীতে যৌথবাদী, পজিটিভিস্ট ইত্যাদি গোষ্ঠী গঠিত হয়।

জার্মানিতে ছিল লাসালপন্থীদের চক্র। কুখ্যাত শ্‌ভাইট্‌সারের সঙ্গে আমি নিজে দু'বছর পত্রালাপ চালিয়েছিলাম এবং তাঁর কাছে তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিলাম যে, লাসালীয় সংগঠন গোষ্ঠীগত সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়, এবং সেইজন্যেই আন্তর্জাতিক যে **প্রকৃত** শ্রমিক-আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তা এই সংগঠনের প্রতিকূল। আমার এই যুক্তি না বোঝার মতো বিশেষ 'কারণ' অবশ্য তাঁর ছিল।

আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে **নিজেকে নেতা বানিয়ে 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সঙ্ঘ'** নামে একটি **দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক** গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৮ সালের শেষভাগে রুশদেশবাসী বাকুনিন **আন্তর্জাতিকে** যোগ দেন। সর্বপ্রকারের তাত্ত্বিক জ্ঞান বিবর্জিত এই ব্যক্তিটি দাবি করেন যে, এই পৃথক সংস্থাটিই নাকি আন্তর্জাতিকের **বৈজ্ঞানিক** মতবাদ প্রচারের প্রতিনিধি এবং এইটেই হচ্ছে নাকি **আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে** এই দ্বিতীয় **আন্তর্জাতিকের** বৈশিষ্ট্য।

তাঁর কর্মসূচিটি হচ্ছে যথেচ্ছ যোগাড় করা ভাসা-ভাসা এক খিচুড়ি **শ্রেণীসমূহের সাম্য** (!), সামাজিক আন্দোলনের **সূচনাবিন্দু** হিসেবে **উত্তরাধিকার লাভের অধিকারের বিলোপসাধন** (স্যাঁ-সিমোঁ মার্কা গাঁজাখোরি), **আপ্তবাক্য** হিসেবে আন্তর্জাতিকের **সভ্যদের** অবশ্য-গ্রহণীয় **নিরীশ্বরবাদ** ইত্যাদি, এবং প্রধান আপ্তবাক্য হিসেবে **(প্রুধোঁপন্থীদের মতো) — রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকা।**

এই ছেলেভোলানো আষাঢ়ে গল্পটা সহানুভূতিমূলক সমর্থন পেয়েছিল (এবং এখনও কিছুটা সমর্থন পাচ্ছে) ইতালিতে এবং স্পেনে, যেখানে শ্রমিক-আন্দোলনের বাস্তব পূর্বশর্ত খুব অল্পই বিকশিত, এবং লাতিন সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়মের মুষ্টিমেয় দাম্ভিক, উচ্চাভিলাষী ও অন্তঃসারশূন্য মতবাগীশদের মধ্যে।

বাকুনিনের কাছে অবশ্য তাঁর মতবাদটা (প্রুধোঁ, স্যাঁ-সিমোঁ প্রমুখের কাছ থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা) আগেও এবং এখনও একটি গৌণ ব্যাপার, তাঁর ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা উপায় মাত্র। তাত্ত্বিক হিসেবে কিছু-না হলেও কুচক্রী হিসেবে কিন্তু তিনি ওস্তাদ।

সাধারণ পরিষদকে কয়েক বছর ধরে লড়াই চালাতে হয়েছে এই ষড়্‌যন্ত্রের বিরুদ্ধে (এই ষড়্‌যন্ত্রকে ফরাসি প্রুধোঁপন্থীরা, বিশেষ করে **ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে**, কিছুটা পর্যন্ত সমর্থন করেছিল)। অবশেষে, সম্মেলনের ১,২ এবং ৩, নবম, ষোড়শ ও সপ্তদশ প্রস্তাবের সাহায্যে পরিষদ তার দীর্ঘ-প্রস্তুত আঘাত হানল (৭৩)।

স্পষ্টতই সাধারণ পরিষদ ইউরোপে যার বিরুদ্ধে লড়েছে আমেরিকায় তাকে সমর্থন করবে না। ১, ২, ৩ এবং নবম প্রস্তাব এখন নিউ ইয়র্ক কমিটির হাতে এমন একটা বৈধ হাতিয়ার তুলে দিল যার সাহায্যে তা সমস্ত গোষ্ঠীবাদ ও অপেশাদার উপদলের অবসান ঘটাতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের বহিষ্কৃত করতে পারবে।...

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় এবং তার জন্যে স্বভাবতই প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর এমন একটি প্রাথমিক সংগঠন যা তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়ে কিছুটা পর্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে অবশ্য, যে আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী শাসক-শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে **শ্রেণী** হিসেবে এগিয়ে আসে এবং বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির দ্বারা তাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করে এমন প্রত্যেকটি আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন। যেমন, কোনো একটি বিশেষ কারখানায়, এমনকি কোনো একটি বিশেষ শিল্পে ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা পৃথক-পৃথক ভাবে পুঁজিপতিদের কাজের ঘণ্টা কমাতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু, দিনে আট ঘণ্টা কাজ ইত্যাদির **আইন** প্রণয়নে বাধ্য করার আন্দোলন **রাজনৈতিক** আন্দোলন। এইভাবে, শ্রমিকদের পৃথক-পৃথক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকে সর্বত্র গড়ে ওঠে **রাজনৈতিক** আন্দোলন, অর্থাৎ **শ্রেণীর** আন্দোলন — যার উদ্দেশ্য হল সাধারণরূপে অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে বাধ্যতামূলক আকারে সে শ্রেণীর স্বার্থসাধন। এই আন্দোলনগুলির জন্যে যদি আগে থেকেই কিছুটা পরিমাণ সংগঠন থাকার প্রয়োজন থাকে, তাহলে এই আন্দোলনগুলিও আবার একইভাবে এই সংগঠনকে বিকশিত করে তোলার উপায়ও বটে।

যৌথশক্তির, অর্থাৎ শাসক-শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো

চূড়ান্ত অভিযানে নামার মতো যথেষ্ট অগ্রসর সংগঠন যদি শ্রমিক শ্রেণীর না থাকে তাহলে শাসক-শ্রেণীগুলির শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে এবং এই শ্রেণীগুলির নীতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্তত সেজন্যে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নতুবা, শ্রমিক শ্রেণী তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ফ্রান্সের সেপ্টেম্বর বিপ্লবে (৭৪) এবং যেমনটি কিছুটা পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে ইংলণ্ডে শ্রীযুক্ত গ্ল্যাডস্টোন ও তাঁর দলবল আজও পর্যন্ত সফলভাবে যে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে।

'Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge und Andere'. Stuttgart, 1906 বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'রচনাবলি', ১৯৩৫ সাল, ২৬ খণ্ডে রুশ ভাষায় সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি ও বইয়ের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

মিলানস্থিত ত. কুনো সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭২

...১৮৬৮ সাল পর্যন্ত বাকুনিন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করে এসেছেন এবং বার্ন শান্তি কংগ্রেসে (৭৫) ফেঁসে যাবার পর আন্তর্জাতিকে যোগদান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার **তার অভ্যন্তরে** সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র পাকাতে আরম্ভ করেন। প্রুধোঁবাদ ও কমিউনিজমের খিচুড়ি পাকিয়ে বাকুনিনের নিজস্ব এক অদ্ভুত তত্ত্ব আছে, যার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, তিনি মনে করেন যে-প্রধান অভিশাপটাকে উচ্ছেদ করতে হবে তা পুঁজি নয়, অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের ফলে উদ্ভূত পুঁজিপতিদের ও মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ নয়, তা হচ্ছে গিয়ে **রাষ্ট্র**। ব্যাপক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকরা যেক্ষেত্রে আমাদের মতো এই মতই পোষণ করে যে নিজেদের সামাজিক বিশেষ সুবিধাগুলি রক্ষার উদ্দেশ্যে শাসক-শ্রেণীসমূহের, জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের হাতের সংগঠন ছাড়া রাষ্ট্রশক্তি আর কিছুই নয়, সেক্ষেত্রে বাকুনিনের মত হচ্ছে এই যে **রাষ্ট্রই** পুঁজি সৃষ্টি করেছে এবং পুঁজিপতিরা পুঁজি পেয়েছে **শুধু রাষ্ট্রেরই কৃপায়**। অতএব রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ, তাই সর্বোপরি রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ করতে হবে, তাহলে পুঁজি আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ওদিকে আমরা বলি: পুঁজিকে খতম করো, মুষ্টিমেয়ের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণের কেন্দ্রীকরণের অবসান ঘটাও, তাহলে রাষ্ট্রের পতন হবে আপনা থেকেই। পার্থক্যটি মৌলিক: আগে একটা সামাজিক ওলটপালট ছাড়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অর্থহীন প্রলাপ; পুঁজির উচ্ছেদই **হচ্ছে** সামাজিক ওলটপালট এবং এর ফলে সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতিরই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বাকুনিনের কাছে যেহেতু রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ

তাই রাষ্ট্রের, সে প্রজাতন্ত্রই হোক, রাজতন্ত্রই হোক বা অন্য যাকিছু হোক, — যে-কোনো ধরনের রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখে যা এমন কিছুই করা চলবে না। অতএব, **সমস্ত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিরতি।** কোনো রাজনৈতিক কাজ করা, বিশেষত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কর্তব্য হল প্রচার চালানো, রাষ্ট্রকে এলোপাতাড়ি গালাগালি দিয়ে যাওয়া, শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং যখন **সমস্ত** শ্রমিক সপক্ষে এসে গেছে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠকে দলে টানা হয়ে গেছে, তখন ভেঙে দাও সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানকে, উচ্ছেদ করো রাষ্ট্রকে এবং তার জায়গায় বসাও আন্তর্জাতিকের সংগঠনকে। স্বর্ণযুগের সূচনাকারী এই মহাকীর্তিটিকে বলা হয়েছে **সামাজিক বিলোপ।**

এই সবকিছুই অত্যন্ত র‍্যাডিকাল শোনায় এবং সবকিছু এতই সহজ যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুখস্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই বাকুনিনের তত্ত্ব এত দ্রুত ইতালি ও স্পেনের তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও অন্যান্য মতবাগীশদের মধ্যে সাড়া পেয়েছে। কিন্তু শ্রমিকেরা কখনও নিজেদের এ কথায় ভোলাতে দেবে না যে, তাদের দেশের সামাজিক ব্যাপারটা তাদেরও ব্যাপার নয়। শ্রমিকেরা প্রকৃতিগতভাবেই **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়** এবং যে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবে যে, রাজনীতি তাদের পরিত্যাগ করা উচিত, তাকেই তারা শেষে পরিত্যাগ করবে। শ্রমিকদের সর্ব অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে বিরত থাকা উচিত, শ্রমিকদের কাছে এই কথা প্রচার করার অর্থ পুরোহিত-পান্ডাদের বা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের কবলে তাদের ঠেলে দেওয়া।

বাকুনিনের মত অনুসারে যেহেতু রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্যে আন্তর্জাতিক গঠিত হয় নি, তা গঠিত হয়েছে যাতে সামাজিক বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তা পুরাতন রাষ্ট্র-সংগঠনের স্থান নিতে পারে, তাই তাকে ভবিষ্যৎ সমাজের বাকুনিনবাদী আদর্শের যথাসম্ভব কাছাকাছি আসতে হবে। এই সমাজে সর্বোপরি কোনো **কর্তৃত্ব** থাকবে না, কারণ কর্তৃত্ব — রাষ্ট্র — পরম অভিশাপ। (একটি নির্ধারক ইচ্ছা ছাড়া, একটি একক ব্যবস্থাপনা ছাড়া একটা কারখানা কি ট্রেন কিম্বা একটি জাহাজ কীভাবে চালানো যাবে তা অবশ্য এঁরা জানান নি।) সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বও আর থাকবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোষ্ঠী হবে স্বায়ত্তশাসিত, কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের স্বায়ত্তশাসনাধিকার কিছুটা ছেড়ে না দেয়, তাহলে সমাজ, এমনকি মাত্র দু'জন মানুষেরও সমাজ কী করে সম্ভব, সে সম্পর্কেও বাকুনিন পুনরপি নীরব।

অতএব, এই আন্তর্জাতিককেও এই আদর্শ অনুসারে গঠিত করে নিতে হবে। তার প্রত্যেক শাখা এবং প্রত্যেক শাখায় প্রত্যেক ব্যক্তি হবে স্বায়ত্তশাসিত। দূর হোক **বাসেল-প্রস্তাবাবলী** (৭৬), সাধারণ পরিষদকে তা এমন এক অনিষ্টকর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছে, যেটা তার নিজের পক্ষেই হীনতাসূচক! যদি এই কর্তৃত্ব **স্বেচ্ছামূলকভাবেও** অর্পিত হয়ে থাকে, তথাপি এর অবসান ঘটাতেই হবে এই **কারণে** যে, সেটা কর্তৃত্ব!

সংক্ষেপে এই হল বুজরুকিটার আসল কথা। কিন্তু, বাসেল-প্রস্তাবাবলীর উদ্ভাবক কারা? **স্বয়ং শ্রী বাকুনিন** এবং তাঁর দলবল!

বাসেল-কংগ্রেসে যখন এই ভদ্রলোকেরা দেখতে পেলেন যে, সাধারণ পরিষদকে জেনেভায় সরিয়ে নিয়ে যাবার অর্থাৎ পরিষদকে নিজেদের হাতে আনবার পরিকল্পনাটিকে কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করাতে তাঁরা পারবেন না, তখন তাঁরা এক ভিন্ন পথ ধরলেন। মহান আন্তর্জাতিকের **অভ্যন্তরেই** তাঁরা 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সংঘ' নামে এক আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করলেন যে অজুহাতে, সেটা বাকুনিনপন্থী ইতালীয় পত্রপত্রিকায়, যেমন *Proletario* ও *Gazzettino Rosa* (৭৭) পত্রিকায় আজকাল ফের দেখা যাচ্ছে: বলা হচ্ছে শীতল ও মন্থরগতি উত্তরের অধিবাসীদের চেয়ে নাকি মাথাগরম লাতিন জাতিদের জন্যে আরও উজ্জ্বল কর্মসূচির প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদের বাধার ফলে এই খাসা পরিকল্পনাটি নস্যাৎ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিকের **ভিতরে** একটি স্বতন্ত্র **আন্তর্জাতিক** সংগঠনের অস্তিত্ব সাধারণ পরিষদ অবশ্যই বরদাস্ত করতে পারে না। তারপর থেকে বাকুনিন ও তাঁর অনুগামীদের আন্তর্জাতিকের কর্মসূচির পরিবর্তে বাকুনিনের নিজস্ব কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠা করার গোপন চেষ্টার জন্যে নানাভাবে ও নানারূপে এই পরিকল্পনা পুনরাবির্ভূত হয়েছে। ওদিকে আবার আন্তর্জাতিককে আক্রমণ করার প্রয়োজন হলে জুল ফাভ্র ও বিসমার্ক থেকে শুরু করে মাত্সিনি পর্যন্ত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলই বরাবর

বাকুনিনপন্থীদের ঠিক এই শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধেই কামান দাগ করেছেন। তাই মাত্‌সিনি ও বাকুনিনের বিরুদ্ধে ৫ ডিসেম্বরের আমার বিবৃতিটির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিবৃতিটি *Gazzettino Rosa*-ও প্রকাশ করেছিল।

বাকুনিন-দঙ্গলের কেন্দ্র হচ্ছে কয়েক ডজন জুরাবাসী* যাদের মোট অনুগামীর সংখ্যা বড় জোর দু'শো শ্রমিক হতে পারে। ইতালির তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের নিয়েই এদের অগ্রগামী অংশ গঠিত। এরা সর্বত্রই নিজেদের ইতালীয় শ্রমিকদের মুখপাত্র বলে চালায়। এদের কিছু আছে বার্সিলোনায় ও মাদ্রিদে এবং লিয়ঁ ও ব্রাসেল্‌সে এদের দু-একজনের সাক্ষাৎ মিলবে, কিন্তু তারা প্রায় কেউ শ্রমিক নয়। আমাদের এখানেও এদের একটিমাত্র নমুনা আছে, সে হল রবিন।

কংগ্রেস ডাকা অসম্ভব হয়ে পড়াতে তার পরিবর্তে পরিস্থিতির চাপে সম্মেলন** আহ্বান করতে হয়েছিল বলে এদের একটা অছিলা জুটে যায়। সুইজারল্যান্ডের ফরাসি দেশান্তরীদের অধিকাংশই এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কেননা তাদের মধ্যে এরা (প্রুধোঁপন্থীরা) আত্মীয়ের সন্ধান পায় এবং এর ব্যক্তিগত কারণও ছিল। তাই তারা আক্রমণ শুরু করেছিল। অবশ্য আন্তর্জাতিকের মধ্যে সর্বত্রই অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুদের ও অস্বীকৃত প্রতিভাধরদের সাক্ষাৎ মেলে। তাই পূর্বোক্তেরা ভরসা রেখেছিল এদেরই ওপর এবং সেটা অকারণে নয়। বর্তমানে তাদের সংগ্রামী শক্তি হচ্ছে এরূপ:

১। বাকুনিন নিজে -- এই অভিযানের নেপোলিয়ন।

২। ২০০ জন জুরাবাসী এবং ফরাসি শাখার (জেনেভায় দেশান্তরী) ৪০-৫০ জন।

৩। ব্রাসেল্‌সে *Liberté* -র (৭৮) সম্পাদক হিন্স. ইনি অবশ্য **প্রকাশ্যে** ওদের সমর্থন করেন না।

---

* সুইজারল্যান্ডের জুরা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা। — সম্পাঃ

** ১৮৭১ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের লন্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

৪। এখানকার ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার (৭৯) অবশিষ্ট অংশ, এঁদের আমরা কখনও স্বীকার করে নিই নি এবং এরা ইতিমধ্যেই পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারপর আছে হের ফন শ্‌ভাইট্‌সারের ধরনের প্রায় ২০ জন লাসালপন্থী, যাদের সকলকেই জার্মান শাখা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে (**আন্তর্জাতিক থেকে** একযোগে **বেরিয়ে আসার** প্রস্তাব করেছিল বলে) এবং যারা চরম কেন্দ্রীকরণ ও কঠোর সংগঠনের প্রবক্তা হিসেবে নৈরাজ্যবাদী ও স্বায়ত্তশাসনবাদীদের লীগের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়।

৫। স্পেনে বাকুনিনের কিছু ব্যক্তিগত বন্ধু ও অনুগামী — শ্রমিকদের উপর, বিশেষত বার্সিলোনার শ্রমিকদের উপর যাদের প্রবল প্রভাব আছে অন্তত তত্ত্বগতভাবে। স্পেনীয়রা অবশ্য সংগঠন সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অন্যদের ভিতর সংগঠনের অভাবটা চট করে তাদের চোখে পড়ে। এখানে বাকুনিন কতখানি সাফল্যের আশা করতে পারেন তা এপ্রিল মাসের স্প্যানিশ কংগ্রেস না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না এবং যেহেতু শ্রমিকরাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করবে, সেইহেতু আমি কোনো দুশ্চিন্তার কারণ দেখি না।

৬। সর্বশেষে, যতদূর জানি ইতালিতে তুরিন, বলোনা ও জিরজেন্তি শাখা **নির্দিষ্ট সময়ের আগেই** কংগ্রেস আহ্বান করার পক্ষে অভিমত ঘোষণা করেছে। বাকুনিনপন্থী পত্রপত্রিকায় দাবি করা হয়েছে যে, ২০টি ইতালীয় শাখা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আমি তাদের জানি না। অন্তত প্রায় সর্বত্রই নেতৃত্ব বাকুনিনের বন্ধুদের ও অনুগামীদের হাতে এবং তারা খুব হৈচৈ শুরু করেছে। কিন্তু একটু ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে খুব সম্ভব দেখা যাবে, এদের অনুগামীদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ইতালীয় শ্রমিকদের অধিকাংশ এখনও মাত্‌সিনির পক্ষপাতী এবং যতদিন রাজনীতি থেকে বিরত থাকার সঙ্গে সেখানে আন্তর্জাতিককে এক করে দেখা হবে ততদিন তাই থাকবে।

যেভাবেই হোক, ইতালিতে আপাতত বাকুনিনপন্থীরাই আন্তর্জাতিকের কর্তা। এ নিয়ে অভিযোগ করার বাসনা সাধারণ পরিষদের নেই; নিজেদের খেয়াল অনুসারে যতখুশি আজগবি কাণ্ড করার অধিকার ইতালীয়দের

আছে, সাধারণ পরিষদ তার প্রতিবন্ধকতা করবে শুধু শান্তিপূর্ণ বিতর্ক মারফত। জুরাবাসীরা যে অর্থে কংগ্রেসের কথা বলছে, সেই অর্থে কংগ্রেস দাবি করার অধিকার এদের আছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিকের যেসব শাখা সবেমাত্র সংগঠনে যোগ দিয়েছে এবং কোনো বিষয়ে কোনো খবর পায় নি, তারাও এই ধরনের একটি ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই, বিশেষ করে বিবদমান দুই পক্ষের বক্তব্য না শুনেই, পক্ষ অবলম্বন করে বসছে, এটা অন্তত খুবই তাজ্জব ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার সাদামাঠা অভিমত আমি তুরিনের লোকেদের জানিয়ে দিয়েছি এবং আর যেসব শাখা অনুরূপ মত প্রকাশ করেছে তাদেরও জানাব। কারণ, সার্কুলারে (৮০) সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিপ্রসূত অভিযোগ করা হয়েছে, এই ধরনের প্রতিটি ঘোষণা পরোক্ষে তারই অনুমোদন। প্রসঙ্গত, সাধারণ পরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে শীঘ্রই তাদের নিজস্ব সার্কুলার প্রচার করবে। এই সার্কুলার প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত মিলানের লোকদের যদি আপনি অনুরূপ ঘোষণা থেকে নিরস্ত করতে পারেন, তাহলে আমাদের বাঞ্ছাই পূর্ণ হয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে-তুরিনের লোকেরা জুরাবাসীদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছে, কাজেকাজেই আমাদেরও স্বৈরতান্ত্রিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, ঠিক তারাই আবার হঠাৎ সাধারণ পরিষদের কাছে দাবি করেছে যে, তুরিনে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক ফেডারেশানের (৮১) বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদকে এমন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যা আগে কখনও করা হয় নি, *Ficcanaso*-র (৮২) বেগহেলিকে বহিষ্কৃত করে দিতে হবে, যদিও তিনি আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নন, ইত্যাদি। আবার এ সবকিছুই করতে হবে শ্রমিক ফেডারেশানের এ বিষয়ে কী বক্তব্য আছে তা শোনার আগেই।

গত সোমবার (২২ জানুয়ারি) আপনাকে পাঠিয়েছি জুরাবাসীদের সার্কুলার সহ *Révolution Sociale* (৮৩), জেনেভার *Égalité*-র (৮৪) একটি সংখ্যা (দুর্ভাগ্যক্রমে জেনেভার ফেডেরাল কমিটির (৮৫) জবাব আছে যে সংখ্যায় তার আর একটি কপিও আমার কাছে নেই; এই সংস্থাটি জুরাবাসীদের চেয়ে বিশগুণ বেশী শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং এক কপি *Volksstaat* (৮৬), যা থেকে আপনি জানতে পারবেন, জার্মানির লোকেরা

ব্যাপারটি সম্পর্কে কী ভাবছে। স্যাক্সন আঞ্চলিক কংগ্রেস — ৬০টি এলাকা থেকে সম্মিলিত ১২০ জন প্রতিনিধি — **সর্বসম্মতিক্রমে** সাধারণ পরিষদের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন (৪৭)।

বেলজিয়ান কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ২৫-২৬) নিয়মাবলীর পুনর্বিচার দাবি করেছে, কিন্তু **নিয়মিত** কংগ্রেসেই (সেপ্টেম্বরে) (৪৮)। ফ্রান্স থেকে আমরা প্রতিদিন অনুমোদনসূচক বিবৃতি পাচ্ছি। এখানে, ইংলণ্ডে অবশ্য এইসব ঘোঁটের জন্যে কোনো সমর্থন নেই। সাধারণ পরিষদ নিশ্চয়ই কয়েকজন আত্মম্ভরী ঘোঁটপাকিয়েকে খুশি করার জন্যে অতিরিক্ত কংগ্রেস আহ্বান করবে না। যতদিন এই ভদ্রলোকেরা নিয়মের চৌহদ্দির মধ্যে থাকবেন, ততদিন সাধারণ পরিষদ সানন্দে তাঁদের খুশিমতো কাজ করতে দেবে — তবে অতি বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি লোকের এই জোট শীঘ্রই ভেঙে যাবে। কিন্তু নিয়মাবলী অথবা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে তাঁরা কিছু করতে শুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পরিষদ তার কর্তব্য করবে।

যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে, লোকগুলি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়টিতে যখন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ হৈচৈ শুরু হয়েছে, তাহলে একথা আপনার মনে না হয়ে পারে না যে, এ খেলায় নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পুলিশের হাত আছে। এবং ঠিক তাই। বেজিয়ার্সে জেনেভার বাকুনিনপন্থীরা প্রধান পুলিশ কমিশনারকে তাদের সংবাদদাতা* নিযুক্ত করেছে। দুজন নামকরা বাকুনিনপন্থী, লিয়ঁ-র আলবের্ত রিশার ও লেবলাঁ এখানে এসেছিলেন। সল নামে লিয়ঁ-র একজন শ্রমিকের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। তাঁকে তাঁরা বলেন, তিয়েরকে উচ্ছেদ করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে আবার বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসানো এবং **বোনাপার্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে** দেশান্তরীদের মধ্যে **প্রচার** চালানোর জন্যেই তাঁরা **বোনাপার্টের টাকায়** সফরে বেরিয়েছেন! এই ভদ্রলোকেরা যাকে বলেন রাজনীতি থেকে বিরত থাকা, এই হল তার নমুনা! বার্লিনে বিসমার্কের অর্থপুষ্ট *Neuer Social-Demokrat* (৪৯) ঠিক এই সুরেই পোঁ ধরেছে। এ ব্যাপারে রুশ পুলিশ কতটা জড়িত

---

* ব্যাঙ্কে। — সম্পাঃ

সে প্রশ্নের কোনো জবাব আমি আপাতত দিচ্ছি না, কিন্তু নেচায়েভের ব্যাপারে (৯০) বাকুনিন ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিলেন (তিনি অবশ্য একথা অস্বীকার করেন, কিন্তু এখানে আমাদের হাতে মূল রুশ দলিলপত্র আছে এবং যেহেতু মার্কস ও আমি রুশ ভাষা বুঝি, সেইহেতু তিনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না)। নেচায়েভ হয় একজন রুশ গুপ্তচর, না হয় সে কাজ করেছে সেই ধরনের। তাছাড়া বাকুনিনের রুশ বন্ধুদের মধ্যে নানারকমের সন্দেহজনক সব লোক রয়েছে।

আপনার চাকুরিটি গেছে শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। আমি তো আপনাকে স্পষ্টই লিখেছিলাম এমন কিছু না করতে যাতে এই ঘটনা ঘটতে পারে। প্রকাশ্য কাজের দ্বারা যে সামান্য ফল অর্জিত হবে তার তুলনায় মিলানে আপনার উপস্থিতি আন্তর্জাতিকের পক্ষে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, গুপ্তভাবেও অনেক কিছু করা যেতে পারে ইত্যাদি। অনুবাদ ইত্যাদির কাজ পাওয়ার ব্যাপারে যদি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি, তাহলে সানন্দে তা করব। কোন কোন ভাষা **থেকে** কোন **ভাষায়** আপনি তর্জমা করতে পারেন এবং **কীভাবে** আপনাকে সাহায্য করতে পারি জানাবেন।

পুলিশ হারামজাদারা দেখছি আমার ফোটোটিকেও আটকে দিয়েছে। আমি আপনার জন্যে এইসঙ্গে আর একখানি ফোটো পাঠাচ্ছি। আপনি আমাকে আপনার দুখানা ফোটো পাঠাবেন। ওর একখানা দিয়ে মার্কস-কন্যার কাছ থেকে তাঁর বাবার একখানা ফোটো আপনার জন্যে আদায় করা যাবে (দু-একখানা ভালো ফোটো এখনও একমাত্র তাঁরই কাছেই আছে)।

আর একবার বলি, বাকুনিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **সমস্ত** লোক সম্পর্কেই একটু সতর্ক থাকবেন। জোট পাকিয়ে থাকা ও চক্রান্ত করা সমস্ত গোষ্ঠীরই স্বভাব। এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, **আপনার যে-কোনো খবর সঙ্গে সঙ্গে** বাকুনিনের কাছে চলে যাবে। তাঁর একটি মূল নীতিই হচ্ছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইত্যাদি ধরনের কাজকে বুর্জোয়া কুসংস্কার বলে গণ্য করা, লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে যা অবশ্যই অশ্রদ্ধেয়। রাশিয়ায় একথা তিনি খোলাখুলিই বলে থাকেন; পশ্চিম ইউরোপে অবশ্য এটা গোপন তত্ত্ব।

খুব তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব দেবেন। অন্য ইতালীয় শাখাগুলির সঙ্গে সুর মেলাতে যদি মিলান শাখাকে আমরা নিরস্ত করতে পারি, তাহলে সত্যিই তা একটা ভালো কাজ করা হবে।...

F. Engels. 'Politisches Vermächtnis. Aus unveröffentlichten Briefen'. Berlin, 1920 বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯২৫ সালে বার্লিনে *Die Gesellschaft* পত্রিকার ১১ নং সংখ্যায় সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত

হ্বেরটুস্বর্গস্থিত আ. বেবেল সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২০ জুন, ১৮৭৩

আমি প্রথমে আপনার চিঠির উত্তর দিচ্ছি, কারণ লিবক্লেখ্টের চিঠি এখনও মার্কসের কাছে রয়েছে, আর তিনি ঠিক এই মুহূর্তে তার খোঁজ পাচ্ছেন না।

হেপ্নার নয়, কমিটির স্বাক্ষরিত যে-চিঠি ইয়র্ক হেপ্নারকে লিখেছিলেন সেই চিঠিতেই আমাদের ভয় হয়েছিল যে, পার্টি কর্তৃপক্ষ যারা দুর্ভাগ্যক্রমে পুরোপুরিই লাসালপন্থী — তারা *Volksstaat*-কে একখানি 'সৎ' *Neuer Social-Demokrat*-এ পরিণত করার জন্যে আপনার কারাবাসের সুযোগ গ্রহণ করবেন। ইয়র্ক স্পষ্টতই এ ধরনের অভিপ্রায়ের কথা স্বীকার করেছিলেন এবং কমিটি সম্পাদকদের নিয়োগ ও অপসারিত করার অধিকার লাভ করেছিল বলেই বিপদটা নিশ্চিতই বেশ গুরুতর মনে হয়েছিল। হেপ্নারের আসন্ন বহিষ্কার এই পরিকল্পনাগুলিকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। এই অবস্থায় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকা আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই এই পত্রালাপ...

লাসালবাদের প্রতি পার্টির মনোভাবের কথায় বলি, কী কৌশল অবলম্বন করতে হবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, তা অবশ্য আমাদের চেয়ে আপনিই ভালো বুঝবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও বিবেচনা করতে হবে। আপনার মতো যখন কেউ কিছুটা পরিমাণে নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘের (৯১) প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সহজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং সর্বদা প্রথমে তারই কথা ভাবতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি -- উভয়কে একত্রে ধরলে তারা এখনও জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর একটি অত্যন্ত

ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ। সুদীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত আমাদের মত হল এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের এখান-ওখান থেকে কিছু ব্যক্তি ও সদস্যদলকে ফুসলিয়ে আনাটাই প্রচারকার্যের সঠিক কৌশল নয়, সঠিক কৌশল হচ্ছে, যে-বিরাট জনসংখ্যা এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছে তাদের মধ্যে কাজ করা। কাঁচা অবস্থা থেকে টেনে আনা হয়েছে এমন একটিমাত্র লোকের তাজা শক্তির মূল্য দশটি লাসালপন্থী দলত্যাগীর চেয়েও বেশী, কারণ তারা সর্বদাই পার্টির মধ্যে তাদের ভ্রান্ত প্রবণতার বীজ বহন করে আনে। আর যদি **স্থানীয় নেতাদের** বাদ দিয়ে শুধু জনসাধারণকে টানতে পারা যায়, তাহলেও চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, টানতে গেলে সব সময় এই ধরনের নেতাদের পুরো দলটিকে জড়িয়েই টানতে হয়। এরা নিজেদের আগেকার মতামতের দ্বারা না হলেও আগেকার প্রকাশ্য বিবৃতিগুলির দায়ে আবদ্ধ থাকে এবং তখন তাদের সর্বোপরি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয় যে, তারা তাদের নীতি ছাড়ে নি, বরং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিই **প্রকৃত** লাসালবাদ প্রচার করছে। আইজেনাখে (৯২) তখন এই দুর্ঘটনাই ঘটেছিল — অবশ্য তখন হয়তো তা এড়ানো যেত না, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এরা পার্টির ক্ষতি করেছে এবং এদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া পার্টি অন্তত আজকের মতো এতটা শক্তিশালী হোত না এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। যাই হোক, এসব লোকের যদি সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তাহলে তাকে আমি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলেই মনে করব।

'ঐক্যের' চীৎকারে নিজেকে ভোলালে চলবে না। যাদের মুখে এই কথাটি সবচেয়ে বেশী লেগে আছে প্রধানত তারাই বিভেদের বীজ বপন করে। ঠিক যেমন এখন সুইজারল্যান্ডে জুরার বাকুনিনপন্থীরা করছে। সব রকমের বিভেদ তারাই উস্কিয়ে তুলেছে, অথচ ঐক্যের জন্যে চীৎকার করছে তারাই সবচেয়ে বেশী। এই ঐক্যপাগলদের হয় বুদ্ধি কম, যারা সবকিছু মিশিয়ে ঘুটে-ঘুটে এমন এক অদ্ভুত খিচুড়ি বানাতে চাইছে যা ঠাণ্ডা হতে দেওয়া মাত্রই পার্থক্যগুলো আবার ভেসে উঠবে এবং একপাত্রে রয়েছে বলে সেগুলি ভেসে উঠবে আগের চেয়ে স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে (জার্মানিতে এর চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলবে সেই সব লোকের মধ্যে যারা শ্রমিকদের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়ার মিলনের কথা প্রচার করছে) — না হয়, তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে (যেমন,

মুলেবের্গার) অথবা সচেতনভাবেই আন্দোলনকে কলুষিত করতে চাইছে। সেইজন্যেই, যারা সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ গোষ্ঠীপন্থী এবং যারা সবচেয়ে ঝগড়াটে ও বদমায়েশ তারাই এককে সময় ঐক্যের জন্যে সবচেয়ে বেশী চীৎকার করে। ঐক্য-চীৎকারকদের জন্যে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ও সবচেয়ে বেশী বেইমানি সইতে হয়েছে।

স্বভাবত প্রত্যেক পার্টি-নেতৃত্বই সাফল্য চায়, এবং এটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু কখনও-কখনও এমন পরিস্থিতিও আসে যখন আরও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর জন্যে **আশু** সাফল্যকে বিসর্জন দেবার সাহস থাকা চাই। বিশেষত, আমাদের পার্টির মতো পার্টির পক্ষে, শেষ পর্যন্ত যার সাফল্য একান্তভাবেই সুনিশ্চিত এবং যে পার্টি আমাদের জীবদ্দশাতেই এবং আমাদের চোখের উপরই এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে সেই পার্টির পক্ষে আশু সাফল্য কোনোক্রমেই সব সময়ে এবং একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আন্তর্জাতিকের কথাই ধরা যাক। কমিউনের ঘটনার পর আন্তর্জাতিক বিরাট সাফল্য অর্জন করে। বুর্জোয়ারা সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে একে সর্বশক্তিমান বলে মনে করতে থাকে। এর বিপুল-সংখ্যক সদস্যের বিশ্বাস ছিল অনন্তকাল বুঝি এইভাবেই চলবে। আমরা কিন্তু ভালোভাবেই জানতাম, এ বুদ্‌বুদ ফেটে **যাবেই**। যত আজেবাজে লোক এসে তখন এতে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিকের মধ্যের সংকীর্ণ গোষ্ঠীপন্থীরা বেশ ফেঁপে উঠতে থাকে এবং নিজেদের হীনতম ও নির্বোধতম কাজকর্মের অনুমোদনলাভের আশা নিয়ে আন্তর্জাতিকের অপব্যবহার করতে থাকে। আমরা তা করতে দিই নি। এ বুদ্‌বুদ একদিন ফেটে যাবেই তা ভালো করে জানতাম বলে বিপর্যয়কে বিলম্বিত করার দিকে আমাদের মনোযোগ ছিল না, আমরা সতর্ক ছিলাম যাতে আন্তর্জাতিক এই বিপর্যয় থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। হেগে এই বুদ্‌বুদ ফেটে যায় এবং আপনি তো জানেন, কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধিই হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরে যান। কিন্তু এই যে-হতাশ ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন আন্তর্জাতিকের মধ্যে তাঁরা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও পুনর্মিলনের আদর্শ দেখতে পাবেন, তাঁদের প্রায় সকলেই নিজ-নিজ দেশে যে কোন্দল করছিলেন সেটা হেগের চেয়ে তীব্রতর! এখন এই গোষ্ঠীবাদী কোন্দলকারীরা পুনর্মিলনের কথা প্রচার করছেন এবং বদমেজাজী ও ডিক্টেটর

বলে আমাদের গালাগালি দিচ্ছেন। আর হেগে যদি আমরা আপসের পথ ধরতাম, যদি আমরা সেখানে ভাঙনের প্রকাশকে চাপা দিয়ে দিতাম তাহলে ফল দাঁড়াত কী? গোষ্ঠীপন্থীরা, অর্থাৎ বাকুনিনপন্থীরা, আর একটি পুরো বছর হাতে পেত আন্তর্জাতিকের নামে আরও অনেক বেশী নির্বোধ ও কলঙ্কজনক কাজ করার; সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকেরা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সরে যেত; বুদ্বুদ ফাটত না, খোঁচায়-খোঁচায় ক্রমশ চুপসে যেত, এবং পরবর্তী কংগ্রেসে যখন অনিবার্যভাবেই সংকট দেখা দিত, তখন সে কংগ্রেস হীনতম ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হোত, কেননা ইতিপূর্বে হেগেই **নীতির** বিসর্জন হয়ে গিয়েছিল! তখন আন্তর্জাতিক সত্যিই ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে যেত — টুকরোটুকরো হয়ে যেত 'ঐক্যেরই' মাধ্যমে! তার পরিবর্তে যা কিছু পচা ছিল তা থেকে আমরা আজ নিজেদের সসম্মানে মুক্ত করতে পেরেছি কমিউনের যেসব সদস্য শেষ ও চূড়ান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেছেন, কমিউনের কোনো বৈঠকই তাঁদের মনে এতখানি প্রবল দাগ কাটতে পারে নি যতখানি দাগ কেটেছিল বিচারকমণ্ডলীর এই বৈঠক, যেখান থেকে ইউরোপের প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয়; দশমাস পর্যন্ত তাঁদের আমরা মিথ্যা, কুৎসা ও চক্রান্তে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করতে দিয়েছিলাম, আর আজ তাঁরা কোথায়? আন্তর্জাতিকের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি বলে কথিত এই ব্যক্তিরা আজ নিজেরাই ঘোষণা করছেন যে, পরবর্তী কংগ্রেসে আসার সাহস তাঁদের নেই। (এই পত্রের সঙ্গে *Volksstaat*-এর* জন্যে যে প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি তাতে ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে আছে।) যদি আমাদের আবার এ-কাজে নামতে হোত, তাহলে সমগ্রভাবে ধরলে আমাদের পদ্ধতি অন্যরকম হোত না — কৌশলগত ভুল অবশ্য সব সময়েই সম্ভব।

সে যাই হোক, আমার মনে হয়, লাসালপন্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যথাসময়ে আপনাদের কাছে এসে পড়বে, অতএব ফল পাকার আগে ফল পাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, যেটি ঐক্যওয়ালারা চাইছে।

তাছাড়া, প্রবীণ হেগেল তো ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছেন, পার্টির মধ্যে

---

* ফ. এঙ্গেলস, 'আন্তর্জাতিকের মধ্যে'। — সম্পাঃ

ভাঙন (৯৩) ধরা এবং এই ভাঙন সহ্য করতে পারার দ্বারাই একটি পার্টি নিজেকে বিজয়ী পার্টি বলে প্রমাণ করে। প্রলেতারীয় আন্দোলন অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যায় এবং প্রতি স্তরেই কিছু লোক আটকে যায় এবং আর অগ্রগতিতে যোগ দেয় না। একমাত্র এই থেকেই বোঝা যায় কেন 'প্রলেতারিয়েতের সংহতি'ই আসলে সর্বত্র রূপ পরিগ্রহ করছে বিভিন্ন পার্টি-গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা রোমক সাম্রাজ্যের ভীষণতম নিপীড়ন-কালের খ্রীস্টান গোষ্ঠীগুলির মতোই পরস্পরের সঙ্গে জীবনমরণ সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে।

একথাও ভুলবেন না যে, *Volksstaat* -এর চেয়ে *Neuer Social-Demokrat*-এর গ্রাহক সংখ্যা যদি বেশী হয়ে থাকে তবে তার কারণ **গোষ্ঠী**মাত্রেই অনিবার্যভাবে মতান্ধ এবং এই মতান্ধতার জোরে বিশেষ করে যে এলাকায় তা নতুন সেখানে (যেমন, শ্লেজভিগ-হলস্টাইনে নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ) — সে অনেক বেশি আশু সাফল্য অর্জন করে সেই পার্টির তুলনায়, যে পার্টি সবরকম গোষ্ঠীগত খামখেয়াল বর্জন করে শুধু প্রকৃত আন্দোলনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তবু মতান্ধতা ক্ষণজীবী ব্যাপার।

চিঠি শেষ করছি, ডাক যাওয়ার সময় হয়েছে বলে। শুধু তাড়াতাড়ি এইটুকু বলে নিই: ফরাসি তর্জমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত* (মোটামুটি জুলাই-এর শেষাশেষি) মার্কস লাসাল (৯৪) হাতে নিতে পারবেন না; তারপর আবার তাঁর একান্তভাবেই বিশ্রামের প্রয়োজন হবে, কারণ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি।...

F. Engels. 'Politisches Vermächtnis. Aus unveröffentlichten Briefen', Berlin, 1920
বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৩২ সালে *Bolshevik* পত্রিকার ১০ নং সংখ্যায় সম্পূর্ণ আকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত

* 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ফরাসি ভাষায় তর্জমার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

হবোকের্নাস্থিত ফ. আ. জোরগে সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১২ [-১৭] সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪

আপনার পদত্যাগে (৯৫) **পুরাতন** আন্তর্জাতিক একদম উঠে গেল, শেষ হয়ে গেল। ভালোই হল। এ ছিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (৯৬) সেই পর্বের বস্তু, যখন সারা ইউরোপব্যাপী নিপীড়নের ফলে সদ্য পুনরুদীয়মান শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে ঐক্যরক্ষা এবং সমস্ত প্রকারের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক থেকে বিরত থাকাই ছিল অবশ্যপালনীয় কাজ। সময়টা প্রলেতারিয়েতের সাধারণ এবং সর্বজাতিক স্বার্থকে সামনে তুলে ধরার উপযোগী। জার্মানি, স্পেন, ইতালি, ডেনমার্ক সবে আন্দোলনের মধ্যে এসেছে অথবা আসছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৪ সালে ইউরোপের সর্বত্র, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে, আন্দোলনের তত্ত্বগত প্রকৃতিটিই ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। শ্রমিকদের সংগঠিত পার্টি হিসেবে জার্মান কমিউনিজমের তখনও কোনো অস্তিত্ব ছিল না, নিজের বিশেষ মর্জির ঘোড়া ছোটাবার মতো শক্তি তখনও প্রুধোঁবাদ অর্জন করতে পারে নি, বাকুনিনের নয়া প্রলাপ তখনও তাঁর নিজের মগজেই আসে নি, এমনকি ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতারাও ভাবতেন, নিয়মাবলীর* মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে আন্দোলনে যোগদানের মতো ভিত্তি তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন। প্রথম বিরাট সাফল্যের ফলে সমস্ত উপদলের এই অতি সরল সম্মিলনটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে বাধ্য ছিল। এই সাফল্যই হল কমিউন। কমিউন-সৃষ্টির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক একটিও অঙ্গুলি উত্তোলন না করলেও চিন্তাধারার দিক থেকে কমিউন যে আন্তর্জাতিকেরই সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং কমিউনের জন্যে যে আন্তর্জাতিককে দায়ী করা হল তা কিছুটা পরিমাণে খুবই সঙ্গত। কিন্তু কমিউনের কল্যাণে যখন আন্তর্জাতিক ইউরোপে একটি নৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল, অমনি হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ধারাই এই সাফল্যকে নিজনিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে লাগল। শুরু হল অনিবার্য ভাঙন। একমাত্র যারা পুরাতন ব্যাপক কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করে

---

* এই সংস্করণের ৫ খণ্ড, ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

যেতে সত্যিই প্রস্তুত ছিল, সেই জার্মান কমিউনিস্টদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বেলজিয়ান প্রুধোঁপন্থীরা গিয়ে পড়ল বাকুনিনপন্থী হঠকারীদের কবলে। আসলে হেগ কংগ্রেসেই সব শেষ হয়ে গেল, — এটা ঘটল উভয় পার্টির ক্ষেত্রেই। একমাত্র দেশ যেখানে আন্তর্জাতিকের নামে তখনও কিছু করা চলত, সে হল আমেরিকা এবং এক শুভ সহজাতবোধে সর্বোচ্চ পরিচালনা-কেন্দ্র সেখানে স্থানান্তরিত করা হল। বর্তমানে সেখানেও তার মর্যাদা ফুরিয়ে এসেছে এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করার যে-কোনো চেষ্টা হবে নিছক নির্বুদ্ধিতা ও শক্তির অপচয়। দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি দিকের উপর, যে দিকটায় ভবিষ্যৎ সেই দিকের উপর, আধিপত্য করেছে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্যে সে গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু পুরাতন রূপে এই আন্তর্জাতিকের উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে। পুরাতন কায়দায় আবার একটি নতুন আন্তর্জাতিক সমস্ত দেশের সমস্ত প্রলেতারীয় পার্টির সঙ্ঘ — গঠন করতে হলে প্রয়োজন ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত যেরূপ নিপীড়ন চলেছিল শ্রমিক-আন্দোলনের উপর সেইরূপ সার্বিক নিপীড়ন। কিন্তু তার পক্ষে প্রলেতারীয় দুনিয়া অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, কয়েক বছর ধরে মার্কসের রচনাবলীর ফল ফলবার পর যে-নূতন আন্তর্জাতিক গঠিত হবে তা হবে সরাসরি কমিউনিস্ট এবং তা ঘোষণা করবে ঠিক আমাদের নীতিগুলিকেই।...

'Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge und Andere' Stuttgart 1906 বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৩৫ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের 'রচনাবলী'র প্রথম সংস্করণে ২৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ আকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

টীকা

১। 'পুঁজি' — মার্কসবাদের অসামান্য ধ্রুপদী সাহিত্য। ঊনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ার দিক থেকেই মার্কস এই গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন এবং এই রচনার কাজ চালিয়ে যান এর চল্লিশ বছর পরে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি।

'অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে রাজনৈতিক সৌধ — এই সত্যটিকে স্বীকার করার ফলে মার্কস তাঁর সবচেয়ে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুধাবনে' (ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলী', ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫)।

অর্থশাস্ত্র নিয়ে নিয়মানুগ পড়াশুনা শুরু করেন মার্কস প্যারিসে থাকতে, ১৮৪৩ সালের শেষদিক থেকে। এক্ষেত্রে তাঁর এই প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল লক্ষ করা যায় '১৮৪৪ সালের অর্থনীতি ও দর্শন-সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিসমূহ', 'জর্মান ভাবাদর্শ', 'দর্শনের দারিদ্র্য', 'মজুরিনির্ভর শ্রম ও পুঁজি', 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ও অন্যান্য রচনায়।

১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে মার্কস ৫০ ফর্মারও বেশি পৃষ্ঠা-সংবলিত একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। এখানি ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ 'পুঁজি' গ্রন্থের মোটামুটি একখানি খসড়া। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই গ্রন্থখানি ১৯৩৯-১৯৪১ সালের মধ্যে জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনাধীন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধীয় ইনস্টিটিউট গ্রন্থখানি প্রকাশ করে 'Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie' ('অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার প্রধান-প্রধান বিষয়') নাম দিয়ে। ওই একই সঙ্গে তিনি তাঁর সমগ্র গ্রন্থের একটি প্রাথমিক রূপরেখা ছকে ফেলেন ও পরবর্তী মাসগুলিতে সেটিকে বিশদ করে তোলেন। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মনস্থির করেন যে বইখানি তিনি ছয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ করবেন। পরে, অল্পদিনের মধ্যেই, অবশ্য মার্কস স্থির করেন যে বইখানি তিনি প্রকাশ করবেন অংশে-অংশে ভাগ করে, পৃথক-পৃথক বই হিসেবে।

১৮৫৮ সালে মার্কস এ-সম্বন্ধীয় প্রথম বইখানি লিখতে শুরু করেন। বইখানির নামকরণ করেন তিনি 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে।

বইখানি লেখার সময়ে মার্কস ছয় খণ্ডে বইখানি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁর প্রথম পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটিয়ে চার খণ্ডে বইটি সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করেন। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে তিনি একখানি নতুন পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি রচনা করেন; এখানি ছিল 'পুঁজি' গ্রন্থের তিনখানি তত্ত্বগত আলোচনা-সংক্রান্ত খণ্ডের প্রথম বিস্তারিত একখানি খসড়া। একমাত্র সমগ্র গ্রন্থখানি লিখে ফেলার পরই (১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে) মার্কস চরম সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। তদুপরি, এঙ্গেলসের পরামর্শ অনুযায়ী, তিনি একই সঙ্গে গোটা বইয়ের সম্পাদনা ও প্রস্তুতির ওপর জোর না-দিয়ে আগে বইখানির প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করার ও প্রকাশের ওপর মনোনিবেশ করতে মনস্থ করেন। এই চরম সম্পাদনার কাজটি মার্কস এত বিশদে ও নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন করেন যে ফলত 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের একটি সম্পূর্ণ নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যায়।

'পুঁজি'র এই প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) জার্মান ভাষায় আরও নতুন-নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতি হিসেবে এবং অন্যান্য ভাষায় বইখানির নানা অনুবাদের সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে মার্কস এই খণ্ডটি নিয়ে আরও কাজ চালিয়ে যান। ফলে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭২ সালে প্রকাশিত) তিনি বহু পরিবর্তন ঘটান এবং বইখানির রুশ সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে বিশদ নির্দেশাদি দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'পুঁজি'র রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে এবং বিদেশী ভাষায় এই সংস্করণটিই ছিল 'পুঁজি'র প্রথম অনুবাদ। এছাড়া মার্কস এই খণ্ডটির ফরাসি অনুবাদ সম্পাদনা করার সময়ে তাতে গুরুতর নানা সংশোধন ঘটান; 'পুঁজি'র এই সংশোধিত ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় দফায়-দফায় ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে।

এই একই সঙ্গে মার্কস 'পুঁজি'র বাকি খণ্ডগুলির সম্পাদনা ও প্রস্তুতির কাজও চালিয়ে যান, অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। তবে এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না, কেননা ওই সময়ে তাঁর অনেকখানি সময় ব্যয়িত হয় প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের বহুবিচিত্র কাজে তিনি লিপ্ত থাকার ফলে। তাছাড়া ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণেও ওই সময়ে ঘন ঘন তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল

'পুঁজি'র অপর দুটি খণ্ডের ছাপাখানার জন্যে প্রস্তুতি ও বই প্রকাশনার কাজ করেন এঙ্গেলস কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর। 'পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

হয় ১৮৮৫ সালে ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। এই কাজটি করতে গিয়ে এঙ্গেলস বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের তত্ত্বের সম্পদভাণ্ডারে অমূল্য অবদান যোগান। পৃঃ ৭

(২) এখানে মার্কস 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের প্রথম অধ্যায়টির ('পণ্যসামগ্রী ও অর্থ'-এর) উল্লেখ করছেন। এই খণ্ডের দ্বিতীয় ও তার পরবর্তী জার্মান সংস্করণগুলিতে উপরোক্ত ওই অধ্যায় বইয়ের প্রথম অংশে পরিণত হয়েছে। পৃঃ ৭

(৩) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ফের্ডিনান্ড লাসাল-এর 'Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder: Kapital und Arbeit'. Berlin. 1864 ('হের বাস্তিয়া শুল্টসে-ডেলিচ, অর্থনৈতিক জুলিয়ান, কিংবা পুঁজি ও শ্রম', বার্লিন, ১৮৬৪) বইটির তৃতীয় অধ্যায়ের। পৃঃ ৮

(৪) **ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকান কলোনিগুলির যুদ্ধ** (১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল) সদ্য-উদ্ভূত আমেরিকান বুর্জোয়া জাতির স্বাধীনতালাভের ও পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে বাধাগুলিকে দূরীকরণের প্রচেষ্টার ফল এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে উদ্ভূত হয় এক স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র — আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। পৃঃ ১১

(৫) **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল) — এই যুদ্ধ বেধে যায় উত্তরের শিল্পোন্নত ও দক্ষিণের বিদ্রোহী দাস-মালিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। ওই সময়ে দক্ষিণের দাস-মালিকদের সমর্থনে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর পলিসির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে এবং গৃহযুদ্ধে ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধে উত্তরের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করেছে। পৃঃ ১১

(৬) মূলে জার্মান ভাষায় এই ধরনের গির্জাকে বলে Hochkirche (বা ইংরেজিতে High Church)। এ-ধরনের গির্জা হল অ্যাংলিকান গির্জার একটি শাখা। এই গির্জার উপাসকদের মধ্যে এক সময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রাধান্য ছিল। এখানে প্রচলিত ছিল জমকালো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের রীতি, এতে প্রমাণ হয় ক্যাথলিক খ্রীস্টিয়ান ধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক। পৃঃ ১২

(৭) **ব্ল্যু বুক** — ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রিদপ্তরের প্রকাশিত কার্যবিবরণী ও কূটনৈতিক দলিলপত্রের সাধারণ নাম। মলাটের নীল রঙের জন্যে এই নাম। পৃঃ ১২

(৮) **১৮৭০-১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ** — জার্মানির সম্পূর্ণ ঐক্যসাধনে বাধা দিতে ও ইউরোপ মহাদেশে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে আগ্রহী ফ্রান্স এবং প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়। পৃঃ ১৬

(৯) S. Mayer, 'Die Sociale Frage in Wien. Studie eines 'Arbeitgebers'. Wien, 1871 (স. মেয়ার, 'ভিয়েনায় সামাজিক প্রশ্ন। একজন 'কর্মদাতার' বিশ্লেষণ', ভিয়েনা, ১৮৭১ সাল)। পৃঃ ১৬

(১০) **পবিত্র মৈত্রীজোট** — ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা ও সেই-সব দেশে সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জারের রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য। পৃঃ ১৮

(১১) বিদেশ থেকে দানা-ফসলের আমদানি সীমাবদ্ধ করা অথবা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে **শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ** ইংলন্ডে প্রবর্তিত হয় বড় ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষাকল্পে। ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের ফ্যাক্টরি-মালিকদ্বয় কবডেন ও ব্রাইট শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন ও লীগের পক্ষ থেকে অবাধ স্বাধীন বাণিজ্যের দাবি জানানো হয়। শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ বাতিল করানোর উদ্দেশ্যে লীগ লড়াই করে চলে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা এবং ভূস্বামী অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল করে তোলার উদ্দেশ্যে। এই লড়াইয়ের ফলে ১৮৪৬ সালে শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ বাতিল হয়ে যায়। এতে সূচিত হয় ভূস্বামী অভিজাতদের বিরুদ্ধে শিল্পপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিজয়। পৃঃ ১৮

(১২) *Der Volksstaat* ('গণরাষ্ট্র') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (আইজেনাখপন্থীদের) কেন্দ্রীয় মুখপত্র। লাইপজিগে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর থেকে ১৮৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভিলহেল্ম লিব্‌ক্নেখ্‌ট পত্রিকাখানির সাধারণ পরিচালনার কাজ করেন এবং আগস্ট বেবেল কাজ করেন ম্যানেজার হিসেবে। মার্কস ও এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে লেখা পাঠাতেন ও পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন। ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল *Demokratisches Wochenblatt* নামে (৫৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

এখানে আলোচ্য উল্লেখটি হল ১৮৬৮ সালে *Demokratisches Wochenblatt* পত্রিকার ৩১, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ই. ডিট্‌স্‌গেনের প্রবন্ধ 'Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie von Karl Marx', Hamburg, 1867 ('কার্ল মার্কস, 'পুঁজি'। অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা', হাম্‌বুর্গ, ১৮৬৭ সাল) বিষয়ে। পৃঃ ২১

(১৩) *The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art* ('রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রশ্নে শনিবারের পর্যবেক্ষণ') —

১৮৫৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ব্রিটিশ রক্ষণশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা। পৃঃ ২১

(১৪) **'সান-পিতের্‌বুর্গস্কিয়ে ভিয়েদমোস্তি'** ('সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পত্রিকা') — রুশ দৈনিক ও গভর্নমেণ্টের সরকারি মুখপত্র। পত্রিকাখানি এই নামে প্রকাশিত হয় ১৭২৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। অতঃপর ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এটি 'পেত্রগ্রাদ্‌স্কিয়ে ভিয়েদমোস্তি' ('পেত্রগ্রাদ পত্রিকা') নামে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ২১

(১৫) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে প্যারিস থেকে ১৮৬৭-১৮৮৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত *La Philosophie positive. Revue* ('পজিটিভিস্ট দর্শনশাস্ত্র, পরিক্রমা') নামের পত্রিকাটির কথা। পত্রিকাটির তৃতীয় বা ১৮৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় মার্কসের 'পুঁজি' বইখানির দ্য রোবের্তি-লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। দ্য রোবের্তি ছিলেন অগুস্ত কোঁত্‌-এর অস্তিবাদী দর্শনের একজন অনুসারী। পৃঃ ২২

(১৬) ন. জিবেরের লিখিত গ্রন্থ **'সাম্প্রতিকতম সংযোজন ও ব্যাখ্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে ডে. রিকার্ডোর মূল্য ও পুঁজির তত্ত্ব'**, কিয়েভ, ১৮৭১ সাল, পৃষ্ঠা ১৭০। পৃঃ ২২

(১৭) **'ভেস্ত্‌নিক ইয়েভ্রোপি'** ('ইউরোপীয় বার্তাবহ') — বুর্জোয়া-উদারনীতিক ধারার অনুসারী একখানি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ও সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ১৮৬৬ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ২২

(১৮) এই উল্লেখটি হল ব্যুক্‌নের, লাঙ্গে, ড্যুরিং, ফেখনার ও অন্যান্য জার্মান বুর্জোয়া দর্শনশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে। পৃঃ ২৬

(১৯) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে দেশের মধ্যে দিয়ে চলাচলকারী পণ্যদ্রব্যাদির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জেনোয়া, ভেনিস ও অন্যান্য উত্তর-ইতালির শহরগুলির ভূমিকা গুরুতরভাবে হ্রাস পাওয়ার কথা। ওই সময়কার প্রধান-প্রধান ভৌগোলিক আবিষ্কার এই ভূমিকাহ্রাসের কারণ। তখন আবিষ্কৃত হয় কিউবা, হাইতি ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকার মহাদেশ, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে ভারতে যাবার সমুদ্র-পথ এবং পরিশেষে দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশ। পৃঃ ৩৩

(২০) এখানে ১০৬৬ সালে নর্ম্যাণ্ডির ডিউক বিজেতা উইলিয়মের ইংলণ্ড দখলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই দখলের ফলে ইংলণ্ডে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার সহায়তা হয়। পৃঃ ৩৫

(২১) J. Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'. Vol. I, Dublin, 1770, p. 52 (জেমস স্ট্যুয়ার্ট, 'অর্থশাস্ত্রের নীতিসমূহ-সম্পর্কিত একটি অনুসন্ধান', প্রথম খণ্ড, ডাব্‌লিন, ১৭৭০ সাল, পৃষ্ঠা ৫২)। পৃঃ ৩৫

(২২) **রিফর্মেশন** (ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন) — ১৬শ শতকে জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ জুড়ে ক্যাথলিক গির্জার বিরোধী ব্যাপক সমাজ-আন্দোলন। যেসব দেশে রিফর্মেশন জয়লাভ করে সেখানে তার ধর্ম-সংক্রান্ত ফলাফল হিসেবে নতুন কয়েকটি তথাকথিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট গির্জা গড়ে ওঠে (যেমন, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, নেদার্ল্যাণ্ডস্, জার্মানির একাংশে ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে)। পৃঃ ৪০

(২৩) **'Pauper ubique jacet'** ('দরিদ্র বঞ্চিত তার অংশ থেকে সর্বত্রই') — ওভিদ-এর 'ফাস্তি' থেকে উদ্ধৃত। 'ফাস্তি', প্রথম খণ্ড, ২১৮-সংখ্যক শ্লোক। পৃঃ ৪১

(২৪) **স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশের পুনঃক্ষমতাপ্রাপ্তি** — ইংলণ্ডে স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশের দ্বিতীয় বারের শাসনের পর্যায় (১৬৬০-১৬৮৯)। ১৭শ শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবে এই রাজবংশের উৎখাত ঘটে। পৃঃ ৪৪

(২৫) যতদূর মনে হচ্ছে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৫৯৭ সালে জারি-করা পলাতক কৃষকদের খুঁজে বের করা সম্বন্ধীয় জারের হুকুমনামাটির। এই হুকুমনামা জারি হয় জার ফিয়দর ইভানোভিচের শাসনকালে, যখন বরিস গদুনোভই ছিলেন রুশদেশের আসল শাসনকর্তা। এই হুকুমনামা অনুযায়ী, ভূস্বামীদের অসহনীয় উৎপীড়ন-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যে-সমস্ত কৃষক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেত তাদের পাঁচ বছরের মধ্যে খুঁজে বের করে বলপ্রয়োগে তাদের প্রাক্তন মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোত। পৃঃ ৪৪

(২৬) 'Glorious Revolution' ('গৌরবময় বিপ্লব') — ইংলণ্ডে ১৬৮৮ সালের ওপর-মহলের ক্ষমতাদখলকে ইংরেজ বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তারা এই নামে অভিহিত করে আসছেন। এই ক্ষমতাদখলের ফলে স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হয় এবং ইংলণ্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় (১৬৮৯ সালে) অরেঞ্জের উইলিয়মের প্রভুত্বাধীনে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজবংশ। জমির মালিক প্রাক্তন অভিজাত সম্প্রদায় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিপত্তিশালী লোকেদের মধ্যে এক আপস-মীমাংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই রাজবংশটি। পৃঃ ৪৪

(২৭) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ৩৬৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমের সাধারণ মানুষের নির্বাচিত দুই শাসক লিসিনাস ও সেক্সটিউসের প্রবর্তিত কৃষি-আইনটির কথা। রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনভিজাত সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ফল ছিল এটি। এই আইন অনুযায়ী কোনো রোমান নাগরিক ঊর্ধ্বপক্ষে ৫০০ ইউগেরের (বা আনুমানিক ৩০৯ একরের) বেশি রাষ্ট্রীয় জমির মালিকানা রাখতে পারত না। পৃঃ ৫০

(২৮) মার্কস এখানে স্টুয়ার্ট-রাজবংশের সমর্থকদের ১৭৪৫-১৭৪৬ সালের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করছেন। বিদ্রোহীরা চেয়েছিল তথাকথিত 'তরুণ দাবিদার' চার্লস এডওয়ার্ডকে ইংলন্ডের সিংহাসনে বসাতে। ওই একই সঙ্গে এই অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল জমিদারদের শোষণ ও জমি থেকে ব্যাপক হারে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ড ও ইংলন্ডের জনসাধারণের প্রতিবাদও। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করার পর স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে এক সর্দারের অধীনে একবংশীয় উপজাতিদের একত্র বাসের প্রথা দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে, জমি থেকে কৃষকদের বিতাড়নও বৃদ্ধি পায়। পৃঃ ৫৩

(২৯) স্কটল্যান্ডে এক সর্দারের অধীনে একবংশীয় উপজাতিদের গোষ্ঠীবদ্ধ একত্র বাসের প্রথার অধীনে গোষ্ঠী-সর্দার বা 'লেয়ার্ড' (মহাজন)-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে যে-সমস্ত প্রবীণ সদস্য থাকত তাদের বলা হোত 'টাক্‌স্‌মেন'। লেয়ার্ড এই প্রবীণ সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণে ছেড়ে দিত ওই সমগ্র উপজাতি-গোষ্ঠীটির যৌথ সম্পত্তি বা জমি ('টাক')। লেয়ার্ড-এর সর্বময় প্রভুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রবীণরা তাকে অল্প-পরিমাণ কর দিত। আবার এই টাক্‌স্‌মেন তাদের অধীনস্থ জমি ভাগ করে দিত তাদের অধীন সামন্ত-সর্দারদের মধ্যে। ক্রমে এই উপজাতি-গোষ্ঠী প্রথার ভাঙন ধরার ফলে লেয়ার্ড-রা পরিণত হল জমিদারে এবং টাক্‌স্‌মেন কার্যত পরিণত হল পুঁজিতন্ত্রী খামারীতে। এরই সঙ্গে সঙ্গে আগেকার সেই করের বদলে চালু হয়ে গেল জমিবাবদ খাজনা দেয়ার রীতি। পৃঃ ৫৩

(৩০) গেইলজাতি — উত্তর ও পশ্চিম স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের আদি অধিবাসী ও প্রাচীন কেল্টজাতির উত্তরপুরুষ। পৃঃ ৫৪

(৩১) মার্কস এখানে ১৮৫৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে *The New York Daily Tribune* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'নির্বাচন — আর্থিক ব্যাপারে মেঘসঞ্চার — সাদারল্যান্ডের ডাচেস ও ক্রীতদাস-প্রথা' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করছেন।

The New York Daily Tribune —১৮৪১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত একখানি প্রগতিশীল আমেরিকান বুর্জোয়া সংবাদপত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত এই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে প্রবন্ধাদি পাঠাতেন। পৃঃ ৫৬

(৩২) **ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত) — প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রীস্টিয়ানদের মধ্যে বিরোধের ফলে বেধে-ওঠা এক সর্ব-ইউরোপীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন ছিল জার্মানি, যুদ্ধে জড়িত দেশগুলির সামরিক লুণ্ঠন ও সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষারও শিকার হয়েছিল সেই দেশ। পৃঃ ৫৮

(৩৩) **শিল্প-সমিতি** (The Royal Society of Arts) — ১৭৫৪ সালে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত একটি বুর্জোয়া শিক্ষাদান-সংক্রান্ত ও জনহিতব্রতী সমিতি। পৃঃ ৫৯

(৩৪) *The Economist* ('অর্থনীতিবিৎ') — অর্থনীতি ও রাজনীতি-বিষয়ক ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা; ১৮৪৩ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রতিপত্তিশালী শিল্পপতি বুর্জোয়াদের মুখপত্র এটি। পৃঃ ৬০

(৩৫) Petty Sessions ('খুদে মামলার বিচার-অধিবেশন') — ছোটখাট অপরাধের বিচারের জন্যে ও অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের সভা। পৃঃ ৬৬

(৩৬) A. Smith. 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'. Vol. I, Edinburgh, 1814, p. 237. (অ্যা. স্মিথের গ্রন্থ: 'জাতিসমূহের ঐশ্বর্যের প্রকৃতি ও তা সংগ্রহের সূত্রগুলি সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান', প্রথম খণ্ড, এডিনবরা, ১৮১৪ সাল, পৃষ্ঠা ২৩৭)। পৃঃ ৬৯

(৩৭) [Linguet, N.]. 'Théorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société', T. I, Londres, 1767, p. 236. পৃঃ ৬৯

(৩৮) শ্রমিকদের যে-কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করে **সঙ্ঘগুলির বিরুদ্ধে আইনসমূহ** ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে। ১৮২৪ সালে পার্লামেণ্ট ওই আইনগুলি নাকচ করে দেয় এবং ১৮২৫ সালে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়। তবে আইনগুলি নাকচ হয়ে যাওয়ার পরেও শ্রমিক-ইউনিয়নগুলির কাজকর্ম বহুলাংশে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। এমনকি ইউনিয়নসমূহে নিছক প্রবেশের জন্যেও শ্রমিকদের আন্দোলন ও ধর্মঘটে তাদের যোগদানকেও 'জবরদস্তি' ও 'সহিংস' ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য করা হোত এবং এগুলিকে অপরাধ গণ্য করে শ্রমিকদের দণ্ড দেয়া হোত। পৃঃ ৭০

(৩৯) **'ষড়যন্ত্রের'** বিরুদ্ধে আইনসমূহ এমনকি সেই সুদূর মধ্যযুগেও ইংলণ্ডে চালু ছিল। একালে এই আইনের বলে শ্রমিকদের সংগঠনসমূহ ও সেগুলির আয়োজিত

শ্রেণী-সংগ্রামকে দমন করা হয়ে আসছে — যেমন সংঘসমূহের বিরুদ্ধে আইনসমূহ (৩৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য) গৃহীত হওয়ার আগে তেমনই ওই আইনগুলি নাকচ হয়ে যাওয়ার পরেও। পৃঃ ৭৩

(৪০) এই উল্লেখটি ফ্রান্সে ১৭৯৩ সালের জুন মাস থেকে ১৭৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জেকবিন একনায়কতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে। পৃঃ ৭৪

(৪১) A. Anderson. 'An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce, from the Earliest Accounts to the Present Time' (অ্যা. অ্যাণ্ডারসন, 'প্রারম্ভিক তথ্য থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাণিজ্যের ঐতিহাসিক ও কালানুক্রমিক বিবরণী') বইটির প্রথম সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৭৬৪ সালে। পৃঃ ৭৯

(৪২) J. Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'. Vol. I, Dublin, 1770, First book, Ch. XVI (জে. স্টুয়ার্ট, 'অর্থশাস্ত্রের মূলভিত্তি-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ', প্রথম খণ্ড, ডাব্লিন, ১৭৭০ সাল, প্রথম অংশ, ষোড়শ অধ্যায়)। পৃঃ ৮০

(৪৩) ১৫৬৬ থেকে ১৬০৯ সালের মধ্যে সংঘটিত বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে স্পেনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব থেকে নেদারল্যাণ্ডস্ (আধুনিক বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের মিলিত ভূখণ্ড) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বুর্জোয়া বিপ্লবে দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনসাধারণ মিলিত হয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে। বারকয়েক যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পরে ১৬০৯ সালে স্পেন বাধ্য হয় বুর্জোয়া ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে। আধুনিক বেলজিয়মের ভূখণ্ডটি কিন্তু ১৭১৪ সাল পর্যন্ত স্পেনের শাসনাধীনে রয়ে যায়। পৃঃ ৮৯

(৪৪) এখানে ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধগুলির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃঃ ৮৯

(৪৫) **আফিম-যুদ্ধ** — এগুলি হল ১৮৩৯-১৮৪২ সালের মধ্যে পরিচালিত চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের এবং ১৮৫৬-১৮৫৮ সাল ও ১৮৬০ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের মিলিত আগ্রাসী যুদ্ধ। প্রথমবার এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল চীনদেশে ইংরেজদের আফিমের চোরা-চালানের বিরুদ্ধে চীনা কর্তৃপক্ষের সরকারি ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে। এর ফলেই এই যুদ্ধগুলির নামকরণ হয় আফিম-যুদ্ধ। পৃঃ ৮৯

(৪৬) **ইস্ট-ইণ্ডিয়া কম্পানি** — এই ব্রিটিশ ব্যবসায়ী কম্পানিটি টিকে ছিল ১৬০০ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এবং ভারতে, চীনে ও অন্যান্য এশীয় দেশে ব্রিটিশের সম্প্রসারণবাদী ঔপনিবেশিক নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে এটি ছিল প্রধান হাতিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে এই কম্পানিটি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে ছিল এবং ভারতে রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বের অধিকারী ছিল। ১৮৫৭-১৮৫৯ সালে ভারতে জাতীয় মুক্তির অভ্যুত্থান ঘটায় ইংলণ্ড বাধ্য হয় তার ঔপনিবেশিক শাসনের ধরন বদলাতে ও ১৮৫৮ সালে কম্পানিটিকে ভেঙে দিতে। পৃঃ ৯১

(৪৭) মার্কস এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন গুস্টাভ গ্যুলিখ-এর বই 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit' ('আমাদের কালের প্রধান বাণিজ্যনির্ভর রাষ্ট্রগুলির ব্যবসায়, শিল্প ও কৃষির ঐতিহাসিক বর্ণনা')-এর প্রথম খণ্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠা থেকে। বইটি ১৮৩০ সালে জেনা থেকে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৯৩

(৪৮) আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মার্কস এখানে পূর্বে-অনুমিত ইয়ান ডে উইট-এর 'Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Friesland' ('ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র ও পশ্চিম ফ্রিস্‌ল্যাণ্ডের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক নীতি ও maxim-এর উল্লেখ') বইখানির ইংরেজি সংস্করণটির কথা উল্লেখ করেছেন। মূল বইখানি লাইডেন থেকে ১৬৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে আসলে বইখানি মূলত লিখেছিলেন ওলন্দাজ অর্থনীতিবিৎ ও ব্যবসায়ী পিটার ফন ডের হোর (বা পিটার ডে লা কুর) এবং বইয়ের কেবল দুটিমাত্র পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন ইয়ান ডে উইট। পৃঃ ৯৭

(৪৯) **সাত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৭৪৬ থেকে ১৭৬৩ সাল) — সামন্ততান্ত্রিক রাজবংশ-শাসিত রাষ্ট্রগুলির সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে উপনিবেশ বিস্তার-সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সর্ব-ইউরোপীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স ব্রিটেনকে তার প্রধান-প্রধান উপনিবেশ (যেমন, কানাডা, ইস্ট-ইণ্ডিয়ায় অবস্থিত উপনিবেশসমূহ, ইত্যাদি) ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও স্যাক্সনি সমর্থ হয় তাদের যুদ্ধপূর্ব উপনিবেশগুলি রক্ষা করতে। পৃঃ ৯৮

(৫০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে **ইউট্রেখ্‌টের সন্ধিচুক্তি** সম্বন্ধে। এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ১৭১৩ সালে একপক্ষে ফ্রান্স ও স্পেন এবং অন্যপক্ষে ফরাসিবিরোধী

মৈত্রীজোটের রাষ্ট্রগ্‌নলির (যেমন, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড্‌স্‌, পোর্তুগাল, প্রাশিয়া ও অস্ট্রীয় হ্যাপ্‌স্‌বার্গ-রাজবংশগ্‌নলির) মধ্যে। এর ফলে স্পেনের অধিকৃত উপনিবেশগ্‌নলি কেড়ে নেয়ার জন্যে অন্‌ষ্ঠিত দীর্ঘস্থায়ী য্‌দ্ধের (একে বলা হয় ১৭০১ থেকে ১৭১৪ সালের 'স্পেনের উত্তরাধিকারের য্‌দ্ধ') অবসান ঘটে। এই চুক্তির শর্ত অন্‌যায়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও উত্তর আমেরিকার কয়েকটি ফরাসি ও স্পেনীয় উপনিবেশ ও সেইসঙ্গে জিব্রাল্টারের কর্তৃত্ব লাভ করে ব্রিটেন।

আসিয়েন্তো — যে-সমস্ত চুক্তি অন্‌যায়ী যোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে স্পেন কিছ্‌-কিছ্‌ বিদেশী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবিশেষকে তার আমেরিকান উপনিবেশগ্‌নলিতে নিগ্রো ক্রীতদাস বিক্রির বিশেষ অধিকার দান করে এটি সেই চুক্তিসমূহের সাধারণ নাম। প্‌ঃ ১০০

(৫১) Tantae molis erat (এতখানি পরিশ্রমের ম্‌ল্যে) — এই বাক্যাংশটি নেয়া হয়েছে ভার্জিলের কাব্যগ্রন্থ 'Aeneid'-এর প্রথম খণ্ডের ৩৩-সংখ্যক শ্লোক থেকে। প্‌ঃ ১০৩

(৫২) C. Pecqueur. 'Théorie nouvelle d'économie sociale et politiques, ou Études sur l'organisation des sociétés'. Paris, 1842, p. 435. (ক. পেকার, 'সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতির নতুন তত্ত্ব, অথবা সমাজ-সংগঠন সংক্রান্ত গবেষণা', প্যারিস, ১৮৪২ সাল, পৃষ্ঠা ৪৩৫)। প্‌ঃ ১০৫

(৫৩) এঙ্গেলস এই প্রবন্ধটি লেখেন *Demokratisches Wochenblatt* পত্রিকার জন্যে। মার্কসের 'প্‌বজি' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের যে-সমালোচনাগ্‌নলি লেখেন তিনি এটি তার মধ্যে একটি। 'প্‌বজি' গ্রন্থের ম্‌ল তত্ত্বগ্‌নলিকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলসের লেখা এই সমালোচনাগ্‌নলি শ্রমিক ও গণতন্ত্রীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রমিকদের অন্‌ধাবনের জন্যে প্রবন্ধাদি লেখা ছাড়া এঙ্গেলস ব্‌র্জোয়া সংবাদপত্রেও বেনামে কয়েকটি আলোচনা-প্রবন্ধ লেখেন — সরকারিভাবে স্বীকৃত অর্থশাস্ত্রীরা ও ব্‌র্জোয়া সংবাদপত্র-জগৎ প্রতিভার এই শ্রেষ্ঠ অবদানকে 'নৈঃশব্দ্যের ষড়্‌যন্ত্র' দিয়ে যেভাবে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছিল তা থেকে তাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। এই শেষোক্ত প্রবন্ধগ্‌নলিতে এঙ্গেলস 'প্‌বজি'র সমালোচনা করেন 'ব্‌র্জোয়া দ্‌ষ্টিভঙ্গি থেকে', ব্‌র্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা যাতে বইখানির আলোচনা করতে বাধ্য হন তার জন্যে মার্কস-কথিত উপরোক্ত এই হাতিয়ারটি তিনি এই প্রবন্ধগ্‌নলিতে ব্যবহার করেন।

Demokratisches Wochenblatt ('গণতান্ত্রিক সাপ্তাহিক') — ১৮৬৮ সালের জান্‌য়ারি থেকে ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাইপজিগ থেকে ভিল্‌হেল্ম লিব্‌ক্নেখ্‌টের সম্পাদনায় জার্মান শ্রমিকদের এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জার্মান

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠনের কাজে পত্রিকাটির অবদান অসামান্য। ১৮৬৯ সালের আইজেনাখ কংগ্রেসে পত্রিকাটিকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং নতুন নামকরণ হয় *Volksstaat* ('গণরাষ্ট্র')। মার্কস ও এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখতেন। পৃঃ ১১০

(৫৪) প্রথম আন্তর্জাতিকের **রুশ শাখা** প্রতিষ্ঠিত হয় সুইজারল্যাণ্ডে ১৮৭০ সালের বসন্তকালে। এই শাখা-সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা করেন একদল দেশান্তরী রুশ রাজনীতিবিৎ। এঁরা ছিলেন মহান বিপ্লবী গণতন্ত্রী চের্নিশেভ্স্কি ও দব্রলিউবভের চিন্তাধারায় লালিত সাধারণ ঘরের যতসব তরুণবয়সী গণতন্ত্রী। ১৮৭০ সালের ১২ মার্চ তারিখে রুশ শাখার নেতৃস্থানীয় কমিটি সাধারণ পরিষদের কাছে শাখার কর্মসূচি ও নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেয় এবং মার্কসের কাছে লেখা এক চিঠিতে তাঁকে অনুরোধ জানায় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদে ওই শাখার তরফে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে।

রুশ শাখার সদস্যবৃন্দ সুইস ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। শাখাটি রুশদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গেও সংযোগস্থাপনে উদ্যোগী হয়। এর অস্তিত্ব লোপ পায় ১৮৭২ সালে। পৃঃ ১২৭

(৫৫) **'গোপনীয় চিঠি'**খানি মার্কস লেখেন ১৮৭০ সালের ২৮ মার্চ তারিখ নাগাদ, যখন আন্তর্জাতিকের মধ্যে থেকে বাকুনিনপন্থীরা সাধারণ পরিষদ, মার্কস ও তাঁর মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলে। এমনকি এর আগেই, ১৮৭০ সালের ১ জানুয়ারি সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ সভায় এই ব্যাপারটি নিয়ে একটি গোপন সার্কুলার-চিঠি (সে-চিঠিও মার্কসের লেখা) গৃহীত হয়। এই চিঠিখানি লেখা হয় বাকুনিনপন্থীদের প্রবল প্রভাবের অধীন সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসি-ভাষাভাষী অঞ্চলের ফেডেরাল পরিষদের কাছে। পরে এই চিঠির অনুলিপি বেলজিয়ম ও ফ্রান্সেও পাঠানো হয়। জার্মানিতে চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মার্কস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃস্থানীয় কমিটির কাছে উপরোক্ত যে-'গোপনীয় চিঠি'খানি পাঠান তার মধ্যে এই সার্কুলার-চিঠির পাঠ পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ওই 'গোপনীয় চিঠি'র ৪র্থ ও ৫ম-সংখ্যক বক্তব্যবিষয়-দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে প্রকাশ পেয়েছে ব্রিটিশ শ্রমিক ও আইরিশ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাকুনিনপন্থীরা বিশেষ করে এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল বিরোধিতা করছিল।

ওই সময়ে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সাধারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ

শ্রমিক-আন্দোলন যে-ভূমিকা পালন করে চলেছিল তার কথা এবং ফলত ওই আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের বিশেষ দায়িত্বের কথা মনে রেখেই মার্কস আলোচ্য ৪র্থ-সংখ্যক বক্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন কেন অন্যান্য দেশের মতো ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিকের একটি ফেডেরাল পরিষদ গঠন করা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী নয়।

৫ম-সংখ্যক বক্তব্যে আয়র্ল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডকে উদাহরণ হিসেবে ধরে মার্কস পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যে সংযোগসূত্রটি এবং প্রলেতারিয়েতের স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে নিপীড়িত জাতিসমূহের ভূমিকাটি তুলে ধরেছেন। পৃঃ ১২৯

(৫৬) **L'Égalité** ('সাম্য') — **সুইস সাপ্তাহিক পত্রিকা। আন্তর্জাতিকের রোমান্স** ফেডারেশনের মুখপত্র। জেনেভা থেকে ফরাসি ভাষায় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কিছুকাল বাকুনিনের প্রভাবাধীন ছিল। ১৮৭০ সালের জানুয়ারিতে রোমান্স ফেডেরাল পরিষদ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাকুনিনপন্থীদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। অতঃপর পত্রিকাটি আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অনুসৃত নীতি সমর্থন করতে শুরু করে। পৃঃ ১২৯

(৫৭) **The Pall Mall Gazette** ('প্যাল ম্যাল পত্রিকা') —১৮৬৫ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একখানি দৈনিক পত্রিকা। ১৮৬০'এর ও ১৮৭০'এর দশকে পত্রিকাটি রক্ষণশীল মতামতের পোষকতা করে। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৭০ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮৭১ সালের জুন মাসের মধ্যে পত্রিকাটিতে প্রবন্ধাদি লেখেন।

The Saturday Review — ১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

The Spectator ('দর্শক') — উদারনৈতিক ভাবধারার ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮২৮ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

The Fortnightly Review ('পক্ষকালীন সমীক্ষা') ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ব্রিটিশ বুর্জোয়া-উদারনৈতিক পত্রিকা। ১৮৬৫ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই নামে পত্রিকাটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ১৩০

(৫৮) **ভূমি ও শ্রম-লীগ** আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় লণ্ডনে, ১৮৬৯ সালের অক্টোবর মাসে। নিম্নোক্ত দাবিদাওয়া লীগের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল যথা, জমির জাতীয়করণ, অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী শ্রমদিন, সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং কৃষি-কলোনিসমূহের প্রতিষ্ঠা। তবে ১৮৭০

সালের হেমন্তঋতু নাগাদ লীগে প্রাধান্যবিস্তার করে বসে বুর্জোয়া ব্যক্তিবিশেষরা এবং ১৮৭২ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিকের সঙ্গে লীগের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পৃঃ ১৩০

(৫৯) এখানে ১৮৬৯ সালের গ্রীষ্মকাল ও শরৎকালে আয়র্ল্যান্ডের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদানকারী বন্দীদের মুক্তির দাবি-সম্পর্কিত আন্দোলনে সাধারণ পরিষদের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃঃ ১৩১

(৬০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর **ব্রিটিশ-আইরিশ সংযুক্তি** সম্পর্কে। এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে আয়র্ল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায়, আইরিশ পার্লামেন্ট যায় বাতিল হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত আয়র্ল্যান্ড হয়ে পড়ে ব্রিটেনের পুরোপুরি পদানত। পৃঃ ১৩১

(৬১) প্রথম আন্তর্জাতিকের **লন্ডন সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালের ১৭ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। প্যারিস কমিউনের পরাজয়ের পরে আন্তর্জাতিকের সদস্যদের ওপর যে-সময়ে কঠোর দমনপীড়ন শুরু হয় সেই সময়ে এই সম্মেলনটি আহূত হওয়ার ফলে সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায়। সম্মেলনে যোগ দেন ভোটদানের অধিকার সহ ২২ জন প্রতিনিধি এবং বক্তব্য উপস্থাপনার অধিকার সহ কিন্তু ভোটদানের অধিকারবঞ্চিত আরও ১০ জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি। যে-সমস্ত দেশ সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারণ পরিষদের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকবৃন্দ। এইভাবে মার্কস প্রতিনিধিত্ব করেন জার্মানির আর এঙ্গেলস ইতালির।

প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস যে-সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন তখন, লন্ডন সম্মেলন তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এই সম্মেলন থেকে 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন'-বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রস্তাবের প্রধান অংশটি আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রলেতারীয় পার্টির বহু গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত ও সংগঠন-সংক্রান্ত নীতি লন্ডন সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে সেই প্রথম দৃঢ়ভাবে সূত্রবদ্ধ হয় আর এগুলি একই সঙ্গে সংকীর্ণতাবাদ ও সংস্কারবাদের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় দলগত আনুগত্যের নীতিগুলিকে তুলে ধরার ব্যাপারে লন্ডন সম্মেলন এক প্রধান ভূমিকা পালন করে। পৃঃ ১৩৪

(৬২) ১৮৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির সভায় সাধারণ পরিষদ প্যারিস কমিউনের প্রথম স্মরণবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে লণ্ডনে ১৮ মার্চ তারিখে একটি জনসভার অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। শেষ মুহূর্তে বাড়ির মালিক সভা অনুষ্ঠানের জন্যে হলঘরটি ভাড়া দিতে অস্বীকার করায় সভাটি নির্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তৎসত্ত্বেও ওই ১৮ মার্চ তারিখেই আন্তর্জাতিকের সদস্যবৃন্দ ও প্রাক্তন কমিউনার্দরা প্রথম প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্মরণবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে অপর এক স্থানে একটি সভার অনুষ্ঠান করেন। বিশেষ করে এই উপলক্ষে মার্কসের লেখা তিনটি সূত্রাকার প্রস্তাব উপরোক্ত ওই সভায় গৃহীত হয়। পৃঃ ১৩৬

(৬৩) কমিউনের অস্তিত্বকালে ভার্সাইয়ে (প্যারিসের নিকটে) তিয়েরের প্রতিবিপ্লবী সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। এই সরকার প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের শরিকদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। পৃঃ ১৩৬

(৬৪) **'জমির জাতীয়করণ'**-বিষয়ক এই পাণ্ডুলিপিটি কৃষি-সমস্যার ক্ষেত্রে একটি প্রধান মার্কসবাদী দলিল। আন্তর্জাতিকের ম্যাঞ্চেস্টার-শাখায় জমির জাতীয়করণ-বিষয়ক প্রশ্নটি নিয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়। ৩ মার্চ তারিখে এঙ্গেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে সাধারণ পরিষদের সদস্য দ্যুপোঁ জানান যে কৃষি-সমস্যার প্রশ্নে উপরোক্ত শাখার সদস্যদের মতামতের মধ্যে নানা ভুল ধারণার অবকাশ দেখা দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ রিপোর্টের পাঁচ দফা বক্তব্য-বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসকে তাঁদের মন্তব্য লিখিতভাবে পাঠাতে আমন্ত্রণ জানান, যাতে তিনি ম্যাঞ্চেস্টার-শাখার সভা অনুষ্ঠানের আগেই তার প্রস্তুতি হিসেবে মার্কস-এঙ্গেলসের মন্তব্যগুলি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এ-প্রসঙ্গে মার্কস জমির জাতীয়করণ-বিষয়ে তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে লিখে পাঠান আর দ্যুপোঁ তাঁর রিপোর্টে মার্কসের এই মতামতের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহারে কার্পণ্য করেন না। জমির জাতীয়করণ সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে মার্কস এই প্রশ্নটিকে এক বিরাট সমস্যা বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সমস্যাটি প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সমগ্রভাবে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের কর্তব্যকর্মগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃঃ ১৩৮

(৬৫) ১৮৬৮ সালের ৬-১৩ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের ব্রাসেল্‌স কংগ্রেসে রেলপথ, ভূ-সম্পত্তি, খনি ও আবাদী জমি সামাজিক মালিকানার অধীন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৃঃ ১৪১

(৬৬) আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির **হেগ কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালের ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই কংগ্রেসে ১৫টি জাতীয় সংগঠনের ৬৫ জন

প্রতিনিধি যোগ দেন। কংগ্রেসের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে সর্বপ্রকার পেটি-বুর্জোয়া সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুসারীরা বহু বছর ধরে যে-সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলেন এই কংগ্রেসে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটতে দেখা যায়। নৈরাজ্যবাদীদের সংকীর্ণ মতান্ধ ক্রিয়াকলাপ নিন্দিত হয় এখানে এবং আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন নৈরাজ্যবাদী নেতৃবৃন্দ। হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর স্বনির্ভর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। পৃঃ ১৪৩

(৬৭) হেগ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার পর (৬৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) মার্কস ও অন্য প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিকের স্থানীয় শাখা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আমস্টার্ডামে যান। ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্কস সেখানকার শাখার এক সভায় হেগ কংগ্রেসের আলোচনার ফলাফল নিয়ে বক্তৃতা করেন। প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ভাবধারাকে অক্লান্তভাবে সমর্থন জানিয়েও মার্কস এই বক্তৃতায় বিভিন্ন দেশে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ধরনধারণের সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। তিনি দেখান যে ওই উত্তরণের ধরন নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর, তা নির্ভর করে শ্রেণী-শক্তিসমূহের প্রতি-তুলনা ও সেগুলির অনুপাতের ওপর। ওই বক্তৃতায় তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে বৈপ্লবিক সহিংস ক্রিয়াকলাপের (যা তখনকার ওই পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ দেশেই প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করার ব্যাপারে অপরিহার্য ছিল) পাশাপাশি কিছু-কিছু দেশে (যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সম্ভবত নেদারল্যাণ্ডসে) তৎকাল-প্রচলিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে (সুসংগঠিত আমলাতান্ত্রিক ও সমরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতির জন্যে) প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে বৈপ্লবিক সহিংস আন্দোলনের সাহায্য ছাড়াই। পৃঃ ১৪৫

(৬৮) এখানকার এই উল্লেখটি হল ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্লিনে তিন সম্রাটের — প্রথম ভিলহেল্ম (জার্মানি), ফ্রানজ্ জোসেফ (অস্ট্রো-হাঙ্গেরি) ও দ্বিতীয় আলেকসান্দরের (রাশিয়া) — মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে। পৃঃ ১৪৭

(৬৯) **Literarisches Centralblatt für Deutschland** ('জার্মানির কেন্দ্রীয় সাহিত্য-পত্রিকা') — বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সমালোচনা-সংবলিত জার্মান সাপ্তাহিক পত্রিকা। লাইপজিগ থেকে ১৮৫০-১৯৪৪ সালের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৪৯

(৭০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে 'পংজি' গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়টি 'পণ্যসামগ্রী ও অর্থ' সম্পর্কে। পৃঃ ১৪৯

(৭১) David Ricardo, 'On the Principles of Political Economy, and Taxation', London, 1821, p. 479 (ডেভিড রিকার্ডো, 'অর্থশাস্ত্র ও শুল্ক ব্যবস্থার মূলনীতি প্রসঙ্গে', লণ্ডন, ১৮২১ সাল, পৃষ্ঠা ৪৭৯)। পৃঃ ১৫০

(৭২) **মিউচুয়ালিস্ট**—১৮৬০'এর দশকে প্রুধোঁপন্থীরা নিজেদের এই নামে অভিহিত করতেন, কারণ তাঁরা শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা (বা mutual aid) সংগঠিত করে (যেমন, সমবায় সমিতি, পারস্পরিক সহায়তা সমিতি, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করে) তাদের মুক্ত করার এক সংস্কারবাদী পেটি-বুর্জোয়া পরিকল্পনার কথা প্রচার করতেন। পৃঃ ১৫২

(৭৩) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলনে গৃহীত নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে। যথা, 'জাতীয় পরিষদসমূহ, ইত্যাদির সূচক আখ্যা' (দ্বিতীয় প্রস্তাব, ১, ২, ও ৩-সংখ্যক ধারা), 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন' (নবম প্রস্তাব), 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সঙ্ঘ' (ষোড়শ প্রস্তাব) এবং 'সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসি-ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা' (সপ্তদশ প্রস্তাব)। পৃঃ ১৫৪

(৭৪) সেদানে ফরাসি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে **১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর** তারিখে প্যারিসের জনসাধারণ বহুতরো বৈপ্লবিক শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। এর ফলে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং দেশে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয় নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীরা ও সেইসঙ্গে রাজতন্ত্রবাদীরাও। নতুন গভর্নমেণ্টের প্রধান হন প্যারিসের ফৌজী শাসনকর্তা ত্রোশু, আর তিয়ের ছিলেন সমগ্র ব্যবস্থাটির আসল হোতা। এ'দের দুজনেরই মনোভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী ও ভূস্বামীদের পরাজিতের মনোভাব ও জনগণ সম্বন্ধে আতঙ্ক। রাজ্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই এ'রা জাতিগত বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশের পথ ধরেন। পৃঃ ১৫৫

(৭৫) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্ন-এ অনুষ্ঠিত শান্তি ও স্বাধীনতা-বিষয়ক লীগ'-এর কংগ্রেসে বাকুনিনের রচিত জগাখিচুড়ি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিটি (যেমন, 'শ্রেণীসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাবিধান', রাষ্ট্রের এবং উত্তরাধিকার-ব্যবস্থার বিলোপসাধন, ইত্যাদি) গ্রহণ করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে বাকুনিনের প্রয়াসের কথা। কংগ্রেসের অধিবেশনে

অধিকাংশের ভোটে তাঁর এই কর্মসূচি যখন প্রত্যাখ্যাত হল তখন বাকুনিন উপরোক্ত লীগের সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ' গঠন করলেন। পৃঃ ১৫৬

(৭৬) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৬৯ সালের ৬-১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সংগঠন-সংক্রান্ত প্রশ্নে সুইজারল্যাণ্ডের বাসেল কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাদি সম্পর্কে। এইসব প্রস্তাবের বলে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এক্তিয়ার সম্প্রসারিত করা হয়। পৃঃ ১৫৮

(৭৭) **Il Proletario** ('প্রলেতারিয়ান')—১৮৭২ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত তুরিন থেকে প্রকাশিত একটি ইতালীয় সংবাদপত্র। পত্রিকাটি ছিল বাকুনিনপন্থীদের সমর্থক এবং সাধারণ পরিষদ ও লণ্ডন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদির বিরোধী।

Gazzettino Rosa ('রক্তবর্ণ সংবাদপত্র')—একটি ইতালীয় দৈনিক পত্রিকা। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত মিলান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সালে এটি প্যারিস কমিউনের সমর্থনে দাঁড়ায়, পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক থেকে প্রচারিত দলিলপত্রাদি ছেপে বের করে। ১৮৭২ সাল থেকে পত্রিকাটি বাকুনিনপন্থীদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। পৃঃ ১৫৮

(৭৮) **La Liberté** ('মুক্তি')—১৮৬৫ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত ব্রাসেলস্ থেকে প্রকাশিত একখানি গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। ১৮৬৭ সাল থেকে পত্রিকাটি বেলজিয়মে আন্তর্জাতিকের অন্যতম মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৫৯

(৭৯) **১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা**—লণ্ডনের ফরাসি শরণার্থীদের একাংশ ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটি গঠন করেন। এই শাখা-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সুইস বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ চালান আন্তর্জাতিকের সংগঠন-সংক্রান্ত নীতিসমূহের বিরুদ্ধে। সংগঠনটির নিয়মাবলীর কয়েকটি ধারা আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলীর পরিপন্থী হওয়ায় একে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। পরবর্তী কালে এই শাখা-সংগঠনটি ভেঙে কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। পৃঃ ১৬০

(৮০) ১৮৭১ সালের ১২ নভেম্বর তারিখে সাঁভিলিয়েরে (সুইজারল্যাণ্ড) অনুষ্ঠিত বাকুনিনপন্থীদের জুরা ফেডারেশনের কংগ্রেসে গৃহীত **'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সকল শাখা-ফেডারেশনের নিকট প্রেরিতব্য সার্কুলার-পত্র'** সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সার্কুলার-পত্রে ১৮৭১ সালের লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এক্তিয়ারকে অস্বীকার করা হয় এবং সকল শাখা-ফেডারেশনকে এইমর্মে পরামর্শ দেয়া হয়

যাতে সংগঠনগ্নলি আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলীর প্ননর্বিচার ও সংশোধনসাধনের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ পরিষদকে বর্জন করার জন্যে অবিলম্বে একটি কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানায়। পৃঃ ১৬১

(৮১) **শ্রমিক ফেডারেশন**—১৮৭১ সালের শরৎকালে তুরিন শহরে গড়ে-ওঠা প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান; প্রতিষ্ঠানটি ব্র্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন ছিল। পৃঃ ১৬১

(৮২) **Ficcanaso** ('অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী')—ইতালীয় প্রজাতন্ত্রীদের দৈনিক ব্যঙ্গ-পত্রিকা। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত তুরিনে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৬১

(৮৩) **La Révolution Sociale** ('সামাজিক বিপ্লব')—১৮৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৮৭২ সালের জান্নয়ারি পর্যন্ত জেনেভা থেকে প্রকাশিত ফরাসি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৭১ সালের নভেম্বর থেকে পত্রিকাটি নৈরাজ্যবাদী জ্নরা ফেডারেশনের সরকারি ম্নখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৬১

(৮৪) **Égalité** —৫৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬১

(৮৫) এঙ্গেলস এখানে স'ভিলিয়ের কংগ্রেসে যোগদানকারী ষোলটি ফেডারেশনের সার্কুলার-পত্রের জবাবে রোমান্স ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কমিটি'র চিঠিখানির উল্লেখ করছেন। পৃঃ ১৬১

(৮৬) ১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৮৭) জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের **স্যাক্সন কংগ্রেসের** অধিবেশন বসে ১৮৭২ সালের ৬-৭ জান্নয়ারি তারিখে খেম্‌নিট্‌সে। কংগ্রেসে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের (যেমন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, ট্রেড ইউনিয়নসম্নহের সংগঠন, ইত্যাদির) সঙ্গে স'ভিলিয়ের কংগ্রেসের (৮০ নং টীকা দ্রষ্টব্য) সার্কুলার-পত্র ও আন্তর্জাতিকের ভেতরে নৈরাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিষয়গ্নলিও আলোচিত হয়। স্যাক্সন কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ পরিষদকে সমর্থন জানানো হয় এবং ১৮৭১ সালে অন্নষ্ঠিত লন্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবগ্নলিও সমর্থিত হয়। পৃঃ ১৬২

(৮৮) **আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বেলজিয়ান ফেডারেশনের অন্নষ্ঠিত কংগ্রেস,** এই কংগ্রেস অন্নষ্ঠিত হয় ব্রাসেল্‌সে ১৮৭১ সালের ২৪-২৫ ডিসেম্বর তারিখে। স'ভিলিয়ের কংগ্রেসের সার্কুলার-পত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস অবশ্য স্নইস নৈরাজ্যবাদীদের অবিলম্বে এক সাধারণ কংগ্রেস আহ্বানের দাবিকে সমর্থন করে না, তবে তা বেলজিয়ান ফেডেরাল পরিষদকে নির্দেশ দেয় পরবর্তী হেগ

কংগ্রেসে (৬৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) আলোচনার জন্যে আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর একটি নতুন খসড়া তৈরি করতে। পৃঃ ১৬২

(৮৯) **Neuer Social-Demokrat** ('নয়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাট')—১৮৭১ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে প্রকাশিত একটি জার্মান সংবাদপত্র ও লাসালপন্থী নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘের মুখপত্র। সংবাদপত্রটি বাকুনিনপন্থীদের ও অন্যান্য প্রলেতারীয়-বিরোধী চিন্তাধারাকে সমর্থন করে এবং আন্দোলন চালায় আন্তর্জাতিকের মার্কসবাদী নেতৃত্ব ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে। পৃঃ ১৬২

(৯০) ১৮৭১ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গোপন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের দায়ে কয়েকজন ছাত্র আলোচ্য এই নেচায়েভ-মামলায় অভিযুক্ত হয়। এর আগে ১৮৬৯ সালে নেচায়েভ বাকুনিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং রুশদেশের কয়েকটি শহরে 'নারদনায়া রাস্‌প্রাভা' (বা 'জনগণের প্রতিশোধ') নামে এক গোপন সমিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল 'সামগ্রিক ধ্বংস'এর নৈরাজ্যবাদী ধ্যানধারণা প্রচার করা। বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ছাত্রছাত্রী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা নেচায়েভের এই সংগঠনে যোগ দেয় জার-গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগঠনটির তীব্র সমালোচনায় ও ওই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রাম শুরু করার আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে। নেচায়েভ বাকুনিনের কাছ থেকে তথাকথিত 'ইউরোপীয় বিপ্লবী ইউনিয়নের' প্রতিনিধির শংসাপত্র পেয়েছিলেন এবং তা লোককে দেখিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি বলে চালাতেন ও নিজ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যকে ধোঁকা দিতেন। ১৮৭১ সালে নেচায়েভের এই সংগঠন ভেঙে যায় এবং সংগঠনের সদস্যদের উপরোক্ত বিচারের মামলায় সংগঠনটির কার্যকলাপের হঠকারী রীতি-পদ্ধতি জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পৃঃ ১৬৩

(৯১) **নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ**—১৮৬৩ সালে লাসালের সক্রিয় সহযোগে গঠিত জার্মান শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সঙ্ঘটি সর্বজনীন নির্বাচনাধিকারের জন্যে সংগ্রামে এবং শান্তিপূর্ণ পার্লামেণ্টারি কার্যকলাপের সীমানায় নিজের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সঙ্ঘের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয়। পৃঃ ১৬৫

(৯২) ১৮৬৯ সালের ৭-৯ অগস্ট তারিখে আইজেনাখ-এ অনুষ্ঠিত জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এক সর্ব-জার্মান কংগ্রেসে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই

পার্টির কর্মসূচি আন্তর্জাতিকের উপস্থাপিত নির্দেশাদির মর্মবস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পৃঃ ১৬৬

(৯৩) গ. ভ. ফ. হেগেল, 'Phänomenologie des Geistes', 'Die Wahrheit der Aufklarung'। পৃঃ ১৬৯

(৯৪) ১৮৭২-১৮৭৩ সালে লিব্‌ক্রেখ্‌ট ও হেপ্‌নার বারবার মার্কসকে অনুরোধ জানান লাসালের চিন্তাধারার সমালোচনা করে হয় একখানি পুস্তিকা আর নয়তো **Der Volksstaat** পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখতে। পৃঃ ১৬৯

(৯৫) ১৮৭৪ সালের অগস্ট মাসে জোর্গে সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৮৭৪ সালের ১৪ অগস্ট তারিখে এঙ্গেলসকে তা জানিয়ে দেন। সরকারিভাবে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন ১৮৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে। পৃঃ ১৭০

(৯৬) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য (১৮৫২-১৮৭০) সম্পর্কে। পৃঃ ১৭০

নামের সূচি

উ

এ

ও

ক

গ

ল

ফ্রান্সের রাজা (১৭৭৪-১৭৯২), অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় এঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। —৬৬

লুথার (Luther), **মার্টিন** (১৪৮৩-১৫৪৬) — ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী, জার্মানিতে প্রোটেস্টান্টবাদের (লুথারপন্থা) প্রতিষ্ঠাতা; জার্মান বার্গারবাদের ভাবাদর্শী। —৯৩

লেব্লাঁ (Leblanc), **আলবের ফেলিক্স** (জন্ম ১৮৪৪ সালে) — আন্তর্জাতিকের প্যারিস-শাখার সদস্য, বাকুনিনপন্থীদের দলে যোগ দেন, প্যারিস কমিউনের সদস্য ছিলেন; কমিউনের দমনের পর ইংলণ্ডে চলে আসেন দেশান্তরী হয়ে, পরে বোনাপার্টপন্থী হন। —১৬২

লেভি (Levi), **লেওন** (১৮২১-১৮৮৮) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ, পরিসংখ্যায়ক, আইনজীবী। —৫৯

লে শাপেলিয়ে (Le Chapelier), **আইজাক রেনে গাই** (১৭৫৪-১৭৯৪) — ফরাসি রাজনীতিক, প্রতিক্রিয়াশীল, শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন ও ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ করে (১৭৯১ সালে) যে-আইন পাশ হয় তার প্রণেতা ছিলেন; জেকোবিনদের একনায়ক-শাসনের কালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। —৭৪

লেসিং (Lessing), **গট্‌হোল্ড এফ্রাইম** (১৭২৯-১৭৮১) — প্রখ্যাত জার্মান লেখক, সমালোচক ও দর্শনশাস্ত্রী, অষ্টাদশ শতকের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু। —২৬

শ

শ্‌ভাইট্‌সার (Schweitzer), **ইয়োহান বাপ্টিস্ট** (১৮৩৩-১৮৭৫) — জার্মানিতে লাসালীয় মতবাদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা, নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি, জার্মান শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করেন। —১৫৩, ১৬০

শরলেমার (Schorlemmer), **কার্ল** (১৮৩৪-১৮৯২) — বিশিষ্ট জার্মান জৈব-রসায়নশাস্ত্রী, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনুসারক; জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য; মার্কস-এঙ্গেলসের বন্ধু। —১২৩

শুল্‌ট্‌সে-ডেলিচ (Schulze-Delitzsch), **ফ্রান্ট্‌স হের্মান** (১৮০৮-১৮৮৩) — জার্মান রাজনীতিবিৎ ও অতি-সরলীকরণবাদী অর্থনীতিবিৎ; নানাবিধ সমবায় সমিতি গঠন করে ইনি শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে আনার প্রয়াস পান। —৮

শেক্সপিয়র (Shakespeare), **উইলিয়ম** (১৫৬৪-১৬১৬) — মহান ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। —৭৭

শেলে (Scheele), **কার্ল ভিলহেল্ম** (১৭৪২-১৭৮৬) — সুইডিশ রসায়নশাস্ত্রী। —১২২, ১২৩, ১২৪

স

সল (Scholl) — ফরাসি শ্রমিক, আন্তর্জাতিকের লিয়ঁ-শাখার সদস্য,

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

আদম — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী মাটি দিয়ে ঈশ্বরের হাতে তৈরি প্রথম মানুষ। আদম নিষেধ লঙ্ঘন করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল। —২৮

এবেল — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী আদমের পুত্র; ঈর্ষার কারণে বড় ভাই কেইন-এর হাতে নিহত। —৮৬

কেইন — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী আদমের বড় ছেলে। কেইন তার ভাই এবেলকে হত্যা করে। —৮৬

পারসিয়ুস (গ্রীক পুরাণ) — জিউস ও ডানি-র পুত্র; বহু-কীর্তিমান; ইনি মেডুসার মাথা কেটে ফেলেন। —১১

মেডুসা (গ্রীক পুরাণ) — দানবী; যে-কোনো মানুষ এর দিকে তাকালে তাকে পাথরে পরিণত করার ক্ষমতা রাখত এই দানবী। —১০